পারাপার | শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পারাপার

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

“রা-স্বা”

বন্দে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

আমার বাবা ও মা
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্তা গায়ত্রী মুখখাপাধ্যায়
শ্রীচরণেষু

সূচিপত্র

সাতাশ
আটাশ
উনত্রিশ
ত্রিশ
একত্রিশ
বত্রিশ
তেত্রিশ
চৌত্রিশ
পঁয়ত্রিশ
ছত্রিশ
সাঁইত্রিশ
আটত্রিশ
উনচল্লিশ
চল্লিশ
একচল্লিশ

এক

হাসপাতাল থেকে ললিতকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাত্র দু'টি লোক এসেছিল। বাড়িওয়ালার ছেলে শম্ভু, আর বহুকালের অভিন্নহৃদয় সেই তুলসী। ইচ্ছে করেই আর কাউকে ছাড়া পাওয়ার তারিখটা জানায়নি ললিত, জানালে হয়তো আরও কেউ কেউ আসত। কিন্তু ললিত ভেবে দেখেছে, এ-সময়টায় খুব বেশি লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া ভাল নয়। যদিও ডাক্তার তাকে কিছুই স্পষ্ট করে বলেনি, তবু সে জানে এটা ঠিক আরোগ্য নয়, খুবই সাময়িক এই ভাল হয়ে যাওয়া। এটা নিয়ে একটুও আনন্দ করার কিছু নেই।

পেটের ভিতরের পুরনো ব্যথাটা আর নেই, তবু বিছানা থেকে লিফট পর্যন্ত হেঁটে আসতে পেটের অপারেশনের কাটা জায়গাটায় টান লাগার একটা ব্যথা সে টের পাচ্ছিল। আসল ব্যথাটার তুলনায় এ-ব্যথাটা কিছুই নয়, তাই সে তুলসী কিংবা শম্ভুর কাঁধে ভর দিল না, আস্তে আস্তে একাই হেঁটে এল। লিফটে নেমে রাস্তা পর্যন্ত আসতে তার কষ্ট হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল পেটের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় একটা ছেঁড়া নাড়ি দোল খাচ্ছে, ওই নাড়িটায় বোধহয় তার শরীরের কোনও যন্ত্র ছিল, যেটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সে অনেকদিন ধরে ভেবে এসেছে যে, বাইরে এলে লোকজনের চলাচল, ট্রাম-বাস আর খোলা আলো-বাতাসের মধ্যে হঠাৎ খুব ভাল লাগবে। তার শরীর আর মন জুড়ে পুরনো চেনা কলকাতা ঝমঝম করে বাজনার মতো বেজে উঠবে।

বস্তুত সে-রকম কিছুই ঘটল না। পড়ন্ত বেলার সূর্যের আলো তার চোখে এসে লাগল। ট্রাম-বাস লোকজনের ভিড় নিয়ে কলকাতা বয়ে যাচ্ছে ঠিকই, এবং ঝমঝম বাজনার মতোই শব্দ হচ্ছে চার দিকে। কিন্তু সে অনুভব করল তার শরীর নিস্তব্ধ, মনেও কোনও চঞ্চলতা নেই। হাতে চোখ আড়াল করে সে দেখল রাস্তার ও-পারে বড় কলেজ-বাড়িটার গায়ে লাল কালিতে লেখা পোস্টার, টেলিফোনের তারে কাক বসে আছে, সেই পুরনো ময়লা ঘিঞ্জি কলকাতা।

তুলসী একটু এগিয়ে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ট্যাক্সির জন্য, সামান্য হাঁফ ধরে গিয়েছিল, আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্টও হচ্ছিল বলে ললিত শম্ভুর কাঁধে একটু ভর দিয়ে হেলে দাঁড়াল। যদিও এখন শরৎকাল, তবু সে খুব ঘামছিল এখন। শম্ভু একটা হাত বাড়িয়ে পিঠের দিক দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। ললিতের মনেই হচ্ছিল না যে দু' মাস সে ঘরে বন্দি ছিল, দু' মাস সে এইসব রাস্তাঘাট দেখেনি; বরং তার মনে হচ্ছিল, আজ সকালেই সে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছে। এত চেনা সবকিছু, এত একঘেয়ে।

একমাত্র মায়ের জন্যই গত দু' মাস যাবৎ একটা দুশ্চিন্তা ছিল ললিতের। দু' মাসে মা মাত্র কয়েকবার দেখতে এসেছে তাকে। গত দু' মাস সে তুলসী কিংবা শম্ভু আসামাত্রই মায়ের কথা জিজ্ঞেস করত। আজ ভুল হয়ে গেছে। আজকের দিনটা অন্য রকমের বলেই এই ভুল। তবু তুলসী যখন চলতি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে বলল, আয় রে ললিত, তখন হঠাৎ সে খেয়াল করে শম্ভুকে প্রশ্ন করল, মা কেমন আছে রে?

শম্ভু হাসল, ভালই।

ভালই! ললিত 'ভালই' কথাটা নিয়ে মনে মনে সামান্য নাড়াচাড়া করতে করতে ট্যাক্সিতে উঠল। না, মা ভাল নেই, ভাল থাকার কথাও নয়। লাম্বাগো আর বাতে পঙ্গু মা ভাল করে হাঁটাচলাও করতে পারে না, প্রায় সময়েই হামাগুড়ি দিয়ে কাজকর্ম করে। মাকে ভাল রাখার চেষ্টা কোনও দিন তেমন করে করেওনি ললিত। একা একা মা'র সারাদিন কাটে, ললিত বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। এখন ট্যাক্সির সিটে এলিয়ে পড়ে থেকে সে মনে মনে ভাবল এবার থেকে সে মায়ের কাছে কাছে বেশি করে থাকবে।

তুলসীর দিকে মুখ ফিরিয়ে ললিত বলল, তোর কাছে সিগারেট নেই রে?

আছে। বলে তুলসী পকেটে হাত দিল। তারপর থেমে বলল, খাবি?

দে না।

একটু ভাবল তুলসী, তারপর সস্তা সিগারেটের প্যাকেটটা আর দেশলাই এগিয়ে দিয়ে বলল, খা, কী আর হবে! সেরে যখন গেছিস...

শেষ কথাটা অনাবশ্যক। তাকে শুনিয়ে বলা। সিগারেট ধরাতে গিয়ে মৃদু একটু হাসল ললিত। মুখে কিছু বলল না সে, কিন্তু মনে মনে বলল, ক্যানসার সারে না রে তুলসী, ক'মাস পর হয়তো তোকে আমার খাটে কাঁধ দিতে হবে।

সিগারেটের স্বাদ ভুল হয়ে গেছে। ধোঁয়াটা কর্কশ আর গন্ধটা বিদ্‌ঘুটে লাগছিল ললিতের। সে দেখল সামনের সিটে শম্ভু বসে সোজা রাস্তায় তাকিয়ে আছে, তুলসীর মুখও বাইরের দিকে ফেরানো। দু'জনেই খুব গম্ভীর, চিন্তিত। এই গুমোটটা ভেঙে দেওয়ার জন্যই ললিত শম্ভুকে ডেকে বলল, হ্যাঁরে শম্ভু, তুই জিমনাশিয়ামে এখনও যাচ্ছিস? শ্রী-ফ্রি একটা কিছু পেলি?

শম্ভু মুখ ফিরিয়ে একটু হাসল, কিছু বলল না।

একাই কথা বলছিল ললিত। তুলসীকে ডেকে বলল, দেখ তুলসী, এই গরিব দেশে শম্ভুটা একাই চারজনের খোরাকি টেনে নিচ্ছে। সরকারের উচিত জিমনাশিয়ামগুলি বন্ধ করে দেওয়া। শম্ভুটা ফ্যানভাত, পালং সেদ্ধ, লাল আটার রুটি কত কিছু বায়নাক্কা যে শুরু করে সকাল থেকে রাত অবধি যে, ওর স্বাস্থ্যের ধাক্কায় বাড়িসুদ্ধ লোক রোগা হয়ে গেল। ওরে শম্ভু, মাসিমা এখনও তোর খাওয়া নিয়ে খিটখিট করে?

শম্ভু হাসিমুখ ফিরিয়ে বলল, এখন আর করছে না কিছুদিন। আমি সার্জেন্টের চাকরিতে সিলেক্টেড হয়ে আছি ক'দিন হল। এখন খাওয়াচ্ছে খুব।

হাসল ললিত। শম্ভু বেশ বুদ্ধি করে উত্তর দিয়েছে। কথা টেনে নিয়ে ললিত বলল, সার্জেন্ট! সেই লাল মোটর সাইকেল আর কোমরে পিস্তল! দূর, ওটা একটা চাকরিই নয়।

কেন?

কলকাতার সার্জেন্টগুলো কেবল রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করে বেড়ায়, আর কোনও কাজ নেই।

খোলা গলায় শম্ভু হাসছিল। আর তখন তুলসী একটা হাত বাড়িয়ে ললিতের হাতে রেখে চাপ দিয়ে বলল, তুই এত কথা বলিস না ললিত।

কেন?

তুলসী চুপ করে রইল। ওর মুখের রসকষহীন চিন্তার ভাবটুকু আড়চোখে দেখল ললিত। ডাক্তার সম্ভবত ওকে কিছু বলেছে! কী বলেছে তা ললিত ওর মুখের ভাবটুকু থেকে সহজেই আন্দাজ করতে পারছিল। আজকালকার বাচ্চা ছেলেরাও এ-রোগের পরিণাম জানে। তুলসী তাই অত গম্ভীর। এমনই দুশ্চিন্তা ওর যে, এখন যে ললিতকে ভুলিয়ে রাখা দরকার সে-কথাও ওর খেয়াল নেই, নইলে নিজের মুখে অন্তত নকল একটা খুশির ভাব ওর ফুটিয়ে তোলা উচিত ছিল।

রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে ট্রাফিকের লাল আলোয় তাদের ট্যাক্সি থামাল। সামনে-পিছনে দুটো ডবলডেকার আর পাশে একটা লরি এসে দাঁড়ানোয় হঠাৎ ট্যাক্সিটাকে খুব ছোট্ট আর অসহায় বলে মনে হচ্ছিল ললিতের। চারপাশের গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে তাদের ট্যাক্সির ভিতরটাকে মুহূর্তের মধ্যে গুমোট করে দিল। ললিত মুখ বের করে ট্রাফিকের আলোর দিকে চেয়ে ছিল। বরাবর তার সবচেয়ে প্রিয় হল মাঝখানের ক্ষণস্থায়ী হলুদ বাতিটি, ঝলসে উঠলে নিজের শরীরের ভিতরে একটা গভীর অনুভূতি সে টের পায়। অনেকদিন সে বাতিটি দেখেনি ললিত।

শম্ভু পাঞ্জাবি ট্যাক্সিওয়ালাকে বলছিল সে যেন সামনের ডবলডেকারটাকে পার হয়ে সোজা রাস্তা ধরে। ললিত হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বলল, না রে শম্ভু, গাড়ি বাঁ দিকে ঘোরাতে বল।

কেন?

একটু ঘুরেফিরে যাই। অনেকদিন কলকাতা ভাল করে দেখা হয়নি। সর্দারজি, বাঁয়ে ঘোরে...

ট্যাক্সি বাঁ দিকে ঘুরল।

শম্ভু বলল, দূর। মিটার উঠবে।

তুলসী মুখ ফিরিয়ে বলল, উঠুক।

শম্ভুর দোষ নেই। শম্ভু বরাবর ট্যাক্সিকে সোজা পথেই নিয়ে যেতে শিখেছে। প্রয়োজনেই তাদের ট্যাক্সিতে চড়া, তাই চড়েও শান্তি থাকে না, উগ্র চোখে চেয়ে সতর্ক থাকতে হয় যাতে ড্রাইভার এতটুকু ঘুরপথে না নিয়ে যেতে পারে। তাই ললিত তুলসীর দিকে চেয়ে একটু হাসল।

তুলসী বুঝল কি না বলা যায় না। শুধু আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবি?

প্রশ্নটা ললিত শুনতেই পেল না। তুলসীর দিকে তাকিয়ে সে তুলসীর কথাই ভাবছিল। তার সন্দেহ হচ্ছিল যে তুলসী বোধহয় আর তার সমবয়স্ক বন্ধু নেই। গত দু' মাসে সে হয়ে গেছে অন্য সম্পর্কের মানুষ। ললিতের বাপ-কাকার মতো কেউ যদি জীবিত থাকত তবে এখন এ-অবস্থায় তাদের মুখের ভাব বোধহয় অনেকটা তুলসীর মতোই হত। তার অজান্তে কখন যেন তুলসী তার অভিভাবক হয়ে গেছে, সন্দেহ হয়, পুরনো বন্ধুত্বের সহজ সম্পর্কটা আর কোনও দিন ফিরে আসবে কি না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল সখেদে তুলসীকে ডেকে বলে, তুলসী, তোকে কী বলে ডাকব এখন বল তো! কাকু না জেঠু?

তুলসী কলকাতার বাইরে একটা স্কুলে চাকরি করে। রোজ যাতায়াত করতে হয়। তা ছাড়া ললিত হাসপাতালে থাকার সময়েই মাসখানেক আগে তুলসীর বিয়ে হয়ে গেল। এত সব ব্যস্ততা, বিয়ে, রোজ স্কুলে যাতায়াত সব সামলেও প্রায় রোজই তুলসী তার কাছে এসেছে। মাঝে মাঝে দেখাশোনা করেছে মায়ের। হাসপাতালে থাকার সময়ে তুলসীই ছিল তার সবচেয়ে বড় সহায়। সম্ভবত সেই সময়েই আস্তে আস্তে তাদের

সম্পর্কটা পালটে গেছে। বস্তুত এখন তুলসীর মুখ দেখে, ওকে একবার 'শালা' বলে ডাকতে, কিংবা ওর বউ নিয়ে একটু রসিকতা করতে ইচ্ছে থাকলেও লজ্জা করছিল ললিতের।

কোথায় যাবি? তুলসী আবার জিজ্ঞেস করে।

বেশি দূর না। গড়িয়াহাটা হয়ে লেকের ধার ঘেঁষে সাদার্ন অ্যাভেনিউ ধরে ফিরে যাব।

শম্ভু মুখ ফিরিয়ে বলল, মাসিমা বসে আছে কিন্তু আপনার জন্যে। যত তাড়াতাড়ি পারি নিয়ে আসব বলে তাঁকে দরজায় বসিয়ে রেখে এসেছি। আপনি না গেলে মাসিমা দরজা ছেড়ে নড়বেন না।

শম্ভুর ভাঙাচোরা চৌকো শক্ত শিরা-ওঠা তেলতেলে মুখটার দিকে অলস চোখে চেয়ে হঠাৎ ললিতের ইচ্ছে করছিল বলে, মা আমার জন্য চিরকাল বসে আছে অপেক্ষায়, আমার জন্মেরও আগে থেকে। এই দেরিটুকু মা'র সইবে।

কিন্তু কথাটা খুব দার্শনিক হয়ে যাবে, শম্ভু মোটেই বুঝতে পারবে না বলে ললিত বলল না। কেবল ম্লান হাসল একটু। তারপর চোখ বুজল। তার ইচ্ছেমতো ট্যাক্সি চলতে লাগল।

মাঝে মাঝে চোখ খুলে ললিত দেখছিল ভিড়ের গড়িয়াহাটা ছাড়িয়ে গেল তার গাড়ি, লেক পার হল হু হু হাওয়ায় উড়ে, তারপর বাঁক নিল বাঁয়ে, মাথার ওপর দিয়ে টালিগঞ্জের রেলপোল চলে গেল, আনোয়ার শা রোড হয়ে এসে থামল তাদের সরু গলির মধ্যে বাসার সামনে।

তুলসী নেমে দরজা খুলে ধরে রইল। সামান্য অস্বস্তি বোধ করে ললিত। শালা তুলসীটা তাকে বাদের খাতায় ধরে নিয়েছে। দৃষ্টিকটু রকমের ভদ্রতা করে যাচ্ছে ও। তাই মাটিতে পা দিয়ে ললিত ইচ্ছে করেই খুব জোরে ঝপাং শব্দে ট্যাক্সির দরজাটা বন্ধ করল।

উলটো দিকের বাড়ির বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে-থাকা রায়বাবু মুখের সামনে থেকে বইটা নামিয়ে ঝুঁকে বললেন, আরে, ললিত!

ললিত হাসল।

উনি বললেন, তুমি তো একদম ভাল হয়ে গেছ। স্বাস্থ্য ফিরে গেছে তোমার।

ললিত আবার হাসল।

রায়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, বাঃ! চমৎকার!

ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করার শব্দে সামনের ঘরের দরজা খুলে গিয়েছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে মৃদু একটু হাসলেন শম্ভুর মা, এলে ললিত?

ললিত হাসল। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সামনের ঘরটায় অনেকজন মেয়ে-বউ। আর সেই ভিড়ের মধ্যে মায়ের চশমার ঘোলা কাচ দুটো ঝকমক করে উঠল। পাড়া-পড়শিরা মাকে ঘিরে বসে আছে।

এখন সামান্য একটু লজ্জা করছিল ললিতের। সামনের ঘরটা শম্ভুদের। তাদের ঘরটা পিছনের দিকে। এখন এই অন্যের ঘরে একগাদা চেনা আধচেনা মেয়ে-বউয়ের সামনে মা তাকে পেয়ে কী যে করবে ভেবে পাচ্ছিল না ললিত। হয়তো জড়িয়ে ধরে কাঁদবে, হয়তো বিলাপ করবে।

খুবই সংকোচের সঙ্গে সে দরজায় উঠে দাঁড়িয়ে রইল। শম্ভুর মা ডাকলেন, ভিতরে এসো ললিত।

ললিত ঢুকল না। ঘরের ভিতরে বাস্তবিক জায়গা নেই। সামনেই ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারে মা বসে আছে। তার চারধারে মেঝেতে এবং চৌকিতে পাঁচ-সাতজন মা'র বয়সিই প্রবীণ মহিলা। এঁরা কেউ কেউ

সধবা। ললিত জানে এঁরাই মা'র অবসরের সঙ্গী, নিঃসঙ্গতার সহায়। সে যখন বাড়িতে থাকে না তখন এঁরাই আসেন যেচে। ললিত তাই নিশ্চিন্ত থাকে। আজও এঁরা এসেছেন তাকে দেখতে। সে কেমন ভাল হয়ে ফিরে এল।

ললিত মাকে দেখল। এক পলকেই বোঝা যায় মা'র চেহারা অনেক পালটে গেছে। এমন নয় যে, মা আরও রোগা কিংবা বুড়ো হয়ে গেছে। তা নয়। কিন্তু হঠাৎ মনে হয় যেন মা আরও বোকা হয়ে গেছে। মুখটা সামান্য খোলা, ভ্যাবলা একটা বোধবুদ্ধিহীন দৃষ্টি তার চোখে। নীচের ঠোঁটটা আবেগে সামান্য কাঁপছে। মা তার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল। হঠাৎ ধক করে উঠল ললিতের বুক, মা কি কিছু বুঝতে পারছে!

রোগা দুটো হাতে চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে মা উঠবার জন্য চেষ্টা করছিল। একবার কোথাও বসলে মা আর সহজে দাঁড়াতে পারে না, কোমরে রস জমে যায়। শম্ভুর মা মা'র পাশে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললেন, দেখুন দিদি, ললিত কেমন সুন্দর চেহারা নিয়ে ফিরেছে!

সকলেই তাকে দেখছিল। ললিত অনুভব করে সকলের চোখেমুখেই একটা নিশ্চিন্ত ভাব। সন্দেহ হয় এরা কেউ ললিতের অসুখটার বিষয়ে ভাল করে কিছু জানে না। মাকেও জানানো হয়নি। জানালেও মা সঠিক বুঝতে পারত কি না কে জানে! মা শুধু জানে যে, তার গুরুতর একটা কোনও অসুখ করেছিল, এখন সেরে গেছে।

চশমা খুলে মা তার থানের আঁচল তুলে চোখের জল মুছছিল। দৃশ্যটা অনেকবার দেখা ললিতের। অনেক ছোটখাটো কারণেও মাকে অনেকবার কাঁদতে দেখেছে ললিত, কোনও দিনই সে মা'র কান্না দেখে খুব বিচলিত হয়নি। আজ কিন্তু সে তার বুকের মধ্যে গুরগুর শব্দে হৃৎপিণ্ডের ডেকে ওঠার শব্দ শুনল।

মায়ের কাছে যা ললিত। করুণাভরা গলায় এ-কথা বললেন মিতুর ঠাকুমা। মিতু— যার বিয়ে হয়ে গেছে বড় বাড়িতে, যাকে এক সময়ে ললিতের বড় পছন্দ ছিল। মিতুর ঠাকুমা থেকে আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে সবাইকে দেখছিল ললিত। এঁরা কেউ মিতুর ঠাকুমা, কেউ মুনুর পিসিমা, কেউ বীরুর মা। এ-সব সম্পর্কের ওপরেই এঁদের পরিচয় বেঁচে আছে, নাম ধরে ডাকার কেউ নেই। বেশির ভাগই বুড়ো অথর্ব অসহায়। এঁরা প্রাণভরে লোককে আশীর্বাদ করে, অভিশাপ দেয়। কোনওটাই শেষ পর্যন্ত ফলে না। এই অসহায়দের দলে মাকেই সবচেয়ে বেশি অসহায় বলে আজ মনে হচ্ছিল ললিতের। সে ছাড়া তার মায়ের আর কেউ নেই, তারও নেই মা ছাড়া আর কেউ। সে আজ মায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে মনে মনে সামান্য অস্থির হয়ে পড়ল।

ঘরের ভিতরে ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না ললিতের। ঘরের আবহাওয়াটা কেমন বুড়োটে, গুমোট হয়ে আছে। তা ছাড়া বাইরে তুলসী দাঁড়িয়ে আছে।

মায়ের কান্নাটা যে দুঃখের ছিল না এটা বুঝতে একটু সময় লাগল ললিতের। সুখে কখনও সে মাকে এর আগে কাঁদতে দেখেনি।

কষ্টেসৃষ্টে নড়বড়ে শরীরটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল মা, ফোকলা তোবড়ানো মুখে অদ্ভুত একটু হেসে সকলের দিকে চেয়ে অনুমতি ভিক্ষে করল, ললিতকে ঘরে নিয়ে যাই?

ললিত বুঝল ওই চাওয়াটুকুর মধ্য দিয়েই সকলের কাছ থেকে ললিতের জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষে করে নিল। সকলেই সহৃদয়ভাবে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল মাকে। মিতুর ঠাকুমা মুখ বাড়িয়ে বলল, এবার ললিতের একটা বিয়ে দাও গো, ললিতের মা!

ললিত মায়ের কাঠের মতো শুকনো দুর্বল একখানা হাত ধরে সিঁড়িটা সাবধানে নামিয়ে আনল। নামতে নামতে মা মুখ ঘুরিয়ে মিতুর ঠাকুমাকে বলল, তোমরা আশীর্বাদ করো বাছা। ছেলেকে তো তোমরা জানোই, আমি বুড়ো অথর্ব হয়ে গেছি, চোখে ভাল দেখি না, তোমরাই বেছেগুছে পছন্দ করে দাও।

সকলেই সমস্বরে কথা বলে উঠল। হ্যাঁ, তারা ললিতকে জানে, হ্যাঁ এমন ছেলে! তারা দেখবে ললিতের জন্য একটি মেয়ে। কোনও চিন্তা নেই। মিতুর ঠাকুমা গলা বাড়িয়ে বলল, ললিতের পছন্দের কেউ আছে কি না খোঁজ নিয়ে গো ললিতের মা!

ললিতের মন বলল, ছিল। মিতু। তার তো বিয়ে হয়ে গেছে।

তুলসীর দিকে একখানা হাত বাড়াল মা, আঃ তুলসী, ললিতকে ফিরিয়ে এনেছিস।

শম্ভুদের বাড়ির পিছন দিকে তাদের ঘর, সরু একটা গলির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ঘরের তালা খুলতে খুলতে মা বলল, দেখ তুলসী, সারাদিন ঘর ছেড়ে নড়বার উপায় নেই আমার। ললিতটা বাইরে বাইরে ঘোরে, আর এই লক্ষ্মীছাড়া ঘর আগলে আমার থাকা। কত কিছু আছে কলকাতায়, কালীঘাট, রামকৃষ্ণের মঠ, ভাগবত রামায়ণ পাঠ। সবাই যায়, কেবল আমারই কিছু হয় না। বসে থাকতে থাকতে দেখ আমায় বাতে ধরেছে। তারা মেয়ে দেখ, আমি ললিতের বিয়ে দিই...

শরীরে এত কষ্ট মা'র তবু তাদের ছোট ঘরখানা ঝকমক করে, ললিতের তক্তপোশে ধবধবে চাদর পাতা।

ললিত সামান্য হাঁপাচ্ছিল। বিছানায় বসতে-না-বসতেই সে গড়িয়ে পড়ল। বলল, মা, এক গ্লাস জল দাও।

দিই বলে মা তবু তুলসীর সঙ্গে কথা বলে, তুই রোজ এসে ওকে বোঝাবি। কেন, মাস্টাররা কি বিয়ে করে না? তুই করিসনি?

খোলা জানালার ওপর সতেজ একটা পেয়ারার ডাল এসে পড়েছে। সিলিঙে ঘুরছে কোন আদ্যিকালের পুরনো ফ্যানটা। দেয়ালে সেই সূর্যাস্ত আর তিনটে ডিঙি নৌকোর ছবিওলা ক্যালেন্ডার। আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইল ললিত।

আর মাস কয়েক পরে এই ঘরের এই বিছানায় শুয়ে তার মৃত্যু হতে পারে।

মায়ের কথাগুলো আর বুঝতে পারছিল না ললিত। কেবল তার একঘেয়ে গলার স্বর তার কানে আসছিল। অনেক অনেকদিন পরে আজ তার হঠাৎ মনে হল এই স্বর তার বড় প্রিয়। এই রকম আরও কত কী প্রিয় ছিল ললিতের। তার কোনওটা হয়তো বা ওই জানালার ওপর হেলে-পড়া পেয়ারার ডাল, কিংবা ওই সূর্যাস্তের ছবিটির মতোই তুচ্ছ।

কাত হয়ে শুয়ে সে মায়ের মুখখানা দেখছিল। দাঁত-পড়া, তোবড়ানো একখানা মুখ। বুড়ি। মাঝে মাঝে আঁচলে নাক মুছে নেওয়ার মুদ্রাদোষ। এই তার মা।

জল চেয়েছিল ললিত, মা জল দিতে ভুলে গেল। আর-একবার চাইতে ইচ্ছে হল না তার। কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে সামান্য তন্দ্রা আর আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে গেল সে।

মা তুলসীর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল। একটানা, একই রকম স্বরে। সে-সব কথা আর ললিতের কানে ঢুকছিল না। চোখের পাতা ভারী হয়ে পরস্পর মিতুর ঠোঁটের মতো লেগে রইল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত চেতনাই সজাগ ছিল তার। সে ভেবে দেখছিল আর কয়েকটা দিন একতলার এই ছোট্ট ঘরে, বুড়ো পঙ্গু অক্ষম মায়ের

সঙ্গে তার কেমন কাটবে। সম্ভবত খুবই একা লাগবে তার। মাঝে মাঝে প্রবীণ মুখশ্রী নিয়ে চিন্তিত তুলসী আসবে অভিভাবকের মতো, ললিতের ঠাট্টার উত্তরে মৃদু ম্লান হাসবে, আড্ডা জমবে না। মা তুলসীকে টেনে নিয়ে যাবে রান্নাঘরের চৌকাঠ অবধি, পিঁড়ি পেতে বসিয়ে দুঃখ আর আক্ষেপের কথা বলে যাবে। একা লাগবে ললিতের। হয়তো সে মাঝে মাঝে বেরোবে পাড়ায়, দু-একটা বাড়ি থেকে মায়ের প্রবীণ সঙ্গিনীরা ললিতকে ডাকবে, এসো, ললিত। ঘরে বসিয়ে তাকে শোনাবে তারই মায়ের দুঃখের কথা। বলবে, এত বড় ফাঁড়াটা কেটে গেল, এবার দেরি করে বিয়ে করো ললিত, জীবনের সব কাজগুলোই করণীয়। কোনওটাই ফেলনা নয়। এ-সবই ললিত জানে। কিংবা হয়তো সে গলির নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কয়েক পলক দেখবে বাচ্চা মেয়েরা রাস্তায় ছক কেটে এক্কা-দোক্কা খেলছে। তাদের কারও বেণি ধরে একটু টেনে দিয়ে ললিত বলবে, কেমন আছিস রে টগর? কিংবা পাড়ার ঘরোয়া চায়ের দোকানটাতে যাওয়া যেতে পারে, যেখানে তার বয়সি পাড়ার কয়েকজন আড্ডা দেয়। তারা কেউই ললিতের বন্ধু নয়, পরিচিত। তবু তাদের সঙ্গেও একটু সময় কেটে যাবে। স্কুল থেকে ছুটি নেওয়া আছে, তবু আর-একটু ভাল বোধ করলে সে স্কুলের কাজও শুরু করতে পারে। হয়তো আগের মতোই বিশ্রী লাগবে তার, তবু সময় কেটে যাবে। সময় তো এখন আর খুব বেশি নয়!

সে মা আর তুলসীর অস্পষ্ট গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিল। চায়ের কাপে চামচ নাড়ার শব্দ। মা তুলসীকে চা করে খাওয়াচ্ছে। ললিত তাকাল না। তার চোখের দু'টি ভারী পাতা পরস্পরের সঙ্গে লেগে রইল। একথা ঠিক যে, দু' মাস বাদে এই ফিরে আসার মধ্যে এতটুকু আনন্দ নেই। কিন্তু যদি মিতু তার বউ হত, তা হলে! ভাবতেই তার আনন্দের একটা স্রোত ললিতের শরীরকে নাড়া দিয়ে গেল। মিতু হলে— মিতু হলে— কিন্তু মিতু তো হল না ললিতের।

হওয়ার কথাও ছিল না। মিতুদের বড় বাড়ি, গেটের ওপর বোগেনভেলিয়ার ঝাড়, গ্যারেজে ছোট্ট একটা গাড়ি। বড় হতাশ লাগত ললিতের। মাঝে মাঝে মিতুর সঙ্গে দেখা হত স্কুলের রাস্তায়, আর ললিতের মনে হত সে এর জন্য সবকিছু করতে পারে। সবকিছু। দরকার হলে একটা-দুটো খুন, বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে পারে এক-আধটা বাড়ি, হাজারটা মারমুখো লোকের মুখোমুখি পারে দাঁড়াতে। আশ্চর্য, কোনও দিনই মিতুর সঙ্গে তবু কথা বলা হয়নি। বড় ভাল ছেলে ছিল ললিত— ধীর, শান্ত, লাজুক আর ভিতু। মিতুর সঙ্গে কথা বলার মতো পাপ সে করেনি। কেবল মিতুকে দেখলে তার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠত, মুখের জল যেত শুকিয়ে, আর সারাটা অবসর সময় সে মনে মনে মিতুর সঙ্গ ধরত, ডাকত, বউ, আমার বউ।

মা তখনও মাঝে মাঝে তার বিয়ের কথা বলত, সেই বছর সাতেক আগেও। সে উত্তর দিত না, অন্যমনস্কর মতো মিতুর কথা ভাবত। মিতু হলে— মিতু হলে—

সম্ভবত মা কিছু টের পেয়েছিল। কীভাবে পেয়েছিল তা ললিত জানে না। হয়তো কেউ মাকে বলেছিল সকাল সাড়ে দশটায় স্কুলে যাওয়ার পথে ললিত হাঁ করে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, রাতে ঘুমের মধ্যে কোনও দিন সে মিতুর নাম ধরে ডেকেছিল, কিংবা বলেছিল যে, সে মিতুকে ভালবাসে। তখন জ্বরবিকারের মতো একটা অবস্থায় কী যে করেছিল ললিত কে জানে!

যেমন করেই হোক মা টের পেয়েছিল। মা ললিতকে কিছুই বলেনি। কিন্তু একদিন যখন ললিত ঘরে ছিল না তখন মা মিতুকে ডেকে এনেছিল ঘরে।

সেই ডেকে-আনার ফল ভাল হয়নি। যা ছিল তার মনের ব্যাপার, যা ছিল তার একার তা সমস্ত পাড়ায় বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে গেল। মা মিতুকে কী বলেছিল, তা ললিত জানে না। শুধু এটুকু জানে যে, মিতু রাজি হয়নি।

বোধ হয় খুবই রেগে গিয়েছিল মিতু, মাকে অপমান করে বলেছিল, আমাকে এভাবে ডেকে আনা আপনার উচিত হয়নি। বাবা শুনলে খুব রেগে যাবে।

তার বোকা, ললিত-সর্বস্ব মা হয়তো বলেছিল, কিন্তু আমার ললিতকে দেখ, কেমন হয়ে যাচ্ছে আমার তরতাজা ছেলে। তুই রাজি হয়ে যা মিতু, আমি তোর বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলব।

শুনে মিতু হয়তো খুব রেগে গিয়েছিল। কেননা, ছেলেবেলা থেকেই সে জানে যে, সে বড় বাড়ির মেয়ে, বড় বাড়িতেই তার বিয়ে হবে। তার সেই নিশ্চিত ভবিষ্যৎ থেকে এইভাবে তাকে চুরির চেষ্টা দেখে সে হয়তো মাটিতে পা ঠুকেছিল, এ আপনার অন্যায় মাসিমা, এটা খুব অন্যায়। আমার মা শুনলে ভয়ংকর বকবে যে, আপনি আমাকে বাড়িতে ডেকে এনে এইসব বিশ্রী কথা বলেছেন।

মা হয়তো তবু ভিখিরির মতো কাঙালপনা করেছিল, দেখিস মিতু, তোর সুখের সংসার হবে। ললিতের কুষ্ঠিতে আছে তিরিশের পর ওর ভোগসুখ, পয়সা হবে ওর দেখিস। তুই সুখে থাকবি, আমি তোদের সব দুঃখ টেনে নিয়ে চলে যাব। দেখিস, যাওয়ার সময় আমি একটুও দুঃখ রেখে যাব না। আমার আর বেশি দিন নেই রে!

কে জানে হয়তো এরপর মিতু কেঁদে ফেলেছিল। ডাইনি জটাইয়ের মতো এই বুড়িটা তাকে বশ করে ফেলছে এই ভয়ে হয়তো ককিয়ে উঠে বলেছিল, পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন মাসিমা! কিংবা তেজি ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে বলেছিল, আপনি আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবেন না মাসিমা। বাবাকে বলে দিলে আপনি মুশকিলে পড়বেন। আর, ঠাকুমাকেও বলে দেব যেন আপনার কাছে আর না আসেন।

সেইদিন মিতু চলে যাওয়ার পর মা ভয় পেয়েছিল। ললিত যদি জানতে পারে! রাতে ঘরে ফিরে এসে ললিত দেখেছিল দারুণ গরমেও মা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

কী হয়েছে মা?

আমার জ্বর হয়েছে ললিত। রান্না করা আছে, তুই নিয়ে থুয়ে খা।

গায়ে হাত দিয়ে ললিত বলল, কোথায় জ্বর!

হয়েছে রে। শরীরের মধ্যে কেমন কাঁপুনি। দুপুর থেকে পড়ে আছি।

সে-রাতে অনেক এলোমেলো কথা বলছিল মা, যার স্পষ্ট অর্থ ললিত ধরতে পারেনি। ললিত বকবে, এই ভাবনায় ভয়ে ভয়ে সে-রাতে মা'র সত্যিই জ্বর এসেছিল।

তন্দ্রা ভেঙে ললিত দেখল ঘরে কেউ নেই। তুলসী চলে গেছে।

আস্তে আস্তে উঠল ললিত। এখন শরীরটা অনেক ঝরঝরে লাগছে। একটু খিদে টের পাচ্ছিল সে। উঠে ললিত ভিতরের দরজায় গিয়ে দেখল পেয়ারাতলার ছোট্ট খুপরি রান্নাঘরটায় মা নিশ্চল হয়ে বসে আছে। একটু কুঁজো হয়ে কেমন ছেলেমানুষের মতো বসবার ভঙ্গি মা'র। যেন কোনও কিশোরীবেলার চিন্তায় বিভোর। আসলে এখন আর মাকে ললিতের পাকা মাথাওলা প্রবীণ মহিলা বলে মনে হয় না। সারাদিন কাটুকুড়ুনির

মতো কুঁজো হয়ে হয়ে মা সারা ঘর ঘুরে বেড়ায়, খুঁজে খুঁজে ময়লা বের করে ঘর থেকে, বার বার সামান্য জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখে, বিছানার চাদর টান করে অকারণে, তারই ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ শূন্য হয়ে যায় চোখ, শিশুর মতো বোকা হয়ে যায় তোবড়ানো মুখ। যেন চারদিকের এই ঘরবাড়ি, ছোটখাটো জিনিসপত্র, এই ছোট এক ঘরের সংসার— এর কোনও কিছুর অর্থই মা বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে ঘুমন্ত অবস্থায়ও মাকে লক্ষ করেছে। হাঁটু মুড়ে ছোটখাটো হয়ে গিয়ে মা ঘুমোয়, নিঃসাড় সেই ঘুম, আর মাঝে মাঝে সেই মুখে একটু একটু হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়। তখন মনে হয় মা স্বপ্ন দেখছে— সেই কিশোরীবেলার স্বপ্ন। এক দূর গ কিংবা গাঁয়ের স্বপ্ন, যার সঙ্গে জেগে দেখা চারপাশের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মাইলের তফাত।

মা'র মন ভুলো হয়ে গেল। বিকেলে জল চেয়েছিল ললিত, মা'র জল দিতে ভুল হয়ে গেল। আর মাসকয়েক পর যদি ললিত মরে যায়, তবে তার এই শিশু মা'কে কে দেখবে!

মাকে ডাকল না ললিত। আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এল। একা লাগছে। বড় বেশি একা।

দুই

গলির মুখেই শম্ভু দাঁড়িয়ে ছিল। তুলসী বেরোতেই দেখা।

তুলসীদা, চললেন?

হুঁ।

তুলসী একটু লক্ষ করে দেখল, শম্ভুর ভোল পালটে গেছে। হাসপাতালে গিয়েছিল সাদামাটা একটা বুশ শার্ট আর সুতির প্যান্ট পরে। এখন চমৎকার একটা গাঢ় রঙের চাপা প্যান্ট তার পরনে, নীল রঙের টেরিলিনের শার্ট, হাতাদুটো অনেক দূর গোটানো— দুটো মাংসল হাত মুগুরের মতো ঝুলছে, বাঁ হাতের কবজিতে ঘড়িটাকে এতটুকু দেখাচ্ছে। মুখটা একটু ফরসা দেখাচ্ছিল শম্ভুর, সম্ভবত বিকেলে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়েছে, একটু স্নো কিংবা পাউডারও দিয়ে থাকা সম্ভব। শম্ভুর মুখে একটা বোকা তৃপ্তির ভাব। চৌকো ভাঙাচোরা মুখ, আর মোটা দুটো ঠোঁটে একটা চাপা নৃশংসতা রয়েছে। সেটুকু তুলসীর ভুল দেখার দোষও হতে পারে। আসলে অতটা স্বাস্থ্যের জন্যই শম্ভুকে বোধহয় মাঝে মাঝে ভয়ংকর মনে হয়। শার্টের ওপর দিয়ে বুকের প্রকাণ্ড দুটো চৌকো পেশি ফুলে আছে, খুব সরু কোমর, ঘাড়টা মোষের ঘাড়ের মতো মোটা আর শক্ত। সেই তুলনায় মাথাটা ছোটই। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা বাবরি ধরনের চুল শম্ভুর, সামনের দিকে ফাঁপিয়ে তুলে আঁচড়ানো। সাজগোজ সত্ত্বেও শম্ভুকে যতটা সুন্দর দেখাচ্ছে, তার চেয়েও বেশি মনে হচ্ছে ভয়ংকর।

আপনি তো ঢাকুরিয়ায় থাকেন, না?

তুলসী মাথা নাড়ল। শম্ভু তার সঙ্গ ধরে আস্তে আস্তে পাশাপাশি হাঁটছিল। বলল, কেমন বুঝলেন ললিতার অবস্থা?

ভালই তো। আপাতত চিন্তা নেই।

ডাক্তাররা কী বলছে?

ওই যা বলে। যদি রিলাপ্স করে তবে মাস কয়েকের মধ্যে করবে।

করবে বলে আপনার মনে হয়?

তুলসী অসহায়ের মতো বলল, কী জানি!

শম্ভু দাঁতে আর জিভে একটা চিরিক শব্দ করল, ললিতদা এই বয়সে মরে-ফরে গেলে বড় বিশ্রী।

তুলসী চুপ করে রইল। শম্ভুর পাশাপাশি হাঁটতে তার নিজেকে বড় বেমানান লাগছিল। সে রোগা, কালো আর ছোট। বিয়ের পর কয়েক দিনে সামান্য একটু চেহারা ফিরেছে তুলসীর, রংটা বোধ হয় আগের চেয়ে খানিকটা উজ্জ্বল। তবু অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবান শম্ভুর কাছাকাছি হাঁটতে সে এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করছিল।

গোপালের মনোহারি দোকানে হ্যাজাক জ্বলছে, কয়েকজন ছেলে-ছোকরা দাঁড়িয়ে। তুলসী শম্ভুকে বলল, দাঁড়াও, একটু সিগারেট কিনে নিই।

শম্ভু ঘাড় নেড়ে ছোকরাদের দলটার মধ্যে ভিড়ে গেল।

সিগারেট কিনতে কিনতে হঠাৎ চোখ তুলে তুলসী দেখে পাঞ্জাবি পরা রোগাটে চেহারার একটা লোক তাকে দেখছে। লোকটার মুখে-চোখে একটা অসহায়, ভয় পাওয়া বুড়োটে ভাব। সে চমকে উঠল। পরমুহূর্তেই ভুল ভেঙে গেল তার। এরা এমন বিদঘুটে জায়গায় আয়না টাঙিয়ে রাখে।

ছোকরাদের দল থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে তুলসী জিজ্ঞেস করল, শম্ভু, তুমি যাবে নাকি?

শম্ভু ভীষণ ব্যস্ত এবং উত্তেজিতভাবে কথা বলছিল। দল থেকে মাথা উঁচু করে বলল, এক মিনিট, তুলসীদা।

সম্ভবত পাড়ার কোনও গণ্ডগোল। শম্ভু এইসব ছেলেদের দলের মাথা, এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তুলসী অস্বস্তির সঙ্গে একটা সিগারেট ধরাল। দাঁড়িয়ে রইল শম্ভুর জন্য।

ললিতকে ফিরিয়ে আনা গেছে, অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও, এটা ভাবতে তুলসীর ভাল লাগছিল। এরপর ললিতের ভাগ্য। যত দূর করার তুলসী করেছে। অবশ্য তুলসী না করলেও কেউ-না-কেউ করতই। না করলেও ক্ষতি ছিল না। চিকিৎসা হাসপাতাল থেকেই হচ্ছিল, সে শুধু যেত ললিতের মনের জোরটা বজায় রাখতে, যাতে সে ভেঙে না পড়ে। কিন্তু ক্রমে তুলসী বুঝতে পেরেছিল বাড়তি মনোবালের কোনও দরকার ললিতের নেই। সে একরকম করে তার অসুখের ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিল। তাকে তাই খুব বেশি গম্ভীর বা বিষণ্ণ দেখাত না। বরং তুলসী গেলে ঠাট্টা করত ললিত, কী রে শালা, তোকে গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন? তোর ভাবী বউটা কি কুচ্ছিত? না কি, দাদা বের করে দিয়েছে তোকে বাড়ি থেকে বিয়ে দেবে না বলে? এ—কথা ঠিক যে, তুলসী কোনও দিনই খুব একটা হাসিখুশি হতে পারে না। তুলসী জানে যে, সে স্বভাবে গম্ভীর নয়। তার আসল অসুখ হল, সে বড় অল্পেই দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়। ছোটখাটো হাজারটা দুশ্চিন্তা তুলসীর, হাজারটা ভয়। তার মন কখনও দুশ্চিন্তা থেকে ছাড় পায় না। কোনও দিন স্কুল কামাই গেলে সারা দিন তার চিন্তা হয় পরদিন হেডমাস্টার তাকে ডেকে অপমানকর কিছু বলবে কি না। এই চিন্তা এমনই পেয়ে বসে তাকে যে, সারাটা দিন সে চাপা উত্তেজনায় কাটায়, একা হলেই হেডমাস্টারের সঙ্গে একটা কল্পিত সংলাপ তৈরি করতে থাকে: 'কাল আসেননি তুলসীবাবু!' 'আজ্ঞে না।' 'কেন!' চাপা রাগ দেখিয়ে তুলসী বলবে, 'কাজ ছিল!' 'কাজ! কাজ থাকতে পারে, কিন্তু গত তিন মাসে আপনার সাতটা ক্যাজুয়েল লিভ গেল, এর পরও তো মশাই নয় মাস রয়েছে, তখন আপনার কাজ থাকবে না? আর দেখুন, আপনি তো জানেন কম স্টাফে আমার স্কুল চালাতে হয়, এক-দু'জন করে রোজ অ্যাবসেন্ট থাকলে ক্লাসগুলো কাকে দিয়ে আমি চালাব! স্মরজিৎবাবু এসে বললেন যে, কাল সময়মতো ওঁর ভাত রান্না হয়নি বলে আসতে পারেননি, আপনি এসে আরও ধোঁয়াটে যুক্তি দিলেন— কাজ ছিল। এ-সব ছেলেমানুষি যুক্তি ছাত্রদের মুখে মানায়, আপনাদের নয়।' তুলসী হিংস্রভাবে বলবে, 'আমার পাওনা ছুটি আমি নিচ্ছি। আর আমার কী রকম কাজ ছিল কিংবা কাজ ছিল কি না এ-সব ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনারও হাজারটা দোষ রয়েছে, সেগুলোকে কে দেখে?' 'কী রকম?' বলে হেডমাস্টার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বেন। তুলসী ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলবে, 'আছে। গ্র্যান্টের টাকায় আপনি সায়েন্স ল্যাবরেটরি করলেন, কিন্তু আমরা সাত মাস টাকা পেলুম না, স্কুলে ছেলে নেই তবু আপনি তিনটে স্ট্রিমে স্কুল চালাচ্ছেন কারণ প্রতিটি স্ট্রিমের জন্য আপনি পঁচিশ টাকা করে অ্যালায়েন্স পান, তা ছাড়া স্কুলের শতকরা ষাট-সত্তরজন ছাত্র ডিফল্টার, তার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই, আপনি গার্জিয়ানদের খুশি রাখার জন্য কোনও স্টেপ নেন না...' ইত্যাদি। বস্তুত এ-সব ভাবতে ভাবতে সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে, সারাটা দিন তার তেতো

হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেডমাস্টার কোনও দিনই তাকে জিজ্ঞেস করে না যে কেন সে গতকাল স্কুলে আসেনি। বড় জোর হেডমাস্টার বলে, 'আপনি কাল আসেননি, না?' তুলসী ভীষণ সংকুচিত হয়ে বলে, 'আজ্ঞে না।' হেডমাস্টার খুব অবহেলার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেয়, 'ঠিক আছে।'

কিংবা কখনও তুলসী ভীষণ রকমের আজগুবি চিন্তার পাল্লায় পড়ে। একদিন সকালে দাদা-বউদির একটা ঝগড়া হয়ে গেল। দাদা গটমট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অফিসে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ঘর থেকে বউদি চেঁচিয়ে বলল, 'ফিরে এসে দেখো আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছি।' কথাটা আধোকান্নার বিকৃত গলায় এমনভাবে বলেছিল বউদি যে তুলসীর মাথায় কথাটা লেগে গিয়েছিল। সারা দিন আর ব্যাপারটা খেয়াল ছিল না তুলসীর। কিন্তু স্কুল থেকে ফেরার পথে ট্রেনে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে পড়ল তুলসী। এখন ফিরে গিয়ে যদি সত্যিই দেখে যে বউদি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে তা হলে সে কী করবে? এ-সব অবস্থায় লোকে কী করে? সে আকাশপাতাল ভেবে দেখল, তার মুখের জল শুকিয়ে গেল, এবং অল্প সময়েই সে টের পেল যে, দুশ্চিন্তায় তার গাল বসে যাচ্ছে। হয়তো গিয়ে সে দেখবে বউদির ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, ডাকাডাকিতে খুলছে না। তখন দরজা ভাঙার আগে তাকে পাড়া-প্রতিবেশীদের ডেকে লোক জড়ো করতে হবে। তারপর দরজা ভাঙা, দড়ি কেটে মড়া নামানো, কিংবা হয়তো মড়া নামানোর আগেই পুলিশ ডাক্তার অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেওয়ার ঝামেলা, দাদাকে ফোন করা। মরবার পর বউদির চেহারা কেমন হবে কে জানে, সেটা দেখাও তো একটা নরক-যন্ত্রণা। বাচ্চাগুলোকে বউদি নিশ্চয়ই পাশের ঘরে বন্ধ করে রাখবে। বের করার পর ওদের কী রকম প্রতিক্রিয়া হবে ভাবতে ভাবতে তুলসী শিউরে উঠল। এরপর পোস্টমর্টেম, ডেথ সার্টিফিকেট ইত্যাদি সব ঝামেলাই তাকে করতে হবে। মড়া উঠতে উঠতে বোধহয় পরদিন রাত হয়ে যাবে। এই শীতে মড়া পুড়িয়ে স্নান করা ইত্যাদিও ভীষণ ব্যাপার। তারপর সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে একা ঘরে শোয়া, অপঘাতে বউদির মৃত্যুর পর সেটাও একটা সমস্যা। এরপর বউ-অন্ত দাদা যদি সন্ন্যাসী হয়, কিংবা সব ছেড়েছুড়ে চলে যায় তা হলে তার গোটা তিনেক বাচ্চার ভারও সারা জীবনের জন্য পড়ল তুলসীর ঘাড়ে...। ভাবতে ভাবতে সমস্ত ব্যাপারটাকে চোখের সামনে এত সত্যের মতো দেখতে পাচ্ছিল তুলসী যে শীতেও তার ঘাম ছাড়তে লাগল। সে সেদিন অনেকক্ষণ আড্ডায় কাটাল, তারপর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল, বাড়িতে ঢুকবার আগে অন্তত বার তিনেক বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করল। রাত বারোটায় চোরের মতো ঢুকে দেখল, ঘরে আলো জ্বেলে দাদা-বউদি আর দাদার বড় মেয়েটা শুকনো মুখে তুলসীর জন্য বসে আছে। তার দেরি দেখে সকলেই চিন্তিত।

বস্তুত তুলসী কখনওই সুখে থাকে না। নিশ্চিন্ত না থাকাটা তার নিয়তির মতো। হয়তো ট্রামে কিংবা বাসে জানালার ধারে প্রিয় সিটটিতে বসে সে যাচ্ছে, এমন সময় ধপ করে পাশে এসে বসল খুব কর্কশ চেহারার একটি লোক, কিংবা এমন কোনও লোক যার নাক কান চুলকোনোর মুদ্রাদোষ আছে, বা এমন কেউ যে বসেই তার পিঠের ওপর দিয়ে হাতটা সিটের পিছনে রেখে তার শরীরের দিকে হেলে বসল। সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তা কিংবা অস্বস্তি শুরু হয়ে যায় তুলসীর!—তার পাশে-বসা লোকটা কেমন! যদি এখন এ-লোকটার সঙ্গে তার কোনও কারণে লেগে যায়! যদি লোকটা তার পকেটে হাত দেয়, কিংবা যদি তার শরীরে আরও হেলান দিয়ে বসে? তা হলে কী করবে তুলসী? অমনি তার মন দু' ভাগ হয়ে গিয়ে পাশে বসা লোকটার সঙ্গে কী রকম কথাবার্তা হতে পারে তার একটা খসড়া তৈরি করতে লেগে যায়।

এখন ললিতের কথা ভাবলেও নানা রকমের ভাবনা একটার সঙ্গে আর-একটা জড়িয়ে আসে। তুলসী ঠিক করে রেখেছে এখন থেকেই সে ললিতের মা'র জন্য একটা আশ্রমটাশ্রম খোঁজ করে রাখবে।

সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল। শম্ভু ভিড় ছেড়ে এগিয়ে এসে বলল, চলুন তুলসীদা, আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।

চলো।

কয়েক পা হেঁটে হঠাৎ শম্ভু বললে, মা প্রথমটায় বিশ্বাসই করতে চায়নি যে রোগটা ছোঁয়াচে নয়। মা'র ধারণা এরপর আর ও-ঘরের ভাড়াটে জুটবে না।

তুলসী অর্থটা ধরতে পারল। চুপ করে রইল সে।

শম্ভু একা একাই হাসল, মা'দের যে কী সব বাজে ধারণা থাকে!

তুলসী জানে হয়তো মাস কয়েক পর ললিতদের ঘরটা খালি হয়ে যাবে। কম ভাড়াতেই ললিতরা আছে। মাত্র পঁচিশ টাকা, বছর দশেক আগেকার ভাড়া। এখন ও-ঘরের ভাড়া অনায়াসে ষাট-সত্তর টাকা হবে। বাথরুম-টাথরুম আলাদা, কলে প্রায় সারা দিন জল। তুলসীর একবার ইচ্ছে হল শম্ভুকে জিজ্ঞেস করে, এবার তারা কত ভাড়ায় ঘরটা দেবে।

তারপরই মনে মনে সে নিজেকে ইতর বলে গাল দিয়ে সামলে গেল। ভাগ্যিস মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যায়নি! তা হলে সম্ভবত শম্ভু একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলত, কেন ললিতা মরে গেলে আপনি নেবেন?

মনে মনে নিজের কাছেই একটা জবাবদিহি খাড়া করার চেষ্টায় খুব অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল তুলসী। এমন সময়ে তাকে চমকে দিয়ে শম্ভু বলল, বাসে অত ঘুরে যাবেন কেন তুলসীদা, আনোয়ার শা রোড ধরে রিকশায় চলে যান, দু'-চার আনা বেশি লাগবে।

আনোয়ার শা রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে তুলসী একটু ভাবল। রিকশায় বা বাসে যেতে তার ইচ্ছে করছিল না। যদিও শরীরটা ক্লান্ত, ট্রেন বাস ট্যাক্সিতে অনেকটা ঘুরেছে সে, এবং ঘরে মৃদুলা— তার বউ— তার অপেক্ষায় আছে, তবুও তার মনে হল নিজেকে একটু শাস্তি দেওয়া দরকার। ললিতদের ঘরটা শম্ভুরা এবার কতয় ভাড়া দেবে, এ-প্রশ্নটা তার মাথায় এল কেন? সে মুখে বলেনি ঠিকই, কিন্তু মনে কথাটা এসেছিল। মনের এই অসংযমটুকুর জন্য মাইল দুই হেঁটে যাওয়ার ছোট্ট একটু শাস্তি বোধহয় তার পক্ষে চমৎকার হবে।— না শম্ভু, আমি বরং এটুকু হেঁটেই চলে যাই।

শম্ভু হাসল, হাঁটবেন! সে তো ভালই, একটু এক্সারসাইজ হবে। শরীরটা তো বড় নাড়াচাড়া করেন না।।

তুমি কোন দিকে? তুলসী জিজ্ঞেস করে।

একটু সিনেমায়-টিনেমায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আর হবে না। পাড়ায় একটা গণ্ডগোল বেধে আছে, ফিরতে হবে।

কী গণ্ডগোল?

কেসটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোককে কাল রাতে কয়েকজন এসে খুব ঠেঙিয়ে গেছে। ভদ্রলোক একা থাকতেন, পাড়ার কারও সঙ্গে মিশতেন না, তবে মাঝেসাঝে একটা মেয়ে আসত বইখাতা হাতে। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা মেয়ে-ঘটিত। একটু দেখতে হবে। বুঝতেই পারছেন পাড়ার ইজ্জত... বাইরের লোক এসে মেরে যাবে...বলে হাসল শম্ভু। আত্মপ্রত্যয়ের হাসি।

তুলসী বলল, তা হলে চলি।

ক'দিন আগে বর্ষা গেছে খুব। ভাঙাচোরা বিশ্রী রাস্তাটায় খোঁসপাঁচড়ার রসের মতো জল জমে আছে। দু'ধারে কাঁচা ড্রেন বর্ষার জল পেয়ে পচে ফুলে আছে। মুসলমানদের বস্তি, দু'-একটা মসজিদ এবং কবর। তুলসী সাবধানে পা ফেলছিল। সন্ধে হয়ে এসেছে। মৃদুলার জন্য আগ্রহ অনুভব করছিল তুলসী।

হাঁটতে হাঁটতে তুলসী ভাবছিল, এই হেঁটে যাওয়ার শাস্তিটুকু তার পাওয়া উচিত। মৃদুলার কাছে যেতেও একটু দেরি হবে। ভাল, এইটুকু দেরি হওয়া ভালই। ললিতদের ঘরটার ভাড়া এখন কত হবে এ-কথা মনে আনা তার উচিত হয়নি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ও-রকম বিশ্রী চিন্তা ইচ্ছে করে তুলসী করেনি। চিন্তাটা এসে গেল। তার মনের আশ্চর্য গতির কথা তুলসী ভাবছিল। নিজের মনের ওপর তার এতটুকু হাত নেই, মাঝে মাঝে সে অসহায়ের মতো টের পায় তার মন ইচ্ছেমতো জঘন্য কুৎসিত নানা রকম চিন্তা তৈরি করে যাচ্ছে। সে তখন নিজেকে প্রাণপণে বলতে চেষ্টা করে— শয়তান আহাম্মক, অন্য কথা ভাবো। কিন্তু কিছুই সে করতে পারে না। নিজের এই কুৎসিত মনটার জন্য তুলসী বড় ভয়ে ভয়ে থাকে। বুঝতে পারে তার ভিতরে এক শয়তান আহাম্মক অহংকারী আমি রয়েছে যাকে বের করে দেওয়া উচিত।

মৃদুলা একদিন তাকে বলেছিল, এত তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল না, জানো?

তুলসী সামান্য অবাক হয়ে বলল, তা হলে হল কেন?

মৃদুলা হাসছিল। বলল, হয়ে গেল, কী আর করা যাবে!

বিছানায় শুয়ে ছিল তুলসী, উঠে বসল। বলল, এ-বিয়েতে তোমার ইচ্ছে ছিল না?

মৃদুলা হাসিমুখেই বলল, ইচ্ছে হয়তো ছিল না। কিন্তু হয়ে গিয়ে এখন ভাল লাগছে।

বলে মৃদুলা তাকে আদর করল অনেক। তুলসী গলে গেল, কিন্তু অস্বস্তিটা ছাড়ল না তাকে। পরের রাতে সে আবার কৌশলে কথাটা তুলল, তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার বাবা বিয়ে দিলেন? জোর করে! অ্যাঁ!

মৃদুলা অবাক হয়ে বলল, জোর করে নয়তো! আমি কি সে কথা বলেছি।

তবে!

তবে কী? বাবার নিজেরও ইচ্ছে ছিল না এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার। গান শিখতুম, লেখাপড়া করতুম — আমার বিয়ের ব্যাপারে কেউ ভাবছিলই না। কিন্তু তবু দেখো দুম করে বিয়ে দিয়ে দিতে হল।

শুনে তুলসীর বুক ধড়ফড় করে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, কেন?

মৃদুলা বলল, সে অনেক ব্যাপার। শুনলে তুমি খুশি হবে না।

তবু শুনি।

না।

মৃদুলা, লক্ষ্মী মেয়ে, বলো। না বললে আমার খুব খারাপ লাগবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনও কিছু গোপন থাকা উচিত না, তাতে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়...

তুলসীর ব্যগ্রতা প্রকাশ হয়ে গেলে মৃদুলা হেসে বলল, তোমার ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয়। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

তবু বলো, লক্ষ্মী, পায়ে পড়ি।

ছিঃ। বলে মৃদুলা একটুক্ষণ তাকে ভাল করে দেখল, হাসল, তারপর বলল, তুমি ভীষণ উইক।

অনেক কাকুতি-মিনতির পর মৃদুলা বলতে রাজি হয়েছিল।

আমার পেছনে কিছু লোক লেগেছিল। তারা ঘুরঘুর করত।

কেন? তুলসী জিজ্ঞেস করেছিল।

কেন আবার! বোঝো না! মেয়ের পিছনে ছেলেরা কেন ঘুরঘুর করে!

হ্যাঁ, তুলসী বোঝে। তবু তার মন থেকে প্রশ্নটা গেল না। কেন কিছু লোক মৃদুলার পিছনে ঘুরঘুর করত? কেন? অ্যাঁ! কী তাদের অধিকার একটা মেয়ের পিছনে ঘুরঘুর করার। ভয়ংকর অন্যায় এটা, ভীষণ অন্যায়।

তারা কারা?

পাড়ারই ছেলে সব। তাদের মধ্যে একজন ছিল বিভু। লেখাপড়া শেখেনি, বাপ দুধ বিক্রি করত, পয়সা ছিল অনেক। ছেলেটা প্রথম প্রথম আমাকে দেখে মাথা নিচু করত, অনেক দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেত। কখনও সখনও একটা সাইকেলে সাঁ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেত। কোনও দিন কথা বলার চেষ্টা করেনি। শুনেছিলুম ছেলেটা খুব ভাল সাইকেল চালায়, সাঁতার দেয়, ফুটবল খেলে। এ-সব কারণেই বোধ হয় লেখাপড়া হয়নি, শুনতুম এক নম্বরের বখা ছেলে। তাই আমাকে দেখে যখন পাশ কাটিয়ে যেত বা মাথা নিচু করত তখন আমার সন্দেহ হত যে, বোধ হয় এবার ছেলেটার মাথা ঘুরে গেছে। আর এ-সব ছেলে মেয়েদের ব্যাপারে সিরিয়াস হলে মুশকিল। তারপর শোনো, কলেজে যাতায়াতের পথে প্রায়ই দেখা হত, কোনও দিন বা বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থাকত, সকালসন্ধে অসংখ্যবার আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেত। তারপর বোধ হয় একা কিছু করা যাচ্ছে না দেখে বন্ধুবান্ধবদের জুটিয়ে আনল। দেখতুম বাস-স্টপে এক দঙ্গল ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে বিভু। আমাকে দেখলেই চাপা গলায় ওর বন্ধুরা বলত, বিভু, তোরটা, তোরটা। আর কী সাহস দেখো, একদিন বাসে উঠেছি, ওমা, বাস আর ছাড়ে না, ড্রাইভার চেঁচিয়ে কাকে যেন সরে যেতে বলছিল। উঁকি দিয়ে দেখি ওই দলের একটা ছেলে রাস্তার মাঝখানে নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধছে, মুখে বদমাইশির হাসি। কোনও কোনও দিন তিন-চারজনকে নিয়ে বাসে উঠত বিভু, কলেজ পর্যন্ত 'ফলো' করত। আমি ভয় পেয়ে গিয়ে মাকে বললুম, মা বলল, কী আর করবি বল, ওদের দিকে কখনও তাকাসনি। বুঝলুম মাকে বলে লাভ নেই, বাবাকেও বলতে ইচ্ছে করত না, কেন না বাবা তোমার মতোই ভিতু ভালমানুষ, এ-সব শুনে হয়তো খুব নার্ভাস হয়ে পড়বেন, আর বলা যায় না, ভিতুদের যা স্বভাব, হয়তো বলে বসবেন, ওর সঙ্গেই তোর বিয়ে দিয়ে দিই মৃদুলা। আমি বাবাকে বললুম না, কিন্তু ওদের সাহস ক্রমে বাড়ছিল। সকালে সন্ধেবেলায় আমাদের বাসার সামনে আড্ডা দিত ভিড় করে দাঁড়িয়ে। আমার ছোট ভাই বাচ্চু রাস্তায় গেলে বলত, এই বিভুর শালা, কোথায় যাচ্ছিস? বাবা সন্ধেবেলায় বাইরের ঘরে বসে মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলতেন, একদিন একটা ছেলে ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে বলল, মেসোমশাই, আগুনটা একটু দেবেন? এইভাবে আমাদের ভয় পাইয়ে আর ঘাবড়ে দিয়ে তারপর একদিন ওরা কয়েকজন মুরুব্বি ছেলেকে বাবার কাছে পাঠাল বিভুর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাড়তে। বাবা ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন, অবাক হয়ে বললেন, ওরা স্বজাতি নয়। ছেলেগুলো ফিরে গেল, কিন্তু তারপর একদিন বিভুর বন্ধুরা দল বেঁধে এল। বিশ্রী কালো কালো কর্কশ চেহারা, রংচঙে পোশাক, একজনও কথা বলতে জানে না। ওরা বলল, জাতফাত নিয়ে মাথা ঘামাবেন না মেসোমশাই, সব জাতই মানুষ। আর তা ছাড়া আপনি যে বামুন তার কোনও প্রমাণ আছে? পাকিস্তান থেকে এসে

অনেকেই ও-রকম বামুন কপচায়। সব এফিডেভিড করা বামুন, আমরা জানি। আর শিক্ষিতা মেয়ে তো কী হয়েছে। বিভু স্পোর্টসম্যান, আজকাল স্পোর্টসম্যানদের লেখাপড়ার দরকার হয় না। তবু যদি বলেন তো বিভু আবার স্কুলে ভরতি হবে, তিন-চারটে মাস্টার রেখে ওকে আমরা পাশ করিয়ে দেব। এ-সব শুনে বাবা আর ভয়ে কথাই বলতে পারল না। পরদিনই আমাকে কলেজ-ফেরত ট্যাক্সিতে তুলে বাবা দমদমে পিসিমার বাড়িতে রেখে এল। কলেজে যাওয়া বন্ধ হল, বিয়ের জন্য তাড়াহুড়ো শুরু করলেন। শুনতুম আমাদের বাড়িতে রাতে কিংবা দুপুরে ঢিল পড়ছে, আমাদের বাইরের ঘরের সিঁড়িতে গু ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে রাত্রিবেলা। এক মাসের মধ্যেই বাবা তোমার খবর আনলেন, বললেন, চমৎকার ছেলে, খুব সৎ আর নিষ্ঠাবান। ব্যস, বিয়ে হয়ে গেল।

মৃদুলার কাছ থেকে এ-গল্প শোনার পর তুলসী স্বস্তি পেল না। মৃদুলা দেখতে এমন কিছু সুন্দর নয়। তার গালে ব্রণর দাগ, ঠোঁট পুরু, তবে চোখ দুটো মৃদুলার সুন্দর। শ্যামবর্ণ মেয়েদের চোখ সুন্দর হলে ফরসা মেয়েদের চেয়ে তাদের আকর্ষণ বেশি হয়। সব সুন্দরই তো আর আকর্ষণ করার শক্তি রাখে না। মৃদুলা সুন্দর না হলেও সেই আকর্ষণশক্তি তার আছে বোধ হয়। তা ছাড়া মৃদুলার শরীরটাও রোগার ওপর বেশ মজবুত। উগ্র ধরনের সতেজ ভাব আছে তার শরীরে, আর মাথায় অনেক চুল। মৃদুলাকে ভাল করে লক্ষ করে বিষণ্ণভাবেই তুলসী বলেছিল, বুঝতে পারছি না তোমার পিছনে ছেলেটা এত ঘুরেছিল কেন!

সম্ভবত তুলসীর মনোভাব বুঝেই মৃদুলা উত্তর দিল, ও, আমার বুঝি কিছু নেই, না!

মৃদুলা হাসছিল। কিন্তু তুলসীর ভাল লাগেনি। সে কাঠ কাঠ গলায় বলল, সে-কথা বলছি না। তবে—

তবে কী তা তুলসী আজও জানে না। গত মাস দেড়েকে সে ভেবে বের করতে পারেনি যে, ঘটনাটুকুর মধ্যে এমন কী ছিল যাতে মাঝে মাঝে তার মৃদুলার ওপর রাগ হচ্ছে। তার এমন কথাও মনে হয়েছে যে, মৃদুলার আকর্ষণশক্তি না থাকলেই ভাল ছিল। মনে হয়েছে যে, মেয়েদের বেশি আকর্ষণশক্তি থাকা বা উগ্র সুন্দরী হওয়াটা এক ধরনের অন্যায়। এখন সেই ছেলেটা— সেই বিভু যদি মৃদুলার খোঁজ পায়, যদি তাদের ঠিকানা খুঁজে বের করে তা হলে কী হবে! এত অল্পে সে মৃদুলাকে ছেড়ে দেবে বা ভুলে যাবে এটা সম্ভব নয়। যদিও তাদের বাসা বিভুর পাড়ায় নয়, তবু বেপরোয়া এবং মরিয়া বিভু এ-পর্যন্ত হানা দিতেই পারে। দিলে, শুধু রাতে বা দুপুরে বাড়িতে ঢিল মেরে এবং সিঁড়িতে গু ঢেলেই কি বিভু নিশ্চিন্ত থাকবে! তুলসীই এখন তার সবচেয়ে বড় বাধা, কাজেই তুলসীকে সরিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা কি তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব! কাগজে রোজ ব্যর্থ প্রেমের সঙ্গে অ্যাসিড বালব্ আর ছোরামারা ইত্যাদি ঘটনার কথা চোখে পড়ে তার।

তাই আজকাল তুলসী বাড়ির বাইরে একটু অস্বস্তি বোধ করে একা, আগে পিছনে ভাল করে নজর রাখে, এবং সতর্কভাবে লোকজনকে লক্ষ করে। বস্তুত সে টের পায় মৃদুলার জন্যই তার শান্তি অনেকটা নষ্ট হয়ে গেল। আবার যখন সে ভাবে যে মৃদুলার জন্য একজন পাগল হয়েছিল, তখন আবার তার মৃদুলার প্রতি এক ধরনের পাগলাটে ভয়ংকর ভালবাসাও জেগে ওঠে।

বাড়ি ফিরে তুলসী দেখল ঘরগুলোর বাতি নেভানো, দাদা-বউদি আর বাচ্চারা বোধ হয় কেউ বাড়িতে নেই। সামনের ঘরের দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। ঘরে ঢুকে সুইচ টিপেই সে ভয়ংকর চমকে গেল। মৃদুলা মেঝেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

লাফিয়ে ওঠা হৃৎপিণ্ডকে সামলে তুলসী প্রশ্ন করল, কী হয়েছে, মৃদুলা?

স্খলিত গলায় মৃদুলা বলল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

তিন

সারা রাত ধরে ঝিরঝির বৃষ্টি হয়ে গেল কি? নাকি রান্নাঘরের টিনের চালের ওপর পেয়ারা গাছের ডালপালা নড়ার শব্দ! গাঢ় ঘুম হয়নি ললিতের— সারা রাত সে এক অবসন্ন আচ্ছন্নতার মধ্যে পড়ে ছিল। তার মধ্যে অস্বস্তিকর খ্যাপাটে সব স্বপ্ন দেখেছে সে।

রেলগাড়ির একটা কামরায় সে একা খুব দূরে কোথাও চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ টের পেল গাড়ি থেমে আসছ। বাইরে ধীরে গম্ভীর গলায় কেউ হেঁকে বলছে— যশিডিহ্...যশিডিহ্...। যেন তার জন্যই ওই ডাক, ওই নামোচ্চারণ। হঠাৎ খেয়াল হয় এইখানেই তার নামার কথা, এইখানেই তার যাত্রা শেষ, এই যশিডিতে। ত্বরিতে উঠল সে, লাফিয়ে নামল বাঙ্ক থেকে, সুটকেস টেনে নিয়ে অন্য হাতে দরজা খুলে সে দেখতে পেল গভীর অন্ধকার চরাচর, প্লাটফর্ম নেই, স্টেশনের বাতি নেই, লোকজন নেই। শুধু খুব লম্বা কালো পাথরের মতো চেহারার একটা দেহাতি লোক একটা মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার জন্যেই। যন্ত্রের মতো ধীর গম্ভীর গলায় সে বলে যাচ্ছে— যশিডিহ্... যশিডিহ্...। তার মশালের আলো তার শরীরের মস্ত ছায়াকে নিয়ে দুলছে। মশালের আলো পড়েছে ধান-কেটে-নেওয়া খেতে, আলের ওপর বর্ষার ব্যাঙ ডাকছে, সেই ডাক শূন্য মাঠগুলিকে আরও বেশি শূন্য করে দিচ্ছে। এই অদ্ভুত যশিডিতে তার জন্যেই থেমেছে রেলগাড়ি। তাকে নেমে যেতে হবে। দুঃখে বুক ভেঙে যাচ্ছিল ললিতের— গাড়ির কামরায় কামরায় ঘুমন্ত সুখী লোকেরা টেরও পেল না যে, ললিতকে অন্ধকার শূন্য একটা মাঠের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে রেলগাড়িটা চলে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক যশিডি নামিয়ে নিচ্ছে তাকে চিরকালের মতো...

শেষরাত্রির দিকে ললিত ঘুমের মধ্যে যশিডির ডাক শুনতে শুনতে চমকে উঠল। যশিডি, না ললিত? তার নাম ধরে কেউ ডাকছে না?

ঘোর অন্ধকারে চোখ খুলল সে। গায়ে ঘাম। ঘরে একটা বদ্ধ হাওয়ার ভ্যাপসা গন্ধ। জেগে সে শুনতে পেল মা ডাকছে, ললিত, ও ললিত।

উঁ।

পাশ ফিরে শো। তোকে বোবায় ধরেছে।

স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল ললিত। বিছানায় একটা ঘেমো ভেজা-ভেজা ভাব, শরীর রাখতে ইচ্ছে হয় না। আস্তে সে উঠে বসল ঘোরের মধ্যে। মাকে জিজ্ঞেস করল, সারা রাত খুব বৃষ্টি হয়েছে, না মা?

দুর! বৃষ্টি কোথায়, আমি তো শুয়ে থেকেই জেগে আছি।

আচ্ছন্নতার মধ্যে বসে থেকে একটু চিন্তা করল ললিত। মনে হল সারা রাত যে বৃষ্টির শব্দটা সে শুনেছে সেটা বোধহয় বৃষ্টি নয়। মশারি তুলে বাইরে যেতে গিয়েও সে অপেক্ষা করল। না, আর কোনও শব্দ নেই। ভুলই। বুকের মধ্যে দুরদুর করে দ্রুত শব্দ হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের— ঘুম ভেঙে হঠাৎ উঠে বসলে এ-রকম হয়, আবার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু আর শুল না ললিত, বালিশের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই হাতড়ে আনল। দেশলাই জ্বালার শব্দে মা আবার জেগে উঠে বলল, ললিত উঠলি!

হুঁ

শরীর কেমন লাগছে?

ভাল। তুমি ঘুমোও।

আমার আর ঘুম! মা বিড়বিড় করে কী একটু অস্পষ্ট কথা বলে পাশ ফিরল। মায়ের হাই তোলার শব্দ শুনল ললিত। ললিতের মনে হল মা এখন আস্তে আস্তে কথা বলতে শুরু করবে। বুড়ো হয়ে গেলে মানুষের কথা বলার ঝোঁক বেড়ে যায়। তা ছাড়া এখন ললিতকে মায়ের অনেক কথা বলার আছে। সে-সব কথার অধিকাংশই আবোল-তাবোল, অর্থহীন, পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে ভুল হয়ে যায়, এক কথা থেকে পারম্পর্যহীন আর-এক কথা এসে পড়ে, কখনও ললিতের বিয়ে এবং ভবিষ্যৎ, চাকরি কিংবা রোগা হয়ে যাওয়া চেহারার কথা বলতে বলতে সম্পূর্ণ অবাস্তব জগতে চলে যায় মা। বলে, একটা বাড়ি করবি ললিত, পুরো চোদ্দো কাঠা জমির ঘেরওলা ছ'টা আম, চারটে কাঁঠাল, একটা ডুমুর, সজনে, দশটা সুপুরি আর দশটা নারকোল গাছ লাগাবি, পিছনে থাকবে কলার ঝাড়। কুঞ্জলতা আমার বড় পছন্দ, বুঝলি! বেড়ার গায়ে গায়ে লতিয়ে দেব। তুই তো শিম খেতে ভালবাসিস— একটু শিমের মাচান করবি, গোয়ালঘরের চালের ওপর লকলকিয়ে উঠবে লাউডগা…। ললিত জানে কোন সুদূর ছেলেবেলায় দেখা পুরনো ছবিটাকে মা আবার টেনে এনে দূর ভবিষ্যতের গায়ে টাঙিয়ে রাখছে। এইভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে মা, ধীর পায়ে মৃত্যুর দিকে। দীর্ঘ সব ঘুমহীন রাত জেগে ভাবতে ভাবতে মা'র মনে সব অতীত ভবিষ্যৎ গুলিয়ে ওঠে, জট পাকায়। বুদ্বুদের মতোই তখন মা'র মুখে কথা ভেসে ওঠে। কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে হালকা হয়ে যায় মা'র মন, আর তখন এইসব একা থাকা দীর্ঘ দিনরাত্রিগুলোকে আর-একটু সহনীয় মনে হয় মা'র।

এখন মায়ের কথা শুনতে ইচ্ছে করছিল না ললিতের। মশারি-টশারি তুলে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের বাতাসে একটু হাঁফ ছাড়তে ইচ্ছে করছিল তার। ঘুমহীনতার জন্য তার শরীরে জ্বর জ্বর ভাব, মুখের ভিতরে আঠালো লালা, চোখের পাতায় আঁশের মতো জড়িয়ে আছে ঘুম। অবসন্ন লাগছিল তার। বাঁ হাতের তেলোয় সিগারেটের ছাই ঝাড়ছিল ললিত। গরম ছাই কখনও ছ্যাঁকা দিচ্ছে হাতে। সেটুকু একরকম ভালই লাগছিল তার। ওই ছ্যাঁকাগুলো থেকেই বোঝা যায় যে, সে জেগে আছে, বেঁচে আছে। খুব সামান্যই এই অনুভূতিটুকু, নিতান্তই শারীরিক। তবু ললিত মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে হাতের পায়ের চামড়ার খুব কাছাকাছি আগুনটা ধরে রাখছিল, চামড়া তেতে গেলে সরিয়ে নিচ্ছিল আগুন। খেলার মতোই, অথচ ঠিক খেলাও নয়। কেননা তার এই ছোট্ট খেলাটুকুর মধ্যেই কোথাও জীবনমৃত্যুর একটা প্রশ্নও জড়িয়ে ছিল। সিগারেটে টান দিলে মশারির ভিতরটুকু আলো হয়ে যাচ্ছিল। সেই লাল আভার ভৌতিক আলোয় মশারির লম্বা সেলাইয়ের ধার ঘেঁষে ছোট্ট একটা ছারপোকাকে লক্ষ করল ললিত। তার বিছানায় বরাবরই ছারপোকা। মা চোখে দেখে না, তবু মাঝে মাঝে বিছানা বালিশ টেনে নিয়ে রোদে দেয়, গরম জলে ধুয়ে দেয় চৌকি। তবু ছারপোকাগুলো কখনও ঠিক নির্বংশ হয় না। কোথাও কোনও কোনায় ঘুপচিতে এক-আধটা থেকে যায়, সেই থেকেই আবার বংশ বিস্তার করে। চোখে পড়লে ললিত মারে। আজ সে সিগারেটের আগুন ছারপোকাটার কাছে নিয়ে গেল। তাপ পেয়ে পোকাটা দৌড় দেয়। ছেড়ে দিল ললিত! ওটা বেঁচে থাকলে ললিতের আর সামান্যই ক্ষতি হবে। বরং পোকাটার প্রাণ দিয়ে সে ভালই করল। কে জানে এর ফলে তার আয়ু কিছুটা বেড়ে যাবে কি না। সব কর্মেরই তো ফল আছে।

সিগারেটের শেষ অংশটুকু ফেলে দেওয়ার জন্য ললিত উঠল। মা আবার নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। যতদুর নিঃশব্দে সম্ভব দরজা খুলে বাইরে এসে ললিত মুগ্ধ হয়ে গেল। এত ভোর সে বোধ হয় তার জ্ঞানবয়সে দেখেনি। আকাশভরা তারা, আর পুব দিকে আকাশের রং ময়ূরের গলার মতো রঙিন। সামান্য হিম পড়েছে। সেই হিম ধুয়ে দিয়েছে বাতাসকে। বাতাস এখন বড় পবিত্র, বড় উদার। শূন্য অলিগলি রাস্তাঘাট নিয়ে কলকাতা এখন প্রকাণ্ড হয়ে আছে। সবাই জেগে উঠলে কলকাতা আবার ঘিঞ্জি আর ছোট হয়ে যাবে।

দরজার সিঁড়িতেই বসল ললিত। চৌকাঠে হেলিয়ে রাখল ক্লান্ত মাথা। আস্তে আস্তে ঘুমের ঢল নেমে আসছিল শরীরে। সামনের আকাশ, আকাশ-ভরতি তারা, না-ওঠা সূর্যের কাছে বিড় বিড় করে প্রার্থনা করল যেন তার মৃত্যু এই রকম সুন্দর একটি শেষরাত্রির সময়ে ঘটে। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল বেলায়, যখন গলির দেয়ালের ওপর দিয়ে রোদ তার মাথা ছুঁয়েছে তখন মা তাকে ডেকে জাগাল। জেগে দেখল সামনে শম্ভু দাঁড়িয়ে আছে, পায়জামার ওপর আধময়লা শার্ট, হাতে বাজারের থলি। কিছুদিন হল ললিতের অসুখের প্রায় শুরু থেকেই শম্ভু তাদের বাজার করে দিচ্ছে।

শম্ভু চৌকো সুখে সরল হাসি হাসল, শরীর কেমন?

ললিত দেখল শম্ভু গেঞ্জি পরেনি, পাতলা বুক-খোলা শার্টের ওপর দিয়ে ওর শরীরের চমৎকার পেশিগুলো জেগে আছে। কখনও শরীরের চর্চা করেনি ললিত, যদিও মাঝে মাঝেই তার মনে হয় গায়ের জোরওয়ালা পুরুষ হতে পারলে বেশ হত। তার ছাত্রদের মধ্যে যারা খেলোয়াড় তারা মাথায় মোটা হলেও ললিতের প্রিয়। শম্ভুর শান্ত মুখ। চোখ আর কণ্ঠায় একটু কোমল ফোলা ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় রাতে ও সুন্দর ঘুমিয়েছে, ঝকমকে দাঁত দেখলে বোঝা যায় ওর লিভারের দোষ নেই। তবে এ-কথা নিশ্চিত যে শম্ভুর চিন্তাশক্তি কম, বুদ্ধি প্রখর নয়। শম্ভর মুখোমুখি নিজেকে বেশ রুগ্ণ আর অসুস্থ বলে বোধ হচ্ছিল তার, হাই তুলে ললিত বলল, শেষ রাতে বাইরে এসে এখানেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

শেষ রাতে তো আমি রোজ উঠি। শম্ভু বলল, আপনি উঠেছেন জানলে ডাক দিয়ে যেতাম।

তুই ভোরে উঠে করিস কী?

দৌড়োই।

হাসল ললিত, শরীর ছাড়া শম্ভুটা কিছু বোঝে না। বলল, রোজ দৌড়োস! কতটা?

আনোয়ার শা রোড এক চক্কর দিয়ে আসি।

ললিত আচমকা প্রশ্ন করল, তোর লজ্জা করে না?

বড় অবাক হল শম্ভু, কেন, লজ্জা কীসের!

তোর পরনে কী থাকে?

এবার শব্দ করে হাসল শম্ভু, আপনি না এক্কেবারে— তারপর বলল, পরনে থাকে শর্টস, গায়ে গেঞ্জি, গলায় মাফলার আর পায়ে কেডস। আপনি একটু ভাল হয়ে নিন, আপনাকে তুলে নিয়ে যাব। রোজ দৌড়ে দেখবেন শরীর খুব ফ্রি হয়ে যাবে।

দূর! ওই পোশাকে আমি বেরোতেই পারব না!

পোশাক আপনি যা খুশি পরুন না। দৌড়টাই আসল। দৌড়নো যায় এমন যে-কোনও পোশাক করবেন। বলতে বলতে শম্ভু গলির মধ্যেই উবু হয়ে বসল, আমি বলছি আপনি দৌড়ে দেখুন ললিতাদা।

মৃদু হাসল ললিত, তারপর কী হবে!

তারপর আমি আপনাকে আসন করা শেখাব। আমাদের জিমনাশিয়ামের ট্রেনারের কাছে নিয়ে যাব। দেখবেন আপনার সব অসুখ সেরে যাবে। যোগব্যায়ামে শরীরকে যা খুশি করা যায়। আপনার কিছু হয়নি, দেখবেন আমি গ্যারান্টি দিয়ে সারিয়ে দেব।

ঘরের ভিতর থেকে মা বলল, নিয়ে যাস তো শম্ভু, আমি ওকে রোজ রাত থাকতে তুলে দেব। জোয়ান বয়সের ছেলে দেখ, রাতে নাকি ঘুম হয় না, সকাল আটটার আগে উঠতে পারে না, একটু বেশি ভালমন্দ খেলে সইতে পারে না। তুই নিয়ে যাস তো। না যায় তোর বন্ধুদের দল বেঁধে এনে জোর করে নিবি। দে তো ওর সব অসুখ সারিয়ে।

শম্ভুর গায়ে জোর আছে, আর আছে বোকার মতো খানিকটা বিশ্বাস। অল্প বুদ্ধিতে শম্ভু যেটুকু বোঝে সেটুকুকেই গোঁয়ারের মতো অনুসরণ করে। যুক্তি-তর্ক সম্ভব-অসম্ভবের কোনও বিচার নেই তার। ললিত সবই বোঝে। তবু এখন তার হঠাৎ শম্ভুর কথাটার ওপর নির্ভর করতে ইচ্ছে করছিল। যোগব্যায়ামে সব সেরে যায়। একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি ললিত! যদি সারে, যদি সেরেই যায়, যখন এ-রকম ভরসা একজন যে-কেউ জোরের সঙ্গে দিচ্ছে— তখন আশা করতে, বিশ্বাস করতে দোষ কী? যোগব্যায়ামের কতটুকু জানে ললিত? কে জানে এই রহস্যময় সব পদ্ধতির ভিতরে কী রকম প্রাণশক্তির সন্ধান রয়েছে।

সে হেসে বলল, খুব শক্ত হলে কিন্তু পারব না রে! আমার ও-সব কোনওকালের অভ্যাস নেই।

শম্ভু তড়িৎগতিতে একটা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরল, বিশ্বাস করুন ললিতা, একটুও শক্ত না। দম নেওয়া আর ছাড়া, খুব ধীরভাবে শরীরকে বাঁকানো— এটুকুই যা শক্ত। খুব সহজে অভ্যাস হয়ে যাবে দেখবেন। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কত রোগের রুগি আসে আমাদের জিমনাশিয়ামে— আরথ্রাইটিস, পোলিও, হার্টের অসুখ, আলসার...।

সব সেরে যাচ্ছে?

সব। কিন্তু জলদিবাজি করলে চলবে না। এ তো কেনাকাটার মতো সহজ ব্যাপার নয়। এ যোগ। করতে হবে ঠিকমতো, চলতে হবে ঠিকমতো, অনাচার করলে চলবে না। যেমন চলতে বলবে, তেমন চলবেন। চাল্‌না ঠিক হওয়া চাই। শম্ভুর চোখ বিশ্বাসে ভক্তিতে চকচক করে উঠছিল, সমস্ত শরীরে চাপা আবেগে পেশির ঝড় খেলা করছে। বোকা শম্ভুর মুখখানা দেখে হঠাৎ ললিতের বুক ভরে উঠছিল। শম্ভু অন্য জায়গায় যেমনই হোক, নিজের ক্ষেত্রকে সে কিন্তু ঠিকঠাক জানে। সম্ভবত সেখানে শম্ভুর ভুল হয় না। শম্ভুর কথার ওপর আত্মসমর্পণ করার একটা তীব্র ইচ্ছা বোধ করছিল ললিত।

ললিতের মনে তার হাসিঠাট্টার ভাব ছিল না। তবু মুখে একটু ঠাট্টার ভাব বজায় রেখে সে প্রশ্ন করে, চল্‌না মানে কী রে?

শম্ভু ললিতের নাড়ির গতি বুঝতে পারছিল। তাই তার চোখমুখে ঐকান্তিক নিষ্ঠার ভাব ফুটে উঠেছে, চলনা মানে চালচলন। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া, অনিয়ম না করা, পরিষ্কার থাকা, সৎ চিন্তা এবং সৎ আচরণ করা— সব বলে দেওয়া হবে।

দুর! হতাশায় মুখ ফেরাল ললিত, ও-সব হবে না। আমি সিগারেট খাব না, রাত জাগব না, দুপুরে ঘুমোব না, আলসেমি করব না! ও-সব বিধবা আর সিদ্ধবাবারা পারে।

হাসল শম্ভু, পারবেন। পারতে হয়। বিপদে পড়লে মানুষ সব পারে।

কথাটা ধাক্কা দিল ললিতকে। সামান্য উত্তেজিত হল ললিত, বলল, আমি পারব না। এতকাল পারিনি। ধাতে সইবে না।

মা দরজার কাছে খুঁটি গেড়ে বসে সব শুনছিল। এবার বলল, এমন কী শক্ত! শম্ভ করছে না! ওর চেহারা দেখ, চোখ জুড়িয়ে যায়। আর তোর কেবল হাড্ডিগুড্ডি সার হচ্ছে। কত ফরসা ছিলি, আর কেমন রোদে-পোড়া চেহারা হয়েছে। খুব পারবি, আমি তোকে চালিয়ে নেব। তুই ওকে দলে নিয়ে নে শম্ভু।

শম্ভু ঘাড় নাড়ে। ললিতকে বলে, ঠিকমতো না চললে হয় না। আমার ক্রনিক ফ্যারিনজাইটিস সারছে না, দেখুন না গলায় মাফলার জড়িয়ে সকালে বেরোতে হয়। সর্দির অ্যালার্জি, চিংড়ি ইলিশ ডিম বারণ তবু খেয়ে ফেলি, অনেক সামলেও নানা রকম অনিয়ম হয়ে যায়। কিন্তু জানি রোগটা সারানো সহজ, ঠিক মতো চললেই সেরে যাবে। অসুখটা তেমন খারাপ নয় বলে গা করি না, কিন্তু আপনার তো তা নয়...

বেলা হয়ে যাচ্ছে বলে শম্ভু উঠল। বলে গেল কাল আসবে, এসে তার জিমনাশিয়ামে নিয়ে যাবে ললিতকে। ললিত রাজি হল না, অত ভিড়ের মধ্যে খালি গায়ে আমি পারব না। প্রথম প্রথম তুই দেখিয়ে দে, একটু একটু বাসায় করি, তারপর যাব তোর জিমনাশিয়ামে।

গলির মুখে যখন শম্ভু বেরিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ ললিতের ইচ্ছে হল ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে, আমার এ-বয়সে একটু দেরি হয়ে যায়নি তো! এখনি কি কোনও ফল হবে? জিজ্ঞেস করল না লজ্জায়। কিন্তু ভাবতেই হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। যদি ফল না হয়!

বেলা দশটা নাগাদ ললিত নাক টিপে, জোর করে বমির ভাব আটকে রেখে এক গ্লাস দুধ খেল। খড়িগোলা জলের মতো বিস্বাদ। এখন তাকে এইসবই খেতে হচ্ছে— দুধ, ফলের রস, দুধভাত, সেদ্ধভাত! ঝাল-মশলা দেওয়া তীব্র স্বাদের খাবারই ললিতের প্রিয় ছিল। জলো স্বাদের খাবার তার ভাল লাগত না। এখন খেতে হচ্ছে। মনে মনে ভেবে রেখেছে ললিত এ-সব নিয়মকানুন ঝেড়ে ফেলে সে স্বাভাবিক বেপরোয়াই হয়ে যাবে আবার, এখন আর ভয় কী? শম্ভু শিঙি মাছ এনে দিয়ে গেছে বাজার থেকে, আর কাঁচা পেঁপে। দুই-ই তার অখাদ্য।

মায়ের দোক্তার কৌটো থেকে সে বেছে বেছে কয়েকটা ভাজা মৌরি ধনে মুখে দিল। তারপর ধোয়া পায়জামা পরল একটা, ধীরে ধীরে গায়ে চড়াল পাঞ্জাবি। মা রান্নার মশলা নিতে ঘরে এসে তাকে দেখে বলল, কোথায় যাচ্ছিস!

স্কুল থেকে একটু ঘুরে আসি।

কোনও দরকার নেই। সদ্য হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছ, মাথা ঘুরেটুরে রাস্তায় পড়ে গেলে...

ঘরে থাকা এখন অসম্ভব। বাইরে টলটল করছে শরৎকালের মিঠে রোদ, রাস্তায় চলেছে লোকজন। এখন একবার হাঁফ ছাড়ার জন্য বাইরে যেতেই হবে ললিতকে। অনেক দিন মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে সে শুয়ে ছিল। তার শরীর দুর্বল, চলাফেরার উপযুক্ত নয়, কিন্তু তবু একবার সুস্থ মানুষের মতো ভিড়ের মধ্যে গিয়ে চলে ফিরে

আসতে বড় ইচ্ছে করছে। মা বলছিল সে ভাল হয়ে গেছে। কিন্তু ললিত নিজের শরীরের চামড়ায় একটা বিবর্ণ হলদে ভাব লক্ষ করে— ছায়ায় বেড়ে ওঠা গাছের রং যেমন হয়। তার সমস্ত শরীর রোদ-জল-মাটির জন্য ছটফট করছে, আবার স্কুল, চায়ের দোকানের আড্ডা, চা-সিগারেট, মেয়ে দেখা, দু'-একটা অশালীন শব্দ, সিনেমা-থিয়েটার, বিয়ের নিমন্ত্রণ, আরও কত কিছুর জন্য চনমন করছে মন। হঠাৎ মনে পড়ে কত তুচ্ছকেই সে কত ভালবেসেছিল। অসুখের আগে কখনও মনে হত না যে, সে বড় ভালভাবে বেঁচে আছে। কিন্তু এখন মনে হয় তখন সে কত ভালভাবে বেঁচে ছিল!

মায়ের কথার সহজ উত্তর দিল না ললিত। বলল, স্কুলে একটু টাকাপয়সার খোঁজ করা দরকার। ডি এ-টা বোধ হয় এসেছে। ট্যাক্সিতে চলে যাব। ক্লাস তো করছি না।

মা তবু গুনগুন করে কী সব বলছিল। কান দিল না ললিত। দরজার বাইরে এসে চেঁচিয়ে বলল, সদরটা বন্ধ করে দাও।

সহজভাবে হাঁটতে পারছিল ললিত। তবে একটু কুঁজো হয়ে, সোজা হলে পেটের কাটা জায়গায় টান পড়ে। পেটের মধ্যেকার সেই ভয়ংকর ব্যথাটা আর নেই, যে-ব্যথায় সে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেত। এক দিন ক্লাসঘরে, আরেক দিন ফুটপাথেও শুয়ে পড়তে হয়েছিল তাকে। কোনও কাণ্ডজ্ঞানই বজায় রাখা যেত না তখন। ও-রকম ব্যথা যে-কোনও লোকেরই শালীনতা-ভদ্রতাবোধ, বিচার এবং বুদ্ধির শক্তি, সমস্ত রকমের সংযম ও পৌরুষ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেই ব্যথার জায়গায় এখন তার পেটে একটা নাড়ি দোল খায় যেন, আর মনে হয় পেটের মধ্যে অনেকটা ফাঁপা শূন্য জায়গা। যেন খানিকটা আকাশ ঢুকে গেছে।

অনেককালের চেনা পাড়ার ভিতর দিয়ে হাঁটছিল ললিত। সে গলির মুখে ডাকবাক্সটা পেরিয়ে গেল, করপোরেশনের জলের কলের গা ঘেঁষে গোপালদার মনোহারি দোকান, ডান দিকে একটা গ্যারেজের মধ্যে ক্লাবঘর, এখন তালাবন্ধ— মাঝে মাঝে বৃষ্টি বা দুর্যোগের দিনে বেরোতে না পারলে ললিত এইখানে এসে পাড়ার একটু বয়স্ক যুবকদের সঙ্গে তাস বা দাবা খেলেছে কখনও সখনও। ক্লাবঘর ছাড়ালে চৌধুরীদের বাগানের টানা লম্বা দেয়াল অনেকটা পর্যন্ত গেছে। দেয়ালের ওপর দিয়ে উঁকি দেয় নারকেল সুপুরি আর জাম গাছের মাথা—এ-রকমই একটা বাগানওলা বাড়ির বড় শখ মা'র। ললিত যেন এ-রকম বাড়ি করে। মাত্র চোদ্দো-পনেরো কাঠা জমি— বেশি তো নয়! বাঁ দিকে একটা তালার কারখানা। অনেক চেনা মুখ চোখে পড়ছে- এই যে ললিত, ভাল তো? হেসে ঘাড় নাড়ে ললিত। এরা বেশির ভাগই তার অসুখের খবর রাখে না, গত দু মাস কেন দেখা হয়নি এই প্রশ্নও কারও মনে আসছে না। ভেবে দেখতে গেলে দু'মাস একটুও বেশি সময় নয়। তবু ললিতের মনে হচ্ছিল অনেক দিন বাদে, যেন প্রায় সেই ছেলেবেলার ছেড়ে যাওয়া কোনও জায়গায় সে আবার ফিরে এসেছে। তার মনে হচ্ছে চার দিকে বিপুল কোনও পরিবর্তন ঘটে গেছে, অথচ কিছুই চোখে পড়ছে না। হয়তো পরিবর্তনটাই খুব গভীর আর রহস্যময়, চোখে দেখা যায় না কিন্তু টের পাওয়া যায়। আজ সব কিছুই সে খুঁটিয়ে দেখছিল, আশ্চর্যের বিষয় যে এতকাল তার নজরে পড়েনি যে সান্যালদের ছাদের ওপর একটা পায়রার বাসা আছে, লক্ষ করেনি ধোপাদের বস্তির পিছনে ছোট্ট একটা শিবমন্দিরের ত্রিশূল রাস্তা থেকেই দেখা যায়। এ-রকম ছোটখাটো আবিষ্কার করতে করতে বড় রাস্তার কাছে পর্যন্ত পৌঁছে গেল ললিত। তারপর আর সে দাঁড়াতে পারছিল না। কিছুটা বা ব্যগ্রতায় সে প্রয়োজনের চেয়ে

দ্রুত হেঁটেছে, অনভ্যাসে তার পদক্ষেপ একটু বেচাল হচ্ছিল, আর সামান্য টলমল করছিল মাথা। এখন তার পা কাঁপছিল, সমস্ত শরীরে ঘাম, মাথার মধ্যে ঝিঁঝি পোকার ডাক, আর বমির ভাব বুক জুড়ে।

অল্প দূরেই দেখা যাচ্ছে গলির পথটা আনোয়ার শা রোডে শেষ হয়েছে। তেরাস্তায় তিন-চারটে রিকশা দাঁড়িয়ে। ওই পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে একটা রিকশায় গা এলিয়ে দিতে পারত ললিত, পৌঁছে যেত ট্রাম-বাসের রাস্তায়। কিন্তু ললিত সে-চেষ্টা করল না। করলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। তার শরীর ইতিমধ্যেই মাটির দিকে ঢলে পড়ছে। মুখের মধ্যে জলহীন শুকনো ভাব, জিভ চটচট করছে। শরীরে জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরেকার মতো ঠান্ডা তাপহীনতা বোধ করছে সে, হাত পা দুর্বল হয়ে আসছে। চেনা একটা ছেলের মুখ নজরে পড়ল ললিতের। পাড়ার ছেলেই হবে, কিংবা হয়তো তার ছাত্রই। বখাটে চেহারা, হাতে সিগারেট। তাকেই হাতছানি দিয়ে ডাকল ললিত। সে কাছে আসতেই বলল, আমাকে একটা রিকশা ডেকে দেবে ভাই, আমি অসুস্থ, হাঁটতে পারছি না।

ছেলেটা সিগারেট লুকোয়নি, কিন্তু চটপটে পায়ে দৌড়ে গিয়ে তেরাস্তা থেকে গলির মধ্যে রিকশা নিয়ে এল। ললিতকে ধরে তুলে দিল রিকশায়। রিকশার ঢাকনা উঠিয়ে দিল। রিকশাওয়ালাকে বলে দিল, আস্তে চালিয়ে নিবি।

অতটুকু ছেলেকে ধন্যবাদ দিতে লজ্জা করছিল ললিতের। সে শুধু একটু কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল। রিকশা চলতেই ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগল চোখেমুখে। আস্তে আস্তে আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছিল সব। চোখ চাইল ললিত— বাঁ ধরে খুপরি দোকানের সারি, নোংরা বাজার আর বস্তি, গত বর্ষার জল উপচে পড়ছে কাঁচা ড্রেনে, ডান ধরে রেলিং ঘেরা একটা পুরনো পুকুর, তার পাশে মসজিদ। বড় রাস্তায় এসে রিকশা ছেড়ে দিল ললিত। দেখল অফিসের ভিড়-বোঝাই বাসে-ট্রামে ওঠা অসম্ভব। এ-সময়ে ট্যাক্সি পাওয়া ভাগ্যের কথা।

অসহায়ভাবে সে ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে রইল। এই অসম্ভব রোগগ্রস্ত শরীরটার জন্য বড় ঘেন্না হচ্ছিল ললিতের। শরীর— তবু শরীর ছাড়া অস্তিত্ব নেই।

একটা ট্রাম তার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল ধীরগতিতে। সেকেন্ড ক্লাস থেকে কে যেন ডাকল, ললিতদা!

অত ভিড়ের মধ্যে কাউকে চিনবার উপায় নেই। ললিত ট্রামটার দিকে চেয়ে রইল শুধু। লক্ষ করল ট্রামটা তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলে দরজার ভিড় ঠেলে লাফিয়ে নামল একজন। দূর থেকেই তাকে দেখে হেসে হাত উঁচু করল, এগিয়ে এল তার দিকে। ভ্রূ কুঁচকে দেখছিল ললিত। লোকটার পরনে ঝকমকে টেরিলিনের প্যান্ট-শার্ট, হাতে ফোলিও ব্যাগ, গলায় টাইও ঝুলছে। কিন্তু এমনই গ্রাম্য তার হাবভাব, হাত পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলার বিশ্রী ভঙ্গি যে, পোশাকটাই মার খেয়ে গেছে। চিনতে পারছিল না ললিত। লোকটা যখন খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাসল তখন তার পান-খাওয়া কালো দাঁত, ডান গালে পানের টিবি, আর কপালে ছোট্ট একটু রক্তচন্দনের ফোটা দেখে চিনতে পারল— এ লক্ষ্মীকান্ত । কোনও দিনই তার সম্বন্ধে আর পাঁচজনের মতামতকে পরোয়া করে না লক্ষ্মীকান্ত। সে যে এখনও পোশাক-আশাক পরে রাস্তায় বেরোয় এটাই রাস্তার লোকের বাবার ভাগ্য।

ফোলিও ব্যাগটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে বাড়িয়ে ললিতের হাত ধরে রামঝাঁকানি দেয় লক্ষ্মীকান্ত, ললিতদা, কী কথা ছিল?

যেন পরশুদিনই কথাটা হয়েছে এমনই জিজ্ঞাসার ভঙ্গি তার। ললিত হাসল, কেমন আছ লক্ষ্মীকান্ত?

ভাল। বলে হাত ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্মীকান্ত কাজের কথায় আসে, ললিতদা, কী কথা ছিল? অ্যাঁ?

ঠিক কী যে করে লক্ষ্মীকান্ত তা জানে না ললিত। তাকে একনজর দেখেই মনে হয় যে লোকটি খুব বিষয়ী, দালাল কিংবা ফড়ে। বস্তুত লক্ষ্মীকান্ত তাই। মোটাসোটা কালোকালো চেহারা তার, মাথায় একটু টাক— সম্ভবত আসল বয়সের তুলনায় তাকে বেশি বয়সেরই দেখায়। তবে তার আসল বয়সটাও অবশ্যই ললিতের চেয়ে অন্তত বছর পাঁচেকের বেশি। তবু বরাবরই লক্ষ্মীকান্ত ললিতকে দাদা বলে ডেকে আসছে, আর ললিত — যে-কোনও লোকের সঙ্গেই যার 'আপনি'থেকে 'তুমি'তে নামতে অনেক সময় লাগে, সেও সেই প্রথম থেকেই লক্ষ্মীকান্তকে নাম ধরে ডেকে 'তুমি' বলে আসছে। এর জন্য লক্ষ্মীকান্তর স্বভাবটিই দায়ী— সকলের কাছে সবসময়েই সে বশংবদ, একনাগাড়ে নিজেকে উজাড় করে কথা বলে যায়, অন্যে বিরক্ত হচ্ছে কি না তা লক্ষও করে না। লক্ষ্মীকান্তর আত্মসচেতনতা নেই, বিষয়ী লোকের তা থাকলে চলেও না। কলকাতার বিস্তৃত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সে হচ্ছে খুঁটে-খাওয়া পাখি। বিশেষত তার অনেক রকমের দালালি, হাজারটা লোককে চরিয়ে খেতে হয়। তাই নিজেকে নিচু করে রাখা লক্ষ্মীকান্তর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কুড়ির ওপর বয়সের যে-কোনও লোককেই সে দাদা বলে ডাকে— ব্যবসার সম্পর্ক থাক আর না থাক। তাকে দেখে মনে হয় সে সম্মান বা সমাদর খুব কমই পায়, এবং পায় না বলে তার কোনও ক্ষোভও নেই। যে-কোনও লোকের সঙ্গেই মিশ খেতে গেলে ও-রকম ক্ষোভ না থাকাই ভাল। কবে, কীভাবে যে ললিতের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল তা আজ আর ললিতের মনে নেই, তবে লক্ষ্মীকান্ত পায়ের তলায় সরষে নিয়ে সারা শহরে চরকিবাজি খায় বলে মাঝে মাঝেই তার সঙ্গে ললিতের দেখা হয়ে যায়, আর দেখা হলেই লক্ষ্মীকান্তর এক কথা, কী কথা ছিল দাদা! মনে নেই?

মনে আছে ললিতের। হাজার পাঁচেক টাকার একটা জীবনবিমা তাকে দিয়ে করাতে চাইছে সে। এবং চার বছর ধরে তার পিছনে লেগে আছে। জীবনবিমার উপকারিতা, বা না-করা যে সামাজিক অপরাধ— এ-সব নিয়ে খুব বেশি কিছু বলে না সে, তার আবেদন অন্য রকমের— যদি না করেন তবে আমার এজেন্সিটা চলে যাবে, খুব ঝামেলায় পড়ে যাব দাদা। তারপর নিজের সংসার, অপদার্থ ছেলেমেয়ে, নিষ্ঠুর ভাইরা এবং একচোখা বাবার কথা অকপটে বলতে থাকে সে। আর মাঝে মাঝে বলে যে, এবার গভর্নমেন্টের সঙ্গে তার একটা মামলা লেগে যাবে। বালিগঞ্জের ভাল একটি পাড়ায় অনেকটা বেওয়ারিশ জমি দখল করে আছে লক্ষ্মীকান্ত। ওখানে জমির দাম পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা। জমিটা কেনেনি সে, খাজনাও বোধ হয় দেয় না। সামনে তার একটা মুদির দোকান আছে, যেটার দেখাশোনা করে তার বারো বছর বয়সের ছেলে। দোকানের গা ঘেঁষেই মাটি দিয়ে গেঁথে কালীর মন্দির বানিয়েছে সে, নিত্যপূজা হয়, বাগান করে গাছ লাগিয়েছে, যাতে সহজে উচ্ছেদ হতে না হয়। লক্ষ্মীকান্তর বাড়ি বাঁকুড়ায়, তবু রিফিউজি কার্ড করিয়ে রেখেছে সে। তার ধারণা তাকে তোলা বড় সহজে হবে না। তার বিশ্বাস আরও বছর দশেক ওখানে টিকে যেতে পারলে জমিটা তার হয়ে যাবে। এ-সবই ললিতের লক্ষ্মীকান্তর কাছেই শোন। এত সব সত্ত্বেও লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গ খুব প্রিয় মনে হয় না ললিতের, দু' দণ্ড তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে। সম্ভবত এই গুণটুকুর জন্যই টিকে আছে সে, টিকে যাবে।

ললিত প্রসন্ন মুখে হেসে বলল, ব্যবসা কেমন?

ভাল কোথায়? আপনি গা করছেন না, কিন্তু এই ভাল সময় চলে যাচ্ছে। দেরি করলেই দেরি। চার বছর আগে করে রাখলে আজ আপনি চার বছর এগিয়ে যেতেন ম্যাচুয়ারিটিতে। চিন্তা করে দেখুন বিশ-পঁচিশ বছর পর এক থোকে অত টাকা...

বিশ-পঁচিশ বছর সময় বড় অলীক বলে মনে হয়। তবু হাসল ললিত, বলল, বিশ-পঁচিশ বছর পর টাকার দাম অনেক কমে যাবে লক্ষ্মীকান্ত, আজকের দাম পাওয়া যাবে না। ঠকা হয়ে যাবে!

হতাশ হল লক্ষ্মীকান্ত, বলল, আপনাদের কেবল ওই এক কথা! বিশ বছর লম্বা সময়, ততদিনে দাম কমে-বেড়ে কী হবে তা কি বলা যায়! হয়তো দেখলেন পাঁচ হাজারের দাম পাঁচ লাখে দাঁড়িয়েছে...

তা কি বলা যায়! তা ছাড়া দেখো লক্ষ্মীকান্ত, পাঁচ হাজার টাকার জন্য বিশ বছর হাঁ করে বসে থাকাও বড় কষ্টের। আমার অত ধৈর্য নেই।

বেঁচে থাকাটাই ধৈর্যের ব্যাপার ললিতদা। দেখুন না, আমি চার বছর ধরে আপনার পিছনে ঘুরছি, আপনি ফিরিয়ে দিচ্ছেন....

ললিত হাসল, যদি ততদিন না বাঁচি লক্ষ্মীকান্ত, তবে আমার টাকাটা খাবে কে? বুড়ি মা ছাড়া আমার কে আছে?

লক্ষ্মীকান্ত জিব দিয়ে চকাস শব্দ করল, টাইয়ের ফ্ল্যাপ তুলে থুতনির কাছে একটু ঘাম মুছে নিল। তারপর সে কথা বলার জন্য মুখ খুলতেই ললিত বুঝতে পারল লক্ষ্মীকান্ত কী বলবে। সে তার ভাবী বউ এবং বাচ্চাকাচ্চার কথা তুলবে এবার, বলবে, এই বেলা বিয়ে করে ফেলুন, আমি মেয়ে দেখে দিচ্ছি। চমৎকার মেয়ে আছে আমার হাতে। যতদূর শুনেছে ললিত, লক্ষ্মীকান্ত ঘটকালিরও একটা সাইড-বিজনেস করে, মেয়ের বাপের কাছ থেকে পয়সা নেয়। তাই ললিত তাড়াতাড়ি বলল, আমার শরীর ভাল নেই লক্ষ্মীকান্ত, সদ্য একটা অপারেশন হয়েছে আমার। তুমি আমাকে একটা ট্যাক্সি ধরে দাও দেখি।

দেখছি। বলে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ল লক্ষ্মীকান্ত।

ট্যাক্সি পাওয়া খুব সহজ হল না। মোটা মানুষ লক্ষ্মীকান্ত তার থলথলে শরীর নিয়ে গাড়িঘোড়ার মধ্য দিয়ে কয়েকবার রাস্তার এপার-ওপার ছোটাছুটি করল, ভরতি ট্যাক্সিকেও হাত তুলে থামাবার চেষ্টা করল বারকয়েক। অনেক দূর হেঁটে গেল, একবার ডান পারে, একবার বাঁ ধারে। তার ব্যস্ততা এবং আগ্রহ দেখবার মতো। ললিত দেখছিল। সে ভেবে দেখল খুব স্বার্থেও সে নিজে কারও জন্য ট্যাক্সি ধরে দিতে এত ছোটাছুটি করত না। প্রাণ আছে লক্ষ্মীকান্তর, কিংবা কে জানে এটাও লক্ষ্মীকান্তর ব্যবসার অঙ্গ কি না। যে-কাউকে খুশি করতেই লক্ষ্মীকান্ত বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সবসময়ে যে তার প্রতিদান চায় তা নয় বোধ হয়। কেন না ললিতের দ্বারা যে তার খুব সুবিধে হবে না এটা লক্ষ্মীকান্ত নিশ্চিত বুঝে গেছে।

ট্যাক্সি পাওয়া গেল অবশেষে। লক্ষ্মীকান্তই ধরে আনল।

একই দিকে যাবে বলে লক্ষ্মীকান্তও উঠল ট্যাক্সিতে। পাশাপাশি বসে ললিতের দিকে তাকিয়ে হাসল সে, বে-খেয়ালে টাইয়ের ফ্ল্যাপ তুলে থুতনির ঘাম মুছল—বস্তুত ওই জায়গাটাই বোধ হয় বেশি ঘামে তার। ললিত ভেবে পেল না টাইটা আসলে লক্ষ্মীকান্তর পোশাকের অংশ, না কৌশলে থুতনির ঘাম মুছবার জন্যই ওটা বেঁধেছে সে!

লক্ষ্মীকান্ত আস্তে আস্তে কথা পাড়ছিল। সংসারও যে একটা ধর্ম এবং সেটা যে উপেক্ষা করার নয়— সেই পুরনো কথা।

ললিত বলল, তুমি কি আমাকে বিয়েটিয়ের কথা বলবে নাকি লক্ষ্মীকান্ত? বলে হাসল সে, তবে দেখো ইনশিওর করা কী ঝামেলার ব্যাপার! পাঁচ হাজার টাকার ওয়ারিসান খুঁজতে গিয়ে বিয়ে করা! তার চেয়ে এই বেশ আছি হে, শেষে ঢাকের দায়ে মনসা বিকোবে...

স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ললিত। লক্ষ্মীকান্ত নেমে বলল, আর একদিন দেখা করব দাদা, এবার বাসায় যাব। ঠিকানা আমার কাছে আছে।

যেয়ো। ললিত হেসে বলল, কিন্তু আমার একটা শক্ত অসুখ করেছে, বোধহয় বেশি দিন বাঁচব না।

কী অসুখ? বলে সত্যিকারের উৎকণ্ঠা দেখাল লক্ষ্মীকান্ত।

ক্যানসার। বলে ললিত ভাল করে ওর মুখটা দেখছিল। আশ্চর্য হয়ে সে দেখল লক্ষ্মীকান্তর চোখে সত্যিকারের বিস্ময় ফুটল, ছোট হয়ে গেল মুখ।

দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল সে, এত অল্প বয়সে, দাদা?

শুধু হাসল ললিত। কিছু বলার ছিল না।

আবার দেখা হবে লক্ষ্মীকান্ত। বলে পিছু ফিরল ললিত। দেখা হবে, না হলেও ক্ষতি নেই। ললিতের ইচ্ছে হল একবার লক্ষ্মীকান্তকে ডেকে বলে— তোমাকে আমি পছন্দ করতুম, লক্ষ্মীকান্ত। পরমুহূর্তে সে সামলে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল লক্ষ্মীকান্ত খুবই ধীরে পায়ে ট্রাম রাস্তার দিকে এগোচ্ছে। একবার সেও ঘাড় ফেরাল। চোখাচোখি হয়ে যাওয়ার ভয়ে ত্বরিতে মুখ ঘুরিয়ে নেয় ললিত।

বড় রাস্তা থেকে গলির মধ্যে কয়েক পা এগোলেই তার স্কুল। পুরনো আমলের জমিদার বাড়ি, বাইরের দিকে বারান্দায় দুটো পাথর বসানো মোটা থাম আর কাজ করা রেলিং। বাড়িটার কাছাকাছি আসতে-না-আসতেই শ'খানেক ছেলে ছুটে এল চার দিক থেকে মৌমাছির মতো। ঘিরে ধরল তাকে। চিৎকারে কানে তালা লেগে গেল ললিতের; 'স্যার...স্যার...স্যার' অজস্র প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছিল ললিত— কোথায় ছিলেন স্যার? কী হয়েছিল স্যার? কেমন আছেন স্যার?

এক পা-ও এগোনোর জো ছিল না আর। খোলা রাস্তার ওপরেই তার পায়ে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম শুরু হয়ে গেছে। পায়ের চামড়ায় কচি হাতগুলো খাবলে দিচ্ছে, ঘষা খাচ্ছে, কাড়াকাড়িতে নখের আঁচড় লাগছে। ধাক্কায় বেসামাল ললিত হাসিমুখেই দাঁড়িয়ে টাল খাচ্ছিল। মনের কোনও চিন্তাশক্তি ছিল না ললিতের। আবেগে সে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল। চোখের পাতা বুজে আসছিল তার— দুর্বল শরীর যে-কোনও সময়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়তে পারে, তবু বড় ভাল লাগছিল ললিতের। যেন চার দিক থেকে প্রাণ আর জীবন তাকে চেপে ধরেছে, হঠাৎ কোথাও তার যাওয়ার উপায় নেই, আর কোনও বহুদূরে নয়। সে দেখছিল যেন হাজার হাজার ছেলে তাকে ঘিরে ধরেছে।

ললিত জানে ছেলেদের কাছে সে কত প্রিয় ছিল। ক্লাসে অনেক দিন ফাঁকি দিয়েছে সে, পড়া ফেলে রেখে গল্প করেছে, কিংবা অকারণ টাস্ক দিয়ে বসিয়ে রেখেছে ছাত্রদের, তারপর আর সে টাস্ক দেখে দেয়নি। তবু ললিত স্যার ছেলেদের বড় প্রিয়, সবচেয়ে প্রিয়। তাই ছেলেদের হল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ অনুভব করল যে, সে বড় বেঁচে আছে। মনে মনে সে বলছিল, ধন্যবাদ, তোমাদের ধন্যবাদ।

তার অবস্থা দেখে মাস্টার মশাইরা অনেকেই বেরিয়ে এসেছিলেন। ললিত শুনল উদ্ধববাবু চিৎকার করছেন, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, স্যারের অসুখ, ভয়ংকর অসুখ। সরে যা। দম নিতে দে... পণ্ডিতমশাই ছেলেদের নড়া ধরে বেড়াল ছানার মতো সরিয়ে দিয়ে ধমকাচ্ছিলেন, আদরে মেরে ফেলবি রোগা মানুষটাকে! হট সব হট যা...

দু'পাশ থেকে তার হাত ধরে উদ্ধববাবু আর পণ্ডিতমশাই তাকে কমনরুমে নিয়ে এলেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে তাকে দেখে। মাথার ওপর ফ্যান চালিয়ে দেওয়া হল, বসতে দেওয়া হল জানালার কাছে সবচেয়ে সুন্দর জায়গার চেয়ারটিতে।

লোকের ভিড়ে নিজেকে আর অনুভব করতে পারছিল না ললিত। এত উত্তাপে আদরে উৎকণ্ঠায় সে গলে চার দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। ক্রমান্বয়ে হাসা ছাড়া তার আর কিছুই করার ছিল না, আর মাঝে মাঝে 'এখন কেমন আছেন?' এই সাধারণ প্রশ্নটির উত্তরে সে মাথা নেড়ে বলছিল, ভাল, বেশ ভাল। তাকে ঘিরে এসে দাঁড়িয়েছে সবাই। অজস্র কথার শব্দ হচ্ছে। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, তবু সুবোধবাবু ভাঁজকরা একটা খবরের কাগজ তার মাথার ওপর পাখার মতো নাড়ছিলেন।

ললিত দেখল জানালা বেয়ে উঠেছে ছেলেরা। শিকের ও-পাশে তাদের ঘিঞ্জি মুখ, দরজার চৌকাঠের ও-পাশ থেকে শরীর ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ভিতরে ঢোকা বারণ বলে। উঁচু ক্লাসের ছেলেরা ভিড় সরাতে সরাতে চেঁচাচ্ছে। ললিত তার চেনা মুখগুলো দেখছিল...সাধন...অমিতাভ...নিশীথ দে... অরুণ বরুণ দুই ভাই... হাতকাটা পশুপতি... অনেকের নাম মনে নেই। সে দেখল কানু বেয়ারা ভিড় ঠেলে প্লেট ঢাকা এক গ্লাস জল নিয়ে তার দিকে আসছে, সেই কানু যে কোনও দিন ললিতের বশ মানেনি। সে সুনীল হালদারকে দেখতে পাচ্ছিল, যার কাছে গত দু'বছর ধরে তার পঁচিশটা টাকা পাওনা আছে। বেঁটেখাটো প্রতাপবাবুর হাসি-হাসি মুখটি ভিড় ঠেলে এগিয়ে আছে, কিছু দিন আগে তিনি ললিতের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলেন। সম্ভবত এখন বিয়েটা হয়নি বলে নিজের ভাগ্যকে তিনি ধন্যবাদ দিচ্ছেন। তবু সকলের প্রতিই একধরনের কৃতজ্ঞতা অনুভব করছিল ললিত।

তার মনে হচ্ছিল এ-রকমভাবে সকলেই যদি চায়, সকলেই যদি ভালবাসায় বেঁধে রাখে তাকে, তবে কে তাকে নিয়ে যাবে জীবন থেকে! কী করে মরবে ললিত!

পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা বাজছিল। দশটা পঞ্চান্ন। জানালা থেকে টুপটাপ করে খসে পড়ছে কচি মুখগুলি, তার চারধারের চাপ ভিড় আলগা হয়ে যাচ্ছে। স্কুল বসবে। ঘণ্টা বাজছে।... স্কুলের ঘন্টা তার বড় চেনা। তবু হঠাৎ মনে পড়ে বিষাদময় সেই ঘণ্টার শব্দ— বড় স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার আগে যেমন বাজে। ভিড় আলগা হয়ে যাচ্ছে চারদিকে... ললিতের অস্তিত্ব থেকে খসে যাচ্ছে চেনা, প্রিয় মানুষেরা... ট্রেন ছাড়তে আর দেরি নেই।

চার

রাত্রিটা খুব ছোট ছিল। খুব ছোট। ভোরের ঘুমে সে স্বপ্ন দেখছিল, চন্দনের গন্ধওলা সাবানের ফেনার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে আছে সে। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। চোখ খুলেই সে দেখতে পেল দুধের মতো সাদা সুন্দর বুকে দুটি স্তন, সরু একটি সোনার চেন স্তনের ওপর দিয়ে ঝুলে তার কপালে লেগে আছে। রিণি, তার বউ।

সঞ্জয় হাসল। এক হাতে আলতোভাবে তার মাথা বুকে চেপে রেখে অন্য হাতে মাথার চুলের মধ্যে বিলি কাটছে রিণি। রিণি— রিন্তি— রিন্তু— তার বউ— তার সোহাগি। সঞ্জয় চোখ বোজে আবার। পাতলা একটা চাদরের তুলায় দু'জনেরই খালি গা। শরীরের ওম ঘন হয়ে আছে রিণির। শরতের সকালের মৃদু হিম থেকে তাকে ঘিরে আছে। মাথাটা আরও ভাল করে রিণির বুকে তুলে দেয় সঞ্জয়, সারা রাতে মাথা-রাখা উষ্ণ বালিশের স্বাদ একঘেয়ে হয়ে গেছে। রাতে গায়ে পাউডার মেখেছে রিণি। চন্দনের গন্ধ।

মাথাটা আবার বালিশের ওপর ঠেলে দিল রিণি, ওঠো, উঠে পড়ো।

সঞ্জয় গুনগুন করে, রিন্তু মিন্তু সিন্তু নিন্তু!

সুগন্ধ চুলের গোছা তার মুখের ওপর ফেলে নিচু হয় রিণি, হয়ে বলে, আর বাকি রইল কী? কিন্তু কিন্তু? ওঠো, উঠে পড়ো।

কখন থেকে আদর করছ আমাকে?

অনেকক্ষণ।

জাগাওনি কেন?

ঠিক সময়ে জাগিয়েছি।

দুই বালিশের ফাঁকে রাখা সঞ্জয়ের হাতঘড়ি বের করে এনে দেখে রিণি, ছ'টা দশ।

ঠিক সময়! ঠিক সময়! সঞ্জয় কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হল, কী করে বুঝলে ঠিক সময়! কীসের ঠিক সময়! কেন ঠিক সময়!

আঃ! অত জানি না। ছ'টা এগারো-বারো হয়ে গেল।

ঠিক সময় ছ'টা দশ! বলতে বলতে সঞ্জয় আবার বালিশে মাথা রেখে গড়ায়, ঠিক সময় ছ'টা এগারো বারো তেরো। আদরের ঠিক সময়, বিছানা ছাড়ার ঠিক ঠিক সময়, চায়ের ঠিক সময়, কাগজের ঠিক সময়...

পাগল!

পাগলামির ঠিক সময়।

সারাদিন তুমি অত কাজের, কিন্তু সকালে ভীষণ কুঁড়ে।

কুঁড়েমির আজিকে সময়... সময়! না অবসর?

দেখো, পিকলুটার বোধ হয় জ্বর।

জ্বর?

মনে হচ্ছে। সারা রাত জ্বালিয়েছে। সকালে আবার ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। তোমার যা ঘুম, টেরও পাওনি।

রিণির ওধারে অয়েল ক্লথের ওপর পাতা পিকলুর বিছানা। তাদের ছেলে। বয়স সাত মাস। হাতের ভর দিয়ে উঠল সঞ্জয়, রিণির শরীরের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত পিকলুর গা দেখে বলল, দূর! জ্বর কোথায়! গা ঠান্ডা।

কী জানি। মনে তো হচ্ছে। রাতে কয়েকবার কেশেছিল তো!

সঞ্জয়ের হাত গায়ে লাগতে পিকলুর ঘুমন্ত ঠোঁট ফুলল, ফোঁপানির শব্দ হল একটু। সঞ্জয় হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, শ্রীমান ক্রন্দন। তারপর বাউল সুরে গুনগুন করল, আপনজনরে চিনলি না রে মন, বাঁচবি ক্যামোনে? বাউল সঞ্জয় বলে...

ও কী কথা! ধমক দেয় রিণি, বিশ্রী!

কেন! গান! সঞ্জয় বাউলের রচনা।

ছাই গান। রিণি পিকলুর বুকের ওপর আলতো হাত রেখে আস্তে করে বলল, ও বাঁচবে। বাঁচবার জন্যই এসেছে।

মেঝের ওপর খবরের কাগজ পড়ে ছিল। বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে কাগজটা তুলে আনল সঞ্জয়, রিণির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখো তো প্রথম পৃষ্ঠায় কী কী খবর আছে।

তুমি দেখো।

কাগজ না দেখে, চোখ বুজেই সঞ্জয় বলতে লাগল, প্রথম হেডিং একটা ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট, প্লেন ক্র্যাশ, খনিতে ধস, একটু ছোট হেডিং— হাঙ্গামায় চারজন খুন, বিস্ফোরণে কয়েকজন হতাহত, রাহাজানি, ডাকাতি, ভিয়েতনামে বোমার শিলাবৃষ্টি...

চুপ করো।

চোখ চেয়ে হাসল সঞ্জয়, এরপরও আশা হয় বাঁচবে?

আঃ।

বেশ শক্ত ব্যাপার। রিন্তু-মিন্তু, পিকলুর পক্ষে ব্যাপারটা বেশ শক্ত হবে। আরও খারাপ দিন আসছে।

তার কথায় কান দিল না রিণি। সে ঝুঁকে পড়ে পিকলুর কপালে নিজের গাল ঠেকিয়ে জ্বর বুঝবার চেষ্টা করছিল।

শ্রীমতী বাতিক। কাগজটা ফেলে দিয়ে সঞ্জয় বলল।

বলে বিছানা ছাড়ল সে। মেঝের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই তার শরীর থেকে ঘুমের আর আলসেমির জড়তা ঝরে গেল। এটা তার অনেক দিনের অভ্যাস— বিশ্রাম বা কুঁড়েমি থেকে চট করে আবার কাজের মধ্যে চলে আসা। বিছানা ছাড়ার পরও আড়মোড়া ভেঙে, হাই তুলে বা ঘুমের আমেজকে বজায় রাখতে গিয়ে সে সময় নষ্ট করে না। সে অনেকটাই ঘড়ির অনুশাসন মেনে-চলা মানুষ। কাজের লোক। সবসময়ে নিজেকে যে-কোনও কাজের জন্য তৈরি রাখা তার প্রিয় অভ্যাস। তাতে মানুষ অহংকারী না হয়েও নিজেকে গুরুত্ব দিতে শেখে। সে শিখেছে। অবশ্য এ-ব্যাপারে সে খুব কড়াকড়ি করে না— যতটা করলে দৃষ্টিকটু দেখায় বা অন্যে অস্বস্তি বোধ করে। কাজের সঙ্গে মজাও তার প্রিয়। মন হালকা না থাকলে সে কাজ করতে পারে না। মেঘলা আকাশ, গোমড়া মুখ, গভীর চিন্তা তার অপছন্দ।

চমৎকার দিন। ঝলমল করছে রোদ। শরৎকাল। পুজো-পুজো ভাব। আপন মনে হাসল সঞ্জয়। চমৎকার দিন... বেশ দিন... হালকা দিন... উড়ে যাব... উড়ে যাই...

বাথরুমের র‍্যাক থেকে টুথব্রাশ তুলে নিয়ে সঞ্জয় দেখল ব্রাশটা পুরনো হয় গেছে। বদলাবার সময়। সে ব্রাশটার সঙ্গে কথা বলছিল— সুপ্রভাত শ্রীযুক্ত ব্রাশ, আপনার শরীরটা তো ভাল দেখছি না। বুড়ো হয়ে গেছেন। এটাই বিশ্রামের ঠিক সময়। বিশ্রাম? সেও কি আপনার কপালে আছে? হয় আমার জুতোর র‍্যাকে, নয়তো রিণির গয়না পরিষ্কার করার কাজে আপনাকে লাগতে হবে। জীবনটা এ-রকমই মশাই, যতক্ষণ কাজ আদায় হয় কেউ ছেড়ে দেয় না।... শ্রীমতী পেস্ট, আপনি একেবারে যুবতী, তবু বুড়ো ব্রাশটার ঘর করতে হচ্ছে! চিন্তা নেই, শিগগিরই আসছেন নতুন বর— ঝকঝকে নতুন...

বাথরুমের আয়নায় তার ছায়া পড়েছিল। সেদিকে চেয়ে হাসল সঞ্জয়। পুরনো বন্ধু সঞ্জয়, আহা বড় দুঃখে ছিল লোকটা। কেবল ধৈর্য অধ্যবসায় আর দুশ্চিন্তাহীন মন ছিল বলে বেঁচে গেছে এ-যাত্রা। এখন মজায় আছে।

চোখ টিপল সঞ্জয়, ফিস ফিস করে বলল, কী টু-পাইস হচ্ছে?

হচ্ছে তো। বলে হাসল। তারপরই মেঘের ছায়ার মতো একটু ম্লানতা এসে গেল তার মুখে। তার মুখের দু'পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে পেস্টের ফেনা। অমানুষের মতো দেখাচ্ছে তাকে। দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে সে একটু হাসল, অস্ফুট গলায় প্রশ্ন করল, ভাল আছ তো, সঞ্জয়?

বোধ হয় ভালই আছে সে। ভাল থাকা এক-এক রকমের। যদি অতীতের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে সে ভালই আছে। মন সে-কথা মানছে কি? না, মানছে না। তাতে কিছু আসে যায় না। যুক্তিশাস্ত্র অনুযায়ী তার ভাল থাকা উচিত। সততা, কর্মক্ষমতা আর নিষ্ঠা তিনটেই তার ছিল। যা মানুষকে সফলতা এনে দেয়। সফলতা, সুখের মৃদু উত্তাপ, নিরাপত্তা। ঝকঝকে সুন্দর বাথরুমটার নানা জায়গায় চোখ রাখল সে। আয়নার তাকের ওপর শ্যাম্পুর শিশি, ও-ডি কোলান, সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই, রুপোর মতো চকমকে র‍্যাকে পরিষ্কার তোয়ালে, দুধের মতো সাদা বেসিন, কমোড, চৌবাচ্চার পাশে তাকের ওপর রাখা শীতকালের জন্য জল গরম করার যন্ত্র। চমৎকার নয়! বছর দুয়েক আগে সে হিন্দুস্থান পার্কের এই আধুনিক ফ্ল্যাটখানা ভাড়া নিয়েছিল। দেড় ঘরের ফ্ল্যাট, তিনশো টাকা। খুব বেশি কি? বেশি না, মোটামুটি ভাল থাকার পক্ষে বেশি না মোটেই। যে কেউ স্বীকার করবে। আবার হাসল সঞ্জয়। প্রচুর ফেনায় তার ঠোঁট দুটোই ঢেকে গেছে, প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে তার হাঁ-মুখকে। অনেকটা বাঘের মতে, না? বাঘের মুখ কি এ-রকম হয়? হবেও বা। অনেক কাল বাঘ-টাঘ আর দেখেনি সঞ্জয়।

সততা, কর্মক্ষমতা আর নিষ্ঠা। তিনটেই ছিল তার। নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে সে বাঁ হাতের দুটো আঙুল তুলে দেখাল, অস্ফুট গলায় বলল, এখন দুটো আছে! শেষ দুটো! কিংবা কে জানে শেষটাও আছে কি না! তবে দুটোই বাদ দাও হে, ধরো একটাই আছে। কর্মক্ষমতা। শেষ পর্যন্ত যদি এটাও থাকে তবে ভাগ্য ভাল... হারাধনের দশটি ছেলের যা হয়েছিল... মনে নেই।

মুখ ধুয়ে সে গুনগুন করে গান গায়, সুখে আছি, সুখে আছি...

ঠিক সাড়ে আটটায় খাবার খায় সে। সাজিয়ে দেয় রিণি। মুড়মুড়ে টোস্ট আর মাখন, ডিমসেদ্ধ, কোকো মেশানো এক গ্লাস দুধ। ব্যস। দুপুরে অফিসেও শুকনো লাঞ্চ সারে সে— রুটি মাংস কিংবা টোস্ট ডিম-

সবজিসেদ্ধ-কলা-কফি। দিনে ভাত খায় না সে। অনেককালের অভ্যাস, প্রায় সেই প্রথম যৌবনের কিংবা শেষ কৈশোরের। যখন সে বোস অ্যান্ড কোম্পানিকে নিজের হাতে তৈরি করছে। নানু বোসের সেই কোম্পানি।

খাওয়ার জায়গাটা ছোট্ট। একটা মাঝারি টেবিল পাতায় জায়গাটা জুড়ে গেছে। এক পাশে গ্রিল দেওয়া, গ্রিলের ও-পাশে বাগান। নীচের তলার ফ্ল্যাট বলে ঘর থেকে বাগানের কিছু গাছপালা দেখা যায়। গ্রিল ঘেঁষে একটি গন্ধরাজের গাছ। যতক্ষণ খায় সঞ্জয় ততক্ষণ বারবার গাছপালাগুলোর দিকে চেয়ে থাকে, রোদ বৃষ্টি কিংবা কুয়াশার খেলা দেখে। আজ চমৎকার রোদ, না-ঠান্ডা না-গরম একটি দিন। আজ উড়ে যাব...উড়ে যাই...

মনের মধ্যে আজকাল মাঝে মাঝে ম্লান মেঘের ছায়া আনাগোনা করে। কখনও একটু ক্লান্তি। বয়স হয়ে যাচ্ছে? দুধের গ্লাস নামিয়ে রেখে সঞ্জয় বলল, বয়স হয়ে যাচ্ছে।

সে-কথার উত্তর না দিয়ে রিণি বলল, মনে করে একটা লিপস্টিক এনো তো! আর পিকলুর জন্য একটা বিলিতি ফিডার।

লিপস্টিক, কোন শেড?

রোজি ড্রিম।

রোজি ড্রিম! রোজি ড্রিম... গোলাপি স্বপ্ন... গো লা পি স্বপ্ন... স্ব প্না লি গোলাপ...

কী হচ্ছে আবার!

নামটা একদম খাপ খায় না।

খাপ খায় না কেন?

গোলাপি স্বপ্ন একদম মেলে না আমার সঙ্গে। বাজে নাম।

হোক বাজে। আমার পছন্দ।

আচ্ছা, শ্রীমতী জিদ, ইচ্ছে মতো সাজো। তোমারে সাজাবো যতনে...। তোমারে, না তোমাকে? আজকাল বড় ভুল হয়ে যায়, বুঝেছ! বয়স হয়ে যাচ্ছে।

বুঝেছি, দাদামশাই।

হাসল সঞ্জয়। পিকলুকে আদর করে বলল, বিলিতি ফিডার চাই! ব্যাটা নবাবপুত্তুর।

আজ উড়ে যাব। চমৎকার দিন, সুন্দর দিন আজ। রিণির লিপস্টিকটার কী যেন রং! গোলাপি স্বপ্ন! গোলাপি স্বপ্নের মতো দিন। সাজতে বড় ভালবাসে রিণি, এখনও। সব কিছুই তার বিলিতি হওয়া চাই। বিলেতের ছোট জামা, বিলেতের লিপস্টিক। শোওয়ার আগে রিণি দাঁত মাজে, গায়ে পাউডার দেয়। ভুল হয় না। বিকেল-বিকেল খোঁপা বাঁধে— নতুন নতুন সব খোঁপা— তাতে বিনুনি নেই, ফিতে নেই। চোখের পাতায় ম্যাস্কারা লাগায়, ভ্রূ-তে পেনসিল। কার জন্য এত সাজগোজ, রিণি? কারও প্রেমে পড়োনি তো? দেখো ডুবিয়ো না। রমেনটার তাই হয়েছিল। বেচারা! কোথায় যে চলে গেল তারপর ময়মনসিংহের সেই জমিদারের ছেলেটা! যাকগে। আজ চমৎকার দিন রিণি, সুন্দর দিন। এই বেলা সাজগোজ করে নাও। বয়স হয়ে যাওয়ার আগে, পিকলু বড় হওয়ার আগে, পিকলুর আর সব ভাইবোনেরা এসে পড়ার আগে, তারপর ওদের দিন, পিকলুদের আর তাদের প্রণয়িনী বা স্ত্রীদের, যদি অবশ্য পিকলুরা ততদিন বাঁচে, যদি যুদ্ধটুদ্ধ আর না হয়, যদি দেশটা আরও পচে না যায়। তোমাদের আমি সুখে রেখেছি তো! রাখিনি? আমার তিনটে জিনিস ছিল— সততা,

কর্মক্ষমতা আর নিষ্ঠা। প্রথম আর শেষটা পকেটমার হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, খুঁজে পাচ্ছি না। কর্মক্ষমতাটা আছে এখনও। কিন্তু সে আর ক'দিন? বয়স হচ্ছে, বয়স হলে মানুষের কিছু সদ্‌গুণ ঝরে যায়, বদলে অভিজ্ঞতা বাড়ে। তোমাদের জন্য আমি দুটো জিনিস দিয়ে দিয়েছি।

হ্যাঁ, অনেক দিন পর্যন্ত আমার তিনটি গুণই ছিল। ছেলেবেলা থেকে। যখন আমি চায়ের দোকানের বাচ্চা বয়, কিংবা মোটরসারাইয়ের শরখানার ছোকরা কারিগর, তারপর হন্যে হয়ে ঘোরা। না, তখনও চুরি করিনি, মিথ্যে কথা বলিনি— ভয় করত। ধর্মভয়? হবেও বা। নানু বোস আমাকে তুলে নিল একদিন। নিজে নিজে তখন অর্ডার সাপ্লাইয়ের চেষ্টা করছি, নানু বোস ছিল সরকারি পারচেজ-এ, দু'হাতে পয়সা মারছে। আমাকে দু'-একটা অর্ডার দিত পয়সা না নিয়ে, দয়া করেই। তারপর একদিন আমাকে ডেকে বলল, এভাবে পারবেন না। আপনি সৎ লোক, খাটিয়ে লোক আছেন। আমার সঙ্গে হাত মেলান। কোম্পানি করছি রঙ্গিনী বোসের নামে— আমার বউ। সরকারি চাকরি, বুঝতেই পারছেন। নিজের নামে করতে পারি না। সব আপনি দেখবেন, টাকা আমার। ভাববার কিছু নেই।

ভাববার কিছু ছিল না। নানু বোসের কোম্পানি খুললুম আমি। বোস অ্যান্ড কোম্পানি। প্রথম দেড় মাস একটিও অর্ডার নেই। সারা দিন শুধু ঘোরা আর ঘোরা। নানু বোসের নিজের দেওয়া সরকারি অর্ডারগুলো বাদ দিলে বিজনেস ছিল পুরো ঝুল। মাইনে নিতে আমার লজ্জা করত। মাস ছয়েক পুরোটাই ক্ষয়ক্ষতিতে গেল। চাঁদনিতে অফিসঘর। তার ভাড়া, বেয়ারার মাইনে, ভাগের টেলিফোনের বিল, তা ছাড়া থোক টাকা আটকে ছিল স্টিলের আলমারি, টাইপরাইটার টেবিল চেয়ার ইত্যাদিতে। ভয় করত, যদি না পারি! নানু বোস ভরসা দিল, মাছের চোকলার মতো টাকা আছে আমার। আপনি চিন্তা করবেন না, চালিয়ে যান। আঃ রিণি, কী যেন তোমার লিপস্টিকটার নাম। গোলাপি স্বপ্ন, না স্বপ্নলি গোলাপ! ঠিক আছে, মনে থাকবে। তোমার চেহারাটা ভাল। যদি চেহারাটা ভাল না হত তা হলে লিপস্টিক কতদূর কী করতে পারত। ব্যবসাতেও তাই। ব্যবসা টাকায় দাঁড়ায় না ততটা, যতটা দাঁড়ায় চরিত্রে। নানু বোসের কোম্পানি তাই দাঁড়াল। আমার তিনটে জিনিস ছিল— তিনটে জিনিস— মা লক্ষ্মীর ঝাঁপি উপুড় করে কড়ির ঢল নেমে এল নানু বোসের ঘরে। সম্ভবত তার ইচ্ছে ছিল বউয়ের ব্যবসা দেখিয়ে কিছু কালো টাকা সাদা করবে, কিন্তু লাভ দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। তার মনে কৌতূহল এল, আর সন্দেহ। ইচ্ছে করলে আমি কি নানু বোসের লাল কোম্পানিকে সাদা করে দিতে পারতুম না? আজকের সুন্দর দিনটার নামে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, মাস-মাইনে ছাড়া আমি কিছুই নিইনি। সেই আমার প্রথম যৌবনের সময়টায় আমি বোস অ্যান্ড কোম্পানির জন্য ঊর্ধ্বশ্বাস— মেয়েদের ভাল করে লক্ষ করিনি, আকাশ গাছপালা বা প্রকৃতিজগতের সৌন্দর্য দেখার জন্য দাঁড়াইনি, হাসি ঠাট্টাও কম করেছি। তাতে লাভ হয়নি। কোম্পানি বড় হয়েছে বলে নতুন কিছু লোক নিল নানু বোস, আর নতুন লোকেরা ছিল তারই আত্মীয়— একজন ভাইপো, অন্যজন শালা। তারপর ক্রমে ক্রমে...কিন্তু তাতেও খুব একটা ক্ষতি হয়নি, কী বলো রিন্তি-মিন্তি- সিন্তি-নিন্তি! বোস কোম্পানি থেকে আমাকে ছাড়িয়ে দিলেও আমার কিন্তু তিনটে জিনিস ঠিকই ছিল— তিনটে জিনিস আর হাসি-ঠাট্টা করার মতো মনের জোর। অফিস আর কোম্পানিগুলো চিনত আমাকে— এই সঞ্জয় সেন, সৎ নিষ্ঠাবান পরিশ্রমী। না, এ আমাদের কখনও ফাঁকি দেয়নি।... একটু কষ্ট হল কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে গেলুম। এবার চাকরিতে, ম্যাকগুইয়ের অ্যান্ড কোং। এক বছর পর পঞ্চাশ টাকা বেশি মাইনেয় জোহানসন অ্যান্ড দালাল— আমার এখনকার কোম্পানিতে। দু' বছর সততা নিষ্ঠা আর উদ্যমে

চাকরি করার পর আমাকে দেওয়া হল পারচেজ-এ, জুনিয়ার অফিসার। কোম্পানির জন্য মালপত্র কিনবার আংশিক ভার। অর্ডারে আমার সই থাকে। মাইনে বেশি না। কিন্তু পাকা কাঁঠালের মতো অবস্থা আমার, চারদিকে মাছি ভন ভন করে। কোম্পানি জানত পয়সা খেয়ে পারচেজের লোকেরা কোম্পানিকে বেচে দিচ্ছে। তাই আমার মতো একজন লোককে তাদের দরকার ছিল এখানে। তখনও আমার তিনটে জিনিস ঠিক ঠিক ছিল, আমি দু' হাতে লোভ ঠেকাতে লাগলুম। আমার রিনরিন, রিন্তি-নিন্তি, এটা দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ জেতার চেয়ে কিছু কম শক্ত ছিল না। ভয় পেয়ে আমি ওপরওয়ালার কাছে দরবার করলুম— আমাকে আমার পুরনো সেকশন এস্টিমেশনে ফিরিয়ে নাও। ওপরওয়ালা প্রথমে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, তারপর হাসল, তোমার অসুবিধেটা আমরা জানি। তবু কাজ করে যাও। আর দেখো, কোম্পানির ক্ষতি না করে তুমি যদি পয়সাওয়ালা হতে চাও হও। তাতে ক্ষতি নেই, আমরা তবু তোমাকে সৎ, নিষ্ঠাবান আর কাজের লোক বলেই জানব। আমরা জানি যে আমরা তোমাকে মাত্র চার শ', টাকা মাইনে দিই, যা এই বাজারে একেবারেই যথেষ্ট নয়। আমরা ইনকনসিডারেট নই। ভাগ্য ফেরাবার এটাই তো বয়স, ঠিক বয়স, তোমার।

আমার সেই দার্শনিক ওপরওয়ালা আসলে আমার ওপর ডাকাতি করতে চেয়েছিল। মূল্যবান তিনটে জিনিস ছিল আমার। আঁকড়ে ধরার মতে, জীবন দেওয়ার মতো। আসলে আমার সেই ওপরওয়ালা জ্ঞানী লোকটি জানত, পারচেজে সৎ লোকের থাকাটা সেই লোকের পক্ষে বিপজ্জনক। অন্যেরা তার সম্বন্ধে অস্বস্তি আর সন্দেহ পোষণ করতে থাকবে ক্রমান্বয়ে। সেটা অনেক দূর গড়াতে পারে।

আমি টিকে গেলুম পারচেজে। দু' বছর আগে তুমি এলে। বড় মজার ব্যাপার হয়েছিল। তোমার বাবা অর্ডার নিতে এলেন— ফরসা রোগা মানুষ, চোখা নাক আর কৌতুকে মিটমিট করছে চোখ। দূরদর্শী লোক, তিনি কোম্পানিকে জানেন, আর আমার চাকরি আর পজিশনের গুরুত্ব বুঝলেন। হয়তো ভাবলেন, ছোকরার এক-আধটা গুণ কেড়ে নিলে ধাঁ করে উন্নতি করে ফেলবে। কিন্তু সেজন্য তিনি উপদেশ দিলেন না, ভিড়িয়ে দিলেন তাঁর সুন্দর মেয়েটিকে, বিয়েরও দেরি করলেন না। এবং সম্ভবত তারপর মনে মনে হাসলেন।

আমার রিণি, এ-কথা ঠিক যে আমার টাকার দরকার ছিল। বিয়ের জন্য, বাসার জন্য, নতুন ঘরকন্নার জন্য। আমার যে অপদার্থ দাদাটা ব্যাঙ্কে পিয়নের কাজ করত তার কাছে আশ্রিত ছিল আমার বিধবা মা আর অন্ধ একটা বোন। মাস-মাইনের অনেকটাই তাদের দিতে হত। 'আমি থাকতুম মেসে। টাকা জমাইনি বলে হঠাৎ টাকার দরকারে একটু ঘাবড়ে গেলুম। ধার করা যেত। করেওছিলুম। ধার দিল মহাজনেরা, যারা কোম্পানিকে মাল বিক্রি করত। সেই ধার আর শোধ দেওয়া হল না।...রিণি, আমার রিন্তি, আমি কাকে দায়ী করব? যদি বলি তুমি দায়ী তা হলে দায় এড়ানো হল, যুদ্ধ জেতা হল না। আমি দায় এড়াতে চাই না। আসলে বয়স। বয়স হলে মানুষের দু'-একটা সদ্‌গুণ ঝরে যায়, বদলে অভিজ্ঞতা বাড়ে। ভেবো না যে ব্যাপারটা হঠাৎ হয়ে গেল। হঠাৎ হয় না এ-সব, হলে মানুষ সামলেও যায়। আমার মন তৈরি হয়েই ছিল, কেবল একটা অভ্যাসজনিত লজ্জা বাধা হচ্ছিল এত দিন। যখন আমি ভাবছিলুম যে আমার তিনটে জিনিসই ঠিকঠাক রয়ে গেছে, তখন বস্তুত আমার ছিল মাত্র দু'টি জিনিস, আমি তা ভাবতেও ভয় পেতুম বলে ভাবতুম না। হারাধনের তিনটি ছেলে... আঃ হা, রইল বাকি দুই! না? কী যেন তোমার লিপস্টিকের নামটা! গোলাপি স্বপ্ন, না? দেখো, ঠিক মনে রেখেছি। আনব, ঠিক আনব। ভুল হবে না। আর পিকলুর জন্য বিলিতি ফিডার। আমি সব আনব একে একে— যা যা চাই। যেমন এনেছি রেফ্রিজারেটার, রেডিয়োগ্রাম, স্টিলের আলমারি। কে

বলবে যে এ-সব আমার দরকার নেই? কে বলবে যে ভালভাবে থাকা উচিত নয়? কে বলবে তোমার ছেলেকে দিশি ফিডার এনে দাও, বউকে বলো যেন লিপস্টিকের বদলে পান খায়?... যতদিন আমার অটুট তিনটে জিনিস ছিল ততদিন আমি কি খুব ভাল ছিলুম? আর এখন নেই বলে খারাপ? মনের ঐশ্বর্য একে একে ত্যাগ করছি বলে আমাকে যদি সন্ন্যাসী বলা যায় তা হলে কি তুমি হাসবে? অত বড় তিন-তিনটে গুণ ঐশ্বর্যের মতো ছিল আমার, সেগুলি ছেড়ে দেওয়া কি কিছু কম ত্যাগের ব্যাপার? চমৎকার দিন আজ, সুন্দর দিন, পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে আমার ট্যাক্সি... উড়ে যাই। এখন চাকরি ছাড়াও আমার নিজের কোম্পানি আছে, আমার সেই অপদার্থ দাদা সেখানে আমার পার্টনার, সেই কোম্পানি থেকে অফিসার হয়ে আমি মাল কিনি...রিণি, মাঝে মাঝে বড় অবাক হতে হয় যে আমার বেচা জিনিস আমিই কিনছি। বোধ হয় জীবনের সর্বত্রই এ-রকম, না? কে জানে! সুন্দর একটি উজ্জ্বল দিনের মধ্য দিয়ে আমি উড়ে যাচ্ছি... উড়ে যাই...

অফিসে দুপুরের দিকে একটা টেলিফোন পেল সঞ্জয়। ফোন তুলে 'হ্যালো' বলে শুনল ও-পাশে মৃদু ভিতু ধরনের একটা গলা, বলছে, সঞ্জয়, তুই কি সঞ্জয়? আমি সঞ্জয় সেনকে চাইছি।

সঞ্জয় বলছি।

আমি ললিত।

ললিত! বলে স্তব্ধ হয়ে রইল সঞ্জয়।

হ্যাঁ। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছি।

সঞ্জয় সামান্য চমকে-ওঠার ভাবটা সামলে নিয়ে হাসল, উঁচু গলায় বলল, ললিত, ভাই, কেমন আছিস এখন? দ্যাখ, হাসপাতালে সেই যে একদিন তোকে দেখতে গিয়েছিলুম, তারপর আর যাওয়াই হয়নি, এমন বিশ্রী চাকরি। ইস ললিত, কবে বেরোলি জানতেই পারলুম না, একটা খবর দিলি না কেন?

এই তো দিচ্ছি। আসল খবর হচ্ছে এখন গোনাগুনতি দিন হাতে আছে। সময় বেশি নেই। তোদার সঙ্গে একটু দেখা হওয়া ভাল।

ফালতু কথা ছাড়। কোথা থেকে ফোন করছিস?

স্কুল থেকে।

শোন, তুই স্কুলে থাক একটু, আমি অফিস থেকে কাট মারছি, ট্যাক্সি করে গিয়ে তোকে তুলে নেব।

তারপর?

তারপর হবে একটা কিছু। সেলিব্রেশন।

ললিত হাসল, তার দরকার নেই। তুই বরং বিকেলে আয়। তুলসীও আসবে। আমি বাসায় থাকব। শরীরটা খুব ভাল নেই রে।

আচ্ছা।

ফোন রেখে দিল সঞ্জয়। একটু বসে রইল চুপচাপ। হঠাৎ লক্ষ করল টেবিলের কাচের ওপর রাখা তার হাতের আঙুলগুলো সামান্য কাঁপছে।

পাঁচ

ললিত প্রথম ফোন করল মানস নামে একটি ছেলেকে তার অফিসে। বড়পিসির পাশের বাসায় থাকে ছেলেটি। ললিত যে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছে সে-খবরটা পিসিকে দিয়ে দেবে।

দ্বিতীয় ফোন করল আদিত্যকে। তাকে পাওয়া গেল না। কোনও দিন পাওয়া যায়ও না। বরাবর তার পাশের টেবিলের কালীনাথ উঠে এসে ফোন ধরে, আর সেই একই কথা বলে, না, উনি তো টেবিলে নেই, সকাল থেকেই দেখছি না।...না, না, এসেছেন দেখছি, এসেই তারপর... আপনার নামটা বলুন, বলে দেব।

আজও নাম বলল ললিত।

কালীনাথ পরিচয়ের হাসি হাসল, ওঃ হোঃ, আপনি! অনেক দিন আর ফোন করেননি তো আদিত্যবাবুকে। কেমন আছেন?

ইতস্তত না করেই ললিত বলল, ভাল। আপনি?

এই চলছে।

ওকে বলবেন যেন বিকেলে আমার বাসায় আসে।

বিকেলে! একটু চিন্তিত শোনাল কালীনাথের গলা, আমাদের একটা মিটিং আছে আজ, ময়দানে। আচ্ছা, ঠিক আছে, বলে দেব।

আদিত্য কি মিটিংয়ে যাচ্ছে?

কালীনাথ হাসে, যেতে চায় না তো কখনও। আজ জোর করে নিয়ে যেতুম। আপনাদের কি জরুরি দরকার?

ললিত একটু ভেবে বলল, খুব জরুরি নয়। আমার একটা অসুখ হয়েছিল, আদিত্য জানে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছি, একটু খবরটা দেবেন। দেখা হলে ভাল হত, কিন্তু সে কাল হলেও হবে।

আপনার কী অসুখ হয়েছিল?

ও পেটের একটা ব্যাপার।

পেট! পেট নিয়ে আমিও ভুগছি। আমারটা ক্রনিক। আপনার কী হয়েছিল?

আমারটাও ক্রনিক। সারবে না মনে হচ্ছে।

আলসার?

ও-রকমই। আচ্ছা, আদিত্যকে বলবেন।

আচ্ছা। বাংলাদেশটা মশাই পেটের জন্য গেল। আপনি একটা কাজ করবেন, বুঝবেন। কাঁচা পেঁপে আর থানকুনির ঝোল খাবেন রোজ, আর সকালে উঠে এক গ্লাস জলে আস্ত একটা কাগজি লেবুর রস, জলটা খুব খাবেন। কলের জল নয় কিন্তু, কলকাতার কলের জল পয়জন, টিউবওয়েলের জল খাবেন, বুঝলেন!

আচ্ছা। বলে ফোন রাখল ললিত। কালীনাথের ছোটখাটো রোগা ক্ষয়া কালো চেহারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল সে। তার ওপর কালীনাথ একটা ঝকঝকে রোল্ডগোল্ডের ফ্রেমের চশমা পরে, আর বারো মাস

ধুতি আর সাদা শার্ট। রোল্ডগোল্ডের ফ্রেমের চশমা পরলে যে-কোনও লোকেরই দু'-দশ বছর বয়স বেড়ে যায়। আর ওই সাদা পোশাক বারো মাস! ভয়ংকর একঘেয়ে। কালীনাথের সঙ্গে রোজ অনেকক্ষণ কাটাতে হলে যে-কোনও লোকেরই মানসিক ক্লান্তি আসতে পারে। কে জানে আদিত্য কালীনাথের পাশের টেবিলে বসতে হয় বলেই টেবিল-ছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়ায় কিনা! তা ছাড়া তার পেটের অসুখের গল্পগুলোও আদিত্যর সহ্য না হওয়ারই কথা।

তৃতীয় কোনটা ললিত করল সঞ্জয়কে।

ফোন রেখে আপনমনে একটু হাসল ললিত। সঞ্জয়! তার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী আর সচ্ছল সঞ্জয়। সবচেয়ে কম লেখাপড়া জানা। সেটা অবশ্য বোঝা যায় না, তুখোড় ইংরিজি বলতে পারে সে, হালফিল দুনিয়ার খবর রাখে। আর আছে একরোখা স্বভাব। অনেক দিন আগে একবার তারা পাঁচ-সাতজন বন্ধু ফুটবলের একটা চ্যারিটি খেলা দেখতে গিয়েছিল। পরের দিন খেলা, তারা আগের দিন রাতে খাওয়ার পর গিয়ে লাইন দিয়েছিল। রাতে বৃষ্টিতে ভিজেছিল তারা, দুটো ছাতা আর দুটো গাছের ডাল মাটিতে পুঁতে ওপরে চাদর টাঙিয়ে তার তলায় বসে টর্চ জ্বেলে তাস খেলেছিল, অশ্লীল গল্প করেছিল, গান গেয়েছিল। তখনও তাদের আগে মাত্র কুড়িজনের মতো লোক ছিল লাইনে, সারা রাতে তাদের সঙ্গেও হয়েছিল বন্ধুত্ব আর পরস্পরের সিগারেট কিংবা জলের বোতলের জল খাওয়া-খাওয়ি। পরদিন বেলা বাড়ছিল আর সামনের লাইনের লোকসংখ্যাও ক্রমে ক্রমে কীভাবে যে বেড়ে যাচ্ছিল! কুড়ির জায়গায় যখন প্রায় তিনশো লোকের পিছনে পড়ে গেল তারা তখন বুঝতে পারল সামনের লোকেরা জায়গা বিক্রি করছে। আট আনায় এক টাকায়। ক্রমে সে রেটও বাড়ছিল। যারা জায়গা বিক্রি করছে তাদের ফোটো আগের দিন তুলে নিয়ে গেছে খবরের কাগজের লোকেরা, নাম পরিচয় লিখে নিয়ে গেছে। কাগজে ছাপবে, এঁরা কত বড় ধৈর্যশীল। বস্তুত ধৈর্যটা যে কেন তা কেউ জানে না। ধৈর্য টাকা এনে দেয়। সঞ্জয়কেও দিয়েছে। ঘোড়সওয়ার পুলিশ যখন এল তখন তাদের একটা লাইনের জায়গায় চার-পাঁচটা লাইন তৈরি হয়ে গেছে, কোনটা আসল কে বলবে। সেই সব লাইন ভেঙে একটা লাইন করার জন্য পুলিশ ঘোড়া চালাল, আর তখন কোথা থেকে যে কোথায় চলে গেল তারা! ধূ ধূ দূরে সরে গেল মাঠে ঢোকার গেট, হাজার লোক এসে গেল তাদের সামনে। ফিরে আসা ছাড়া উপায় ছিল না, লাভও নয়। কিন্তু সঞ্জয় কেবল তার না-খাওয়া না-ঘুমোনো চোয়াড়ে মুখ শক্ত রেখে বলল, তোরা যা, আমি খেলার শেষে ফিরব। তাই ফিরেছিল সঞ্জয়, খেলা দেখেই। কী করে যে কে জানে। জিজ্ঞেস করলে সে শুধু বলেছিল, কেউ কখনও দয়া করে আমাকে কিছু দেয়নি। তা ঠিক! ললিত জানে। ধৈর্য, সম্ভবত ধৈর্যই সঞ্জয়কে সবই দিয়েছে, আর ওই লেগে থাকার ক্ষমতা। একটা সময় ছিল, বা এক-একটা সময় আসে যখন সঞ্জয়কে নিজের থেকে নিচু মনে হয় ললিতের, সেটা ওর লেখাপড়ার অভাবের জন্যই। মনে হয় চেষ্টা করলে, সামান্য একটু উদ্যোগী হলেই ও-রকম বা ওর চেয়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছে যাওয়া যেত।

কিন্তু যাওয়া যায়নি। এম এ পাশ করার পর সহজেই স্কুলের চাকরিটা পাওয়া গেল। আপাতত এটাই করা যাক, যতদিন বড় সুযোগ না আসছে, এ-কথা ভেবে চাকরি নিল ললিত। তারপর সাত বছর রয়ে গেল স্কুলে, বড় সুযোগ আর এল না। না, ভেবে দেখলে কোনও দিনই খুব একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না ললিতের, সেই ছেলেবেলা থেকেই নয়। পরীক্ষার খাতায় পাশ নম্বর ওঠার মতো লেখা হয়ে গেলে তার আর লিখতে ইচ্ছে করেনি কোনও দিন। অনর্থক মনে হত। তাই এই স্কুল ছেড়ে পড়াটাও তার বরাবর পণ্ডশ্রম মনে হয়েছে।

অনেক ছুটি, স্ট্রাইক, ফাঁকি এবং কামাইয়ের স্বাদ পেয়ে ক্রমে আরও অলস, উদ্যমহীন এবং আড্ডাবাজ হয়ে গেছে সে, দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কী করে লোকে চাকরি করে তা ভাবতেও সে শিউরে ওঠে। তাই মাঝে মাঝে সঞ্চয়ের শ্রমটাকেও পণ্ডশ্রম মনে হয় ললিতের। কিন্তু কখনও রাস্তার শো-কেসে দামি জিনিস দেখলে, কিংবা বন্ধুরা খুব দূরে বেড়াতে যাচ্ছে শুনলে, বা মা মাঝে মাঝে তাকে বাড়ি তৈরি করার কথা বললে তার মনে হয়, টাকা থাকলে মন্দ হত না। অনেক অপব্যয় অন্তত করা যেত। কিংবা সমাজের খুব উঁচু একটা জায়গায় পৌঁছুলে ক্ষতি কী ছিল। সে মাঝে মাঝে ভেবে দেখে, কখনও কিছু হওয়ার জন্য সে চেষ্টা করেনি, কিন্তু চেষ্টা করলে সে কি পারত?

আপনমনে মাথা নাড়ল ললিত। না, পারত না। বড় হওয়ার অনেক ঝামেলা। নির্ঝঞ্ঝাটে সে বেশ আছে। তা ছাড়া ভেবে দেখলে এ-রকমই সবচেয়ে ভাল হয়েছে। সে আর-একটু পয়সাওলা হলে, এমনকী অধ্যাপক হলেও সম্ভবত এতদিনে সে বিয়েটিয়ে করে ফেলত। কে জানে, বাচ্চাও হত হয়তো। তখন?

স্কুল থেকে বেরিয়ে আসার মুখে অঙ্কের সতীশ হালদার ধরল তাকে। একটা ফর্ম বাড়িয়ে দিয়ে বলল, একটা লটারির টিকিট কিনুন।

ললিত হাসল, কত প্রাইজ?

এক লাখ দশ হাজার।

দ্যুৎ ওটুকুতে আমার কী হবে?

অন্তত সিগারেটের খরচটা চলে যাবে তো? মাত্র তো একটা টাকার টিকিট। লিখুন।

এটা সতীশ হালদারের সাইড বিজনেস, বোধহয় কুড়ি টিকিটে টাকা ছয়েক লাভ থাকে তার। ললিত অবহেলায় তার নাম লিখল।

সতীশ হালদার ফর্মটা নিয়ে নম্-ডিপ্লুমটা দেখে হাসল, কোনও মেয়ের নাম?

হ্যাঁ

বেশ ঘরোয়া নাম। মিনু।

টাকাটা পেলে মিনুকেই দিয়ে দেওয়া যাবে। না, পুরোটা মিনুকে নয়। অর্ধেকটা মা'র। তারপর ভেবে দেখল ললিত, দূর! অর্ধেক দিয়েই বা মিনু কী করবে; তার অনেক আছে, হয়তো নেবেই না তার লটারির টাকা। সে সতীশ হালদারকে ডেকে বলল, নামটা পালটাব।

কী লিখবেন?

একটু ভেবে ললিত বলল, ধৈর্য। পেশেন্স।

সতীশ হালদার লিখে নিল। তারপর হেসে বলল, লোকে নাম নিয়ে ভাবে। আসলে নামে কিছু যায় আসে না। যে-কোনও নামেই পাওয়া যায়, ভাগ্যে থাকলে।

চলে আসতে আসতে হঠাৎ ললিতের মনে হল সতীশ হালদার তার অসুখের খবর জানে তো! জানলে ললিতকে এ-রকম টিকিট বিক্রি করাটা কি ঠিক হয়েছে তার?

দুপুরে খাওয়ার পর মাকে ডেকে ললিত বলল, আমি যখন থাকি না তখন তুমি সারা দুপুর কী করো মা?

কী আর! এই এ-বাড়ি ও-বাড়ি সে-বাড়ি একটু যাই, কি ওরাই আসে আমার বাড়ি, লুডো কি তাস টাস একটু খেলা হয়, পাঁচটা কথা এসে পড়ে। কোনও দিন হয়তো বা একটু ঘুমোই।

তুমি খুব আড্ডাবাজ, না?

কেমন ছেলের মা, একটু হব না?

ও! তা হলে তোমার কাছ থেকেই আড্ডার স্বভাবটা পেয়েছি আমি! বাবার কাছ থেকে নয়।

মা হাসে, তোদের বংশই আড্ডাবাজদের বংশ। বসে খেতে পারলে আর কিছু করতে চাইবে না। ভাশুরঠাকুরকেও দেখতুম...

পুরনো কথা এসে পড়ার আগেই ললিত বলল, তোমার লুডোটা বের করো তো! পর পর কয়েক গেম হারিয়ে দিই তোমাকে!

খেলবি! একটু অবাক হয় মা।

হুঁ। মা, তুমি কি এ-পাড়ার লুডো-চ্যাম্পিয়ন?

শিশুর মতো হাসে মা, আমার হাতে খুব দান পড়ে, জানিস!

সত্যি! তবে আজ তোমার চ্যাম্পিয়নি কেড়ে নিই, এসো।

সে তোকে আমি এমনি দিলুম।

সে হবে না। খেলে দাও, দয়া করে না।

পাগলা। বলে মা মেঝেতে শতরঞ্জি বিছায়, লুডোর ছক পাতে। আঁচলে ভারী চশমাটা মুছে নেয়। বলে, তুই একটু শুয়ে থাকলে পারতিস, রোদ্দুরে অত ঘোরাঘুরি করে এলি!

সে-কথায় কান না দিয়ে ললিত কাঠের ছোট্ট চালুনিটার মধ্যে খটাখট শব্দে ছক্কাটাকে নাড়ে। দান ফেলে বলে, দেখো মা, ছক্কা!

ইস! চোখে দেখি না ভেবেছিস। পাঞ্জা!

তবে আর একবার কাল দাও, এটা ট্রায়াল।

নে।

চালতে গিয়ে হাসে ললিত, নেব কেন! আমি কি উইক খেলোয়াড় নাকি!

মার একটা পোয়া পড়ল। হেসে গড়াল ললিত, এই তোমার ভাল দানের হাত!

ললিতের অবশেষে ছয় পড়ল। পর পর দু'বার। দেখে মা'র মুখ শুকিয়ে গেল, দেখিস, সাবধানে চালিস, তিন ছক্কা না হয়। হলে পচা।

আবার ছয় পড়ল। তিন ছক্কা। মা একটু ঝুঁকে বলল, পাঞ্জা, না? দুই ছয় পাঁচ তা হলে।

ললিত মাথা নাড়ে, না। তিন ছক্কা। পচা। তুমি দেখেও দেখছ না।

মা রাগ করে, ভাল করে চাল। চালুনিটা অত জোরে নাড়িস কেন? অলক্ষুণে অভ্যাস!

ললিতের এবার পোয়া পড়ল। মা একটুও খুশি হল না।

তুমি চালো এবার। বলে চালুনি এগিয়ে দিল ললিত।

মা'র পড়ল ছয়। দুই ছয়। দম বন্ধ করে দেখছিল ললিত। তিন ছয় না হয়। না, দুই ছয় তিন। মা'র দুটো গুটি বেরিয়ে গেল। 'বাক আপ' বলে চেঁচাল ললিত, এগিয়ে যাও মা, এগিয়ে যাও।

মা হাসে, তুই ভাল করে চাল। আমি ফাঁকা মাঠে এগিয়ে কী করব তুই সামনে না থাকলে!

আহা, সারা খেলায় আমার যদি ছয় না পড়ে আর!

দূর, তাই হয় নাকি!

হবে না কেন! এটা তো চান্সের ব্যাপার, না-ও পড়তে পারে।

তা হয় না। ছয় পড়বেই। ঠিক করে চাল।

পড়বেই! ছয় পড়বেই! গুনগুন করল ললিত। দেখল তার দানে পড়েছে দুই।

মা'র দানের হাত সত্যিই ভাল। অনিচ্ছায় চালছিল মা তবু ছক্কা-পাঞ্জার ছড়াছড়ি হতে লাগল। ললিত বলল, তোমার কপট পাশা— না কপট লুডো মা! তুমি মন্ত্র করে রেখেছ।

মা হাসে। খেলা এগোয়। পাঁচ-ছয়-তিন-দুই-চার-পোয়া।

মা'র একটা চাল দেখে ললিত চেঁচাল, তিনের মুখে আমার গুটিটা খাও মা।

ইস! মা মৃদু হাসে, ললিতের গুটি না খেয়ে অন্য গুটি চালে মা, বলে, গুটি খাব কেন! আমি আমার পাকা গুটি ঘরে তুলব।

হতাশায় ললিত দু' হাত ওপরে তুলে বলে, এই তুমি পাকা খেলুড়ি? খাওয়ার গুটি খাচ্ছ না!

নিজের গুটি পাকাতে পারলে অন্যের গুটি কে খায়!

আমি কিন্তু খাব। ছাড়ব না।

খা না! খেতেই তো দিচ্ছি। তুই এগিয়ে যা তোর তো দানই পড়ছে না। ভাল করে চাল দেখি!

ললিতের গুটি খাওয়ার ঘরে পেয়েও এড়িয়ে যাচ্ছে মা, অন্য গুটি চালছে। নিজের গুটি এগিয়ে দিচ্ছে ললিতের গুটির মুখে মুখে। আমার গুটি খা ললিত, তুই এগিয়ে যা। তুই সামনে না থাকলে ফাঁকা মাঠ। ধু-ধু মাঠ। আমি কার দিকে এগোব, কোন ঘরের দিকে!

খেলা তাই জমে না। হেলা-ফেলা করেও মা-ই এগিয়ে যায়। ললিত পিছনে পড়ে। হাসে। বলে, খেলা জমছে না, মা।

তোর দান আমি চেলে দিই ললিত? আমার দানের হাত ভাল।

দূর। তাই হয় নাকি! খেলা খেলাই, যার দান তার দান। তুমি ফেললে দান তোমার হয়ে গেল।

মা লজ্জা পেয়ে হাসে। যখন মা'র বয়স আরও কম ছিল তখন মা মাঝে মাঝে গুনগুন করে গান গাইত। রামপ্রসাদি। সে-সব গানের এক-আধটা ললিতের প্রিয় ছিল। সে তার মা'র মুখে শোনা প্রিয় একটা লাইন গুনগুন করছিল, মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা মা, ডিক্রি হবে এক সওয়ালে...

একটি-দু'টি করে পাড়ার বুড়িরা দরজায় দেখা দিতে লাগল, কী হচ্ছে গো, ললিতের মা!...ওমা, তুই যে আজকাল বড় লক্ষ্মী হয়েছিস ললিত!...মায়ে পুতে খেলা, জবর খেলা গো, হারজিত আছে, না নেই?

ললিত ঝুঁকে মা'র কানে কানে বলে, মা, তুমি হচ্ছ এ-পাড়ার সব বুড়িদের মধ্যে হিরো। হিরো-বুড়ি। তোমাকে না দেখে দেখো সব দলে দলে আসছে।

ঘরে বুড়িদের জটলা হয়ে গেল। মাঝপথে খেলা ভেঙে উঠে পড়ল ললিত, বলল, এবার তোমরা খেলো, মা।

তুইও বোস না।

আমি একটু খোলা হাওয়ায় যাই।

কোথায় যাবি আবার! দুপুর রোদ এখন।

গলির মধ্যেই। একটু পায়চারি করি।

অন্য বুড়িরা কাছে থাকলে মা'র সামনে সিগারেট খায় না ললিত। তার ধারণা তাতে মাকে অপমান করা হয়। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বালিশের খাঁজ থেকে তুলে নিয়ে সে গলিতে বেরিয়ে আসে। দরজা থেকে মুখ ফিরিয়ে দেখে ছয়-সাতজনের ভিড়ের মধ্যে মা বসে আছে। হিরো-বুড়ি। তোমার দলে তুমি হিরো মা, আমার দলে আমি কিন্তু হিরো নই। বাক আপ মা, আপনমনে হাসল ললিত। তুমি এগিয়ে যাও তো! দেখি কেমন আমাকে ছাড়া পারো।

ঘন ছায়ায় ঠান্ডা হয়ে আছে গলিটা। গলির মুখেই তেজি রোদ। ছুরির মতো ধারালো হয়ে আছে রোদ ও ছায়ার সীমারেখাটুকু। সেই রেখাটার ধারে দাঁড়াল ললিত। চোখ বুজে ভাবল সে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রহ্মপুত্র নদী— তাদের গাঁয়ের পাশ দিয়ে যা বয়ে যেত। না, দেশের কথা তেমন মনে নেই ললিতের। সে তখন ছোট, মা তখন এত বুড়ি নয়, আর বাবা বেঁচে আছে তখনও। মনে পড়ে সে তখন সাঁতরে গাঙ পার হত, গাছে উঠত। আশ্চর্যের বিষয়, কলকাতায় এসে তার কোনও দিন গঙ্গায় নামতে তেমন তীব্র ইচ্ছে হয়নি। দেশগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই যে যেন তার সাঁতার আর গাছে-ওঠাও ফেলে এসেছে অনেক দূরে, ভিন দেশে। সেইখানে ফিরে গেলে আবার এক বার ফিরে পাওয়া যেতে পারে সেই সাঁতার কিংবা সেই কাঠবেড়ালির মতো গাছ-বাওয়া! দেশ ভাগের পর একদিন দূরের স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য শেষ রাতে তারা গ্রাম ছেড়ে এল। খুব বেশি কিছু মনে নেই ললিতের, শুধু মনে আছে ঘুমচোখে শেষরাতের অন্ধকারে পা ফেলতে গিয়ে সে তাদের উঠোনে বিষ-পিঁপড়ের ঘর ভেঙেছিল। বিদ্যুৎ চমকের মতো তার পায়ের পাতা থেকে ঊরু পর্যন্ত উঠে এসেছিল পিঁপড়ের কামড়। বিষ-যন্ত্রণা। চিৎকার করে কেঁদেছিল সে, আর বাবা চাপা গলায় কাকুতি মিনতি করে বলছিল 'চুপ কর ললিত, চুপ কর।' আর হাত ধরে জোরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে। তখনও ঘুমচোখ, মাথায় স্বপ্নের বাসা, দিকহীন শেষরাতের আবছা অন্ধকারে বাবার হাত ধরে কোন পথে কোথায় যে যাচ্ছিল ললিত!

ক্রমে ক্রমে আর সবকিছুই আবছা হয়ে গেছে। এখন আর ঠিকঠাক সব মনে পড়ে না। কেবল মনে আছে পায়ের পাতা থেকে ঊরু পর্যন্ত সেই বিষ-পিঁপড়ের কামড়। সেই বিষ-যন্ত্রণা। এত স্পষ্ট যে আজও হঠাৎ মনে পড়লে তার ভিতরকার এক ছোট্ট ললিত যন্ত্রণায় মোচড় খেয়ে ওঠে। ওই উঠোনে কত দাপিয়ে বেড়িয়েছে ললিত। কোনও দিন পিঁপড়ের ঘর নজরে পড়েনি। সেদিন তবে তাদের চেনা উঠোনে কোথা থেকে এসেছিল সেই পিঁপড়ের বাসা? কোথা থেকে?

কে জানে?

মা কেবল গল্প করে। নদী, নৌকো আর গাছগাছালির গল্প। মাছ, ধান আর পিঠে-পায়েসের গল্প। একঘেয়ে, তবু মাঝে মাঝে কান পেতে শোনে ললিত। মায়ের গলায় জল-মাটির নোনা আর সোঁদা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। তবু সবকিছু ছাপিয়ে ওঠে সেই পিঁপড়ের কামড়, শেষরাত্রির আবছায়া ঘুম ও স্বপ্নের মধ্যে এক অলৌকিক নিরুদ্দেশ যাত্রা।

ছয়

সিগারেটটা তখনও শেষ হয়নি, মোড় পেরিয়ে আদিত্যকে আসতে দেখল ললিত। ব্যাটা অফিস কেটে এসেছে। ওর পিছনে কালো মতো একটা মেয়ে আসছিল। প্রথমে ললিত ভেবেছিল যে পথ-চলতি মেয়ে। কিন্তু কাছে আসতে বোঝা গেল সে আদিত্যর সঙ্গে আসছে।

এই যে লোলিটা। বলে হাসল আদিত্য। রোগা-ফরসা আদিত্য, ঝাঁকড়া চুল— মোটা ঠোঁটের আদিত্য, বেঠিক পোশাকের আদিত্য। কলকাতার বনেদি ঘুঘু ওদের বরিবার, বাগবাজারে ওদের প্রকাণ্ড একটা বাড়ি আছে যার ভিতর-মহলে যাওয়া এখনও বারণ, আর ওর বাবার এখনও একজন রক্ষিতা আছে শোভাবাজারে, যাকে আদিত্য এবং তার ভাইরা রাঙা-মা না কী-যেন-মা বলে ডাকে। বাইরের চাকরি-বাকরি, আড্ডা সেরে বাড়িতে ঢুকলেই ওরা দেড়শো বছরের পুরনো একটা জগতের মধ্যে চলে যায়, যেখানে এখনও রয়েছে দেড়শো বছরের পুরনো বাসন-কোসন, বিছানা, সেজবাতি, আলমারি, পুতুল এবং আচরণ।

আয়। বলে একটু বিব্রত মুখে হাসল ললিত, বলল, ঘরে এক দঙ্গল বুড়ির ভিড়। কোথায় যে তাদের বসাব!

আদিত্য মেয়েটার দিকে ফিরে বলল, এই হচ্ছে ললিত। কাঠ বাঙাল। তারপর ললিতের দিকে ফিরে বলল, বুঝলি লোলিটা, সতীর এক মেসোমশাইয়ের ক্যান্সার হয়েছিল। অপারেশনের পর বেঁচে গেছে!

ললিত হাসল, তাই নাকি!

মেয়েটিকে এক পলকেই দেখে নিল ললিত। সম্ভবত আদিত্যর প্রেমিকা। কালোর মধ্যে মিষ্টি মুখখানা, সুন্দর বড় একজোড়া চোখ। দেখে মনে হয় প্রাণে দয়ামায়া আছে, হৃদয় আছে। চালু নয় খুব। কিন্তু রোগা নরম ধরনের শরীরটিতে মা-মা ভাব। একনজরেই ভাল লাগে। আদিত্যর কপাল ভালই। কিন্তু মেয়েটার?

ললিত মৃদু গলায় বলল, চলুন, আপনাকে আমার মা'র কাছে নিয়ে যাই। আমরা দুই বন্ধু গলিতে দাঁড়িয়ে গল্প করব।

আদিত্য বাধা দিল, তুই ওকে লজ্জা পাস না ললিত। মাইরি, তোর যা লজ্জা! পরিচয় করে নে, এ হচ্ছে শাশ্বতী ব্যানার্জি, আমি সংক্ষেপে সতী বলে ডাকি। আমাদের শিগগিরই বিয়ে হবে। কালীনাথের কাছে তোর ফোনের খবর পেয়েই কলেজে গিয়ে ওকে ধরলুম। তোর কথা ওকে অনেক বলেছি, তাই বললুম, চলো দেখে আসবে, আর তোমার মেসোমশাইয়ের গল্পটাও শুনিয়ে দিয়ে আসবে ওকে। ব্যাটা সাহস পাবে তা হলে।

ললিত আবার মেয়েটিকে বলল, ঘরে চলুন।

মেয়েটি দ্বিধায় পড়ে বলল, থাক না, আমি বরং এইখানেই দাঁড়িয়ে গল্প করি।

আদিত্য বলল, সেই ভাল। মাসিমা একা থাকলে কথা ছিল না। কিন্তু পাড়ার বুড়িদের চোখ কটকট করবে। মাসিমাকে পরে বাঁকা বাঁকা কথা শোনাবে হয়তো। থাকগে। ললিত মাইরি তুই হাসপাতালে থেকে একটু লালটু হয়েছিস।

তুই তো এক দিনও যাসনি দেখতে হাসপাতালে!

মাইরি, তুই রাগ করেছিস? আমার ভাই কোনওকালে হাসপাতাল-টাতাল সহ্য হয় না, ওষুধের গন্ধ, মড়া-ফড়া, রোগের জীবাণু সব মিলিয়ে কেমন গা গুলোয়, বমি পায়, মাথা ধরে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হয় কেমন একটা ভয় ঢুকে যায় মাইরি, মনে হয় আমিও মরে যাব। রাতে ঘুম হয় না। আমাদের সাতপুরুষের কেউ হাসপাতালে যায়নি, বাড়ির বাঁধা ডাক্তারের হাতে মরেছে। তুই তো জানিস।

ললিত হাসল, ঠিক আছে, তোকে ফাঁড়া কাটাতে হবে না। ললিত মেয়েটিকে বলল, আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি গায়ে একটা জামা দিয়ে আসি। পাড়ায় একটা চায়ের দোকান আছে। বাজে দোকান। সেখানে বসেই একটু গল্প করা যাবে। কেমন!

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

ঘরে ঢুকে যখন জামা নিচ্ছিল ললিত তখন মা বলল, বেরোচ্ছিস?

না। চায়ের দোকানে যাচ্ছি।

কেবল চা আর চা।

বেরিয়ে এল ললিত।

গণেশের দোকান। বাইরের দিকে কাচের বাক্সে ছানার মিষ্টি সাজিয়ে রাখে, ভিতরে ঘিঞ্জি জায়গায় একখানা বেঞ্চি আর লম্বা একটা টেবিল, অনেকটা স্কুলের হাইডেস্কের মতো। সকাল বিকেল পাড়ার বখাটে ছেলেরা আড্ডা দেয় এখানে। দুপুর বলে কেউ নেই। গণেশ তার শিয়রে কাঠের ক্যাশ বাক্স তার মুখের ওপর মাছির জন্য আধময়লা গামছা ফেলে রেখে ঘুমোচ্ছিল। ডাকতে যাচ্ছিল ললিত, আদিত্য বাধা দিয়ে বলল, দে না ঘুমোতে বেচারাকে। আমরা নিরিবিলিতে গল্পগাছা করি, ও যখন উঠবে, উঠবে।

শাশ্বতী মৃদু গলায় বলল, সেই ভাল।

তিনজনে পাশাপাশি বসল। মাঝখানে আদিত্য; দু’ পাশে শাশ্বতী আর ললিত।

আদিত্য বলল, দ্যাখ, মাইরি, আমি বড় মুশকিলে পড়ে গেছি। জীবনে একটা মাত্র প্রেম করলুম, তাও বাঙাল মেয়ের সঙ্গে।

বাঙাল! ললিত ঝুঁকে শাশ্বতীর দিকে তাকাল, কোথায় বাড়ি ছিল আপনাদের?

যশোরে, কপোতাক্ষতীরে।

কপোতাক্ষতীরে!

শাশ্বতী হাসল, সাগরদাঁড়ি থেকে আমাদের গ্রাম খুব দূরে ছিল না। আমি অবশ্য দেশ দেখিনি, আমার জন্ম কলকাতায়, দেশ ভাগের পরে। তবু লোককে বলার সময়ে বলি আমরা মাইকেল মধুসূদনের প্রতিবেশী ছিলাম।

আদিত্য করুণ মুখে বলল, হ্যাঁ দ্যাখ, শাশ্বতী পুরোপুরি বাঙালও নয়, কলকাতার লোকেদের চেয়েও ভাল কলকাতার কথা বলে, ওর বাড়ির লোকেরাও তাই, কিন্তু আমার বাড়ির লোকেরা কিছু বুঝবে না। বাঙালের গন্ধ পেলেই কুরুক্ষেত্র লেগে যাবে। মাইরি দ্যাখ, আমার বেশির ভাগ বন্ধু বাঙাল, তুই, তুলসী, সঞ্জয় আরও অনেক, নিজের পাড়ায় আমার বন্ধু নেই, তবু দ্যাখ বিয়ের সময়ে বাড়ি থেকে ঠিক করবে আর-এক ঘুণধরা বনেদি পরিবারের মেয়ে— যার গায়ে রোদ লাগেনি।

কী করবি এখন! হেসে ললিত বলে।

আমি আলাদা হয়ে যাচ্ছি বাড়ি থেকে। বলে আদিত্য শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে হাসল, বুঝলি লোলিটা, সতী বলেছে যে, ও আমাদের পরিবারে ঢুকে একটা বিপ্লব ঘটাবে। মা'কে ট্যাক্সি করে নিয়ে সিনেমায় যাবে। বাবাকে ষোলো ইঞ্চি ঘেরের প্যান্ট আর টি-শার্ট পরিয়ে নিয়ে যাবে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে। মাইরি, সতী, তোমার আয়ুটা গণৎকার দিয়ে দেখানো উচিত। আমি ও-সব রিস্‌ক-এর মধ্যে নেই। আমি আলাদা বাস করছি।

ললিতের ইচ্ছে হল একবার জিজ্ঞেস করে যে, তা হলে কী করে ওদের চলবে! আদিত্য চাকরি করে সরকারের, বড় কেরানি। তবু ললিত জানে চাকরিটা ওর কিছু নয়, ওর আসল অস্তিত্ব ওর বাগবাজারের বাড়ি আর বাবার ব্যবসা। নিজের বাড়িকে যতই গাল দিক আদিত্য, তবু ললিত জানে ওই বাড়ি আছে বলেই আদিত্যকে অনেক কিছুই সইতে হচ্ছে না, ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে বাইরের পৃথিবীর নানা রকমের মার সে সইতে পারবে কি! ভাবল ললিত, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। সুখী ছেলে আদিত্য, খুব পুরু বিছানায় শোয়, কেওড়া দেওয়া জল খায়, শ্বেতপাথরের ওপর হাঁটে।

আদিত্য শাশ্বতীকে বলছিল, আমার বাবা এক্কেবারে খ্যাপা, বুঝলে! বাবা না মাইরি, একটা লোককে কামড়ে দিয়েছিল। বলে ফিরে ললিতের দিকে চেয়ে বলল, তুই তো জানিস! সেই শরিকের ঝগড়া, বাবার জ্যাঠতুতো ভাই আমাদের অস্তুকাকুকে বাবা দিনেদুপুরে কামড়ে দিল...

গল্প বলার এমনই একটা বৈঠকি চাল আছে আদিত্যর যে, যে-কোনও গল্পকেই সে সকলের শোনার মতো করে তোলে। আর-একটা গুণ— ও নিজের কিছুই গোপন রাখে না। সব বলে দেয়, মনে যা আসে সব।

গল্পটা বলতেই যাচ্ছিল আদিত্য, শাশ্বতী নিচু গলায় ওকে কিছু বলল। আদিত্য— ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বলে ললিতের দিকে চেয়ে বলল, দ্যাখ মাইরি নিজের সমস্যা নিয়ে এমন মেতে আছি, তোর খোঁজই নেওয়া হচ্ছে না।

ললিত জিজ্ঞেস করল, তোরা কবে বিয়ে করছিস?

দেখি। শিগগিরই করব। তুই একটা বাসা খোঁজ— বলেই আবার সামলে গেল আদিত্য, তোর তো আবার অসুখ! শালা, এ-বয়সে কোথা থেকে বাগালি রোগটাকে! মাইরি, পারিস তুই মানুষকে চমকে দিতে! তারপর গলা নিচু করে বলল, হ্যাঁরে লোলিটা, মরে-ফরে যাবি না তো! মাইরি, মরিস না, ভীষণ ভেঙে পড়ব রে, শালা আর বাঁচতেই ইচ্ছে করবে না। কথা দে—

কী কথা?

মরবি না।

ললিত হাসল প্রাণ খুলে। তারপর বলল, এখন আর কিছু দিতেই আপত্তি নেই। যা, দিলাম তোকে কথা।

দিলি! তা হলে মরবি না। বরং সতীর কাছে ওর মেসোমশাইয়ের গল্পটা শুনে নে।

শাশ্বতী ঝুঁকে ললিতের দিকে চেয়ে বলল, আমার মেসোমশাইয়ের গল্পটা কিন্তু সত্যি। উনি এখনও বেঁচে আছেন, চাকরি করছেন।

তাই নাকি! ললিত হাসল।

শাশ্বতী গলায় যথেষ্ট দৃঢ়তা আনার চেষ্টা করে বলল, দেখবেন, আপনি সেরে যাবেন।

হঠাৎ ললিত খুব নিষ্ঠুরের মতো শাশ্বতীকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে হেসে বলল, আপনারা তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে ফেলুন। আমি যেন দেখে যেতে পারি।

বলেই দেখল শাশ্বতীর মুখ ম্লান হয়ে গেল। আদিত্য তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল শালা যমের জান লিয়ে লিব, দেখে লিস।

বিকেলের মুখে মুখে ওরা উঠল। তুলসী আর সঞ্জয় আসবে, কিন্তু সে-খবর আদিত্যকে দিল না ললিত। তা হলে আদিত্য থাকতে চাইবে। না, ওরা বরং এখন ময়দান বা গঙ্গার ধারে বা দোকানে গিয়ে বসুক, কিংবা হাঁটুক রাস্তার সুন্দর দোকানের আলোগুলোর ভিতর দিয়ে। কথা বলুক। শাশ্বতীকে তার কাছে এনে ভাল করেনি আদিত্য। সুন্দর মেয়েটা এমন একজনকে দেখে গেল, যে আর কিছুদিন পরে মারা যাবে। হয়তো এখন নানা দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে সে দুঃখিতচিত্তে ললিতের কথা ভাববে। সভয়ে প্রতীক্ষা করবে আদিত্যর কাছে একদিন তার মৃত্যুসংবাদ শোনার। ললিত বোধ হয় আজ মেয়েটার বিকেল মাটি করে দিল, হয়ে রইল রাতে ওর মাথা ধরার বা কম খাওয়ার কারণ।

যশোরে কপোতাক্ষের তীরে ছিল ওর বাড়ি। সাগরদাঁড়ি থেকে খুব দূরে নয়। গলির মুখে দাঁড়িয়ে আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে সে কবিতাখানা মনে আনবার চেষ্টা করছিল— দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে...কবিতাটা কতবার ক্লাসে পড়িয়েছে ললিত। আশ্চর্য, তবু মুখস্থ হয়নি!

সাত

সারা সকাল মৃদুলাকে একা পাওয়া গেল না। বাইরের ঘরে বাচ্চাদের পড়াচ্ছে একটি অল্প বয়সের কলেজের ছাত্রী। মাঝখানের ঘরটাতে বিছানায় খবরের কাগজ বিছিয়ে সারা সকাল দাদা বসে আছে। ভিতরের ছোট্ট বারান্দায় রান্নার জায়গা— সেখানে বউদি। বাসাটা জুড়েই দাদার সংসার। সে আর মৃদুলা দুটো ফালতু লোক বাস করছে এখানে— এ-রকমই মনে হয় তুলসীর।

বারান্দার কোণে বসে চা খাচ্ছিল তুলসী, আর একটা চোর-বেড়ালের মতো আড়চোখে চেয়ে দেখছিল, ধপধপে সাদা পরিষ্কার একটা লালপাড়ের শাড়ি পরে মৃদুলা খুব নরম হয়ে বসে পিতলের গামলা কাত করে চাল-ধোয়া জল হাতের আঁজলায় ছেঁকে নিচ্ছে। সকালে চুল আঁচড়ে সিঁদুর পরেছে সে, নোয়ানো মাথায় লাল ধুলোর পথের মতো অনেক দূর চলে গেছে, রেখাটি, শান্ত শরীর মায়ের মতো নিষ্কাম হয়ে আছে সকালের আলোয়।

সকালের দিকেই সুন্দর সুন্দর কথা মনে আসে তুলসীর। কিন্তু মৃদুলাকে বলা হয় না। সারা দিন পর যখন রাতে মৃদুলাকে একা পায়, তখন তুলসীর মাথার ভিতরটা হিজিবিজি হয়ে যায়, একটাও তেমন সুন্দর কথা মনে পড়ে না। তখন মনে হয় সারা দিন ধরে জরাজীর্ণ এক পৃথিবীর ধুলো-ময়লা গায়ে মেখে সে বিছানায় এসে বসেছে। তখন কেবল ব্যর্থতা আর অপমানগুলি মনে পড়ে— হেডমাস্টার কেমন অবহেলার সঙ্গে কথা বলেছিল, শিবকালী ঘোষ করেছিল বদ একটা রসিকতা, ক্লাস টেন-এর লম্বা কালো মতো একটা ছেলে সারা ক্লাস 'বেঞ্চে ছারপোকা সার' এই কথা বলে আর ইয়ারকি দিয়ে তাকে জ্বালিয়েছিল; কিংবা মনে পড়ে, ট্রেনে একটা অচেনা লোক ভিড়ের মধ্যে তার দিকে কেমন স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। তাই তখন সুন্দর কথাগুলি মনে পড়ে না কিছুতেই। কেবল সকালবেলাতে তার মন স্মৃতিশূন্য থাকে, ফাঁকা ঘরে পাখির মতো উড়ে আসে চমৎকার সব কথা। কিন্তু মৃদুলাকে একা পাওয়া যায় না।

সকালবেলার সুন্দর কথাগুলো মৃদুলাকে বলা হয় না। ওদিকে বয়স বেড়ে যায়।

দাদার সংসারে অনেককাল থাকা হয়ে গেল তার। চুয়াল্লিশ সালে বাবা মারা গেল, তার সাড়ে তিন বছর পর মা, তারপর থেকে দিন শেষে বাসায় ফেরার সময়ে কোনও দিন তার মনে হয়নি, বাসায় ফিরছি। এখন মাঝে মাঝে তার নিজের বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করে। নিজের বাসা। যেখানে সকালবেলা সুন্দর কথাগুলো সে অনর্গল শোনাবে মৃদুলাকে, সেখানে সকালে মাস্টারনি এসে বাচ্চাদের পড়াবে বলে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরের বিছানা ছাড়তে হবে না, যতক্ষণ খুশি উদোম হয়ে শুয়ে থাকবে তুলসী, ইচ্ছে হলে সারা ঘর ঘুরে চোর-চোর খেলবে মৃদুলার সঙ্গে, কিংবা চেঁচিয়ে বলবে, আমি তোমাকে ভালবাসি।

কত কিছুই ইচ্ছে করে তুলসীর। হয় না। চা শেষ করে একটু বিষণ্ণ অন্যমনস্ক মনে তুলসী বাজারে বেরোল। কয়েক দিন আগে স্কুলে বেরোবার সময়ে মৃদুলাকে একটু একা পেয়েছিল সে। মৃদুলা বাইরের ঘরে মাস্টারনির এঁটো চায়ের কাপ নিতে এসেছিল, সেই সময়ে দরজার আড়ালে টেনে নিয়ে এক পলকে মৃদুলাকে একটা চুমু খেয়েছিল সে। আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই দু' ঘরের মাঝখানের দরজার পরদা সরিয়ে বড় ভাইঝিটা

ব্যাপার-স্যাপার দেখে ফেলল। বাপারটা হঠাৎ হয়ে-যাওয়া কিনা কে জানে! বড় ভাইঝি পিতু বারো বছর বয়সেই ঝানু পেকে গেছে। ফ্রকের তলা থেকে ঠেলে উঠছে বুক, চোখে চিকন কাজ দেখা যাচ্ছে তার, ছাদ থেকে পশ্চিমে ঘোষালদের যে ছাড়া জমিটা দেখা যায় সেখানে এক দঙ্গল ছেলের আড্ডা। তারা ঘুড়ি ওড়ায়, সিগারেট ফোঁকে, বদ মতলবে ভাঙা ইটের টুকরো জড়ো করে। ছাদের আলসে থেকে পশ্চিমে পিতুকে অনেকবার সন্ধেবেলায় ঝুঁকে থাকতে দেখেছে তুলসী। তা ছাড়া মৃদুলার কাছে শুনেছে যে, পিতু গোপনে মৃদুলার সুটকেস হাঁটকায়, খুঁজে দেখে কাকা কাকিমাকে গোপনে কিছু শাড়ি-টাড়ি দিল কি না। তা ছাড়া মৃদুলাকে মাঝে মাঝে নিরীহ মুখে জিজ্ঞেস করে, রাত্রিবেলা তোমাদের ঘরে অত শব্দ হয় কেন? কাজেই পিতুর মতো পাকা মেয়ে সেদিন, সেই চুমু খাওয়ার দিন যে কাকা-কাকিমার ব্যাপারটা দেখার জন্য ওত পেতে ছিল না, তা কে বলতে পারে!

যেদিন ললিতকে হাসপাতাল থেকে বাসায় পৌঁছে দিল তুলসী সেদিন হঠাৎ তার শম্ভুকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল, এবার ললিতরা না থাকলে ওদের বাসাটা শম্ভুরা কতয় ভাড়া দেবে। এ-রকম নৃশংস চিন্তা কেন তার মাথায় এসেছিল তা সে বুঝতে পারেনি তখন। পরে ভেবেছে যে, আসলে সেটা ছিল তার অবচেতন মনেরই ব্যাপার। আর খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, সেদিনই বাসায় ফিরে সে দেখল, দাদা বউদি বাচ্চারা কেউ বাসায় নেই, অন্ধকার বাসায় বাইরের ঘরের মেঝেয় বসে মৃদুলা কাঁদছে। তুলসী রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? মৃদুলা বলল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। তুলসী জিজ্ঞেস করল, কী কথা? মৃদুলা বলল, তুমি আলাদা বাসা করো। আমি এখানে থাকব না। ভীষণ চমকে গেল তুলসী, বাসা। বাসা কেন? মৃদুলা গলায় ঝাঁঝ দিয়ে বলল, এখানে আমি মানিয়ে গুছিয়ে থাকতে পারছি না। আমি চিরকাল লেখাপড়া শিখেছি, গান গেয়েছি, তাই ঘরের কাজ শিখিনি, সেটা কি খুব দোষের? আমার হাতে রুটি ফোলে না, পিরিচ ভাঙে, ঘর ঝাঁট দিলে কোন কোনায় ময়লা থেকে যায়— তাই আমি অলক্ষ্মী? দরকার হলে দিদি শিখিয়ে নিক, বড়রা নেয় না? তা না করে দিদি সকলের কাছে আমার অকাজের কথা বলে বেড়ায়। আবার দেখো, দ্বিরাগমনে বাপের বাড়ি না গিয়ে পিসির বাড়ি গিয়েছিলাম বলেও কথা উঠেছে। দিদির কোন এক ভাই যেন আমাদের পাড়ায় থাকে, সে বোধ হয় বিভুর ব্যাপারটা কিছু বলেছে দিদিকে, তাই দিদি আজকাল শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, আজকালকার মেয়েদের ফ্রক না ছাড়তেই ভালবাসা, পিরিতের কাপ্তানরা সব রাস্তায় ঘাটে বসে থাকে, এখন বাপের বাড়ি যাওয়ার পথ বন্ধ, লজ্জায় মরে যাই। এই সব নোংরা কথা। তুমিই বলো, আমার দোষ ছিল? তা ছাড়া দিদির নিজের মেয়ে কী? ওই পিতু! স্কুল-রাস্তায় পিতুর জন্য কাপ্তানরা দাঁড়িয়ে থাকে না? ওর বইয়ের বাক্স খুঁজলে চিঠি পাওয়া যাবে না? অত বড় মেয়ে ফ্রক পরে বুক দেখিয়ে বেড়ায়, হুট হাট সিনেমায় যাচ্ছে, ফাংশন দেখে রাত করে ফিরছে, দিদি দেখেও দেখে না। তারপর দেখো পরশুদিন দুপুরে খাওয়ার পর বাথরুমে গিয়ে বমি করেছি সন্ধেবেলা সেটা দাদাকে শুনিয়ে দিদি বলল, দেখো বিয়ের মাস থেকেই বেঁধে গেল, একটুও আঁট নেই, বেহায়া আর কাকে বলে! কেন বলবে ও-কথা? আমি কি আঁটকুড়ি যে আমার বাচ্চা হবে না? আজ আমার বাবা এসেছিল, দিদি তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, মেয়েদের গান-বাজনা, লেখাপড়া শেষ পর্যন্ত কাজে লাগে না; ও-সব বড়লোকে বড়লোকে চলে। আমাদের সাধারণ ঘরে লক্ষ্মীরই কদর বেশি, সরস্বতীর তেমন নয়। ঘুরিয়ে বলা, কিন্তু বাবা তো বোকা নয়, তাই আমাকে আড়ালে ডেকে বকে গেল, কাজকর্ম করবি। তুলসীর বাবা-মা নেই, দাদা-বউদিই ওর বাপ-মার মতো। ওঁরা যেমন চালায় তেমনই চলবি। আমি বাবাকে কিছু

বললুম না, কিন্তু বলো, দুঃখ হয় না? বাবা কোনও দিন আমাকে বকে না, জানো? তাই আজ বিকেল থেকে আমি কাঁদছি। তা ছাড়া দেখো, আজকাল দিদি আমাকে একা রেখে দুপুরে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বেড়াতে চলে যায়, বলে, এতকাল আমি ঘর আগলে থেকেছি, এবার তুমি আগলাও, আমি একটু হাঁফ ছেড়ে আসি। তুমিই বলো, এ বয়সের নতুন বউকে একা রেখে যাওয়া কি ঠিক? দুপুরের কলকাতা ডেঞ্জারাস নয়? কত ঠগ, জোচ্চোর, খুনে এখানে ফিরিওয়ালার সাজ পরে আসে, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি সেজে আসে, ডাকপিয়ন হয়ে এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। তা ছাড়া কে জানে বিভুর দলবল এখনও তক্কে তক্কে আছে কি না! তুমি সন্ধের আগে ফেরো না, কখনও বা বন্ধুর অসুখ দেখতে যাও, একা একা আমার ভয় করে। আমি এখানে থাকব না। তুমি বাসা না করলে ঠিক বাপের বাড়ি চলে যাব। বাবা আজ বলে গেল, এখনও বিভুর দলবল বাসায় ঢিল ছোড়ে, বেয়ারিং ডাকে বেনামা চিঠি দিয়ে শাসায়, গেলে হয়তো অ্যাসিড বালব ছুড়বে, ছোরা বসাবে, বোমা মারবে, কিংবা জোর করে টেনে নিয়ে যাবে...

অত কথা একসঙ্গে সঠিক বুঝতে পারেনি তুলসী। বুঝবার দরকারও ছিল না তুলসী জানে বাংলাদেশে সেই পুরনো আমল আর নেই, যখন দুটো আহ্লাদি বেড়ালের মতো দাঁত নখ লুকিয়ে মা আর জেঠিমা এক পাতে গন্ধলেবুর পাতা দিয়ে মেখে পান্তাভাত খেতে বসত। মেয়েতে মেয়েতে কোনও দিনই ঠিক ঠিক ভাব হয় না, পুরুষদের যেমন হয়। তবু কী করে যেন মা আর জেঠিমা কেউ কাউকে সহ্য না করেও বিশ বছর একসঙ্গে ছিল। তবু বাংলাদেশে সেই পুরনো আমল আর নেই, মানুষের সহ্যশক্তি অনেক কমে গেছে। তুলসী অন্য কথা ভাবে। স্কুল থেকে সে নিয়মিত বেতন পায় না, ছাত্ররা গ্রামের গেরস্থ কিংবা চাষার ছেলে, নিয়মিত মাইনে দেয় না, যা দেয় তাই তারা সবাই ভাগ করে নেয়— কোনও মাসে পঞ্চাশ, কোনও মাসে ষাট। ন' মাসে ছ' মাসে সরকারি সাহায্যের টাকা আসে। তাই তার অভাবের মাসগুলো দাদাই চালিয়ে নেয়। আলাদা বাসা করলে কীভাবে চলবে? তা ছাড়া মৃদুলাকে আলাদা বাসায় ফেলে রেখে কী করে অত দূরে যাবে তুলসী! যখন দুপুরের কলকাতা ভয়ংকর! যখন বিভুর দলবল হাল ছাড়েনি।

শান্ত মনে সকালের ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে বাজারে যাচ্ছিল তুলসী। মাথার মধ্যে এ-সব হিজিবিজি চিন্তা ঘুলিয়ে উঠতে লাগল।

সকালে প্রায়দিনই বাজারে একটা মোটাসোটা আধবুড়ো লোককে ঘুরে বেড়াতে দেখে তুলসী। বড় নিরীহ, ভিতু-চেহারা, দেখলেই মায়া হয়। লোকটা বিষণ্ণ চোখে চারদিকে দেখতে দেখতে যায়, এ-দোকান সে-দোকানে একটু দরদস্তুর করে, কেনে খুব অল্পই, কিন্তু বাজারের চত্বরে অনেকক্ষণ তাকে থাকতে দেখেছে তুলসী। কোনও দিনই খুব খেয়াল করে দেখে না। আজ দেখল, নাকফুল কানফুলের মতো ছোট ছোট ফুলকপি নিয়ে যে বেচুনি মেয়েছেলেটা অহংকারে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, তারই মুখোমুখি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। কোনও দরকার ছিল না, কেবলমাত্র মাথায় হিজিবিজি চিন্তাগুলোকে তাড়ানোর জনাই তুলসী হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে একটু হেসে লোকটাকে বলল, ফুলকপি নিলেন?

তার দিকে চেয়ে একটু ম্লান হাসল লোকটা, না। বাবার কথা ভাবছিলাম। বাবা বড় ভালবাসতেন।

ওঃ হোঃ। বলে বুঝদারের মতো হাসল তুলসী।

আমি ফুলকপি খাই না। তার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে লোকটা লাজুক গলায় বলল, বাবা খেয়ে যেতে পারেনি। সেদিন এই ফুলকপি, মুলো দিয়ে মটরের ডাল, বেগুন ভাজা রান্না হয়েছিল দুপুরবেলায়। ছুটির দিন

ছিল, সারা সকাল বিছানায় পুরনো প্রবাসী পড়েছে লোকটা, তারপর বোধ হয় ঢুলুনি এসেছিল একটু। স্নান-খাওয়ার জন্য ডাকতে এসে মা দেখল, লোকটা ঘুমোচ্ছে যেন— খোলা প্রবাসীর ওপর যত্নে রাখা চশমা-জোড়া, দু' পায়ে আঁকড়ে-ধরা কোলবালিশ, নাকের ওপর জমে আছে সেই চিরকালের ঘামের ফোঁটা, তবু লোকটা নেই।

আহাঃ! তুলসী বলল।

বাপ মা'র মতো জন হয় না। লোকটা ধীর শান্ত গলায় বলে, আমার বাবা লোকটা ছিল গরিবজন, ছোট দোকানের দোকানদার, এক-আধদিন ভাল-মন্দ খেতে পেত। বেঁচে থাকতে কোনও দিন মান্যগণ্য করতাম না। কিন্তু এখন! এখন কেবল সেই খোলা প্রবাসীর ওপর ডাঁটি-ভাঙা চশমা-জোড়া মনে পড়ে। বড় আশায় আশায় আমার দিকে চেয়ে আছে। বলতে বলতে লোকটা তুলসীর দিকে অন্যমনে তাকায়, কিন্তু তুলসীকে বোধ হয় সঠিক দেখে না, ম্লান একটু হেসে বলে, বাবা মরে যাওয়ার অনেক পরে আমি বাপ হয়েছিলাম। একটাই ছেলে ছিল আমার অসৎ, বখা, গুন্ডা। অতি আদরে বাঁদর। সামলাতে পারতাম না। তখন বুঝতে পারতাম তেমনই এক গরিব বাপ আমি, ছোট চাকরি করে খাই, ঘরে বাইরে কেউ কোথাও পাত্তা দেয় না, লোকের নজরে পড়ি না, এমনই ছোট। তখন যেন বাবার সেই ডাঁটি-ভাঙা চশমা-জোড়াই আমার চোখে, জুল জুল করে চেয়ে থাকি, আশায় আশায়। তখন বুঝি বাপ হওয়া কেমন, বাপ কেমন জন। ছেলেটা মিশত বদ, দাঙ্গাবাজ, হারামজাদা ছেলেদের সঙ্গে। উনিশ বছর বয়সে হাতে বোমা ফেটে মারা গেল। অত বড় শরীরটার আর কিছুই ছিল না।

আঃ! তুলসী বলে।

না, আমি আর ফুলকপি, মটরের ডাল, মুলো, বেগুন খাই না, ছেলেটা ভালবাসত মাছ মাংস ডিম, ঝাল লঙ্কা, পেঁয়াজ, রসুন, এঁচোড়ের ডালনা। আমরা সে-সব ছেড়ে দিয়েছি। আমরা বুড়োবুড়ি এখন আর সত্যিই কোনও খাবারের স্বাদ পাই না। লোকটা আবার একটু ম্লান হাসে, বাজার করতে বড় ভালবাসতাম। মা-বাপ, বউ-ছেলে— এদের কার কোনটা স্বাদের জিনিস তা মনে করে, খুঁজে-পেতে, দরদস্তুর করে সেরেক-এ চার-আট আনা কমিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কত আনন্দ ছিল। বাজারও ছিল অন্য রকম। এখন দেখুন বেশি দাম, কম ওজনের বাটখারা, দোকানদারদের তিরিক্ষি মেজাজ, গায়ে গায়ে ব্যস্ত খদ্দেরের ভিড়, বাজারে আর সেই আনন্দ নেই। তবু আসি। চল্লিশ বছর ধরে বাজার করে আসছি— সকালবেলায় এইখানে এই যে এক ঢল সবুজ দেখা যায়, এর বড় নেশা। তাজা তরিতরকারি, শাকপাতা, ঝকঝকে মাছ ঘুরে ঘুরে দেখি। কত কথা মনে পড়ে যায়! মাঝেমধ্যে দর করি, একটু কিনি, কিনি না। শেষ বাজারে বেছে-গুছে সেইসব জিনিস একটু করে নিয়ে যাই, যা আমার বাপ পছন্দ করত না, ছেলে খেত না।

মাছ-বাজারের সামনে লোকটার কাছ থেকে বিদায় নিল তুলসী, বলল, আবার দেখা হবে।

লোকটা একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসে, কত কথা বলে ফেললাম! হ্যাঁ, দেখা হবে। তবে বেশিদিন আর না। চাকরির আর কয়েকটা বছর, তারপর গাঁয়ের দিকে চলে যাব। আমরা আসলে গ্রামেরই লোক মশাই, সাধারণ লোক।

লোকটা তুলসীর মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু, তারপর 'আচ্ছা...' বলে উদাসীন চোখ ফিরিয়ে নিল। সবজি বাজারের ভিতর দিয়ে ভিড় ঠেলে আস্তে আস্তে চলে গেল। তুলসী দেখল, লোকটার ডান হাতে সাদা শূন্য বাজারের থলিটা হাওয়ায় লটপট করছে।

ব্যাপারটা কিছুই না, তবু বুকের মধ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একটা শান্টিং ইঞ্জিন হঠাৎ গুপ করে ধাক্কা মারে। এখনও বাপ হয়নি তুলসী, কিন্তু মৃদুলার পেটে বাচ্চা এসেছে। অন্যমনস্কভাবে কেনাকাটা করছিল তুলসী, আর দু'-তিনটি কথা তার মাথার মধ্যে মাছির মতো ঘুরেফিরে বসতে লাগল। বাপ কেমন জন...গরিব বাপ আমি সাধারণ মানুষ...আসলে আমরা গ্রামেরই লোক। কথাগুলোর মধ্যে কিছু একটা আছে, যা সে স্পষ্ট ধরতে পারছিল না। অনেকক্ষণ ধরে ভাবল তুলসী। তারপর হঠাৎ লোকটার শেষ কথাটা ভেবে তার মনে হল, গ্রাম! গ্রামে চলে গেলে কেমন হয়! ভাবতেই যথেষ্ট উত্তেজনা বোধ করে তুলসী, মাথার হিজিবিজি কেটে যায়। এতকাল গ্রামে গিয়ে বসবাস করার কথা তার মনেও হয়নি। বরং সে বৃথা তিন বছর ধরে কলকাতায় চাকরি খুঁজেছে। পায়নি। অথচ গ্রামের সেই ভাঙাচোরা স্কুলটাই এতকাল ধরে খাওয়াচ্ছে তাকে। তবে সে কেন কলকাতার কাছে ভিখিরিপনা করবে?

লোকটাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলেই মনে হল তুলসীর। গ্রামে গেলেই এখন সব দিক দিয়ে ভাল হয় তার। লোকটা অত কথার মধ্যে এই কথাটারই ইঙ্গিত দিয়ে গেল না? সেখানে মৃদুলা নিরাপদ, বাসাভাড়া কম, ভালই থাকবে সে। ভাবতে ভাবতে সে স্পষ্ট দেখতে পেল, সে যেন গ্রামীণ গৃহস্থ-তুলসী, চারধারে ধানের মরাই, সবজিখেত, পোষা গোরু-ছাগল।

এ-কথা ঠিক যে, কলকাতাতেই তার জান পোঁতা আছে। এখানেই চায়ের দোকানে, বন্ধুদের আড্ডায় কেটেছে তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়। একটা বড় কলকাতা আছে— যার পার্ক স্ট্রিটে রেস্টুরেন্ট, ক্যামাক স্ট্রিটে বাড়ি, কিংবা গ্র্যান্ড হোটেল, সে কলকাতাকে চেনে না তুলসী। সে চেনে জগার দোকান, কফি হাউস, নাইট শোর সিনেমা, মেয়েছেলে দেখা, বেকার ঘুরে বেড়ানো কিংবা সময় নষ্ট করার কলকাতাকে। তবু কলকাতার আত্মাই তার বুকের মধ্যে ধকধক করছে। গ্রামে চাকরি করতে যায় তুলসী, গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কথা বলে, গাঁয়ের ছেলেদের পড়ায়, আর সবসময়ে তার মনে হয় 'আমি এদের চেয়ে উঁচুদরের লোক'। কেন মনে হয় ও রকম কথা কে জানে! হয়তো কলকাতায় বাস করলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে ও রকম অহংকার তৈরি হয়ে যায়। আর অহংকারী হওয়া মানেই নিজেকে না জানা, অন্যকেও না জানা। এখন ওই ঈশ্বর-প্রেরিত লোকটার কথারই প্রতিধ্বনি সে তার মনের মধ্যে শুনতে পায়। এক গরিব জন আমি— সাধারণ মানুষ। কোটি কোটি মানুষের একজন মাত্র। দেশ-গ্রামের সঙ্গে তার নাভির যোগ, কলকাতা সেই নাড়ির বন্ধন ছিঁড়ে রেখেছে বহুকাল ধরে। এবার গ্রামেই চলে যাবে তুলসী।

বাজার থেকে ফিরে সারা সকাল মৃদুলাকে এই কথাটা বলার সুযোগ খুঁজল তুলসী। পেল না।

স্কুলে যাওয়ার পথে রেল গাড়ির কামরায় সে মানুষজনের দিকে চেয়ে রইল। গাড়ির মেঝেয় বসে দুটো লোক পোনামাছের চারা-ভরতি-জলের হাঁড়িতে থাবড়া দিতে দিতে চলেছে, খালি ঝুড়ি নিয়ে ফিরে যাচ্ছে কয়েকজন ব্যাপারী, দুই বেঞ্চের মাঝখানে গামছা বিছিয়ে ব্রিজ খেলছে তারা, গাড়িতে উঠে হাঁকডাক শুরু করেছিল; একজন চিরুনি অন্যজন হাতকাটা তেলের ফিরিঅলা, বিক্রিবাটা মন্দা দেখে এখন তারা নিবিড় হয়ে বসে গল্প করছে। সাধারণ মানুষ সব, দুঃখী মানুষ। এদেরই একজন সে! ভাবতে ভাবতে আনন্দে শিউরে উঠল তুলসী। কলকাতায় থাকতে থাকতে এতদিন এ-কথাটা তার মনেই হয়নি। তার মনে পড়ল কতবার রাস্তায়-ঘাটে মানুষজন তার কাছ থেকে বিড়ি-সিগারেট ধরাতে আগুন চেয়ে নিয়েছে, কত লোক জিজ্ঞেস করেছে ঘড়িতে ক'টা বাজল, কত লোক দুঃখের কথা বলতে চেয়েছে তাকে। তুলসী ভাল করে তাদের মুখও দেখেনি।

কলকাতায় থাকারই মুদ্রাদোষ ওটা। হ্যাঁ, এবার গ্রামীণ-গৃহস্থ হয়ে যাবে সে, খেত-খামার করবে, ও-গ্রাম সে-গ্রামের লোকেদের চিনে বেড়াবে, খালি পায়ে হাঁটবে মাটির ওপর।

স্টেশন থেকে স্কুলে যাওয়ার দুটো রাস্তা। একটা জাতীয় সড়ক, সেটা ঘুরপথ। আর একটা ধানখেতের মধ্য দিয়ে, আলপথ। আলপথেই যায় তুলসী। মাইল খানেক রাস্তা। অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল সে। হঠাৎ দেখতে পেল সামনে একটা পতিত জমির ওপর দিয়ে দৌড়ে এসে একটা লোক আলের ওপর দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। হাঁটুর ওপর কাপড়, খালি গা, মাথায় গামছা জড়ানো। কাছাকাছি হতেই লোকটা তুলসীর দিকে চেয়ে হঠাৎ হাত তুলে জমিনটার দিকে দেখিয়ে বলল, ওই যে দেখেন!

তুলসী দাঁড়িয়ে পড়ল, কী?

ওই যে! লোকটা আঙুল দিয়ে দেখালে, দেখছেন?

তুলসী দেখল। এবড়ো-খেবড়ো জমি, মাটির ঢেলা, আর ঘাসের মধ্যে প্রথমটায় ভাল দেখা যায়নি, তারপরই দেখা গেল জমির ঠিক মাঝখান দিয়ে কোনাকুনি সাপটা চলে যাচ্ছে। ছাইরঙা শরীর, রোদে চকচক করছে গায়ের আঁশ— একটা বড় মাটির ঢিবি— সাপটা ঢেউ খেলে পেরিয়ে যাচ্ছে। গতি দেখলে মনে হয় একটু আগে এই আলপথটাই পার হয়ে গেছে।

গা ঘিনঘিন করে উঠল তুলসীর, বলল, কী সাপ?

লোকটা হাঁফাচ্ছিল, সাধুভাষায় বলল, বিষ ধরে মশাই, গোখরো। এটা অপরাধী সাপ, ও-চলন দেখলেই আমি চিনতে পারি। এইমাত্র কাউকে কেটে এল...ওই দেখুন, চলনটা দেখুন...দেখছেন? হুঁ, অপরাধী সাপ মশাই।

ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে আর-একটা ঘাসের আড়ালে চলে যাচ্ছিল অপরাধী সাপ। বাতাস কাটার একটা হায়-হায় শব্দ করছে। চলনটা ঠিক বুঝল না তুলসী, তবু তার মনে হল সাপটা চোরের মতো পালাচ্ছে। কোনও দিকেই ওর নজর নেই। আলপথ পার হয়ে ধান খেতের পাশ দিয়ে ক্ষীণ মসৃণ একটি জলধারার মতো নেমে গেল সাপটা পিছনে শূন্য জমিটাকে ভীতিকর করে রেখে দিয়ে গেল। লোকটা সাপটার গতি নিরীক্ষণ করে বলল, শালা নদীর দিকে যাচ্ছে। নদী পার হয়ে গেলেই ফতে। রুগিকে বাঁচায় কে! ওর চলন আমি চিনি মশাই।... বলতে বলতে লোকটা উলটো দিকের খেতের মধ্যে নেমে পড়ল, মুখ ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, আশপাশের গাঁয়ে কোথাও কেটে এসেছে শালা! যদি নগেন ওঝাকে সময়মতো ধরতে পারি...বলে দৌড়তে থাকল লোকটা। কচি ধান গাছের ওপর দিয়ে তার বেপরোয়া মাথাটা মাতালের মতো টলতে টলতে দূরে চলে যাচ্ছিল।

ওঁক করে একটা বমির ভাব উঠে এল তুলসীর পেট থেকে। গা পাকিয়ে উঠল, শিরশির করে ওঠে হাত-পা। গা ঘিনঘিন করে। সামনের দিকে ধুতির অংশটা হাতে তুলে প্রথমে কয়েক পা দৌড়য় তুলসী, তারপর জোরে জোরে হাঁটতে থাকে। সাপটা পশ্চিম বারে গেল। ও দিকে নদী মাইল দুই দূর। লোকটা বলছিল সাপ নদী পার হলে রুগি বাঁচবে না, সত্যি কি! সাপটা নদী পার হওয়ার আগে লোকটা ওঝাকে পাবে কি না কে জানে।

স্কুলের কমন-রুমে পৌঁছতে হাঁফ ধরে গেল তার। হাতের প্লাস্টিকের ফোলিও-ব্যাগটা টেবিলের ওপর ছুড়ে দিয়ে বলল, সাপ!

সবাই তার দিকে তাকাল, কোথায় সাপ?

তুলসী হাঁফাতে হাঁফাতেই সেই লোকটাকে নকল করে বলল, বিষধর সাপ মশাই, গোখরো। অপরাধী সাপ চেনেন কেউ?

হ্যাঁ, অনেকেই চেনে।

কোথায় দেখলেন। কাকে ঠুকে এল?

তুলসী ঘটনাটা বলতেই গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। সবাই চেনে নগেন ওঝাকে, তুলসী বুঝতে পারছিল। যে-লোকটা সাপটাকে দেখিয়েছিল সেও সকলেরই চেনা, রাজেন। তারপর যা হয়— আস্তে আস্তে সাপের গল্প শুরু হয়ে গেল। প্রতি পিরিয়ডের ফাঁকে ফাঁকে এসে তুলসী কমনরুমে সাপের গল্প শুনে যাচ্ছিল। বিচিত্র গল্প সব বিচিত্র সব সাপের। বেনাচিতি, কেউটে, গোখরো, দাঁড়াশ, লাউডগা, জিংলাপোড়া। থার্ড পিরিয়ডের লেজারে এসে সায়েন্স-এর মাস্টার আদ্যিকালের বি এস-সি বুড়ো হরনাথ ঘোষালের গল্পটা শুনল। ঘোষাল বিজ্ঞান পড়তে পড়তে প্রথম যৌবনে ধর্ম-টর্মের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। সেই সময়ে তারা দুই বন্ধু একসঙ্গে পইতে পুড়িয়েছিল একটা পাঁজিতে আগুন জ্বেলে, সেই আগুনে। ঘোষালের বাড়িতে এটা নিয়ে বিরাট হইচই হল, তার গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসী বাপ তাকে বেরও করে দিল ঘর থেকে, কিন্তু ঘোষাল পইতে নিতে রাজি হল না। এক বন্ধুর বাড়ির কাছারি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিল ঘোষাল, সেখানেই থাকতে লাগল। বিজ্ঞান ছাড়া জগতের অন্য কোনও রহস্যকেই সে তখন স্বীকার করত না, প্রবল মনোবল ছিল তার, সে অটল রইল। সে সময়ে একদিন রাতে ঘুমের মধ্যে ঘোষাল টের পেল তার বুকের ওপর বেশ ভারী একটা ওজন, বাঁ কাঁধ থেকে বুক জুড়ে ডান দিকের কোমর পর্যন্ত পিছল, ঠান্ডা, ভারী কী এক বস্তু আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। তন্দ্রার ভাব ছুটে যেতেই লাফিয়ে উঠল ঘোষাল। সাপটা ততক্ষণে নেমে গেছে প্রায়। কেবল লেজের শেষ অংশটা তখন ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে তার কোমর থেকে। টর্চ জ্বেলে এই দৃশ্য দেখল সে, প্রকাণ্ড জাত-গোখরো তার শরীর সাপটে ছিল এতক্ষণ। যদিও সাপটা তখনও তার কোনও ক্ষতি করেনি, তবু ভয় পেয়ে চিৎকার করে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। কাছারি-ঘরটায় লোক শুত অনেক। তারা উঠে বাতি-টাতি জ্বেলে মেরে ফেলল সাপটাকে। কিন্তু তারপর থেকেই— ঘোষাল বলল, আমার বাঁ কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত কেবল একটা শিরশিরে ভাব— গা ঘিনঘিন্ করে, কিচ্ছু খেতে পারি না, উলটে চলে আসে প্রথম পোয়াতির মতো, রাতে ঘুম হয় না, নিজের গা থেকে নোংরা আঁশটে গন্ধ নাকে আসে। সবসময়ে ভয়-ভয় ভাব। আমার আত্মবিশ্বাস কমে যেতে লাগল। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, যুক্তিবাদী, তা ছাড়া আমি গাঁয়ের ছেলে, সাপের গতিবিধি আমি জানি। তব দেখুন দিনরাত আমার মনে হত নরক থেকে, নোংরা জঘন্য বিশ্বাসঘাতক হীন একটা প্রাণী এসে আমাকে ছুঁয়ে গেছে, শত স্নানেও নিজেকে পবিত্র লাগত না। আর মশাই, সারাদিন ধরে বাঁ কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত এই যে জায়গাটা যেখান দিয়ে গিয়েছিল সেই জঘন্য জীব, সেই জায়গাটায় সারাদিন শিরশির ঝিরঝির একটা অবশ ভাব। ডাক্তার এসে মনের শক্তির জন্য ওষুধ দিল, কিছু হল না। আস্তে আস্তে পৃথিবীটা আমার কাছে নিরানন্দ বিষাদময় হয়ে যাচ্ছিল। ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে চাই, লোকের কথা বুঝতে পারি না, কাউকে কিছু বোঝাতেও পারি না। ও গুণিনরা এসে ঝাড়ফুঁক করে গেল অনেক। কিছু হল না। তারপরই একদিন আমাদের কুলগুরুকে নিয়ে বাবা হাজির হলেন, আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে গলায় পইতে পরিয়ে দিলেন। তখন হঠাৎ খেয়াল হল পইতে যেখানে থাকে আমাদের, বুকের ওপর কাঁধ থেকে আড়াআড়ি,

ঠিক সেই জায়গা দিয়েই গিয়েছিল সাপটা। ওই কথাটা মনে হতেই অসুখ অর্ধেকটা সেরে গেল। তারপর শুরু করলাম গায়ত্রী জপ। সারাদিন জপ করি। চোখ বুজে বিভোর হয়ে জপ করি। আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক হয়ে এলাম আমি। অবিশ্বাস-টবিশ্বাস কোথায় উড়ে গেল আমার!

এটা কি সাপের গল্প হল? কে একজন বলল, এ তো পইতের মহিমা-কীর্তন! আর এর সাপটাও যে প্রতীক!

একজ্যাক্টলি, হরেনবাবু সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, একজ্যাক্টলি। পূর্বপুরুষদের বহুকালের তপস্যায় এবং আচরণে অর্জিত ধর্মীয় সংস্কারগুলিকে ত্যাগ করলে অবিশ্বাস, বঞ্চনা এবং মহাভীতি আমাদের আলিঙ্গন করে। তবু দেখুন আমি সত্যিই কিন্তু পঞ্জিকায় আগুন জ্বেলে পইতে পুড়িয়েছিলাম, আর আমার বুকের ওপর দিয়ে সাপও হেঁটেছিল, দুটোই সত্যি।

টিফিনেই খবর চলে এল, পুবপাড়ায় সত্যিই একজনকে সাপে কামড়েছে।

সিক্সথ পিরিয়ডে ক্লাস সেভেনে ক্লাস নিচ্ছিল তুলসী। ক্লাসের মাঝামাঝি সময়ে দেখতে পেল পিছনের বেঞ্চের ছেলেরা পাশের জানালা দিয়ে মাঠের দিকে চেয়ে আছে। ওদের মধ্যে খুব উত্তেজনা। কী রে? বলে হাঁক দিতেই একটা ছেলে বলল, স্যার নগেন ওঝা যাচ্ছে, কাউকে বোধ হয় সাপে কেটেছে। শুনে জানালার কাছে এসে দেখল তুলসী, মাঠের মধ্যে দু'-চারটে লোক আগে চলেছে, পিছনে খুব লম্বা, মিশমিশে কালো একটা লোক, পরনে লাল ডগভগে কাপড়, লাল ফতুয়া। লোকটা যেন অনেকটা স্বপ্নের ঘোরে হেঁটে চলেছে, এমনই ধ্যানমগ্ন তার ভঙ্গি। দেখলে মনে হয় একটা অপ্রাকৃত আবহাওয়া লোকটাকে ঘিরে আছে। নগেন ওঝার সঙ্গে খালি-গায়ে রাজেনকেও দেখতে পেল তুলসী। ওরা গেল পুবপাড়ার দিকে। নগেন ওঝাকে দেখার পর ক্লাস আর বাগে থাকছিল না। ছেলেরা গুনগুন শুরু করে দিল। পুবপাড়ার দিকে যে-বাড়িতে সাপে কামড়েছে সে-বাড়িতে গিয়ে এখন তুক করবে নগেন ওঝা, বাড়ি বাড়ি ঘুরে কুমারীদের হাত থেকে ভিক্ষে নেবে, সেই চালের ভাত রান্না করবে একজন কুমারী, সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে। নগেন ওঝার অনেক তুক। ছেলেরা তাই আর ক্লাসে থাকতে চাইছে না।

নগেন ওঝার জন্যেই কিনা কে জানে সিক্সথ পিরিয়ডের পর ছুটির ঘণ্টা বেজে গেল। পুবপাড়ার দিকে ছুটতে লাগল ছেলের পাল।

তুলসী কমন-রুমে এসে শুনল, তখনও সাপের গল্প হচ্ছে। হাতঘড়িতে দেখল সাড়ে তিনটে। তিনটে সাতচল্লিশের ট্রেনটা পাওয়া যেতে পারে। টেবিল থেকে প্লাস্টিকের পোর্টফোলিও ব্যাগটা তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। ফেরার সময়ে আলপথ ধরল না সে, সুন্দর জাতীয় সড়ক দিয়ে ঘুরপথে গেল স্টেশনের দিকে। হঠাৎ তার খেয়াল হল, রাজেন বলেছিল সাপটা নদীর দিকে যাচ্ছে, নদী পেরোতে পারলেই ফতে। কে জানে সাপটা অবশেষে নদী পেরোতে পেরেছিল কি না!

না, নদী পেরোতে পারেনি সে। তখন ধানগাছের গোড়ায় গোড়ায় গত বর্ষার জল, সাপটা তাই উঁচু-নিচু আলপথের ওপর উঠে এল। একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখল, অনেকটা পথ সে পার হয়ে এসেছে। সামনের দিকে চেয়ে, দেখল, অনেকটা পথ এখনও বাকি। কিন্তু সে কোথায় চলেছে তা তার সঠিক জানা ছিল না। খোলা জায়গার ওপর দিয়ে চলছিল সে। সামনেই আলপথের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল নিয়তি-নির্ভর কয়েকজন মানুষ, সাপটা ঘাসের মধ্যে শরীর নামিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করল একটু। সামনেই অনেকটা পতিত জমি।

মানুষগুলি সরে গেলে সাপটা আস্তে আস্তে নেমে এল জমিতে। খোঁটায় বাঁধা একটা গোরু চরছে। তার পিছনের পায়ের কাছ দিয়ে সে চলে যাচ্ছিল। গোরুটার পায়ে পোকা বসেছিল, পা নাড়তে গিয়ে সাপটাকে দেখল সে, স্থির হয়ে রইল। যেখান দিয়েই সে যাচ্ছিল সেখানেই স্থির হয়ে যাচ্ছিল ঘাস, তৃণ, থেমে যাচ্ছিল পোকামাকড় ব্যাঙের শব্দ। কোনও দিকেই তার মনোযোগ ছিল না। অনেক বয়স হয়ে গেছে তার, বুড়ো একটা সাপ সে। ক্লান্ত। তবু জাতীয় সড়কের পাশে ঢালু জমি বেয়ে সে ধীরে ধীরে উঠে এল ওপরে। রোদে চকচক করছে কালো চওড়া রাস্তা। লরি যাচ্ছে, সাইকেল চলেছে। তার চোখের খুব কাছ দিয়ে চলে গেল গোরুর গাড়ির চাকা। এখানে বিপদ, সে বুঝতে পারল। আবার মুখ ঘুরিয়ে নেমে এল নিচু নাবাল জমিতে। জাতীয় সড়কের সমান্তরাল অনেক দূর চলে গেল সে, তারপর কালভার্টের তলা দিয়ে ও পারে যাওয়ার পথ পেল। জলের পাশ দিয়ে আলগা পাথরগুলোর ওপর সে তার শরীরে ঢেউ তুলে পেরিয়ে গেল। একবার জলে জিভ ছুঁইয়ে নিল। নদীর ঠান্ডা সুগন্ধ বাতাস সে টের পায়। তবু নদী এখনও অনেকটাই দূরে। পিড়িক করে একটা শব্দ হয়। কে? তীব্র ফণা তলে সে ঘুরে দেখে। চড়ুই। আবার মাথা নামিয়ে নেয়, ক্লান্তভাবে চলে। বয়স হয়ে গেছে। পৃথিবীতে তার আয়ুষ্কাল কখনও খুব নিরাপদ ছিল না, বিনা বাধায় কোনও বাদ্য পায়নি সে, নির্ভয় হৃদয়ে কোথাও বাস করেনি, তার চলা মানে কেবলই পালানো। এবার তার দীর্ঘ শরীর আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে আসছে। নদীর ধারে এসে সে থেমে যায়। মুখ তুলে দেখে— স্রোত, স্রোতের ওপারে আবার দীর্ঘ পথ। কোথায় পৌঁছবে সে। জলের ধারে সে নেমে আসে, লম্বা ঘাসের বন হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। সে সেইখানে আরামদায়ক কুণ্ডলী পাকিয়ে নেয়। ঘুমিয়ে পড়ে। শব্দ! সে চোখ খোলে। ব্যাঙ লাফিয়ে গেল। সে দিন দুয়েক কিছুই খায়নি। খিদে টের পায়। আবার শরীর খুলে নেয়। শরীর চলতে থাকে। ঘুরে ফিরে জাতীয় সড়কের কাছেই চলে আসে আবার। উঁচু ঢালু জমিটার ওপরে উঠে দেখে, কালো চওড়া রাস্তা, লরি যাচ্ছে। সে আবার নামতে থাকে। একটা ব্যাঙ লাফিয়ে গর্তের মধ্যে পিছনের অংশটা ঢুকিয়ে দিল, তারপর তাড়াতাড়ি ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তার মোটা শরীর, সহজে ঢুকছিল না। সকৌতুকে সাপটা এই দৃশ্য দেখল। বোকা ব্যাঙটা। সে তার শরীর বুক পর্যন্ত শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে আনল। বোকা ব্যাঙটা প্রচণ্ড চেষ্টা করছিল ঢুকে যেতে, সাপটা আস্তে তার মাথার ওপর নেমে এল। মুখে তুলে নিল তাকে। 'কঁ— ক্' করে কেঁপে উঠল ব্যাঙটা। তার সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনি লাগল। বুড়ো হয়ে গেছে সে, বড় ক্লান্ত। ঝাঁকুনিটা তার ভাল লাগল না। 'কঁ— ক্' আবার পা ছোড়ে ব্যাঙটা। ঝাঁকুনি লাগে। ক্লান্ত বোধ করে সে। ব্যাঙটার শরীর মোটা, থলথলে, তার সমস্ত মুখ ঠেসে বন্ধ করে রেখেছে। সে অপেক্ষা করে। ক্লান্তি লাগে বড়। ব্যাটা আবার কেঁপে ওঠে। তার শরীর অসাড় হয়ে আসে। সে দেখতে পায় জাতীয় সড়কের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়েছে। সে টের পেল তার বুকের নীচে দুর দুর করে কাঁপছে মাটি, লরি চলে যাচ্ছে পথ বেয়ে। সে অনেক পথ ঘুরেছে সারা জীবন। তার ক্লান্তি লাগে। চোখ বুজে আসে। ব্যাঙের প্রকাণ্ড শরীরটা চোয়ালে আর-একবার চেপে ধরতে চেষ্টা করে, পারে না। আলগা হয়ে আসে মুখ। দুর্বল লাগে। ব্যাঙটা চেপে বসে আছে তার মুখে। মোটা প্রকাণ্ড ব্যাঙটা। সে হাঁফিয়ে যায়। ঝাঁকুনি লাগে। আবার ঝাঁকুনি। না, আর কোনও চেষ্টাই করতে পারে না সে। আস্তে আস্তে তার স্থবির শরীর অসাড় হয়ে আসে, চোখ চেয়ে সে এবার তার দীর্ঘ জীবনের একটা অর্থ বুঝবার ক্ষীণ চেষ্টা করে। তারপরই হঠাৎ তার শ্বাস রোধ করে ব্যাঙটা ঠেলে আসে মুখের ভিতরে। চোখ অন্ধকার হয়ে যায় তার।

তখনও মুখে তার আধমরা ব্যাঙ, তার মৃত শরীরটা ঢালু বেয়ে সামান্য গড়িয়ে যায়। তারপর একটা ছোট্ট পাথরে আটকে দড়ির মতো ঝুলতে থাকে।

জাতীয় সড়ক ধরে যেতে যেতে তুলসী শুনল সাপের ব্যাঙ ধরার আওয়াজ। সে খুব তাড়াতাড়ি জায়গাটা পেরিয়ে গেল।

আট

রাস্তায় পায়চারি করতে করতে ললিত দেখল তার মাথার ওপর মশার ঝাঁক। মুখ তুলে 'উম্-ম-ম্-ম্' শব্দ করছিল সে, মশার বৃত্তটা আস্তে আস্তে নেমে আসছিল, মাথার ওপর নাকে কানে চোখে পিড়পিড় করছিল।

ফরসা প্রকাণ্ড চেহারার বুড়ো লোকটি রায়বাবু, বারান্দার ইজিচেয়ারে আধশোয়া, ডান হাতে বই, মলাটের ওপর দিয়ে দেখা যায় তাঁর চশমাজোড়া, হাতের বইটি সরিয়ে ললিতকে লক্ষ করলেন, কী ললিত?

ললিত হাসে, মশা।

হ্যাঁ, বড্ড মশা। আমার বাঁ দিকটায় কামড়ায়। খুব চালাক মশা।

বাঁ হাত নড়ে না, বাঁ পা নড়ে না, বাঁ চোখের পাতা পড়ে না, লোকটার বাঁ দিকটা জড়। করোনারির দুটো আক্রমণ গেছে, এখন তৃতীয়টার অপেক্ষা। দুপুরে খাওয়া ছেঁচাপানের রস বাঁ দিকের কষ বেয়ে ফতুয়াটার বুক ভাসিয়েছে। ছোরা-খাওয়া কিংবা গুলিবিদ্ধ একজন মানুষ যেন। হাতের বইয়ের মলাটে ছবিটা দেখে ললিত বড় অবাক হল। অবিকল একই রকম একটা ছবি— জাহাজের ডেক-এর ওপর গুলি খেয়ে এই রকম রক্তাক্ত বুকে মরে যাচ্ছে একটা লোক, অদূরে রিভলভার হাতে মুখোশ-টুপি-ওভারকোট পরা একজন। বারান্দার রেলিঙের ও-পাশে রায়বাবুর তখন অবিকল গুলি-খাওয়া লোকটার চেহারা।

কী বই ওটা?

রায়বাবু মলাটটা উলটে দেখে নিয়ে বললেন, দস্যু ওয়াং ও ঐতিহাসিক হীরা।

ললিত হাসে।

তুমি আমাকে বই এনে দিয়ে ললিত।

দেব।

দিয়ো, এখন আর কেউ বই এনে দেয় না।

গল্প মনে থাকে না, খেই হারিয়ে যায়।

একবারের দেওয়া বই দু'বার-তিনবার দিয়ে দেখেছে ললিত, লোকটা নির্বিচারে আবার পড়ে যায়। রায়বাবুকে বই দেওয়া সোজা।

তুমি কেমন?

ভাল।

অসুখটা কী যেন?

ওই পেটের একটা ব্যাপার।

পেট! রায়বাবু চিন্তিতভাবে তাকিয়ে রইলেন।

ক্লাবঘরটা বন্ধ। জলের কলে অনেক লোক আর মেয়েছেলে। শম্ভুদের ছাড়া জমিটায় লাটাইয়ে হাত্তা দিতে দিতে পিছিয়ে যাচ্ছে একটি ছেলে। ক্লাবঘরের দরজা পর্যন্ত যায় ললিত, আবার ফেরে। মিত্রদের দোতলার জানালা খোলা— একটা পালঙ্কের কোণ, স্ট্যান্ডে টাঙানো মশারি আর দেয়ালে ছবি দেখা যায়। গণেশের

দোকানে ক্যালেন্ডারে এক দুর্দান্ত যুবতী হাওয়ায় নড়ছে, তার পরনে নিকারবোকারই হবে বোধ হয়। রায়বাবুর মাথার ওপরকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিরুনি থেকে ছাড়ানো চুলের দলা থুথু দিয়ে বাইরে ছুড়ে ঘরে গেল নমিতা। এই সব ছবি ভেঙেচুরে অলক্ষে একটা জাহাজ চলছে। জাহাজ ঢেউ খায়। জাহাজ দোলে। দস্যু ফেরারি ওয়াং তার সামুদ্রিক দূরবিন তুলে চেয়ে থাকে। বিশাল সমুদ্র, মহান আকাশ। দস্যু ওয়াং ফিরেও দেখে না। কোথায় কোন মুলুকে কার কাছে গচ্ছিত রয়েছে সেই ঐতিহাসিক হীরা! পাপী ওয়াং সমুদ্র পার হয়, দ্রুতগামী মোটরে চলে যায়, দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওঠে, নিরপরাধ লোককে খুন করে, বিদেশি বন্দরে রহস্যময় রেস্তরাঁয় চিহ্নিত লোকের সঙ্গে সাংকেতিক কথাবার্তা বলে। জমজম করে তার জীবন।

গল্পটা জানে না ললিত। দরকারও নেই। তবু টের পায় জাহাজ চলেছে। জাহাজ ঢেউ খায়। জাহাজ দোলে। দস্যু ফেরারি ওয়াং তার সামুদ্রিক দূরবিন তুলে চেয়ে থাকে। রায়বাবুর ডান দিকটা বই পড়ে উত্তেজিত হয়, বাঁ দিকটা স্থির থাকে। সংসারী মানুষের মতোই।

ললিত হাসে।

ওই যাচ্ছে অবিনাশ। পরনে ময়লা পায়জামা আর শার্ট, হাতে কাগজ-ঠাসা ডায়েরি, রোগা ছোট্ট চেহারা। উদ্‌ভ্রান্ত মুখচোখ।

ললিত অবিনাশকে ডাকে।

আরে ললিত! কী খবর?

কোথায় চলেছ অবিনাশ?

সাড়ে ছ'টায় একটা মিটিং আছে। দেরি হয়ে গেছে। চলি।

ললিত হাসে। বরাবর অবিনাশের মিটিং থাকে রোজ। দেখা হলেই সেই এক কথা, একটা মিটিং আছে। দেরি হয়ে গেল। চলি ভাই! অবিনাশের চাকরি নেই, বাইরে থেকে অনেকগুলো কারখানার ট্রেড-ইউনিয়ন চালায়, পার্টি থেকে পায় পঁচাত্তর টাকা। উদ্‌ভ্রান্ত দেখায় তাকে। তার পার্টি কী বলতে বা করতে চায়, তা বোধহয় সঠিক জানে না অবিনাশ। ভাসাভাসা যেটুকু জানে সেটুকুকেই সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। মিটিঙে যায়, কিন্তু সেখানে সকলের সব কথা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না! তবু উত্তেজিত হয়ে ফিরে আসে। কী চাও অবিনাশ? মানুষের মুক্তি। কী ভাবে মুক্তি আসবে? সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র কাকে বলে? অবিনাশ থতিয়ে যায় — সমাজতন্ত্র! হ্যাঁ, সমাজতন্ত্র...তার মানে সকলের জন্য সকলের হয়ে ওঠা, ক্ষুধা থেকে মুক্তি, অভাব থেকে মুক্তি, শ্রেণীবৈষম্য থেকে মুক্তি, এইরকম কত কী বলে যায় অবিনাশ। মোটা সব বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে, হাতে নিয়ে বসে থাকে, কিন্তু সঠিক বুঝতে পারে না। তবু মনে হয়, এর মধ্যে একটা কিছু আছে। একটা কিছু, যা এইসব বই কিংবা মিটিঙের মতো নীরস নয়। কিংবা কে জানে সত্যিই মিটিংগুলো অবিনাশের কাছে নীরস কি না। কোনও দিনই কেউ অবিনাশকে পাত্তা দেয়নি, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে তাকে। আশৈশব ওই রোগা চেহারা, আর বুদ্ধির অভাব তাকে মূল্যবান হতে বাধা দিয়েছে। কিন্তু ওইসব মিটিংগুলোতে সে কথা বলার সুযোগ পায়, তার দলের নেতাদের কাছাকাছি যেতে পারে, একটা ধর্মঘটের কারণ হয়ে ওঠে সে, একটা মিছিলের সবার আগের লোকটি হয়ে এগিয়ে যেতে পারে। তখন নিজের মহত্ত্বকে টের পায় অবিনাশ। হ্যাঁ, বোধহয় সমাজতন্ত্রের মানে, নিজেকে তুচ্ছ ভাবার হাত থেকে মুক্তি।

সন্ধের মুখে বাসায় ঢুকে ললিত দেখল, মরা-মরা তুলসী গাছটার গোড়ায় প্রদীপ জ্বেলে মা প্রাণপণে শঙ্খে আওয়াজ তুলবার চেষ্টা করছে গাল ফুলিয়ে, কিন্তু ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে দম বেরিয়ে যাচ্ছে। শাঁখের শব্দ হচ্ছে না। তাকে দেখে মা বলল, দেখ তো, একটু ফুঁ দিয়ে, পারিস কি না। আমার আর আজকাল হয় না।

মায়ের এঁটো শাঁখটা মুখে তুলল ললিত। দু'-তিনবার চেষ্টা করল সে, পেটের সেই জায়গাটায় শক্ত একটা ডেলা পাকিয়ে উঠল। তবু ছাড়ল না, খুব কষ্ট করে তিন-তিনবার ভোঁ বাজিয়ে দিল সে।

কত দিন পর শাঁখ বাজল এ-বাসায়। বলে মা শাঁখ ধুয়ে ঘরে নিয়ে গেল।

সন্ধেবেলা শম্ভুদের ছাদে উঠল ললিত। উঠতে কষ্ট হচ্ছিল খুব। কিন্তু ছাদে সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল। ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। কয়েক মুহূর্তেই জুড়িয়ে গেল শরীর। একটা চাদর নিয়ে গিয়েছিল ললিত। সেইটে পেতে কিছুক্ষণ শুয়ে নিঝুম আকাশের দিকে চেয়ে রইল। আজকের আকাশে সপ্তর্ষি ছিল, ছায়াপথ ছিল না। ছায়াপথই ললিতের বেশি প্রিয়। ধুলারাশির মতো আকীর্ণ নক্ষত্রপুঞ্জ বিপুল একটি অনির্দিষ্ট পথের মতো পড়ে থাকে, ওখানে রোজ ঝড় ওঠে, ঝড়ো হাওয়ায় নক্ষত্রের গুঁড়ো উড়ে সমস্ত আকাশ ছড়ায়। আজ ছায়াপথ ছিল না। ললিত সপ্তর্ষি দেখছিল। সপ্তর্ষির চেহারা শান্ত। প্রশ্নচিহ্নের মতো। ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের সীমায় বসে আছেন সাতজন শান্ত-সমাহিত ঋষি। কিন্তু এর চেয়ে বিছের উপমাটাই বোধ হয় ভাল। সপ্তর্ষিকে আসলে একটা বিছের মতোই দেখায়। ললিতের মনে পড়ল, তার রাশি বৃশ্চিক। বৃশ্চিকের শেষ জীবন খুব সুখের হয় না। শেষ জীবন পর্যন্ত অবশ্য পৌঁছনো গেল না। ললিত চেয়ে রইল। টের পেল সপ্তর্ষির আলো এসে তার গায়ে পড়েছে, স্নেহে লেহন করছে তাকে। তার রাশিচক্র বলছে, এইসব গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে, চাঁদ কিংবা সূর্যের সঙ্গে তার রহস্যময় যোগাযোগ রয়েছে। তার বিশ্বাস হয় না। বরাবরই সে এ-সব বিশ্বাসের বিরোধী ছিল। এখনও সে চায় না মৃত্যুর পরে কোনও চেতনাকে, কিংবা চায় না আরও একবার জন্ম নিতে। কেবল ইচ্ছে করে চার পাশে নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝখানে আকাশ জুড়ে শুয়ে থাকতে। মহান একটি ঘুম, তার বেশি কিছু না। ছেলেবেলায় খেলার শেষে ফাঁকা মাঠে শুয়ে থেকে কত দিন আকাশ দেখেছে সে। দেখতে দেখতে কোন শূন্যতায় সে পৌঁছে যেত। পার্থিব কোনও কিছুই আর মনে থাকত না, বিপুল আকাশ-চেতনা আচ্ছন্ন করে রাখত তাকে, শূন্যের বিষণ্ণতায় ডুবে থাকত। সে-কথা মনে করে আজ একটু হাসল ললিত। তখন আকাশে থাকতেন দেবতারা, মানুষের ইচ্ছা পূরণ করতেন। আজ তাঁরা কেউ নেই— না মনে, না আকাশে তবু আজও কিছুক্ষণ সপ্তর্ষির অদৃশ্য আলো সে তার শরীর আর চেতনায় অনুভব করল। আকাশ থেকে মহৎ এক বিষণ্ণতা হনহন করে হেঁটে আসছে তার দিকে, টের পেল। কিন্তু আচ্ছন্ন হল না। আজ তার চারপাশের বিষণ্ণতা বয়স-হওয়া ললিতকে শক্ত মুঠিতে ধরেছে, আকাশের বিষণ্ণতা আজ আর তেমন একটা কিছু নয়।

উঠে পড়ল ললিত। ছাদের রেলিঙের ধার ঘেঁষে বেড়াতে লাগল।

দেখতে পেল বড় রাস্তার দিক থেকে ছোট্ট সাদা একটা মোটর গাড়ি আস্তে আস্তে এসে তাদের গলির মুখে থামল। আবার পিছন ফিরে মুখ ঘোরাল, আবার পিছিয়ে এসে থামল। মুখ ঝুঁকিয়ে ললিত দেখল গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভারের সিট থেকে সঞ্জয় নামছে। সঞ্জয়ের গাড়ি দেখে একটু অবাক হল ললিত, এত তাড়াতাড়ি ওর গাড়ি হয়ে গেল!

ললিত ছাদ থেকেই উঁচু গলায় বলল, সঞ্জয়, ঘরে যা। আমি আসছি।

সঞ্জয়, ওপর দিকে তাকাল, রাস্তার আলো থেকে হাতে চোখ আড়াল করে ললিতকে দেখার চেষ্টা করে বলল, তুই ওপরে? আমিও আসব?

ছাদটা শম্ভুদের। এখানে বাইরের লোক সঞ্জয়কে আনা ঠিক হবে না। তাই ললিত বলল, না, তুই ভিতরে যা।

ললিত নীচে এসে দেখল, সঞ্জয় তখনও গলির মুখে দাঁড়িয়ে, চেন-এ বাঁধা গাড়ির চাবিটা বোঁ বোঁ করে ঘোরাচ্ছে। তাকে দেখে হাসে সঞ্জয়, ক' দিনের নোটিস রে! নাকি জামিনে খালাস আছিস, সময় ফুরোলে ধরে নিয়ে যাবে।

ললিত হাসে, শালা, পাষণ্ড!

বাহবা! টেলিফোনে তোর গলা শুনে ভেবেছিলুম যে, এসে শুনব তুই বিছানায় পড়ে চিনচিন করে 'বিদায় দে মা' গাইছিস। তা তো নয়, এই তো দিব্যি মুখ ফুটছে।

চোখের ইঙ্গিতে গাড়িটা দেখিয়ে ললিত বলল, তোর?

পোষা কুকুরের গায়ে লোকে যেমন আদরের থাপ্পড় দেয়, তেমনই গারিটার গায়ে একটা থাপ্পড় দিয়ে সঞ্জয় বলে, না রে। এখনও আমার নয়, তবে মনে হচ্ছে আমার হয়ে যাবে।

কী রকম!

এক মাড়োয়ারি পার্টির গাড়ি। নতুন, মাত্র হাজার ছয়েক মাইল চলেছে। পাঁচ হাজার টাকায় দিয়ে দেবে। আজ বিকেলে এসে কয়েক দিন ট্রায়ালে রাখতে দিয়ে গেল।

জলের দর।

তুই বুঝবি না রে, অন্য দিকে পুষিয়ে না নিলে জলের দরে দেয়! পুষিয়ে নিচ্ছে। কেনা-বেচার ব্যাপার তুই কী বুঝবি বে?

তুই উন্নতি করে ফেললি।

সঞ্জয় হাসে, উন্নতির এখনই কী দেখলি? রচনা বইতে পড়েছিলুম, 'এক কোটি টাকা পাইলে আমি সব ভাত গুড় দিয়া খাইব।' এখনও গুড় দিয়ে সব ভাত খাওয়া হয়নি। গাড়ি হয়েছে, বাড়ি হবে, মেয়েমানুষ পুষব, গ্রীষ্ম কাটাতে যাব সুইজারল্যান্ড। দেখিস, গরিবের রোগেও আমি মরব না। আমাশা, শোথ, উদুরি— দূর দূর। মরতে হয় তো মরব ক্যান্সার কিংবা সেরিব্র্যাল স্ট্রোকে— ভিয়েনা কি আমেরিকার নার্সিং হোমে। শম্ভুনাথ, নীলরতনের জেনারেল বেডে নয়। বুঝলি বে!

তোর শেষ দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

দেখে যা কাইন্ডলি, তোর মাস্টারির চাকরির কাজে লাগবে। ছাত্রদের দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে পারবি, অধ্যবসায়ের পরিণাম।

জুতো ছেড়ে ঘরে ঢোকার কথা সঞ্জয় এখনও ভোলেনি। ললিত দেখল ঘরে ঢোকার আগে এক পায়ে দাঁড়িয়ে কুঁজো হয়ে সঞ্জয় জুতো ছাড়ছে।

ললিত বলে, জুতো নিয়েই আয় না!

দূর! মাসিমার ঠাকুর দেবতারা ঘর ছেড়ে পালাবে না?

ঘরে ঢুকেই সঞ্জয় চেঁচাল, মাসিমা, ও মাসিমা!

রান্নাঘর থেকে মা'র ক্ষীণ গলা শোনা গেল, কে রে! সঞ্জয়! কতকাল আসিস না!

সঞ্জয় ঘরে বসল না, সোজা চলে গেল মোজা-পায়ে রান্নাঘরের দরজায়। ললিত শুনল, সঞ্জয় চেঁচিয়ে বলছে, আপনি একটুও বুড়ো হননি তো মাসিমা। তারপর নিচু গলায় গুনগুন করে কথা বলতে লাগল মা'র সঙ্গে।

ছাদের সিঁড়ি দিয়ে বড় তাড়াতাড়ি নেমেছে ললিত। শরীর অবশ লাগছে। বিছানায় বসে আধশোয়া হল সে।

সঞ্জয় রান্নাঘর থেকে এসে চৌকিতে বসে বলল, তুলসী-মড়াটা কোথায়! সেটারও তো আজ আসার কথা। আর, আদিত্য?

আদিত্য আসবে না। ওর কাজ আছে। তুলসী আসবে ঠিক।

হেগে মরুক গে আদিত্য। তুলসীটা আসুক, আজ ওকে রগড়াব।

কেন?

ও মড়াটা দিন দিন আরও মরে যাচ্ছে। কী একটা বউ যে হয়েছে ওর ত্রি-ভুবনসুন্দরী, বুকের মধ্যে সেই বউয়ের দোলমঞ্চ নিয়ে ব্যাটা ঘুরে বেড়ায়। কিছুদিন আগে মাস্টারদের অবস্থান ধর্মঘটে গিয়েছিল এসপ্ল্যানেড ইস্টে, সেখান থেকে এসেছিল আমার অফিসে। যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ কোথায় পুরনো দিনের পাইজ্যামি বদমাইশির কথা বলব, তা না কেবল বউয়ের কথা, শালা এমন বেহায়া, বলে কিনা বিয়ে করে অনাস্বাদিতপূর্ব সুখে ডুবে আছি, বউ বড় সুখী করেছে আমাকে, ঠিক ওই রকম বইয়ের ভাষাতেই বলেছিল। অফিস না হলে পাছায় একটা লাথ কষাতুম। এদিকে দেখ, বলছে সুখে আছে অথচ চোখে মুখে মরকুটে ভাব, কাঠ-কাঠ হাসি, চোখ ম্যাট ম্যাট করছে। অনেক ধানাই পানাই করে বলল, সঞ্জয়, তোর হাতে ভাল গুন্ডা আছে? চমকে উঠে বললুম, কেন রে! বললে, একটা লোককে একটু টিট করতে হবে। জিজ্ঞেস করলুম, কে! কিছুতেই বলে না। বললুম, গুন্ডাই যদি লাগাবি, তবে আমাকে লাগা, জানিস তো আমি কেমন হারমাদ ছিলুম, এখনও ওটা আমার সাইড-বিজনেস। শুনে এলোমেলো কী-সব বলল, বুঝলাম না। চা-চা খেয়ে বিরস মুখে চলে গেল। মাইরি, ও শালাকে আজ আমি রগড়াব, তুই দেখিস। ওর উইক পয়েন্ট আমি বের করেছি।

ললিত হাসছিল, কী সেটা!

ওর বউ।

হবেও বা। ললিত ঠিক জানে না। নিজের ব্যথা-বেদনা-ব্যাধি নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে, কাউকেই এ ক'দিন ভাল করে লক্ষ করা হয়নি। হঠাৎ মনে পড়ল, তুলসীর বউকে এখনও দেখাই হয়নি। এককালে পরস্পরে বিয়ে নিয়ে কত জল্পনাকল্পনা ছিল তাদের। ঠিক ছিল তুলসীর বিয়ে হবে খুব দূরে কোথাও, নাগপুর কানপুর বা ও-রকম দুরে, তারা দল বেঁধে বরযাত্রী যাবে। আর ললিতের বিয়ে হবে এমন জায়গায়, যেখানে যেতে নৌকো লাগে। সঞ্জয়েরটা ঠিক ছিল বিলেতে, মেমসাহেবের দিকেই বরাবর ঝোঁক সঞ্জয়ের, তাই ওর বিয়েতে এরোপ্লেনের বন্দোবস্তই ঠিক হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তুলসীর বিয়েতে যাওয়াই হল না, হারামজাদা বিচ্ছিরি একটা সময় বেছে বিয়ে করল।

সঞ্জয় বলল, আদিত্য এলে আজ তুলসীর পেছনে লাগাতুম। জিরাফের মতো লম্বা গলা উঁচু-নিচু করে, চোখ বুজে দু' হাতের কাচকলা নেড়ে গাইত 'তুলসী গাছেতে, কুকুর মোতে-তে-এ।' শালাটা এল না কেন? কী এনগেজমেন্ট ওর?

বলতেই যাচ্ছিল ললিত। ইতস্তত করে সতর্ক হয়ে গেল; শাশ্বতীর কথাটা মুখে এল না। বোঝা যাচ্ছে আদিত্য আর শাশ্বতীর ব্যাপারটা এখনও সঞ্জয় জানে না। তাই, ওই নরম সুন্দর শ্যামলা মেয়েটিকে সঞ্জয়ের পালিশ-করা মুখের সামনে এগিয়ে দিতে মায়া হল তার। বললেই সঞ্জয়ের মুখ ছুটবে।

বলল, কী জানি!

জানিস না?

না।

সাড়ে সাতটায় বিষণ্ণ মুখে তুলসী এল। ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই সঞ্জয় ওর পিছনে লাগল, আয় তুলসী, আমরা বউ বদল করে ফেলি। আমারটা আমার কাছে পুরনো হয়ে গেছে, তোরটা তোর কাছে। পালটে ফেলি।

তুলসী মৃদু হাসে, আমারটা পুরনো হয়নি। কোনও দিন হবেও না।

সঞ্জয় ললিতের দিকে তাকায়, শুনছিস ললিত?

তারপর গলা নামিয়ে বলে, পুরনো না হলেই বা, তোরটা তো কুচ্ছিত! আমার মতো সুন্দর বউ? একে সুন্দর, তার ওপর যা সাজগোজ করে থাকে না। বলতে বলতে হঠাৎ জিভ কাটল সঞ্জয়, যাঃ মাইরি, একদম ভুল হয়ে গেছে।

ললিত বলে, কী?

সাজগোজের কথায় মনে পড়ল, রিনি লিপস্টিক নিয়ে যেতে বলেছিল। গোলাপি স্বপ্ন না কী যেন নাম! ইয়াঃ, রোজি ড্রিম। ভুল হয়ে গেল রে! বলতে বলতে ঘড়ি দেখল সঞ্জয়, নাঃ, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে, বেরোতে বেরোতে আটটা হয়ে যাবে। দোকান খোলা পাব না।

তুলসী বলে, তুই কেটে পড় না।

আমি কেটে পড়লে খুব সুবিধে, না? পিছনে লাগার কেউ থাকবে না, তুমি ললিতের মুখোমুখি দাবা-খেলুড়ির মতো মুখ নিয়ে বসে থাকবে! তা ছাড়া, বউয়ের লিপস্টিকের অজুহাতে কেটে পড়লে তোরা আমার নিন্দে করবি না? বলবি, দেখ, ওই সঞ্জয়টা লেখাপড়া শেখেনি, চায়ের দোকানে বয়গিরি করত, আর এখন শালা বউয়ের লিপস্টিক কেনার জন্য অসুস্থ বন্ধুকে ছেড়ে চলে গেল। শালা আদেখলা, চালবাজ। বলবি না?

বললেই বা! তুই কার তোয়াক্কা করিস! তুলসী বলে।

ঠিক। আমি কারও তোয়াক্কা করি না। একমাত্র বয়স ছাড়া। সঞ্জয় বলে, বয়স! বুঝলি! এই যে লিপস্টিকের কথা ভুল হয়ে গেল, এই গেঁতো অলস আরামপ্রিয় হয়ে যাচ্ছি, চুরিটুরি করছি, টাকাপয়সা ভাল লাগছে, এ-সবের মূলে ওই বয়স। বাইরে গলির মুখে একটা সাদা গাড়ি দেখে এলি না তুলসী? ওটা আমার। হিংসে হচ্ছে না?

দূর। তুলসী ঠোঁট ওলটায়।

হলে ভাল লাগত, বুঝলি! আজকাল লোকে হিংসে করলে ভাল লাগে। আরও দেখ, এখন আর অনিশ্চয়তা নেই, ছোটাছুটি নেই, বসে বসে টাকা এসে যায়। আমার স্পিড কমে যাচ্ছে। জবুথবু হয়ে যাচ্ছি। শরীরে চর্বি ঠেকাতে পারছি না। কেবল মনে হয় বয়স হয়ে যাচ্ছে।

আর কী, এবার বুড়ি বেশ্যার মতো কপালে ফোঁটা কাটো, আর হরিনাম নাও। তুলসী বলে, ব্যাটা পাপিষ্ঠ!

সঞ্জয় হাসে, তুই বুঝবি না রে, তুই হচ্ছিস প্রলেটারিয়েট— ল্যাংটা মানুষ, বউকে একখানা গয়না দিতে তোর কোমর বেঁকে যায়। আমি তোর চেয়ে একটু বেশি দেখি।

তোর চেয়ে আমি মহৎ। তুই তো কোম্পানিকে ফাঁক করছিস।

সঞ্জয় হেসে তুলসীর পিঠে হাত বোলায়, ঠিক রে ল্যাংটাভোলা, ঠিক। তুই সুখী মহৎ, কারণ তোর অভাব তো এইটুকু, না? ঠিক, তুই মহৎ। কারণ, তুই ক'টা ভাল বাড়িতে ঢুকেছিস? ক'টা ভাল আসবাবপত্র দেখেছিস! সত্যিকারের দামি গাড়িতে চড়েছিল কোনও দিন? না, দেখেছিস তেমন সুন্দরী মেয়েছেলে? ভাল খাবার কী খেয়েছিস আজ পর্যন্ত, বাঙালি-বিয়ের নেমন্তন্ন ছাড়া?

তুলসী চিড়বিড়িয়ে ওঠে, তাতে কী?

তাতেই তুই মহৎ! কারণ, তুই বেশি দেখিসনি। আমি দেখি। শালা কত টাকা, কত খাবার, কত সুন্দরী মেয়েছেলে দুনিয়াভর, কত গাড়ি-বাড়ি,— এত ভোগ করার ক্ষমতাই নেই আমার। এই তো মাত্র পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছরের আয়ু, এতে কী হয়? কিছু না। দুনিয়া ফিনিশ করতে হলে লাখবার জন্মাতে হবে। বুঝলি রে ল্যাংটা মানুষ, কেন বয়সের কথা ভাবি!

ললিত হাসছিল। সঞ্জয় তার দিকে ফিরে বলল, তুলসীকে খ্যাপানোর জন্য বলছি বটে, কিন্তু আমার মধ্যে সত্যিই কী একটা হচ্ছে। আজ সকালে হঠাৎ রমেনের কথা মনে পড়ে গেল। সেই যে বউ পালানোর পর সব ছেড়েছুড়ে চলে গেল রমেন, আর ফিরলই না। এত কীসের দুঃখ হয়েছিল ওর? এত ভোগসুখে ছিল, দু' হাতে টাকা ওড়াত, বউয়ের জায়গায় দশটা মেয়েমানুষ পুষতে পারত, তবে সব ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হওয়ার মানে কী? আজ সারাদিন রমেনের কথা ভাবছি আর নার্ভাস লাগছে। সারা জীবন কষ্ট করে আমি সদ্য একটু সুখের মুখ দেখেছি, এখন শালা এখন যদি কোথা থেকে হঠাৎ ভুতুড়ে কোনও দুঃখ এসে কাঁধে চেপে বসে, আর অত কষ্টের তৈরি করা সবকিছু যদি হঠাৎ বিস্বাদ লাগে! যদি সব ছেড়েছুড়ে আমিও লম্বা দিই? ভাবতেই ভয় করে যে। দুপুরে তোর ফোন পেলাম, তোর অসুখের কথা জানতাম, তবু কেন ভয়ংকর চমকে উঠলাম বল তো! ফোন রেখে দেওয়ার পর দেখি হাত দুটো কাঁপছে।

তুলসী আর ললিত দু'জনেই নিবিষ্টভাবে চেয়ে ছিল তার দিকে। সঞ্জয় হঠাৎ লজ্জা পেল। তুলসীকে বলল, আজ তোর বউয়ের কাছে তোর প্রেস্টিজ খুব বেড়ে যাবে। আজ তোকে আমার গাড়িতে একটা লিফট দেব।

ললিত মাকে দেখতে পেল, ভিতরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আঁচলে হাত মুছছে। ফোকলা মুখে একটু হাসি।

মা বলল, ও সঞ্জয়, আমার ললিতকে একটা ভাল চাকরি দে। তোর হাতে এখন কত ক্ষমতা!

ললিত ধমক দেয়, আঃ মা!

মা হাসে, তাতে কী! সঞ্জয় আমার ছেলের মতো।

ঠিকই তো! বলে সঞ্জয় উঠে গিয়ে মা'র হাত ধরে নিয়ে আসে, সকলের মাঝখানে বিছানায় বসায়, বসুন মাসিমা।

মা তুলসীকে বলে, ও তুলসী! আমাকে তোর বউ দেখালি না?

ললিত হাত ছুড়ে বলে, ইস মা, তোমার যে কত ডিমান্ড!

সেদিকে খেয়াল না করে বুড়ি আবার সঞ্জয়কে বলে, তোর গাড়িতে একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবি, একদিন তারকেশ্বর। নিবি না?

বলে মা ফোকলা মুখে হাসে। দুটো ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

মা'র জন্য অস্বস্তি বোধ করে ললিত, বলে, তুমি যাও না, মা। ওদের জন্য কিছু করে দাও।

দিই। চায়ের জল চড়িয়ে এসেছি, চিঁড়ে আর পাঁপড় ভেজে দেব।

আঁচলে নাক মুছে মা উঠে দাঁড়ায়।

মা চলে গেলে আবার সহজ লাগে তাদের।

সঞ্জয় হঠাৎ ঝুঁকে ললিতের বুকে আঙুলের দুটো টোকা দিয়ে বলে, তোর মনোবল চমৎকার আছে। এইজন্য তোকে আমি হিংসে করি।

বাচ্চা ছেলের মতো লজ্জায় হাসল ললিত। এতদিন কথাটা তাকে কেউ বলেনি। সকলেই তাকে ভোলাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার দরকার ছিল না। তার মন চাইছিল কেউ এ-রকম একটা কিছু বলুক যে, সে সাহসের সঙ্গেই মুখোমুখি হচ্ছে সবকিছুর। ললিত তাই লজ্জায় হাসল।

সঞ্জয় বলে, আমি একগুঁয়ে, জেদি, কোনও কিছুর শেষ না দেখে ছাড়ি না। তবু দেখ শেষ পর্যন্ত আমি দুর্বল। একটা ঘটনার কথা বলি শোন। কিছুদিন আগে আমি একটা পাখা কিনেছিলাম। সিলিং ফ্যান। কিনে এনে নিজেই সেটাকে টেবিলের ওপর চেয়ার তুলে ফিট করলাম। তারপর রাত্রে পাখাটার ঠিক নীচে মেঝেয় মাদুর পেতে রিনিকে নিয়ে শুলাম। এভাবে তিন-চারদিন কেটে গেল, পাখার নীচে শুই, হাওয়া খাই, রিনিকে ভালবাসার কথা বলি; তারপর একদিন অফিসের শেষে এক পার্টির সঙ্গে রেস্তরাঁয় গেছি। বিজনেসের নানা রকম কথা হচ্ছে, তারই এক ফাঁকে আমি সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকালাম। একই কোম্পানির পাখা। চোখটা একটু আটকে গেল। তারপর কথা বলি আর বারবার পাখাটার দিকে চেয়ে দেখি। যতবার তাকাই ততবারই একটা অস্বস্তি হতে থাকে। ওইভাবে বারবার দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার চোখ আটকে গেল একটা ছোট স্ক্রু-র ওপর। পাখাটা যে-রড়টায় ঝোলানো থাকে, সেই রড আর পাখার জয়েন্টে একটা ছোট্ট স্ক্রু লাগানো। স্ক্রুটা দেখতে দেখতে আমি বিজনেসের কথা বলছি, আর মনে মনে বুঝতে চেষ্টা করছি ওই স্ক্রুটা আমি দেখছি কেন! পাখাটা যাতে রডের প্যাঁচ কেটে পড়ে না যায় তার জন্যই ওই স্ক্রুটা লাগানো, এ তো আমি জানি! তবে দেখছি কেন! ঠিক এই সময়ে আমি একটা শব্দ শুনলাম। হয়তো রাস্তায় গাড়ির ব্রেক কষার শব্দ, কিংবা পেয়ালা পিরিচের ভেঙে যাওয়ার শব্দ, কীসের শব্দ তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু ওই শব্দটাই আমার মাথার মধ্যেকার ধোঁয়া কাটিয়ে দিল। হঠাৎ মনে পড়ল আমার পাখাটার ওই স্ক্রু লাগানো হয়নি! সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফিয়ে উঠলাম, দৌড়ে বেরোলাম দোকান থেকে। রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম, ভিড়। আমি পাগলের মতো রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সি থামালাম। সে-ট্যাক্সিতে সোয়ারি ছিল, আমি তার প্রায় পায়ের ওপর পড়ে বললাম, বড় বিপদ, আমাকে বালিগঞ্জে পৌঁছে দিন। প্লিজ। ট্যাক্সিতে বসে আমি উন্মাদের মতো অস্থির ছিলাম। সারা দুপুর-বিকেল ঠিক পাখাটার তলায় মাদুর পেতে রিনি ঘুমোয়, ওর বুকের কাছে থাকে পিকলু। চার-পাঁচ দিন ঘুরেছে পাখাটা, ওই স্ক্রু ছাড়া। আলগা প্যাঁচের ওপর রডের সঙ্গে লাগানো! ভাবাই যায় না— ওইভাবে ওই পাখা আমিই লাগিয়েছি। আমি— যে-আমি ছিলাম মেকানিক, কতজনের বাসায় পাখা ফিট করে দিয়ে এসেছি! পাখা লাগানোর সব কিছুই আমি জানি। এ আমার অধীত বিদ্যা। তবু ভুল! ছোট্ট একটা

মারাত্মক স্ক্রু আমি লক্ষই করলাম না! কে জানে বাসায় গিয়ে দেখব, ভাঙাচোরা রিনি আর থ্যাঁতলানো পিকলুর ওপর জগদ্দল পাখাটা মুখ থুবড়ে আছে। ট্যাক্সির লোকটা জিজ্ঞেস করল, আপনার কী বিপদ? আমি কেবল বললাম, একটা স্ক্রু, একটা স্ক্রু! লোকটা না বুঝে ভয় পেয়ে চুপ করে গেল। বাসার সামনে নেমে আমি এক দৌড়ে ভিতরে গিয়ে দেখলাম— সঞ্জয় হাসে, কী দেখলাম বল তো?

তুলসী রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করে, কী?

পাখাটা চলছে, আর তাতে স্ক্রু লাগানো আছে ঠিকমতোই। ভুল হয়নি।

তুলসী হাসল, ট্রাজি-কমেডি!

কিন্তু মাইরি, তারপর থেকেই আমি বুঝে গেছি যে, নিজেকে আর বিশ্বাস করা যায় না। শালা, কোথায় নাট-বল্টুর ভুল করে রেখে দিয়েছি কে জানে! একদিন নিজের ফিট করা সংসার-টংসার হুড়মুড় করে নেমে যাবে। আর নয়তো ফুর্তি করতে করতে হঠাৎ বেমক্কা লাফিয়ে উঠে একটা স্ক্রু একটা স্ক্রু বলে ছুট লাগাব। নিজের ওপর আর কিছুতেই নির্ভর করা যাবে না! মাইরি, ললিত, তোর চেয়ে আমি অনেক দুর্বল। কেবলই মনে হয়, কোথায় কোন গোলমাল করে রেখেছি, সব ভেঙেচুরে যাবে।

ললিত হাসে।

সঞ্জয় বলে, আমার মনে হয় রমেনটারও এ-রকমই একটা কিছু হয়েছিল। ছোট্ট একটা ভুল ছিল কোথাও, হঠাৎ ধরতে পেরেছিল রমেন। নইলে ওর হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে যাওয়ার মানে কী? অ্যাঁ! দু'জনে একসঙ্গে কত বদমাইশি করেছি বল তো! ট্রাফিক পুলিশের মাথা থেকে টুপি তুলে নিয়ে ছুট লাগিয়েছি, দোকানে খেয়ে পয়সা দিইনি, বদলে আফ্রিকান নাচ দেখিয়ে ছাড়া পেয়েছি, সিনেমা হল-এ মারপিট করে নতুন বইয়ের প্রথম শো দেখেছি— কী স্পিড ছিল রমেনের! তবু ওর হল কী? আজ সারাদিন আমার রমেনটার কথা মনে পড়ছে।

রমেন! ললিত তার ডান দিকে তাকটার দিকে তাকাল। ওখানে অনেক ধুলো-পড়া পুরনো কাগজপত্র। ওর মধ্যে খুঁজলে রমেনের কয়েকটা চিঠি পাওয়া যাবে। আর, ঠিকানা। বড় সুন্দর ছেলে ছিল রমেন, ময়মনসিংহের সেই জমিদারের ছেলেটা। কখনও-সখনও নাম সই করত, রায় রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

ললিত বলল, আমার কাছে রমেনের ঠিকানা আছে। নিবি?

না। মাথা নাড়ল সঞ্জয়, থাকগে। যে যার মনে থাকুক। বলে খুব চালাক-হাসি হাসল সঞ্জয়, বললে, ও শালা আমার কাছে হাজার দুয়েক টাকা পায়! সেটা আমার ব্যবসায় ডুবেছে।

তুলসী বলে, পাপিষ্ঠ।

সাড়ে আটটা নাগাদ সঞ্জয় আর তুলসী উঠল। দরজা থেকে তুলসী হঠাৎ বলল, আজ আদিত্যকে দেখলাম।

সঞ্জয় বলে, কোথায়!

গড়িয়াহাটায়। ডবল ডেকারের দোতলা থেকে দেখলাম আদিত্য চিনেবাদাম খেতে খেতে দক্ষিণমুখো চলেছে। সঙ্গে একটা কালোমতো মোটাসোটা মেয়েছেলে।

শুনে সঞ্জয় চেঁচিয়ে হাসল। আর, ললিত চমকে উঠল।

ললিতের মনটা খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ। অমন সুন্দর, শ্যামলা মেয়েটি— শাশ্বতী আদিত্যর ও-পাশ থেকে ঝুঁকে বার বার ব্যাকুল হয়ে বলছিল, আমার পিসেমশাই এই রোগ থেকে সেরে উঠেছেন। দেখবেন, আপনারও

সেরে যাবে। তুলসীটার রুচি নেই, চোখও না। কালোমতে, মোটাসোটা মেয়েছেলে! কেমন বিশ্রীভাবে বলল! তুলসী ওকে ঠিকমতো দেখেইনি।

গলির মুখে দাঁড়িয়ে ললিত অন্যমনস্কভাবে শুনল, সঞ্জয় তুলসীকে বলছে, শালা গাঁইয়া, এখনও গাড়ির দরজা ঠিকমতো বন্ধ করতে শিখিসনি!

গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে ওরা দু'জন ঝুঁকে একসঙ্গে সিগারেট ধরিয়ে নেয়। পিছন থেকে মা চেঁচিয়ে বলে, বউকে নিয়ে একদিন আসিস সঞ্জয়। তোর ছেলেটাকে দেখিনি। আর, আমাকে নিয়ে যাস তোর গাড়িতে। তুলসী, তোর বউ আনিস।

আসব... আসব... ওরা চেঁচিয়ে বলে, চলি রে, ললিত।

ললিত মাথা নাড়ে।

পিছন ফিরে গলির অন্ধকারের মুখোমুখি হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ললিত। মেয়েটি, ওই শ্যামলা সুন্দর শাশ্বতী, আজ রাতে হয়তো তার কথাই ভাবছে।

হঠাৎ তীব্র একটা আনন্দ বোধ করে ললিত। পরমুহূর্তেই মনে হয়, এটা গর্হিত আনন্দ।

নয়

বাবার যে পুরনো ছবিটা দেয়ালে টাঙানো আছে তার পিছন থেকে দেয়াল বেয়ে পেট-মোটা একটা টিকটিকি ললিতের মুখোমুখি নেমে এল। গত কয়েক দিন ধরেই ললিত লক্ষ করেছে, মাঝে মাঝে টিকটিকিটা দেয়াল থেকে ধুপধাপ টেবিলের ওপর, মেঝের ওপর পড়ে যায়, আবার দেয়াল বেয়ে ওঠে, বাবার ছবিটার আড়ালে চলে যায়। সেই পুরনো টিকটির্কিটাই কি, যেটা মায়ের সব কথায় সায় দিয়ে বরাবর ডেকে উঠত, টিকটিক টিকটিক? সে-কথাগুলো প্রায় সময়েই ছিল তার বিয়ে করার ঘর-সংসার করার কথা, কিংবা বাড়ি তৈরির জন্য তাগাদা। বরাবর টিকটিকিটা সায় দিয়ে গেছে। ও পরিষ্কার মায়ের দলে। মা কথা শেষ করে টিকটিকির ডাক শুনে মেঝেয় টোকা দিয়ে বলেছে, ওই শোন, তিন সত্যি। ললিত উত্তর দিতে গিয়ে কান পেতে থেকেছে, টিকটিকিটা ডাকেনি। সেই পুরনো টিকটিকিটাই কি না তা লক্ষ করার জন্য টেবিল ল্যাম্পের আলোটা ঘুরিয়ে ওর গায়ে ফেলে ললিত। লক্ষ করে টিকটিকিটার পেট বেঢপ মোটা। প্রায় কাচের মতো স্বচ্ছ সেই পেটের মধ্যে কালচে মতো কী যেন দেখা যাচ্ছে। আরও একটু কাছে চোখ নিয়ে সে দেখল পিছনের পায়ের কাছাকাছি পেটের মধ্যে দু' ধারে নিখুঁত গোল দুটি ডিম। এত স্পষ্ট যে, ললিত চমকে ওঠে। ডিম দুটো ঢাকা দেওয়ার কোনও বন্দোবস্ত নেই ওর শরীরে। খুব অল্প যন্ত্রপাতি দিয়েই ওর শরীর তৈরি হয়েছে, ওইটুকু স্বচ্ছ শরীরের মধ্যেই ওর বুদ্ধি, হজমশক্তি, ভয় এবং সন্তান। বরাবরই ও ললিতের বিপক্ষে ছিল, মায়ের দলে। ললিত এখন দেখল, ও মাথা তুলে কালো জ্বলজ্বলে দু'খানা পুঁতির মতো চোখ দিয়ে তাকে দেখছে। বুঝি বা ললিতকে জানাচ্ছে গর্ভধারণের কষ্ট। কেন যে এটা বরাবর মায়ের সঙ্গে তার বিপক্ষে জোট বেঁধেছে তা এখন ললিত বুঝতে পেরে হাসে। ছাদ পর্যন্ত মসৃণ সাদা দেয়ালটার কোথায় ও ডিম পাড়বে! নিখুঁত গোল দু'টি ডিমকে গড়িয়ে পড়া থেকে কী করে বাঁচাবে ও? চিন্তিতভাবে টিকটিকিটার চোখে চোখ রেখে ভাবছিল ললিত। আপন মনে বলল, তোমার বেশ বিপদ, বুঝলে টিকটিকি-মা! তারপর সে ভেবে দেখল কখনও টিকটিকির ডিম মেঝেয় পড়ে ভাঙতে দেখেনি সে। ওরা ঠিক কোথাও-না-কোথাও এক আধটা খাঁজ খুঁজে পায়। প্রত্যেকের জন্যই এক-একটা বন্দোবস্ত আছে পৃথিবীতে। বাবার ছবিটার দিকে চেয়ে সে একটু হাসল। ছবিটার পিছনেই বোধ হয় টিকটিকিটার বাসা। ছবিতে মোক্তারের পোশাক পরা লোকটা এককালে পুববাংলায় দাপটে ফুটবল খেলোয়াড় ছিল। ঢোলা প্যান্ট পরে খালি পায়ে সাহেবদের বুট-পরা পায়ের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে। সাহেব-রেফারিরা যে-সব গোল নাকচ করেছিল সেগুলো ধরলে সে-আমলে শ' দেড়েক গোল দিয়েছিল লোকটা। প্রতিটি গোলেরই আলাদা আলাদা গল্প ছিল। রোমাঞ্চকর সে-সব গল্প। উইয়ে খাওয়া একটা ফটোগ্রাফ ছবির ফ্রেম থেকে খুলে মা সযত্নে ট্রাঙ্কে রেখে দিয়েছে। ছবিটায় আছে প্রকাণ্ড একটা শিল্ডকে ঘিরে একটা পুরনো আমলের ফুটবল টিম। শিল্ডটার বাঁ বারে মাটিতে বসে বাবা— সামনে দু'খানা পা পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি করে রাখ, নাকের নীচে মোটা গোঁফ, মাথার মাঝখানে সিঁথি, মোটাসোটা নাদুসনুদুস শরীর, গায়ে জার্সি না থাকলে খেলোয়াড় বলে মনেই হত না। লোকটার বরাবর গর্ব ছিল, আমরা 'হায়ারে' খেলতাম। মাকে ছেলেবেলায় বলতে শুনেছে ললিত বে, ফুটবলের ডিমে তা দিয়েই লোকটা অর্ধেক জীবন কাটিয়ে দিল। দেশ

স্বাধীন হওয়ার উৎসবের সময়ে গ্রামে নবীনদের সঙ্গে প্রবীণদের একটা খেলা হয়েছিল। সেই শেষবার প্রবীণদের দলে বাবাকে খেলতে দেখেছিল ললিত। অফসাইডের জন্য বাবার দেওয়া একটা গোল নাকচ হল। ললিত কাঁদো-কাঁদো হয়েছিল ক্ষোভে, আক্রোশে। সান্ত্বনার মধ্যে রেফারিটা ছিল চশমা চোখে। সেই বিকেলেই হল 'কেদার রায়' নাটকের অভিনয়। শেষ দৃশ্য: কার্ভালো বুকে পিস্তল দেগে আ...আ...গু-উ-ড বাই বে-ন্-গো-ও-ল' বলে ঢলে পড়ছে। চোখের জল শার্টের ঝুলে মুছে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিল ললিত, চেঁচিয়ে সবাইকে ডেক বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, ওই লোকটা, ওই কার্ভালো তার বাবা! তার বাবা! পিছনের দুটো লোক চেঁচিয়ে বলেছিল, বসে পড়ো খোকা, তোমার বাবা সত্যিই মরে নাই।

মোক্তারের পোশাক পরা লোকটার ছবির দিকে চেয়ে একটু হাসল ললিত, মনে মনে বলে, টিকটিকির ডিমে তা দিচ্ছো, বাবা? তারপর গম্ভীর হয়ে আবার হাসল, দাও। হায়ারেই খেলছ কিন্তু এখনও!

টেবিলের ওপর ছড়ানো কাগজপত্র, পুরনো চিঠি। সেগুলো ধুলো-টুলো ঝেড়ে দেখছিল ললিত। তাকে চিঠি লেখার লোক কম। তাই চিঠি বেশি জমেনি। কিছু চিঠি হারিয়ে গেছে, কিছু বা উনুন ধরানোর কাজে লাগিয়েছে মা। তবু এর মধ্যেই রমেনের কয়েকখানা চিঠি পাওয়া গেল। অনেক দিন আগে লেখা। রমেনের সঙ্গে চিঠি চালাচালি বন্ধ হয়ে গেছে বহুদিন। তার কথা ভুলেই গিয়েছিল ললিত। সঞ্জয় আজ না বললে মনেই পড়ত না, মনে পড়ে ভাল হয়েছে। তিন-চার শ' টাকা দেনা আছে রমেনের কাছে। সেটা শোধ দেওয়া দরকার। টাকাটার কথা হয়তো রমেনের মনেও নেই। কত লোকের কাছে রমেনের কত টাকা পড়ে আছে। জড়ো করলে কয়েক হাজার হবে। তার হিসেব রমেন রাখত না। রমেনের কাছ থেকে যারা টাকা নিয়েছে, তারা কোনও দিনই বোধ হয় সেটা শোধ দেওয়ার কথা ভাবেনি, রমেন নিজেই ভাবতে দেয়নি। তারপর এখন রমেন বোধ হয় সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসিই কিছু হয়ে গেছে, বিহারের ছোট শহরে এক আশ্রমে বাস করছে। সেই আশ্রমের ব্যাপার-স্যাপার ললিত জানে না। তবে মনে হয় তারা এতদিনে রমেনকে গেরুয়া-টেরুয়া পরিয়ে, মাথা কামিয়ে একটা আধ্যাত্মিক চেহারা দিয়েছে। সে হয়তো এখন আর টাকা-ফাকা ছোঁয় না, যে-কোনও মেয়েছেলেকে মা বলে ডাকে, কীর্তন-টীর্তন করে। এখন আর তার টাকা শোধ দেওয়ার মানেই হয় না। তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে চায় ললিত। রমেনের কথা মনে না পড়লে টাকাটার কথাও মনে পড়ত না, কিন্তু দৈবক্রমে যখন মনে পড়েই গেছে তখন শোধ করে দেওয়াটাই ঠিক হবে। কোনও দিন যদি রমেনের স্বার্থবুদ্ধি ফিরে আসে, তখন যেন ললিতের প্রতি তার কোনও আক্রোশ না থাকে। মরার পরও যদি ললিত কিছুদিন তার চেনা লোকজন, আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবের স্মৃতিতে থেকে যায় তবে সে-থাকাটা যেন ঋণমুক্ত, হিংসা-দ্বেষহীন এবং ভারশূন্য হয়।

রমেনের ঠিকানাটা পাওয়া গেল সহজেই। সোজা ঠিকানা। শুধু নাম, আর পোস্ট-অফিস। এতেই চিঠি চলে যায়। চিঠির কাগজে কেবল 'ভাই রমেন' এটি পাঠটুকু লিখে ললিত এর পরে কী লিখবে তা ভাবছিল, এমন সময়ে শম্ভু এসে ডাকল, ললিতদা।

কী রে!

একটু বাইরে আসুন।

একটু দরকার আছে।

ললিত বাইরে এসে দেখল গলির মুখে পাড়ার কয়েকজন ছেলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় কথা বলছে। তাকে দেখে সিগারেট লুকোল। শম্ভু গলির মধ্যে তাকে এনে বলল, আপনি বিমান রক্ষিত নামে কাউকে

চিনতেন?

ললিত একটু ভেবে বলল, কেমন চেহারা বল তো! কোথায় থাকে?

শম্ভু বলল, এ-পাড়ারই লোক। নতুন এসেছে। ফরসা রোগা চেহারা, দেখলে মনে হয় অসুখবিসুখ আছে, ভাসা-ভাসা চোখ...

ললিতের মনে পড়ল না। বলল, উঁহু। দেখলে হয়তো চিনব। কিন্তু কী ব্যাপার?

শম্ভু তার দলের একটা ছেলেকে ডাকল। সুবল। সুবল এগিয়ে এসে বলল, লোকটা এ-পাড়ায় নতুন। পশ্চিমের বস্তিবাড়ির কাছেই একটা খোলার ঘরে থাকে। কয়েক দিন আগে রাত্রিবেলা কিছু লোক এসে লোকটাকে খুব মেরে-ধরে গেছে। আমরা কিছু জানতাম না। পরদিন সকালে খবর পেয়ে আমরাই ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়েছি। কিন্তু মার খাওয়ার পর থেকেই লোকটা কেমন পাগল-পাগল হয়ে গেছে। একা একা কান্নাকাটি করে। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। গতকাল থেকে সে আপনার নাম বলছে। বলছে যে, আপনার সঙ্গে নাকি কলেজে এক ক্লাসে পড়ত। আমরা ভদ্রলোকের মার-খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজখবর করছি, কিন্তু কিছুই বের করা যাচ্ছে না। পুলিশেও খবর দেবে না, হাসপাতালেও যাবে না। লোকটা রোগা, কিন্তু ভীষণ গোঁয়ার। আমরা খুব চাপাচাপি করায় গতকাল হঠাৎ বলল, ঠিক আছে, এ-পাড়ায় ললিত ভট্টাচার্য থাকে, সে আমার কলেজের ক্লাস-মেট, তাকে ডেকে দিন, তার কাছে বলব। আপনার অসুখ বলে আপনাকে আমরা প্রথমে খবর দিইনি, কিন্তু এখন দেখছি আপনাকে না হলে ব্যাপারটা কিছুই জানা যাবে না।

শম্ভুর দলবলের অধিকাংশ ছেলেই বেকার। তাদের সময় কাটতে চায় না। পাড়ায় কোনও ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট হলে খুশি হয়, সেইটে নিয়ে কিছু দিন মেতে থাকে। অচেনা একটা লোক রহস্যময় কারণে বেপাড়ার কিছু লোকের হাতে মার খেয়েছে, এর গুপ্ত রহস্য ভেদ না করলে শান্তি নেই।

কিন্তু ললিত কিছুতেই মনে করতে পারল না। যে-কলেজে সে পড়ত সেটা কলকাতার একটা বড় কলেজ। আসলে সেটা ছিল গোয়ালঘর। এক ঘরে আড়াই শ’ ছেলে গাদাগাদি করে বসে তারা জেনারেল ক্লাস করত। প্রায় সবসময়েই রোল কলের পর পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের করিডোরে সিগারেট ফুঁকত, কিংবা চায়ের দোকানে আড্ডা জমাত। সেই আড়াই শ’ ছেলের মধ্যে কে যে রোগা ফরসা চেহারার ভাসা-ভাসা চোখের বিমান রক্ষিত তা কে বলবে! সে, রমেন আর আদিত্য পড়ত এক ক্লাসে, তুলসী পড়ত এক ইয়ার নীচে। এরা ছাড়া আর যারা ক্লাসের বন্ধু ছিল তাদের মধ্যে কাউকেই বিমান রক্ষিত বলে মনে হল না তার। সে মাথা নাড়ল, না রে সুবল, মনে পড়ছে না। চল, একবার দেখেই আসি ছেলেটাকে।

ঘরে গিয়ে জামা নিয়ে বেরিয়ে এল ললিত। চেঁচিয়ে মাকে সদর বন্ধ করতে বলল, তারপর আর মায়ের উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করল না।

পশ্চিমের বস্তি খুব দূরে নয়। মিনিট তিনেক যেতে হয়। পাড়ার রাস্তা থেকে একটা শ্যাওলা-পড়া কাঁচা মেটে রাস্তা গিয়ে বস্তিতে শেষ হয়েছে। বস্তি থেকে একটু আলগা ঘরখানা। ওপরে খোলার চাল, কিন্তু দেয়াল আর মেঝে পাকা। ঘরে ইলেকট্রিক বাতিও রয়েছে। সুবল বলল, এই ঘর। ভদ্রলোক বাইরের ঘরে থাকেন, ভিতর দিকটা বাড়িওলার।

সুবল এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের লোকজন উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করল। খালি গায়ে লুঙ্গিপরা একটা লোক এসে তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। লোকটা বিমান রক্ষিতের বাড়িওয়ালা।

রাস্তার আলোয় তার মুখে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা দেখতে পেল ললিত। লোকটা তাকে চেনে। এ-পাড়ায় এখনও ললিতের খানিকটা দাপট আছে। লোকটা তাকে দেখে নমস্কার করল; বলল, একটা কিছু সমাধান করে যান দাদা। শুনেছি আপনার বন্ধু, ঘরখানা ছেড়ে দিতে বলেন। বড় অশান্তি হচ্ছে।

দরজায় অনেকক্ষণ ধাক্কা দেওয়ার পর দরজা খুলল। দরজায় দাঁড়িয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা একটা লোক। রাস্তার ম্লান আলোতেও হঠাৎ লোকটার দুটো চোখ ধকধক করে জ্বলে উঠল। লোকটা বলল, কী ব্যাপার?

অসম্ভব সুন্দর ভরাট গলা লোকটার। একবার শুনলেই মন আকৃষ্ট হয়। পরনে পায়জামা, ওপর-গায়ে একটা তোয়ালে জড়ানো।

সুবল বলল, ললিতদাকে নিয়ে এসেছি।

শুনে লোকটা তাদের কয়েকজনের দিকে একটু অনির্দিষ্টভাবে চেয়ে থেকে বলল, আসুন।

ঘরে পঁচিশ কি চল্লিশ পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে। সেই অস্পষ্ট আলোয় ঘরের ভিতরটা দেখল ললিত, চারদিকে কেবল বই আর বই। নোংরা বিছানা, ময়লা মশারি নিচু করে টাঙানো, ঘরের এধার-ওধার জুড়ে টাঙানো দড়িতে রাজ্যের জামাকাপড়। বিমান রক্ষিত যে জামা-কাপড় ধোপাবাড়ি দেয় না তা একনজরেই বোঝা যায়। দড়ি থেকে গামছা ঝুলছে, পায়জামা শুকোচ্ছে। এক উদাসীনতা ছাড়া ঘরটার আর কোনও চরিত্র নেই। এই হতদরিদ্র ঘরে চকচকে নতুন দামি মলাটের ইংরিজি বইগুলি খুবই বেমানান লাগছিল।

দরজা খুলে দিয়েই লোকটা আবার বিছানায় গিয়ে বালিশে পিঠ দিয়ে আধশোয়া হয়েছে। তাকে দেখে বলল, এসো ললিত, বিছানায় বোসো।

কাছ থেকে ললিত মুখখানা দেখল। ব্যান্ডেজের তলায় কপাল ঢাকা পড়েছে, নাকটা ফুলে লাল হয়ে আছে, বাঁ চোখ থেকে ডান দিকের থুতনি অবধি একটা প্রকাণ্ড কালশিরার দাগ, ঠোঁট ফাটা, তাতে রক্ত জমে আছে। গা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা, তাই সেখানকার ক্ষতগুলো দেখা গেল না। স্বাভাবিক মুখখানা হয়তো বা চিনতে পারত ললিত। কিন্তু এখন এই ফোলা-কাটা-ফাটা মুখখানা কিছুতেই চেনা গেল না। তার দিকে অপ্রতিভ তাকিয়ে লোকটা একটু হাসবার চেষ্টা করল, সঙ্গে সঙ্গে ফাটা ঠোঁট দিয়ে রক্ত ফুটে বেরোল। 'আপনি' না 'তুমি' কী বলবে ঠিক করতে না পেরে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল ললিত। হঠাৎ খেয়াল হল লোকটা একটু আগেই তাকে 'তুমি' বলেছে। সে বলল, কথা বোলো না, তোমার ঠোঁট দিয়ে রক্ত পড়ছে।

তোয়ালে দিয়ে ঠোঁটটা একটু চেপে ধরে লোকটা সেই ভরাট সুন্দর গলায় বলল, আমি তোমাকে চিনি। তোমার বোধহয় আমাকে মনে পড়ছে না!

ললিত একটু হাসল।

শম্ভুরা ঘরের মধ্যে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, জানালা দরজা দিয়ে উঁকি মারছে কৌতূহলী লোক। লোকটা এই ভিড়ের দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভ মুখে চুপ করে রইল। চোখে-মুখে খানিকটা ঘাবড়ে যাওয়া ভাব।

ললিত শম্ভুর দিকে তাকিয়ে বলল, তোরা এখন যা, আমি একটু কথা বলি।

শম্ভু মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিছনে গেল ওর দলবল। ললিত উঠে দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখল ওরা দরজার বাইরে জটলা করছে। সুবল গলা বাড়িয়ে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, চিনতে পারছেন তো? না কি শালা চারশ' বিশ!

ললিত বলল, চিনেছি। তোরা চলে যা। কাল সকালে দেখা করিস।

দরজা বন্ধ করল ললিত, জানালা ভেজিয়ে দিল। তারপর সিগারেটের প্যাকেট মাঝখানে রেখে লোকটার মুখোমুখি বিছানায় বসল।

বোঝা যায় ভাসা-ভাসা দুটো চোখের তলায় অনেক কথা জমা হয়ে আছে। লোকটা ভ্রূ জড়ো করে তার দিকে একটু তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে বলল, তুমি সত্যিই আমাকে চিনতে পারছ?

ললিত একটু দ্বিধা করে বলল, ঠিক মনে পড়ছে না।

লোকটা চোখ খুলল, আমাকে খুব কম ছেলেই চিনত। আমি কারও সঙ্গেই মিশতে পারতাম না।

বলে একটু থেমে বলল, কলেজ-জীবনে তুমি ছিলে আমার হিরো। তোমাকে আমার খুব মনে আছে। তুমি ছাত্র ইউনিয়ন করতে। চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারতে, অনেক ভোটে জিতে তুমি হয়েছিলে কলেজ-ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি। সব ঠিক বলছি তো?

ললিত মাথা নাড়ল, ঠিক।

লোকটা আবার বলল, তুমি ছিলে ছাত্রমহলে ভীষণ পপুলার। যে-কেউ মুশকিলে পড়লে তোমার কাছে ছুটে যেত। তুমি কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেক লড়াই জিতেছিলে। প্রায়ই দেখতাম ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে তোমাকে ঘিরে জটলা হচ্ছে। ছেলেরা তোমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কখনও করিডরে, কখনও কলেজের সামনে রাস্তায়, কখনও চায়ের দোকানে। তুমি কড়া মেজাজের প্রিন্সিপালের ঘরে অনায়াসে ঢুকে যেতে পারতে, ভাইস-প্রিন্সিপালকে মেজাজ দেখিয়ে আসতে পারতে, প্রফেসররা তোমাকে ভয় পেত। তুমি ছাত্রদের অনেক ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করেছ। ঠিক বলছি না?

ললিত মাথা নাড়ে, ঠিক।

আমার খুব হিংসে হত ভাই! বলে লোকটা আবার হাসল। তার ফাটা ঠোঁট দিয়ে রক্তবিন্দু ক্রমান্বয়ে গড়িয়ে আসছে, আর সে তোয়ালে দিয়ে চেপে চেপে মুছে কথা বলছে, আমি ভেবেই পেতাম না ছেলেরা তোমার সঙ্গে এত কী কথা বলে! তাদের সঙ্গে তোমারই বা কী এত কথা থাকতে পারে! কথার অভাবে আমার কোনওকালে তেমন বন্ধু জোটেনি। দু'-চারটে কথার পরই আমার কথা ফুরিয়ে যায়, বলার মতো কিছুই আমি আর খুঁজে পাই না, অসহায়ভাবে আমি চুপ করে থাকি। ছেলেবেলা থেকেই এইরকম আমার কপাল। যতবার বন্ধু পাতাতে গেছি ততবারই টের পেয়েছি আমার বলার মতো তেমন কিছু নেই। অথচ চিরকাল দেখেছি আমার সমবয়সি বন্ধুরা ক্লাসের পিছনের বেঞ্চে বসে নিচু স্বরে কথা বলছে, খেলতে খেলতে কথা বলছে, খেলার শেষে কথা বলছে, স্কুলে যেতে যেতে, স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে দল বেঁধে, জোট বেঁধে কথা বলছে। আমার ইচ্ছে হত আড়াল থেকে আড়ি পেতে ওদের কথাগুলো মুখস্থ করে রাখি, তারপর সেই কথাগুলোই আমার কথা করে তুলি। কিন্তু শুনতে গিয়ে দেখেছি সেই কথাগুলো একেবারেই তুচ্ছ সামান্য সব কথা, যার তেমন কোনও মানে নেই। তবু সবাই ওইরকম আজেবাজে কথা দিয়েই পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখছে। আমি ও-রকম আজেবাজে কথা বলার চেষ্টাও করে দেখেছি, আমার হয় না। বন্ধুরা বরাবর আমাকে এড়িয়ে গেছে। তাই ক্রমে ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার কথাবার্তা খুব কমে যেতে লাগল। নিজের কথার অভাব সম্বন্ধে আমি এত সচেতন হয়ে উঠছিলাম যে, মানুষের সঙ্গে আমার যোগাযোগ খুব কমে যেতে লাগল। সকলের মধ্যেই ঘুরি ফিরি, কিন্তু কারও সঙ্গেই সাহস করে কথা বলি না। এটা আমার এমন একটা রোগের মতো হয়ে দাঁড়াল যে, আমার উপস্থিত-বুদ্ধি পর্যন্ত কমে যাচ্ছিল। রাস্তার অচেনা লোক কোনও ঠিকানা বা

রাস্তার খোঁজ করলে আমি খুব ঘাবড়ে যেতাম, ঘড়িতে ক'টা বাজে জিজ্ঞেস করলে দিশেহারা হয়ে নিজে হাতঘড়ির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকেও সঠিক সময়টা বুঝতে পারতাম না। প্রায়ই আমি লোককে ভুল ঠিকানা কিংবা ভুল সময় বলে দিয়েছি। আমাদের বাড়িতে কোনও আত্মীয়-স্বজন এলে, কিংবা কেউ বেড়াতে এলে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম। আমি অন্য কারও বাড়িতে পারতপক্ষে যেতাম না। ট্রামে-বাসে কেউ আমার পা মাড়িয়ে দিলে আমি বলতে পারতাম না, পা-টা সরিয়ে নিন মশাই, দোকানদার ভুল পয়সা ফেরত দিলে বলতে পারতাম না যে, পয়সা ভুল হয়েছে, ওজনে কম দিলে বলতে পারতাম না, তোমার দাঁড়িপাল্লার ফেরটা একটু দেখি হে! এক বার বাসে আমার চোখের সামনে দেখলাম, একটা ছোকরা পকেটমার এক বুড়ো লোকের পকেট থেকে ব্যাগ তুলে নিল। আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। এক বার ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে গ্যালারির ওপর থেকে আমি সিগারেটের জ্বলন্ত শেষ অংশটুকু ফেলে দিয়ে লক্ষ করলাম সেটা গ্যালারির কাঠের ফাঁক দিয়ে নীচে পড়ল। সেখানে একটা লোক উবু হয়ে বসে পেচ্ছাব করছিল, তার ঘাড়ের শার্টের কলারে গিয়ে আটকে গেল টুকরোটা! লোকটা টের পায়নি, ওদিকে তার শার্টের পিছন দিকটা ধরে গিয়ে ধোঁয়া উঠছিল। আমি একদৃষ্টে সভয়ে সে-দৃশ্যটা দেখলাম, কিন্তু লোকটাকে ডেকে ব্যাপারটা বলতেই পারলাম না।

আবার ঠোঁটে তোয়ালে চাপা দিল লোকটা। বলল, তুমি এটা ঠিক বুঝবে না। কারণ, তোমার কখনও কথার অভাব হয়নি। তুমি বরাবর অনায়াসে কথা বলেছ। শুনে তোমার একটু অদ্ভুত লাগছে না?

হাসল ললিত। বলল, বলো, থেমো না।

তোমার একটা সিগারেট খাই। বলে লোকটা সিগারেট ধরাল। খুব কষ্টে ফাটা ঠোঁটে সিগারেট আটকে অল্পস্বল্প টান দিল। তারপর বলল, স্কুলে বা কলেজে যে-সব ছাত্র জনপ্রিয় ছিল, তাদের সবাই ছিল আমার হিরো। তুমিও ছিলে। তোমাকে খুব লক্ষ করতাম আমি। ছিপছিপে ফরসা শরীর, চোখা নাক, চাপা গাল, তুমি চুপ করে থাকলেও তোমার ধারালো মুখখানা কিন্তু নীরবে কথা বলত। তুমি কখনও কাউকে অগ্রাহ্য করতে না, এবং নিজের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে তুমি সচেতন ছিলে। আমার ধারণা হত যে, একদিন তুমি দেশের নেতা-টেতা গোছের কিছু হয়ে উঠবে। কলেজের ফাংশনে একবার তোমাকে দেখেছিলাম কলকাতার মেয়রের সঙ্গে কথা বলতে, আর-এক বার দেখেছিলাম এক সুন্দরী বিখ্যাত গায়িকার সঙ্গে। আমার বিশ্বাস ছিল তোমার ক্ষমতা এত বেশি যে, তুমি হয়তো একদিন ওই বিখ্যাত গায়িকাকে বিয়ে পর্যন্ত করতে পারবে। তোমাকে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ বড় চমৎকার মানিয়েছিল। তোমাকে আমি হিংসে করতাম, কিন্তু মনে মনে সবসময় চাইতাম তুমি যেন অপরাজেয় হয়ে থাকো, সামনের ইউনিয়ন ইলেকশনে কেউ যেন তোমাকে হারাতে না পারে, কলেজ কর্তৃপক্ষ যেন কখনও তোমাকে উপেক্ষা না করে, তোমার সম্ভাব্য বিয়ের প্রস্তাব যেন কখনও প্রত্যাখ্যান না করে সেই বিখ্যাত সুন্দরী গায়িকা। দেখো, তোমাকে আমি কতটা মনে রেখেছি।

হাসল লোকটা, রক্তের ফোঁটা ফুটে উঠল ঠোঁটে, তোয়ালে চাপা দিয়ে বলল, কিন্তু আসলে আমার দুর্বলতা থেকে তোমাকে আমি যতটা বড় মনে করতাম তুমি হয়তো ঠিক ততটা বড় নও। তুমি যা, তার চেয়ে তোমাকে আমি বহু গুণ বাড়িয়ে দেখেছিলাম। না?

ললিত মৃদু হেসে মাথা নাড়ল, ঠিক।

আমি যে সত্যিই তোমার সঙ্গে পড়তাম তার আরও একটা প্রমাণ দিই। সে সময়ে তুমি কলেজের ম্যাগাজিনে একটা প্রবন্ধে লিখেছিলে, 'ভারতে সাম্যবাদ এবং কয়েকটি অসুবিধা'— ঠিক বলছি না? সেই

প্রবন্ধে তুমি লিখেছিলে যে, ভারতবর্ষে ধর্মই হচ্ছে সাম্যবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। অথচ এ-ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। কারণ, ধর্মই ভারতবর্ষের সভ্যতাকে তৈরি করেছে, ধর্মই চিরকাল ধরে নিয়ন্ত্রণ করেছে এ দেশের ইতিহাস। একটা পুরো জাতি ধর্মে শৃঙ্খলিত। সাম্যবাদের প্রথম আঘাতটি যখন এর ওপর এসে পড়ে তখন ঠিক অনুরূপ একটি প্রত্যাঘাতও লাভ করে। কারণ, এ দেশের লোক ধর্মের নামেই পারত্রিক দুঃখগুলি ক্লেশে বহন করে, কর্মফল স্বীকার করে বাস্তব পৃথিবীর আঘাতগুলি অনায়াসে গ্রহণ করে। তুমি আরও লিখেছিলে: আর আশ্চর্যের বিষয় যে, এখনও কোনও কোনও মন্দির বা দেবস্থানে হত্যা দিয়ে বা মানসিক করে লোকের কিছু কিছু মনস্কামনা পূরণ হয়। কোনও ধর্মগুরু বা যাজক এখনও লোককে কিছু কিছু অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করান, যার ফলে মানুষের ধর্মবিশ্বাস ভাঙনের মুখে এসেও আবার জোড়া লেগে যায়। তোমার প্রবন্ধটা এ-রকমই ছিল, না?

ললিত মাথা নাড়ে, ঠিক।

তুমি এই সাম্যবাদ এবং ধর্মের একটা সমাধান দিয়েছিলে। তুমি লিখেছিলে: এ দেশে ধর্মের অসারতা প্রমাণ করতে হলে সাম্যবাদের প্রতিটি প্রচারককেই হাতেকলমে ধর্মের প্রতিটি বিধি এবং আচারকে মানতে হবে। মনুর অনুশাসনকে শিরোধার্য করে নিয়ে লোকের সামনে সমস্ত বিধিগুলি পূর্ণ করে দিয়ে দেখতে হবে যে, এগুলো আসলে ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। এদেশে ধর্মকে হাতেকলমে অপ্রমাণ না করতে পারলে এর ভিত নড়ানো যাবে না।

সিগারেটটা শেষ করে ঘরের একধারে না দেখে ছুড়ে ফেলল লোকটা, বলল, তোমার সমাধানটা আমার অদ্ভুত লেগেছিল।

বলতে বলতে হঠাৎ হো-হো করে হাসল লোকটা, খুব অদ্ভুত। ধর্মকে অস্বীকার করার জন্য সাম্যবাদীরা ফোঁটা তিলক কেটে বোষ্টম হচ্ছে, কাপালিক হয়ে শ্মশানকালীর পুজো করছে, কিংবা সাধু হয়ে চলে যাচ্ছে হিমালয়ে, কীর্তন করে ফিরছে সারা দেশ—ভাবাই যায় না।

লজ্জায় ললিত একটু লাল হল। বাস্তবিক ও-রকমই একটা অস্বাভাবিক প্রস্তাব সে করেছিল সেই প্রবন্ধটায়। ঠিক।

লোকটা একটু স্থির হয়ে, রক্তাক্ত হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বলল, তুমি কি এখনও সেই প্রস্তাবে বিশ্বাস করো?

ললিত মাথা নাড়ল, না।

কেন করো না?

ললিত চুপ করে রইল।

লোকটা হঠাৎ বলল, আমি বিশ্বাস করি। তুমি ঠিকই লিখেছিলে।

টিকটিক করে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল। লোকটা লক্ষ করল না, কিন্তু ললিত শুনল।

বেশ কষ্ট এবং কসরত করে লোকটা উঠে বসল। জিজ্ঞেস করল, চা খাবে?

ললিত বলল, না।

আমি একটু খাব।

বলে লোকটা উঠল। ঘরের একধারে রান্নার জন্য কিছু অ্যালুমিনিয়মের বাসনপত্র আর কেরোসিন স্টোভ ছিল। লোকটা স্টোভ জ্বেলে কেটলি চাপিয়ে আবার এসে চৌকিতে বসে একটু হাঁফাল। তোয়ালেটা গা থেকে বেখেয়ালে সরে যেতেই লোকটার খুব রোগা শরীর দেখা গেল। বুকের খাঁচাটা সরু একটা নলের মতো গোল। ললিত স্থির চোখে লোকটাকে দেখছিল। সুবলের সন্দেহ, মার খেয়ে লোকটা পাগল-পাগল হয়ে গেছে। তাই হবে।

লোকটা বলল, এ-পাড়ায় এসে আমি তোমাকে দূর থেকে দেখেই চিনেছিলাম। না, তোমার চেহারা সেই আগেকার মতো ধারালো নেই, একটু ভোঁতা হয়ে গেছে। আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করলাম না। কারণ, আমি জানতাম তুমি আমাকে ঠিক চিনবে না। আমাকে খানিকটা চিনত তোমার বন্ধু রমেন।

রমেন?

লোকটা মাথা নাড়ল। বলল, তোমাকে এ-পাড়ায় দেখে খুব হতাশ হলাম। দেখলাম, আমি যা ভেবেছিলাম তুমি তার কিছুই হওনি। অলস সময় কাটিয়ে দিচ্ছ। তারপর শুনলাম, তোমার অসুখ। তারপর আর তোমার সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল হয়নি।

ললিত মৃদু একটু হেসে বলল, আমার কথা বাদ দাও। আমার নিজেরও আর কৌতূহল নেই। তুমি নিজের কথা বলো।

লোকটার মাথায় বা কোথাও কোনও যন্ত্রণা হচ্ছিল। খানিকক্ষণ মুখখানা বিকৃত করে যন্ত্রণাটা সহ্য করল। তারপর একটু ঝিম মেরে রইল। বলল, আমি কি খুব এলোমেলো কথা বলছি?

না তো!

ঠিকঠাক গুছিয়ে বলতে পারছি?

নিশ্চয়ই।

লোকটার ঘোলাটে চোখ চিকমিক করে উঠল। তেমনই ধীর ভরাট গলায় বলল, আমার বাবা উকিল ছিল, বাবার ইচ্ছে ছিল আমিও উকিল হই। কিন্তু আমার রকমসকম দেখে বাবা সে-আশা ছেড়ে দিল। আমি যা ইচ্ছে পড়তে লাগলুম। প্রথমে বিজ্ঞানে ইন্টারমিডিয়েট, তারপর বি কম, মাঝপথে বি কম ছেড়ে দর্শনে অনার্স নিয়ে বি এ অনার্সের ক্লাসে তোমার বন্ধু রমেনের সঙ্গে আলাপ।

আলাপ?

লোকটা হাসল, আলাপ শুনে হাসছ? বাস্তবিক আলাপটা হঠাৎ হয়নি। রমেনকে তুমি বোধ হয় খানিকটা চেনো, সে খুব কৌতুহলী ছেলে। কোনও বিষয়ে একবার সে কৌতূহলী হলে তাকে ঠকানো মুশকিল। আমার চুপচাপ অসহায় ভাব লক্ষ করে সে আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে। আমার কথা আসতই না, দু'-একটা কথা বলেই আমি থেমে যেতাম। কিন্তু রমেন আমার শেষ দেখবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল।

লোকটা হঠাৎ মুখ বিকৃত করে বলল, যাক গে, সে বিস্তর কথা। বি এ পাস করে আমি দর্শনের এম এ-তে ভরতি হলাম, তুমি পড়তে ইংরিজি নিয়ে। তখনও তোমাকে আমি দেখেছি। শেষ পর্যন্ত আমার আর পড়া হয়নি।

কেন?

লোকটা হাসল। তারপর অকপটে বলল, আমি কিছু দিনের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

দশ

লোকটা কষ্টেসৃষ্টে উঠে স্টোভ থেকে চায়ের কেটলি নামিয়ে বলল, আমি আকাশের কথা ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

নিপুণ হাতে চা তৈরি করল লোকটি। কেটলি থেকে যখন লিকার ঢালছিল তখন সেই লিকারটাকে একদম কালো আর থকথকে ঘন দেখাচ্ছিল। খুব কড়া লিকারের চা। রক্তবর্ণ সেই চা কাপে নিয়ে আবার এঁকেবেঁকে বিছানায় এসে বসল। বলল, আকাশের কথা ভাবতে ভাবতে, কিন্তু দেখো, বরাবর আমার চারপাশের পৃথিবীর বা সমাজ-সংসারের ভাবনার চেয়ে আকাশের ভাবনাই আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। বিভোর হয়ে ভাবতুম। ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমার ধারণা, লোকের মধ্যে আকাশের ভাবনা ঢুকিয়ে দিতে পারলে, আকাশ-বিভোর করে দিতে পারলে পৃথিবীতে পাপটাপ অনেক কমে যাবে, দুঃখ-কষ্ট, বিরহ-মৃত্যু অনেকটাই সহনীয় হয়ে যাবে তখন। মানুষ খানিকটা বিবাগী উদাসী হয়ে যাবে। অবশ্য তারও একটা বিপদ ছিল। মানুষ তখন আর তেমন চাষেবাসে মনোযোগী হবে না, ঠিকমতো কলকারখানা চালাবে না, প্রজনন বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তাতেও পৃথিবীর খুব একটা ক্ষতি হত না। হত কি? হিসেব করলে দেখা যায়, আমরা পৃথিবীতে প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশি জিনিস উৎপাদন করি। বেশি উৎপাদন করি বলেই বেশি লুকিয়ে রাখি, বেশি সঞ্চয় করি। তাতে বেশি অভাব দেখা দেয়। কী বলো? তা ছাড়া আকাশ-চিন্তায় মানুষের কামভাব কমে যায় অনেক। তাতে মানুষ কমই জন্মাবে পৃথিবীতে, লোকসংখ্যা কমে যাবে ঢের। সচ্ছলতা দেখা দেবে। না?

চায়ে চুমুক দিয়ে সেই গরম কড়া চায়ের তীব্র স্বাদে লোকটা মুখ বিকৃত করল। তারপর বলল, এইভাবে আকাশ-চিন্তায় আমি পাগল হয়ে গেলাম। আকাশটা একটু একটু করে আমার মধ্যে ঢুকছিল। কিন্তু আমার মাথা একটা সসীম বস্তু। তার নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং বেধ রয়েছে, তার ভাবনা-চিন্তার রয়েছে একটা সীমা। তার মধ্যে অসীম আকাশটা ঢুকবে কী করে? তবু রোজই আমি টের পেতাম অনবরত আমার মাথার মধ্যে বিশাল, প্রকাণ্ড অনন্ত আকাশ ঢুকছে তো ঢুকছেই। আমার মাথার ভিতরটা টইটম্বুর হয়ে গেল, তারপর ফাটো ফাটো হল। ব্যথায় আমি একা একা চিৎকার করতাম। সেই সময়ে আমাকে ইউনিভার্সিটি থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়। আমার মা-বাবার ধারণা হয়েছিল যে, দর্শন পড়তে পড়তেই আমার ও-রকম অবস্থা। আমি তিন-চার মাস বাসায় বসে রইলাম। আমার বাবা ছিল জজ-কোর্টের উকিল, কিন্তু তাঁর পসার ছিল না। সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে কাছারিতে যেত, জামিন বা এফিডেবিটের ছোটখাটো কাজ থেকে পয়সা পেত। সংসার চলত না। বি এ ক্লাসের মাঝামাঝি থেকে রমেন আমার পড়ার খরচ না দিলে আমার পড়া কবে বন্ধ হয়ে যেত। তিন-চার মাস পর আমার পাগলামি সেরে গেলে বাবা আর আমাকে পড়তে দিল না। খুব ধরা-করা করে কর্পোরেশনে আমাকে একটা কেরানির কাজে বহাল করে দিল। ধাঙড়-জমাদারদের হাজিরা নেওয়ার কাজ। তারপর বাবা বুড়ো হয়ে, অসুখে ভুগে মারা গেল। তার এক বছর বাদে উদুরিতে মারা গেল মা। আমার ছোট বোনটা একজনকে ভালবেসে বিয়ে করল। আমার দাদা চলে গেল চাকরি নিয়ে জার্মানিতে। আমাকে একা পেয়ে সাবেকি বাসা থেকে উচ্ছেদ করে দিল বাড়িওয়ালা। আমি মামলায় হাজির হইনি বলে একতরফা ডিক্রি পেয়ে সে কোর্টের

পেয়াদা এনে আমার মালপত্র, বই, বিছানা ফুটপাথে বের করে দিল সকালবেলায়। আমি সারা দিন পাড়াপড়শিদের ভিড়ের মধ্যে ফুটপাথে আমার বাক্সের ওপর বসে রইলাম। আমার অনেক জিনিস চুরি হয়ে গেল। আমি কাউকেই বলতে পারলাম না যে, 'আমাকে একটু সাহায্য করুন' কিংবা 'আমাকে একটু আশ্রয় দিন।' ভাগ্যক্রমে কর্পোরেশনের একটা দয়ালু জমাদার আমাকে দেখতে পায়। সে হাজিরা-খাতায় টিপসই দিয়ে সারা দিন নিজের ধান্ধায় ঘুরত। আমি তাকে কিছুই বলতাম না এমনিতেই, তার ওপর সে রোজ আমাকে বাঁধা রেট-এ দশ পয়সা করে ঘুষ দিত মুখ বন্ধ রাখার জন্য। সেই লোকটাই অবশেষে আমাকে এইখানে নিয়ে আসে। সেই থেকে আমি এই ঘরে আছি।

হঠাৎ আচমকা ললিত প্রশ্ন করল, তুমি ঘুষ নাও?

লোকটা মাথা নাড়ল, নিই। আপত্তি করতে আমার লজ্জা করে। ওরা, ওই ধাঙ্গড়-জমাদাররা খুব আদর করে খুব ভালবাসার সঙ্গে পয়সাটা দেয়। আমি খুব অসহায় বোধ করি, ফিরিয়ে দিতে পারি না। তা ছাড়া যদি ফিরিয়ে দিই তবে ওদের দিয়ে আমাকে কাজ করিয়ে নিতে হবে। যদি তা করি তবে ওরা রেগে যাবে, ছুতোনাতা ধরে হাঙ্গামা করবে, আমাকে চাকরিতে থাকতে দেবে না। সেই হাঙ্গামা সহ্য করার মতো জোর আমার নেই। বুঝলে! আমি যদি সৎ হই, তবে আমার কর্তব্যপরায়ণ এবং সাহসীও হওয়া দরকার। নইলে দুর্বল সৎকে দিয়ে সমাজের কোনও উপকার নেই। সৎ হওয়া সোজা। আমি রোজ সকালে জমাদারদের দেওয়া পয়সা ফিরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কিছুতেই তাদের দিয়ে কাজ করাতে পারি না। আমি ঘুষ না-নিলেও শহর নোংরা থাকবে। নয় কি? কেননা আমি কর্তব্যপরায়ণ বা সাহসী নই। ঠিক বলছি না?

ললিত হাসল। বলল, বলে যাও।

লোকটা একটু চুপ করে রইল। কপালে ব্যান্ডেজের তলা দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে একটু চুলকে নিল। তারপর যন্ত্রণায় মুখ একটু বিকৃত করে বলল, আমার সবচেয়ে প্রিয় বই হচ্ছে কবিতা আর দর্শনের। এই সমস্ত দামি বইগুলো আমার ঘুষের পয়সায় কেনা। ওদের পয়সা না নিলে আমি কী করে এই বইগুলো কিনতাম! অ্যাঁ! ওই সব বইগুলোর মধ্যে এক-একটা আশ্চর্য জগৎ, একটা কবিতার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের ছায়া, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে ওই বইগুলি। আমি সৎ হলে কিংবা ধাঙ্গড়-জমাদাররা কাজে ফাঁকি না দিলে এই আনন্দ আমি কোথায় পেতাম! তা ছাড়া দেখো, ওই ঘুষ নেওয়ার ব্যাপারটা আমি প্রচলন করিনি। ওই চাকরির ওটাই নিয়ম ছিল, আমি কেবল ওই নিয়মটার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম। আমি নিয়ম পালটানোর খুব পক্ষপাতী নই। যদি নিয়ম পালটাতেই হয় তবে সমস্ত দেশটার সব নিয়ম এক আঘাতে, একবারে পালটে ফেলাই ভাল। আমি যদি আমার দুর্বল ক্ষমতা নিয়ে ছোট্ট একটা নিয়মকে পালটানোর চেষ্টা করি তা হলে গোলমাল হবে খুব, আমার বিপদ ঘটবে। প্রকাণ্ড একটা পুরনো মেশিনে তুমি যদি একটা নতুন ধরনের পার্টস লাগানোর চেষ্টা করো তা হলে পুরো মেশিনটাই চেঁচাবে, আর্তনাদ করবে, নতুন পার্টসটাকে কিছুতেই থাকতে দেবে না। তাই আমি একটা বিরাট রহস্যময় মেশিনের কোনও অংশই পালটানোর চেষ্টা করিনি। তার নিয়ম মতোই তাকে চলতে দিয়েছি। আমি ধাঙ্গড়-জমাদারদের চটাইনি, বরং তাদের নিয়ম মতো খুশি রেখেছি। ফলে দেখো, তাদের পয়সায় আমি ইচ্ছেমতো বই কিনেছি, তাদেরই দয়ায় ফুটপাথ থেকে এমন সুন্দর একটা ঘরে আশ্রয় পেয়েছি।

'সুন্দর ঘর' কথাটা শুনে ললিত মুখ লুকিয়ে একটু হাসল।

চা শেষ করে কাপটা বিছানার ওপরেই রেখে উঁচু বালিশে আধশোয়া হয়ে লোকটা বলতে লাগল, দেখো, একটা নিয়ম পালটানোর চেষ্টা করতে গিয়েই আজ আমার এই অবস্থা। আমি অনেক দিন ধরেই জানি যে, আমি দুর্বল মানুষ, আমি কথা বলতে পারি না। সারা জীবনে আমার প্রতি যত অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে, আমাকে যত অপমান করা হয়েছে সবই আমি সহ্য করেছি। কেননা আমার স্বভাব অনুযায়ী সেটাই ঠিক নিয়ম। এবং এই নিয়ম অনুযায়ী চললে আমার কোনও বিপদ নেই। অথচ কয়েক দিন আগে এক বার অল্পক্ষণের জন্য আমি আমার স্বভাবের, এই নিয়ম পালটে ফেলেছিলাম। ঘটনাটা অবশ্য খুবই ছোট এবং সাধারণ একটা ঘটনা। সেদিন অনেক রাত্রে আমি নাইট শোতে একটা সিনেমা দেখে ফিরছিলাম...

ললিত একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, তুমি সিনেমা দেখো?

লোকটা ঘাড় নাড়ল, দেখি। বই পড়তে পড়তে বা চিন্তা করতে করতে আমার মাথা ভার হয়ে যায়। তাই আমি সিনেমা হল কিংবা খেলার মাঠে চলে যাই। আমি কখনও সিরিয়াস ছবি-টবি দেখি না, আমি দেখি বেলেল্লা হিন্দি ছবি, যাতে প্রচুর হুল্লোড় আছে, যার মধ্যে দুঃখ-টুঃখ বড় একটা নেই। ওইসব ছবি আমার মাথাকে খুব সজীব করে দেয়।

ললিত হাসল, ঠিক আছে। তারপর বলো।

হ্যাঁ, তারপর সেদিন অনেক রাতে আমি ফিরছিলাম। ভিড়ের বাসে আমি উঠতে পারিনি। ভবানীপুর থেকে টালিগঞ্জ খুব একটা দুর নয় বলে আমি হাঁটা-পথেই চলে আসছিলাম। রেল-ব্রিজ পেরিয়ে কিছু দূর আসতেই কে যেন পিছন থেকে বলল, "ও মশাই, শুনুন! ফিরে দেখি ল্যাম্প-পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে দু'জন লোক। সাধারণ বাঙালির মতোই তাদের চেহারা। শ্যামলাই বোধহয় গায়ের রং, রোগা-টোগা, না-লম্বা-না-বেঁটে। পরনে ধুতি আর শার্ট। আমি ফিরে তাকাতেই বলল, 'আপনার কাছে দশ কি পাঁচ পয়সার কয়েন হবে? আমরা দুই বন্ধু একটা বাজি ফেলেছি, কিন্তু 'টস' করার মতো খুচরো পয়সা আমাদের কাছে নেই।' লোকটা ভারী ভদ্রলোকের মতো হেসে বলল। খুব শান্ত আর ধীরস্থির তার হাবভাব। আমি কথা না বলে পকেট থেকে একটা আধুলি পেয়ে তার হাতে দিলাম। লোকটা খুব আপ্যায়িত হয়ে বলল, 'বাঃ, এতেই হবে। বলে আমার সামনে দাঁড়িয়েই 'টস' করল। বাঁই করে পয়সা আঙুলের টোকায় শূন্যে উড়িয়ে দু'হাতের চেটোয় চেপে ধরল। তারপর 'টসে'র ফলাফল দেখে আমার হাতে আধুলিটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। আমি চলে আসছি, তখন আবার সেই লোকটা পিছু ডাকল, 'দাদা, শুনুন।' আমি দাঁড়ালাম। আবার বিনয়ের হাসি হেসে বলল, 'আমাদের 'টস'-এর রেজাল্টটা জেনে গেলেন না? আমার এই বন্ধুর ভাগে পড়েছে আপনার হাতঘড়িটা, আর আমার ভাগে আপনার ম্যানিব্যাগ। ও দুটো দিয়ে আপনি চলে যান।' দেখলাম লোকটার বন্ধু একটা মাঝারি লম্বা ছুরি বের করে খুব মনোযোগের সঙ্গে নিজের আঙুলের নখ কাটছে। আমাকে লক্ষই করছে না। দু'জনেরই ভাবভঙ্গি শান্ত, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, আর বেশ গা-ছেড়ে-দেওয়া, হাসিখুশি। তারা আমাকে একটুও ভয় দেখানোর চেষ্টা করেনি, চাপা গলায় কথা বলেনি। আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন বড়জোর রাত বারোটা বেজে দশ কি পনেরো মিনিট। কলকাতায় ওটা তখনও রাতই নয়। আমাদের চারদিকেই তখনও কিছু লোকজন চলাচল করছে, রাস্তায় জ্বলছে আলো, অল্প দূরেই একটা মাংসের দোকান ধোলাই হচ্ছে, ঝাঁটা আর জলের শব্দ আমার কানে আসছিল, ফুটপাথে শোয়া লোকগুলো তখনও ঘুমিয়ে পড়েনি সবাই। এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা আমাকে প্রকাশ্যে লুট করছিল। আমার স্বভাবের নিয়ম অনুযায়ী তখন কী করা

স্বাভাবিক ছিল, বলো তো! স্বাভাবিক ছিল চুপচাপ তাদের হাতে আমার পুরনো বাবার আমলের ঘড়ি আর অল্প কয়েকটা টাকাওলা মানিব্যাগটা ছেড়ে দেওয়া। সেটাই ঠিক স্বাভাবিক হত। আমার চেয়ে ঢের সাহসী লোকও ঠিক তাই করত। কিন্তু সেই মুহূর্তে, অল্প কিছুক্ষণের জন্য আমি আমার স্বভাবের নিয়ম পালটে ফেললাম। আমি দিলাম না।

দিলে না?

লোকটা মাথা নাড়ল, না। তারা যদি আমাকে ভয় দেখাত, কিংবা যদি আচমকা আমার সামনে দাঁড়িয়ে সব কেড়েকুড়ে নিত, তা হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের সব দিয়ে দিতাম। কিন্তু তারা তা করেনি। তারা অনেক সময় নিয়েছিল, রসিকতা করে আমারই পয়সা দিয়ে 'টস' করল, তারা আমাকে দেখাল তাদের আত্মবিশ্বাস কত প্রবল, কত সহজে ঠান্ডা মাথায় তারা দুঃসাহসিক সব কাজ করতে পারে। আর সেটা লক্ষ করেই আমার স্বভাবের নিয়মটা বোধ হয় হঠাৎ পালটে গেল। এ-রকম মাঝে মাঝে হয় যে, খুব সাধারণ দুর্বল মানুষও কোনও দুঃসাহসিক কাজ দেখলে অনুরূপ কাজ করতে উৎসাহ বোধ করে। আমার বিশ্বাস, খুব সাধু সৎ প্রকৃতির কোনও লোকও যদি চোখের সামনে একটা দুঃসাহসিক খুন, ডাকাতি কিংবা গুন্ডামি দেখে তবে তার মনের গভীরে কোথাও-না-কোথাও ওইরকম একটা কিছু করার ইচ্ছে জেগে উঠবে। এটা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা। কিন্তু সাধারণ মানুষের ইচ্ছে হলেও তারা সব করে না। তারা বিবেকানন্দের জীবনী পড়ে, বড় খেলোয়াড়ের খেলা দেখে, বড় গুড়ার গুন্ডামির খবর শোনে, বলাৎকার বা ধর্ষণের খবর পড়ে পত্রিকায়। তবু অধিকাংশ মানুষই মহাপুরুষ কিংবা খেলোয়াড়, গুন্ডা কিংবা ধর্ষণকারী হয় না। কিন্তু তাদের মনের মধ্যে সব ইচ্ছাই পাশাপাশি থেকে যায়। কিন্তু তারা স্বভাবের নিয়ম বড় একটা ভাঙে না, সাধারণ নিরীহ জীবন যাপন করে যায়। তারা যে মহাপুরুষের মতো ত্যাগী জ্ঞানী মানবপ্রেমিক হয় না, খেলোয়াড়ের মতো কুশলী হয় না, অসৎ গুন্ডার মতো নৃশংস হয় না, কিংবা ধর্ষণ বা বলাৎকারের গুপ্ত উত্তেজনা উপভোগ করে না। তার কারণ, তারা জানে যে, ও-রকম কিছু হতে গেলে বা করতে গেলে প্রকৃতি এবং নিয়তি তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। আমাকে সেই রাত্রে যারা ছিনতাই করছিল তাদের দুঃসাহস এবং আত্মপ্রত্যয় দেখে অনুরূপ দুঃসাহস এবং আত্মপ্রত্যয় দেখানোর ইচ্ছেটা হয়তো স্বাভাবিক হত। কিন্তু আমি তাদের হাতে আমার মানিব্যাগ বা ঘড়ি দিলাম না। আমি তাদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য তাদের পিছনে রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে বললাম, পুলিশের গাড়ি! তারা চমকে পিছু ফিরে চাইল। আমি দৌড় দিলাম। আর দৌড়োতে দৌড়োতে আমি একটা তীব্র উত্তেজনা এবং আনন্দ বোধ করছিলাম। ও-রকম আনন্দ আর উত্তেজনা আমি কখনও বোধ করিনি, আমার দর্শন কিংবা কবিতার বইয়ে এতকাল ধরে আমি যা আনন্দ পেয়েছি, এ আনন্দ তার চেয়ে অনেক বেশি। আমার মনে হল জীবনে এই প্রথম আমি একটা কিছু করছি, একটা অসাধারণ কিছু। আমি একদম দৌড়োতে জানি না, কখনও দৌড়েইনি, খানিকটা ছুটেই আমার হাঁফ ধরে গেল, তবু আমি দাঁতে ঠোঁট চেপে হাসছিলাম, এবং নিজের এই ব্যবহারে আমি অবাকও হচ্ছিলাম খুব। সেই লোক দুটো বোধ হয় আমাকে চিনত। তাদের ধারণা ছিল আমাকে লুট করা খুবই সহজ ব্যাপার হবে, তাই তারা লুটের আগে আমার সঙ্গে রসিকতা করেছিল। কিন্তু আমি তাদের ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছি দেখেই তারা হয়তো খুব রেগে গেল। সেটাও খুবই স্বাভাবিক। যার ওপর আধিপত্য করা সহজ, তুমি যদি দেখো যে, সে তোমার বশ মানছে না, তবে তুমি রেগে যাবে না? কাজেই স্বাভাবিক কারণেই তারা রেগে গেল। কারণ, আমি পোকামাকড়ের মতো

তুচ্ছ একটা লোক তাদের সঙ্গে টক্কর দিয়েছি। তাদের প্রেস্টিজে লেগেছিল। কিন্তু তারা সোজাসুজি আমার পিছু নিল না। সম্ভবত তারা আমার ঘর চিনত। কারণ, আমি খানিকটা ছুটে, খানিকটা জোরে হেঁটে যখন ঘরের দরজায় পৌঁছলাম তখন দেখি আমার দরজার বাইরে দু'ধারে তারা দুজন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। শান্তভাবে। বোধ হয় তারা কোনও শর্টকাট রাস্তায় এসেছিল, যা আমি জানি না। তাদের একজনের হাতে একটা সাইকেলের চেন, অন্যজনের হাতে লোহার উকো। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, আমার আর দৌড়োবার ক্ষমতা ছিল না। তারা দু'জন চটপটে পায়ে এসে আমার দু'দিকে দাঁড়াল, ধরে নিয়ে গিয়ে বলল, দরজা খোলো। আমি তালা খুলে ভিতরে ঢুকতে তারাও ঢুকল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তখনও স্বভাবের নিয়মে আমি তাদের ভয় পাচ্ছিলাম না। আমি তখনও তীব্র আনন্দ এবং উত্তেজনা বোধ করছিলাম। তারা দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপরেই ফাইট শুরু হয়ে গেল। আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়ে তারা ভুল করেছিল। কারণ, আমি শান্তভাবে মার খেলাম না, ঘড়ি আর মানিব্যাগও ছাড়লাম না। আমি একজনকে বই ছুড়ে মেরেছিলাম। মাটিতে পড়ে গিয়ে একজনের গোড়ালি কামড়ে দিয়েছিলাম। সারাক্ষণ আমি লড়াই করার চেষ্টা করেছিলাম বলে তারা আমাকে বেশি মেরেছিল। ওদিকে হইচই শুনে লোকজন উঠে পড়ছিল বোধ হয়, তারা অল্প সময়ে যত দূর সম্ভব আমাকে মেরে পালিয়ে গেল।

লোকটা হাসল। ফাটা ঠোঁট দিয়ে টস করে রক্তের ফোঁটা পড়ল সাদা তোয়ালেটার ওপর। তারপর লোকটা বালিশের তলা থেকে একটা কালো মানিব্যাগ আর পুরনো আমলের বড় গোল একটা হাতঘড়ি বের করে ললিতকে দেখাল, এই সেই ঘড়ি আর মানিব্যাগ। একেবারেই এলেবেলে জিনিস। পুরনো পচা ঘড়ি, ছেঁড়া মানিব্যাগে বোধ হয় গোটা তিন-চার টাকা ছিল। এর জনেই আমি এত লড়াই দিয়েছি ভেবে আমি এখন আশ্চর্য হই।

লোকটা মানিব্যাগ আর হাতঘড়িটা দু'হাতে চেপে ধরে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সযত্নে আবার বালিশের তলায় ঢুকিয়ে রেখে বলল, এই হচ্ছে ব্যাপার। খুবই সামান্য তুচ্ছ একটা ঘটনা।

লোকটা ভ্রূ কুঁচকে ভেবে বলল, দেখো, ঘটনাটা যতটা সামান্য মনে হচ্ছে, বাস্তবিক সেটা ততটা সামান্য নয়। লোক দুটো আমাকে মারবার সময়ে বলেছিল, শালা, শুয়োরের বাচ্চা, বেজন্মা, তোমার জিয়োগ্রাফি পালটে দেব। কিন্তু কার্যত আমার জিয়োগ্রাফির বদলে তারা আমার ফিলজফি পালটে দিয়ে গেছে।

লোকটা চুপ করল। ললিত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী রকম?

লোকটা তার চোখে চোখ রেখে বলল, আমি এখন আর তেমন নিরীহ শান্ত লাজুক মানুষটি নই। এই ঘরে মাঝে মাঝে একটা সাদা বেড়াল আসে, আমার চায়ের দুধ ডেকচি উলটে খেয়ে যায়। দেখতে পেলে আমি তাড়িয়ে দিই, কিন্তু আর কিছু করি না। কিন্তু পরশুদিন দুপুরবেলা বেড়ালটা আমার ঘরে ঢুকে ডেকচি খোলবার চেষ্টা করতেই আমি লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গিয়ে ওর লেজটা চেপে ধরলাম। ও পালাবার ফিকিরে জানালায় লাফিয়ে উঠেছিল, কিন্তু লেজটা আমি হাতে পেয়ে গিয়েছিলাম। বেড়ালটা আমাকে ফ্যাঁস করে আঁচড়ে দিল, হাতে দাঁত বসাল, আমি ওকে তবু ছাড়লাম না, তুলে এক আছাড় দিলাম মেঝেয়। ব্যাটা ঝিম ধরে অনেকক্ষণ পড়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। আর আসেনি। ও যখন আমাকে আঁচড়ে কামড়ে দিচ্ছিল তখনও আমি ঠিক ও-রকম একটা উত্তেজনা আর আনন্দ টের পাচ্ছিলাম। তা ছাড়া দেখো, আগে আমি যে-কোনও লোকের কাছেই চট করে বশ মেনে নিতাম, কারও সঙ্গেই কখনও গোঁয়ারতুমি করিনি। কিন্তু তোমার পাড়ার

ছেলেরা এসে যখন আমার মার খাওয়ার ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করল তখন আমি তাদের স্পষ্ট কিছুই বললাম না। তারা আমাকে ব্যাপারটা খোলসা করে বলার জন্য অনেক ভয় দেখিয়েছে, আবার অভয়ও দিয়েছে, বলেছে আমার হয়ে তারা শোধ নেবে। এ-সব ছেলেদের আমি চিরকালই ভয় পাই, কারণ বরাবর রাস্তায় ছেলেরা আমাকে খ্যাপায়, টিটকিরি দেয়। কিন্তু এবার আমি আমার জেদ বজায় রাখলাম, তাদের কিছুই বললাম না। তারা বলল, আমার কাছে প্রায়ই একটা মেয়ে আসে বইখাতা নিয়ে, এ-ব্যাপারটার সঙ্গে সেই মেয়েটার কোনও যোগাযোগ আছে কি না। আমি তাদের কোনও উত্তর দিলাম না। যদিও জানি যে, পাড়ার ছেলেরা সেই মেয়েটার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে একটা কেচ্ছা রটিয়ে দিতে পারে।

মেয়েটা কে? ললিত নরম গলায় জিজ্ঞেস করল।

সেটা আর-একদিন বলা যাবে। বলে ক্লান্তিতে লোকটা চোখ বুজল। বলল, আমি অনেকক্ষণ কথা বলেছি। আমার মাথার মধ্যে কুয়াশা জমছে।

ললিত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি তোমার কাছে পরে আসব। আজ তুমি ঘুমোও।

লোকটা হেসে বলল, আমার হিরো।

বলে চোখ বুজল।

ললিত দরজার কাছ থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি খাও কোথায়?

লোকটা চোখ খুলে তাকে দেখল। বলল, নিজে রান্না করি।

ললিত বলল, এখন কে তোমাকে রান্না করে দেয়?

লোকটা মাথা নাড়ে, কেউ না। পাড়ার একটা বাচ্চা-টাচ্চাকে ধরে পাউরুটি নিয়ে দুধ বা চা দিয়ে খেয়ে নিই। কখনও কষ্টেসৃষ্টে সেদ্ধভাত করে নিই।

ললিতের দয়া হচ্ছিল। বলল, কিছু মনে কোরো না, কয়েক দিন আমার বাসায় খাও। আমি তোমার খাবার পাঠিয়ে দেব।

দেবে?

লোকটার চোখমুখ হঠাৎ খুব উজ্জ্বল দেখাল। মাথা নেড়ে বলল, তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করছ?

করছি। ললিত হাসল।

লোকটা খুশি হয়ে বলে, আমি বহুকাল নিমন্ত্রণ খাইনি। ভাল খাবার কাকে বলে জানিই না। তুমি পাঠিয়ে দিয়ো। একটু ভাল হলে আমি নিজেই যাব তোমাদের বাসায়, মাঝে মাঝে খেয়ে আসব।

লোকটা চুপচাপ একটু ললিতের মুখখানা দেখল। বলল, তোমার মা খুব ভাল রাঁধেন, না? আমার খুব পোস্তর বড়া, কচুর শাক আর লাউঘন্ট খেতে ইচ্ছে করে, তোমার মাকে এ-কথা বোলো।

ললিত হেসে ঘাড় নাড়ল। বলবে। তারপর বলল, তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো।

লোকটা হাসে, আমি অনেক দিন ধরে তো ভালই ছিলাম। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ভাল থাকাটা ভীষণ একঘেয়ে।

ললিত কথাটা ঠিক বুঝল না। বাইরে বেরিয়ে ফাঁকা রাস্তাঘাট দেখে আর দূরে কুকুরের ডাক শুনে ললিত বুঝল রাত অনেক হয়েছে। হাতে ঘড়ি ছিল না, আন্দাজ করল, বারোটার কাছাকাছি।

মিত্রদের বাড়ির সামনে অশ্বত্থ গাছটার তলায় গাঢ় ছায়া জমে আছে। সেই ছায়ার মধ্যে পা দিয়ে আপন মনে বিষণ্ণ একটু হাসল ললিত। পাড়ার বুড়িদের মধ্যমণি বলে মাকে সে মাঝে মাঝে বলে, হিরোবুড়ি। কিন্তু

সে যে কখনও হিরো ছিল কারও, তা ললিত টের পায়নি। সত্য বটে কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে সে ইউনিয়ন করেছে, ভোটে নেমেছে, বক্তৃতা করেছে, কলেজের ফাংশনে হয়তো কথা বলেছে, কলকাতার মেয়র কিংবা বিখ্যাত কোনও সুন্দরী গায়িকার সঙ্গে। কিন্তু সে-সব স্পষ্ট মনে নেই তার, সে-সব নিয়ে গৌরব করার মতোও কিছু ছিল না। অথচ সেইসব কলেজি হইচই ছেলেমানুষির মধ্যেও সে ছিল একটি দুঃখী ছেলের হিরো। তার শরীর একটা অচেনা আনলে শিউরে উঠল।

অথচ ভেবে দেখল বিমান রক্ষিতের চোখে তাকে যা দেখিয়েছিল তা আসলে সত্য ছিল না। ললিতেরও ছিল নানা দুর্বলতা, ক্ষোভ, লজ্জা। বিমান জানে না, লাজুক ললিত মিতু নামে একটি মেয়ের সঙ্গে দুর্বলতাবশত কোনও দিন কথাই বলতে পারেনি। একবার ছাত্র আন্দোলনের সময়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে বিকেলের দিকে গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। গলিঘুঁজি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল ললিত, ওয়েলেসলি স্ট্রিটে একজন সার্জেন্ট তার কনুই চেপে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল সে কোথায় যাচ্ছে। ললিত কেবল বোকার মতো বলেছিল, বাড়ি। সার্জেন্টটা তার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করায় সে এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে কিছুতেই তার বাড়িটা কোথায় তা মনে করতে পারেনি। অনির্দিষ্টভাবে হাত তুলে বোধহয় ময়দানের দিকটা দেখিয়েই সে বলেছিল, ওই দিকে। তার অবস্থা দেখে করুণা করেই সার্জেন্টটা সেদিন ছেড়ে দিয়েছিল তাকে। বলেছিল, সাবধানে যাবেন, নিজের বাড়িটা ভুল করবেন না। সেই ঘটনার লজ্জা এখন খুব ক্ষীণ হয়ে এলেও ললিতের মনের মধ্যে রয়ে গেছে। কিছুই ভোলেনি ললিত। কিছু দিন আগে, বোধ হয় বছরখানেক হবে, সে একবার পিসিমার সঙ্গে তাদের এক দূর সম্পর্কের বড়লোক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিল পিসিমার বাড়ির জন্য সরকারি ঋণের তদবির করতে। সেখানে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, ড্রইং রুমে ছোট্ট মদের 'বার', শেকলে ঝোলানো ঝাড়লণ্ঠনের মতো মস্ত কাচের বাতিদান দেখেছিল ললিত, আর দেখেছিল একটি মেয়েকে, যার গায়ের রং নতুন তামার পয়সার মতো উজ্জ্বল এবং আলো বিকিরণকারী, সে কৌতূহলী চোখে অনেকক্ষণ দেখেছিল ললিতকে। সেই আত্মীয় ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছিলেন সে কী করে। প্রশ্নটা শুনে ললিত খুব দুর্বল আর অসহায় বোধ করেছিল। তার চোখের সামনে তখন ওই বিপুল সাদা শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। অদ্ভুত বাতিদান, ছোট্ট মদের 'বার'-এর কাচগুলি ঝিকমিকিয়ে উঠছে, আর ওই সুন্দরী কিশোরীর কৌতূহলী চোখের মাঝখানে বোকার মতো বসে থেকে তার মুখে আনতে খুবই লজ্জা করছিল যে সে মাস্টারির চাকরি করে, আড়াইশো টাকারও কম বেতন পায়। এতকাল ধরে বড়লোকদের সম্পর্কে তার যে আক্রোশ আর ঘেন্না ছিল তা কোথায় উবে গিয়েছিল তখন! প্রকাণ্ড সোফায় বসে সেই বিপুল ঘরখানাকে চারিদিকে টের পেয়ে তার মনে তীব্র ভয় আর আত্মগ্লানি দেখা দিয়েছিল। নিজের হতশ্রী এবং দারিদ্র্যকে সে কখনও আর এমনভাবে টের পায়নি। তার ইচ্ছে হয়েছিল তখনই উঠে পালিয়ে চলে যায়। সম্ভবত পিসিমাও ভেবেছিল যে অত বড়লোকের কাছে তার মাস্টারির চাকরিটার কথা বলা উচিত হবে না। তাই কৌশলে পিসিমা তার হয়ে উত্তর দিয়েছিল, ও এখন এম এ পাশ করে রিসার্চ করছে। আশ্চর্য এই যে, পিসিমার উত্তর শুনে এক রকমের স্বস্তি পেয়েছিল সে।

এ-সবের কিছু বিমান জানে না। কিন্তু ললিত জানে যে সে হিরো নয়। কোনওকালে ছিলও না। বিমান একটা ভুল ছবি টাঙিয়ে রেখেছিল চোখের সামনে। ভাবতে ভাবতে ললিত শ্বাসকষ্টের মতো একটা বুক চেপে-ধরা দুঃখকে টের পাচ্ছিল। এইরকম ছোটখাটো ভুলের ওপর, মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা নড়বড়ে সে।

ভুল ললিতকেই চিনছে সবাই। সেও নিরীক্ষণ করছে এক ভুল নিজেকে। এখন একবার মৃত্যুর আগে সঠিক ললিতকে তার চিনে নেওয়া দরকার।

একা ফাঁকা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সে তার চটির ক্ষীণ দুর্বল শব্দ শুনতে পাচ্ছিল, সুস্থ সবল মানুষের পায়ের শব্দ যেমন হয়, তারটা তেমন নয়। এত মৃদু শব্দ যে মনে হয়, আর কয়েক পা গেলেই শব্দটা মিলিয়ে যাবে।

ঘরে এসে ললিত দেখল, মা মেঝেয় শতরঞ্জি পেতে হাঁ করে ঘুমিয়ে আছে। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে তখনও। চেয়ারে বসতে গিয়ে সে লক্ষ করল বাবার ছবির আড়াল থেকে টিকটিকিটা মুখ বাড়িয়ে তাকে দেখছে। ললিত ম্লান হেসে মৃদু স্বরে বলল, কার জন্য জেগে আছ, টিকটিকি-মা? কোনজন বাড়ি ফেরেনি তোমার—ছেলে, না কর্তা?

চেয়ার টানার শব্দে মা ঘুম ভেঙে বলল, কে রে! ললিত!

হুঁ।

কোথায় যে যাস! বলে মা উঠে বসল, অরুণ এসেছিল।

কে অরুণ!

ওমা! অরুণ তোর পিসির ছেলে। কাল একবার ওদের বাসায় যাস, যদি পারিস। বার বার যেতে বলে গেছে।

আচ্ছা।

শোয়ার ঘরেই মা ভাতের হাঁড়ি-টাড়ি এনে রেখেছে। এখন উঠে ভাত বাড়তে বসে বলল, ক'টা বাজে দেখ তো?

ললিত ঘড়ি দেখে বলল, পৌনে বারোটা।

ইস! কত রাত হয়েছে...

খাওয়ার পর রোজই মায়ে-পোয়ে একটু গল্প হয়।

খাওয়ার পর ললিত অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। মা তখন নিজের বিছানায় অন্ধকারে বসে আঙুলে চুলের জট ছাড়াচ্ছে। বলল, আত্মীয়-স্বজনদের একটু খোঁজখবর করিস। নইলে আমি মরে যাওয়ার পর কেউ তোকে চিনবেই না। দেখলেও ভাববে, কে না কে!

ললিত হেসে বলল, কে কোথায় থাকে মা!

মা বলল, কেন, কাঁচড়াপাড়ায় তোর ফুলমাসি থাকে, রাঙাকাকা থাকে মাজদিয়া, ইছাপুরে সোনাভাই, হাবড়ায় থাকে নসু ঠাকুরপো...

জটিল সব সম্পর্ক। অচেনা সব মানুষ। শুনতে শুনতে ললিত ঘুমিয়ে পড়ে।

রাত বারোটাতেও তুলসী আর সঞ্জয়ের ছাড়াছাড়ি হয়নি। ললিতের বাসা থেকে গাড়ি ছাড়ল সঞ্জয়। চলল, সোজা এসপ্ল্যানেডের দিকে। তখন আটটা বেজে গেছে।

তুলসী বলল, কোথায় যাচ্ছিস! আমাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে যা।

সঞ্জয় হাসল, দুনিয়াটাই তো বাসা রে। সেই বাসাটা দেখে নে।

তারপর সোজা গাড়ি চালিয়ে এসে থামল এসপ্ল্যানেডের একটা নিরিবিলি, শান্ত বার-এর সামনে। দরজা খুলে বলল, নাম শালা।

তুলসী ইতস্তত করে বলল, গোলমাল হয়ে যাবে মাইরি।

কেন, বউ গন্ধ পাবে? বলে হাসল সঞ্জয়, বেশি সাধুগিরি দেখাবি তো বউ হাওয়া হয়ে যাবে, দেখিস। রমেনটার তাই হয়েছিল।

তুলসী অস্বস্তিতে হাসল। তারপর নামল। বলল, অনেককাল অভ্যাস নেই।

ইস! শালা যেন কত খেয়েছে!

রাত দশটায় যখন বার-এর মদ দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল তখন তুলসী অনেকটা মাতাল। সঞ্জয় বলল, আর খাবি তুলসী?

তুলসী মাথা নাড়ল, খাবে। তার দু'চোখ দিয়ে তখন অঝোরে জল পড়ছে। কাঁদছিল সে।

সঞ্জয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল। এখানে বন্ধ হয়ে গেছে। সাকী কিংবা গ্র্যান্ডে যাই।

গ্র্যান্ড। মৃদু আলো, বাজনা, ছড়ানো প্রকান্ড রেস্টুরেন্ট। দেখে হু হু করে উঠল তুলসীর বুক। কে বলবে বাংলাদেশ এটা! কে বলবে! কে বলবে যে সে সেই তুলসী যে মফস্‌সলের মাস্টার, স্টেশন থেকে মাইলটাক আলপথ তাকে ধুতি হাঁটুর ওপর তুলে হাঁটতে হয়। সেখানকার স্কুলে আদ্যিকালের বুড়ো বি এ, বি এস সি আধামূর্খ গ্রাম্য একদল লোকের সঙ্গে কাজ করতে হয়! সেখানে মাঠে-ঘাটে বিষধর সাপ, জলেজঙ্গলে রহস্যময় পোকামাকড়। না, এটা মোটে বাংলাদেশই নয়। এই তো নিউ-ইয়র্ক! ইজ নট ইট? সে আপন মনে হাসল। ইট ইজ লন্ডন পারহ্যাপস? হ্যাঁ, লন্ডন। বসন্তকাল।

চেয়ারে বসে সে সঞ্জয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে আবার কেঁদে ফেলল, মাইরি, ললিতটার জন্য কষ্ট হচ্ছে।

সঞ্জয় তার কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল, স্টেডি!

চারধারে একবার বোকা চোখে চেয়ে দেখল তুলসী, তারপর বলল, আমার লাইফ-এ মাইরি কী আছে বল তো! অ্যাঁ!

তারপর আবার কাঁদতে লাগল। চেয়ে দেখল তার অদূরে বসে আছে চারজন জাহাজি লোক, হাতে উল্কি, মুখে সমুদ্রের জলবায়ুর কর্কশ ছাপ। তাদের চওড়া কাঁধ, চওড়া কবজি, তারা বিদেশি ভাষায় কথা বলছে। কিছু দিনের মধ্যেই তাদের জাহাজ ছেড়ে যাবে, দূর থেকে কত দূরে চলে যাবে তারা। তখনও আমি হাঁটুর ওপর ধুতি তুলে...আলপথে! তুলসী কাঁদতে থাকে। মদ খায়। কাঁদে।

কী হচ্ছে? সঞ্জয় ধমক দেয়।

আমার লাইফ-এ কী আছে বল তো? অ্যাঁ!

বউ! তোর বউ আছে। সঞ্জয় সান্ত্বনা দেয়।

তুলসী দেখে জলপাই রঙের সুট পরা একটা বিদেশি লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। কোন দেশি লোক ও? স্পেন? অ্যাঁ! ইয়েস, স্পেন। বুলফাইট। ও লোকটা বুলফাইটার। একজন নিগ্রোর মুখ নজরে পড়ে তুলসীর। লোকটার মোটা ঠোঁট উলটে দিল— ঝকঝকে ধারালো দাঁত দেখা যায়। বক্সার! হ্যাঁ, লোকটা বক্সার। ক্যাসিয়াস ক্লে! না, প্যাটারসন?

নিউ ইয়র্ক! দিস ইজ নিউ ইয়র্ক। তুলসী বিড় বিড় করে।

হঠাৎ সে শুনতে পেল 'কঁ কঁ' করে কর্ক খোলার একটা শব্দ। সে চমকে উঠল। শব্দটা সে কোথায় শুনেছে! শব্দটা চেনা। খুব চেনা। আবার সেই 'কঁ কঁ' শব্দটা শুনল তুলসী। সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর নিচু হয়ে টেবিলের তলাটা দেখল।

কী খুঁজছিস? সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে।

সাপটাকে।

সাপ?

হ্যাঁ, মাইরি এখানেই আছে। শালা ব্যাঙ ধরেছে।

চারদিকে আর-একবার তাকিয়ে তারপর সতর্কভাবে উঠে দাঁড়ায় তুলসী। হাত উঁচু করে সবাইকে সাবধান করে দেয়। স্টপ! অল স্টপ! দেয়ার ইজ এ স্নেক হিয়ার...

সঞ্জয় তার হাত টেনে বসিয়ে দেয়।

তুলসী নীরবে কাঁদতে থাকে।

রাত সাড়ে বারোটায় যখন বাসায় ফিরল তুলসী তখন সিঁড়ির দরজায় ভিড় করে দাদা বউদি মৃদুলা দাঁড়িয়ে আছে। তুলসী ভ্যাবলা চোখে তাকিয়ে দেখল। অসহায়ভাবে। বউদি এগিয়ে এসে ধরল তাকে। মৃদুলা মুখ ফিরিয়ে নিল, দাদা আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল।

ডু ইউ হেট মি? সে মৃদুলাকে জিজ্ঞেস করল। তারপর বুঝদারের মতো হাসল সে, ইউ হেট মি। আই নো!

বউদি ঘরে পৌঁছে দিল তাকে। মৃদুলাকেও ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দরজা টেনে বাইরে থেকে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

মৃদুলা দরজা বন্ধ করতেই খুব হাসল তুলসী। তারপর হঠাৎ বলল, আমার একটা কথা রাখবে?

মৃদুলা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, কী?

তুলসী বলে, মনে করো এটা একটা রাস্তা, তুমি একটা অচেনা মেয়ে হেঁটে যাচ্ছ, আর আমি একটা রকবাজ মাস্তান ছেলে। তুমি হাঁটো...হেঁটে যাও...যেন আমাকে চেনো না...হাঁটো...

ভয় পেয়ে কয়েক পা হাঁটে মৃদুলা। তুলসী মুখের মধ্যে আঙুল পুরে তীব্র সিটি বাজিয়ে দেয়। চমকে ওঠে মৃদুলা। তুলসী হাসে, মাইরি, আমি কখনও রকবাজি করিনি, মাস্তানি করিনি। সঞ্জয়ের কাছে সিটি দেওয়া শিখেছিলাম, কোনও কাজে লাগেনি। লাইফে আমি একটা মেয়েকেও টিজ করতে পারিনি...বিশ্বাস করো...

তুলসীর চোখে জল এসে যায়। তারপর বলে, এবার তুমি একটা অচেনা মেয়ে—তোমাকে আমি সিটি দিয়েছি...তুমি দাঁড়িয়ে পড়ো---ঘুরে এসে আমাকে একটা চড় মারো, কিংবা চটিজুতো...কিছু একটা করো... বিট মি...আমাকে ছেড়ে দিয়ো না...আমি রকবাজ মাস্তান নোংরা, মাইরি মৃদুল, আমাকে ছেড়ে দিয়ো না...

তুলসী কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে।

শোয়ার আগে সঞ্জয় বুকে-পিঠে পাউডার ছড়াচ্ছিল। আয়নায় গলা উঁচু করে কী একটু গলার কাছে আঙুল দিয়ে টিপে দেখল সে। তারপর রিনির দিকে ফিরে বলল, গলায় একটা লাম্প টের পাচ্ছি যেন!

কীসের লাম্প?

সঞ্জয় ঠোঁট ওলটায়, কী জানি!

তারপর আবার জায়গাটাকে টিপে দেখে। মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে যায়। লাইট নিবিয়ে বিছানায় আসতে আসতে বলে, বড় ভয় করে বুঝেছ! এখন কাজকর্ম সদ্য জমিয়ে তুলেছি...

তাতে কী হল?

কিছু না। সঞ্জয় একটু হাসে, মাঝে মাঝে হঠাৎ বড় ভয় করে আজকাল। ক্যান্সার-ফ্যান্সার যদি হয়...

দূর! অলক্ষুণে কথা!

রিনি তাকে আলতো জড়িয়ে ধরে।

তখন বহু দূরের একটা গ্রামে জাতীয় সড়কের পাশে একটা সাপের মৃতদেহকে ঘিরে পরিশ্রমী সঞ্চয়ী পিঁপড়েদের ভিড়। ললিতের বাবার ছবির পিছনে গর্ভযন্ত্রণায় অস্থির একটা টিকটিকি ডেকে উঠল।

এগারো

ললিতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দু'জনে অনেকক্ষণ চুপচাপ হেঁটেছিল। আদিত্য আর শাশ্বতী। বড় রাস্তার কাছে এসে আদিত্য হঠাৎ আপন মনে হেসে বলল, এই হচ্ছে ললিত, বুঝলে সতী, এই হচ্ছে ললিত!

শাশ্বতী বুঝল, আদিত্য কোনও গভীর ভাবনার মধ্যে আছে। হয়তো কলেজ-জীবনের স্মৃতি কিংবা অন্য অনেক তুচ্ছ সুন্দর সব ঘটনার কথা। 'এই হচ্ছে ললিত' এই কথাটা দিয়ে শাশ্বতীকে কিছুই বোঝাতে চায়নি আদিত্য, সে নিজের মনেই ললিতের ছবি দেখছে, আর মনের সেই ছবিটাকেই দেখাতে চাইছে শাশ্বতীকে। শাশ্বতী লক্ষ করল, আদিত্যর চোখ অন্যমনস্ক। ট্রামলাইন পেরোবার আগে হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে ফিরে দাঁড়াল, আমার সিগারেট!

বিপজ্জনক রাস্তার মাঝখান থেকে শাশ্বতী তার জামার হাত ধরে টেনে সরিয়ে আনল। হাসল আদিত্য।

রাস্তা পেরিয়ে আদিত্য বলল, আমার সিগারেটের প্যাকেটটা বোধ হয় চায়ের দোকানেই ফেলে এসেছি। নিয়ে আসব? তুমি একটু দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসি...

শাশ্বতী ভ্রূ কোঁচকায়, ক'টা সিগারেট ছিল প্যাকেটে?

গোটা চার-পাঁচ হবে বোধ হয়।

দূর! ওর জন্য এতটা রাস্তা যাবে! বরং এক প্যাকেট কিনে নাও।

নেব?

নাও।

আদিত্য সিগারেট কিনতে গেল কয়েক পা দূরের দোকানটায়। শাশ্বতী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল আদিত্য দোকানের আয়নায় মুখ দেখছে। চোখের কোল টেনে ধরে দেখল চোখের রং, গালের একটা ব্রণ টিপল একটু, মুখটা সামান্য বেঁকিয়ে বোধ হয় নিজেকে ভেঙাল, ধৈর্যশীল দোকানদারটি ততক্ষণ সিগারেটের প্যাকেটটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে রইল। আদিত্য হাসল একটু, তারপর সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে হাত নেড়ে কী কথা বলতে লাগল দোকানির সঙ্গে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে প্যাকেট খুলল, সিগারেট বের করে দড়ির আগুনে ধরিয়ে নিল। এবং এতক্ষণ সময় সে একবারও শাশ্বতীর দিকে ফিরে তাকাল না। যেন তার সঙ্গে যে শাশ্বতী আছে এ কথা সে ভুলেই গেছে। শাশ্বতীর মনে হয় এখন যদি সে চুপে চুপে ট্রামে উঠে সরে পড়ে তা হলেও আদিত্য হয়তো ব্যাপারটা ঠিক খেয়াল করবে না। অন্যমনস্কভাবে এসে পরের ট্রামে উঠে কোথাও চলে যাবে। অনেকক্ষণ পরে হয়তো খেয়াল হবে তার যে শাশ্বতী তার সঙ্গে ছিল। তখন যে-অবস্থায় থাক লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠে ট্রাম বাস বা ট্যাক্সি ধরে শাশ্বতীর খোঁজ নিতে ছুটবে। একদিন তারা দু'জনে সিনেমা 'হল' থেকে দুপুরের শো দেখে বেরিয়ে ভিড়ের মধ্যে আলাদা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ভিড়ের মধ্যেও লম্বা আদিত্যকে দেখতে পাচ্ছিল শাশ্বতী। আদিত্য এক বারও মুখ ফিরিয়ে তাকে খুঁজল না। সোজা এগিয়ে গেল রাস্তায়, ভিড়ের জন্য আস্তে যাচ্ছিল একটা বাস, সোজা তার পাদানিতে উঠে গেল। ব্যাপারটা কী হল বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল শাশ্বতীর। তারপর সারা বিকেল আর সন্ধে শাশ্বতীর কেবল কান্না পেয়েছিল বারবার। রাত আটটা নাগাদ তাদের বাড়িতে

এসে আদিত্য হাজির। খুব অনুতপ্ত তার চোখমুখ। তাকে আড়ালে ডেকে বলল, ছিঃ ছিঃ...আমার কী যে হয়েছিল...ইস...মাইরি, আমি একটা পাগল! আসলে..বুঝলে সতী, ছবিটা ছিল ভীষণ অ্যাবজরবিং, আমি ওই ছবিটার কথা ভাবতে ভাবতেই কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম...মাইরি দেখো, ভুলের জন্য হাতে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে রেখেছি...পানিশমেন্ট...আর ভুল হবে না। শাশ্বতী দেখেছিল আদিত্যর বাঁ হাতে উলটো পিঠে সদ্য-পড়া একটা ফোস্কা, তখনও চারধারটার চামড়া লালচে হয়ে আছে। আদিত্যর অনুতাপে কোনও ভান ছিল না, শাশ্বতী জানে। এখন তার কেবল এইটুকুই মনে হয় যে, সে এমন একটা লোককে আঁচলে বাঁধছে যে-লোকটা খানিকটা পাগল-খ্যাপা, খানিকটা উদাসীন, যার মধ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভালবাসার বোধ অনেকটা ভোঁতা হয়ে গেছে। এখন একটু দূর থেকে আদিত্যকে দেখছিল শাশ্বতী। লম্বা ঢ্যাঙা রোগা ফরসা একটা লোক এলোমেলো এক ঝাঁকড়া চুল মাথায়, শার্টের ভাঁজ ঠিক নেই— দেখলেই বোঝা যায় বড় অস্থির স্বভাবের লোক। অত্যধিক কথা বলে আদিত্য, কথা বলার সময়ে তার চোখ নাচে, মুখের চামড়া কাঁপে, হাত-পা নড়ে। বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না যে, বাগবাজারে সাত-আট কিংবা দশ পুরুষের প্রকাণ্ড একখানা দেড় বিঘার বাড়িতে সে থাকে— যেখানে শ্বেতপাথরের মেঝে, আর ঝাড়লণ্ঠন রয়েছে। আদিত্যর মুখেই শুনেছে শাশ্বতী যে, যদিও বাড়িটা শরিকে শরিকে কিছুটা ভাগ হয়ে গেছে, তবু আদিত্যরা এখনও দুটো মহল নিয়ে থাকে, যে-মহলে এখনও চোরা গুপ্ত-কুঠুরি আছে। আর আছে মাটির নীচে ঘর, সে-ঘরের কোনওটায় থাকে নগদ টাকা আর গয়না, কোনওটায় বেলেমাটির প্রকাণ্ড জালায় রাখা হয় গ্রীষ্মকালের ঠান্ডা জল, কোনও কোনও ঘর আছে যা এক সময়ে ছিল এ-মহলের ও-মহলের মধ্যে সুড়ঙ্গ-পথ। ভাবলেই ভয় করে শাশ্বতীর। ওই বাড়ির মধ্যে যদি কোনও দিন তাকে বউ হয়ে যেতে হয় (যদিও শাশ্বতীর সন্দেহ আছে, তাকে কোনও দিন আদিত্যর মা-বাবা বাড়ির বউ হিসেবে নেবে কি না!) তা হলে কত রকমের ভয়-ভাবনার মধ্যে গিয়ে পড়বে সে! সে সে-বাড়ির আচার-ব্যবহার-সহবত জানে না, সঠিক ভাষা কিংবা সভ্যতা জানে না, ওখানে চোরা গুপ্ত সব কুঠুরির মধ্যে প্রাচীন প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়ায়, কাঁকড়াবিছে লুকিয়ে থাকে, রাত্রিবেলা ডেকে ওঠে তক্ষক, সেখানে শ্যাওলা-ধরা ছাদের ফাটল দিয়ে গজিয়ে উঠছে অশ্বত্থ গাছ। কত দূরে কোন অচেনা রাজ্যে চলে যেতে হবে তাকে। যদিও বাইরে থেকে অনেকটা জমিদারের মতোই দেখায় আদিত্যদের, কিন্তু আসলে তারা জমিদার নয়। কোনওকালে ছিলও না। তাদের বংশ বেনের। চিরকাল তারা ব্যবসা করেই এসেছে। কখনও বা তাদের ব্যবসা লোহার, কখনও তেজারতির। তাদের প্রজা নেই, গ্রামে সম্পত্তি নেই। আদিত্যদের ধারণা জমিদারদের তুলনায় তারা অনেক সৎ, অনেক কম অহংকারী। আমরা কখনও প্রজার রক্ত শুষে খাইনি, বুঝেছ, সতী! আদিত্য বলে, মানুষের মাথায় পা রেখে চলিনি আমরা, প্রজার সেলাম নিইনি। আমার বাবা চিরকাল খদ্দেরদের 'বাবু' বলে ডেকেছে। অমুকবাবু-তমুকবাবু নয়, শুধু 'বাবু'। উঁচুদরের খদ্দেরকে বলেছে 'হুজুর'। বলতে বলতে হাসে আদিত্য, আমরা বিনয়ী লোক। আর রমেনটা ছিল জমিদার। পূর্ব বাংলায় কোথায় কোন ময়মনসিংহে জমিদারি ছিল ব্যাটার, চিরকাল সেই জমিদারির দাপট খাটিয়ে গেছে। পাটিশানের পরে কলকাতাতেও দেখেছি ওর সব আগেকার প্রজাদের। একবার বাসে ওকে দেখে একটা বেশ ভদ্র চেহারার লোক তাড়াহুড়ো করে সিট ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন, ছোটবাবু, বসুন। বলেই সিটটা হাত দিয়ে একটু ঝেড়েও দিল। অথচ তখন আর লোকটা রমেনদের প্রজা নয়, রমেনও নয় আর জমিদার। তবু তখনও প্রজা-জমিদার স্বত্বের সম্পর্কটা রয়ে গেছে। না, আমরা ও-রকম নই, মানুষের আত্মা আমরা কিনে নিইনি। আমরা

লাভ করেছি, এই পর্যন্ত, ব্যস! শাশ্বতী ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছে, তুমি তোমার বাবার খদ্দেরদের কী বলে ডাকো? বাবু? আদিত্য লজ্জা পেয়ে ঠোঁট উলটেছে, দূর! তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কই নেই। শাশ্বতী হাসে, লুকোচ্ছ কেন? বলো না! আদিত্য হাসে, বললে তুমি আর আমাকে ভালবাসবে না। বাঙালি মেয়েরা ভীষণ অহংকারী। তবু শেষ পর্যন্ত আদিত্য কিছুই লুকোতে পারে না, বলে দেয়। লাজুক হেসে বলেছে, ছেলেবেলায় আমিও খদ্দেরদের 'বাবু' বলে ডাকতুম। ব্যাপারটা যে অস্বাভাবিক তা বুঝতে পারতুম না। কলেজে ললিত রমেনদের পাল্লায় পড়ে আমার প্রথম লজ্জা হল। যখন আমি আমাদের খদ্দের দেখলে সম্মান করি, 'বাবু' ডাকি, তখন ও-দিকে রামেনকে দেখে বাসের সিট ছেড়ে দেয় ওর প্রজা। দেখেশুনে ঠিক করলুম আমি ব্যবসায় আর নেই। চাকরি করব। দেখো, তাই করছি। এখন আর বাবার খদ্দেরদের আমি চিনিই না। শাশ্বতী হাসে, এ মাঃ, তুমি কাউকে কোনও দিন 'বাবু' ডেকেছ ভাবতেই পারি না। আদিত্য মাথা নাড়ে, এখন আমি দুটোই অপছন্দ করি। কেউ আমাকে 'বাবু' ডাকুক, সেটাও। কাউকে আমি বাবু' ডাকি, সেটাও। স্বার্থই মানুষকে ও-রকম ডাকায়। স্বার্থই মানুষকে ছোট কিংবা বড় করে দেখায়। নইলে দেখো রমেন আর আমি একবয়সি, একই ক্লাসে পড়তুম, তবু অনেক দিন পর্যন্ত রমেনকে আমার হিংসে হয়েছে। অথচ হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। রমেনটা চমৎকার দৌড়োত, ভাল ফুটবল খেলত, গান গাইত, লম্বা চওড়া চেহারা ছিল, নায়কের মতো মুখশ্রী। সে-সব কিছুই আমার ছিল না। তবু কখনও ওর খেলাধুলো, গান বা চেহারার জন্য ওকে হিংসে হয়নি। কিন্তু যখনই মনে পড়ত বাসে একজন রীতিমতো ভদ্রলোক ওকে 'ছোটবাবু' বলে ডেকে সিট ছেড়ে দিয়েছিল, তখনই আমার বংশানুক্রমিক একটা স্বার্থে ঘা লাগত। আমি ব্যাপারটা সহ্য করতে পারতুম না। সবসময়ে রমেনের সঙ্গে নিজের তুলনা করে দেখতুম কে বড়, কে ছোট। তাই রমেনের বন্ধু হতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। ললিত বা তুলসীর কোনও কমপ্লেক্স ছিল না, ওদের সময় লাগেনি। রমেন মাঝে মাঝে ওদের ঢাউস পুরনো মোটর গাড়িটা নিয়ে কলেজে আসত, আমরা চার-পাঁচজন সেই গাড়িতে চড়ে বেড়াতে যেতাম। গঙ্গার ধার দিয়েই সাধারণত গাড়ি নিয়ে যেত রমেন। অনেক দূর গিয়ে নির্জন কোনও জায়গায় গাড়ি থামিয়ে বলত, নাম। তারপর জামা-কাপড় খুলে আন্ডারওয়্যার পরে জলে ঝাঁপ দিত, চেঁচিয়ে ডাকত আমাদের, আয়রে। কেউ কেউ নামত জলে, আমি সাঁতার জানতাম না বলে নামিনি। রমেন একদিন জোর করে ধরে নামাল। ডায়মন্ডহারবারের কাছে উথাল পাথাল গঙ্গা, সেইখানে স্রোতের মুখে আমাকে টেনে নিয়ে গেল দূরে। আমি ওর কোমর জড়িয়ে ধরে ভয়ে চেঁচাচ্ছিলাম, ও মুখ ঘুরিয়ে বলল, চেঁচাস না, শালা। লোকে আমাকে সন্দেহ করবে। এখন তুই-আমি মিলেমিশে এক হয়ে গেছি, তুই ডুবলে আমিও ডুবব, ভয় নেই। বুঝলে সতী, রমেনটা কিছু ভেবেটেবে ও-কথা বলেনি। কিন্তু হঠাৎ আমার চেঁচানি বন্ধ হয়ে গেল। কেমন যেন সাহস পেয়ে গেলাম। আমি ডুবলে রমেন ও ডুববে— এই কথাটা বলার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা হঠাৎ ভীষণ একটা আনন্দ দিয়েছিল আমাকে। চারধারে বিপুল জলস্রোত, আমি সাঁতার জানি না, রমেন—একমাত্র রমেন ছাড়া তখন আর আমার কোনও অবলম্বনই নেই। ঠিক সে সময়ে ওই কথা কোনও ভরসার কথা নয়, তব আমি ভরসা পেলাম। মনের ভয় কেটে গেল। ও না-ভেবেই বলেছিল, তুই-আমি মিলেমিশে এক হয়ে গেছি। জলের মধ্যে আমি ওর কোমর ধরে ছিলাম বলেই বোধ হয় ও এই কথা বলেছিল। কিন্তু কথাটা যত বার পরে ভেবে দেখেছি তত বারই মনে হয়েছে ওই রমেন শাল মস্ত জ্ঞানীর মতো বলেছিল কথাটা। জলে হোক, ডাঙায় হোক, সুখে হোক, দুঃখে হোক, কোথাও-না-কোথাও একবার না একবার আমাদের মিলেমিশে এক হওয়ার

কথা। কিন্তু আমরা তা হচ্ছি না। বুঝলে সতী, তারপর থেকেই আমি মনে মনে ছোট-বড়র ভাবটা আস্তে আস্তে তুলে ফেলার চেষ্টা করছি। ইচ্ছে করেই আমি বাবার ব্যবসাতে নামিনি, বাবা কত রাগারাগি করেছে। এতদিন কোন ঘুন-ধরা বনেদি পরিবারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু আমি তা করিনি। আদিত্যর এ-সব কথার মধ্যে খানিকটা সত্য ছিল, খানিকটা ছিলও না। শাশ্বতী জানে, আদিত্য সুখী ছেলে। আদরে মানুষ। সে এখনও তেমন কষ্টসহিষ্ণু নয়, কোনও দিন নিজে হাতে বাজারও করেনি। সবচেয়ে বড় কথা, এখনও নিজেদের ব্যবসা নিয়ে তার একটু অহংকার আছে, আর এখনও সে তার সেই বন্ধু রমেনকে একটু হলেও হিংসে করে। বাড়ি ছেড়ে এসে আদিত্য তাকে বিয়ে করবে, এটা ভাবতেও শাশ্বতীর ভাল লাগে না।

একটু দূর থেকে আদিত্যকে দেখছিল শাশ্বতী। অনেকক্ষণ দেখল। তারপর হঠাৎ একটু শ্বাস ছেড়ে আপন মনে বলল, পাগল!

সিগারেট ধরিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াতেই শাশ্বতী আদিত্যকে জিজ্ঞেস করল, দোকানদারের সঙ্গে কী অত কথা বলছিলে?

আদিত্য হাসল, সে অনেক কথা। প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম, এখান দিয়ে চার নম্বর বাস কতক্ষণ পর পর যায়। তারপর ওর কাচ্চা-বাচ্চা, কারবার, দেশ-গাঁওয়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম। খুব খাতির করল...

শাশ্বতী রাগ করে, আর আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম ঠায় এতক্ষণ! তুমি এক বার ফিরেও তাকালে না!

আদিত্য চুপচাপ সিগারেট টেনে গেল, তারপর অনেক ভেবেচিন্তে বলল, আমার মন ভাল নেই, তাই অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করছিলাম।

শাশ্বতী চুপ করে অন্য দিকে চেয়ে থাকে।

আদিত্য হঠাৎ হাসে, ললিতকে কেমন দেখলে?

শাশ্বতী বলল, কেমন মানে?

আদিত্য ধীর চোখে অনেকক্ষণ শাশ্বতীকে দেখে, তারপর বলে, তোমার কি মনে হয় ও ব্যাটা টিকে যাবে?

শাশ্বতী ভ্রূ কোঁচকায়, ও-সব কী কথা! আমি কী করে জানব?

আদিত্য বলে, তোমার মেলোমশাইয়ের চেহারা অসুখের পর কীরকম হয়েছিল? খুব সুন্দর?

শাশ্বতী ইতস্তত করে, অত মনে নেই।

আদিত্য মাথা নাড়ে, আজ ললিতের যে-চেহারাটা আমি দেখলাম সেটা ওর আসল চেহারাই নয়। ও দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে। অনেক ব্রাইট। কিন্তু আমি বলছি সতী, এটা ওর চেহারাই নয়। অমন ঝলমলে চোখ ছিল না ওর। আসলে এটাই ওর শেষ চেহারা।

শাশ্বতী ধমক দেয়, ট্রাম আসছে। সরে এসো।

আদিত্য শাশ্বতীর দিকে তাকায়। বলে, লোকে মরে যাওয়ার আগে সুন্দর হয়।

শাশ্বতী বলে, সবাই হয় না।

আদিত্য একটু চিন্তা করে, সবাই হয় না, কিন্তু কেউ কেউ তো হয়। ধরো যারা পাপ-টাপ খুব একটা করেনি, যারা মোটামুটি সৎ পবিত্র জীবন যাপন করেছে, তাদের হয়তো ভগবান শেষ কয়েকটা দিন সুখের

করে দেন। তখন ব্যাধি থাকে না, চেহারা সুন্দর হয়ে ওঠে, চোখ উজ্জ্বল হয়, পৃথিবীর ওপর আরও মায়া হতে থাকে। আর ঠিক এই অবস্থাতেই তারা হঠাৎ চলে যায়।

একটু চুপ করে থাকে আদিত্য, তারপর হঠাৎ বলে, মাইরি সতী, ললিতটা বরাবরই কেমন একটু পবিত্র ছিল। খুব পরোপকারী আর তেজি। তাই ওর চেহারার এই উজ্জ্বলতাটা ভাল নয়।

রাস্তায় ধুলো উড়ছে খুব। চারপাশে ভিড়। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে শাশ্বতী একটু পিছিয়ে দাঁড়ায়, তারপর বলে, ট্রামে উঠবে না?

দাঁড়াও, সিগারেটটা শেষ করে নিই। অবশেষে ওরা উঠল একটা ভিড়ের ট্রামে। শাশ্বতী মেয়েদের সিটে বসবার জায়গা পেল। আদিত্য দাঁড়িয়ে রইল।

শাশ্বতী দেখল, আদিত্যকে খুব অন্যমনস্ক লেখাচ্ছে। একগাদা লোকের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছে আদিত্য, তার চোখে চোখ পড়তেই একটু ম্লান হাসল। তারপর দীর্ঘ শরীরটা অল্প একটু নুইয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। হয়তো বন্ধু ললিতের জন্য ওর মন খারাপ। কিংবা হয়তো এখন নিজের পরিবারের গোঁড়ামি, এবং শাশ্বতীকে বিয়ে করার অনিশ্চয়তার কথা ভেবে এর মন ভাল নয়। কে বলবে কোনটা ঠিক? কিন্তু শাশ্বতী জানে আদিত্যর মন একটা গানে ঢাল জায়গা, সেখানে জল দাঁড়ায় না। মাঝে মাঝে কেবল সুখ দুঃখ বিষতা কিংবা তীব্র কোনও অনুভূতি প্লাবনের মতো এলে চলে যায়। আদিত্য কখনও কখনও তাকে ভীষণ ভালবাসে, কখনও কখনও তার কথা ভুলে যায়। শাশ্বতীর ভয় করে।

শাশ্বতী তার এই বয়সের মধ্যে খুব বেশি পুরুষ দেখেনি। তাদের পরিবারে এক ধরনের অনুশাসন ছিল। বরাবর বাইরের ঘরে পরুষমানুষ এলে তারা ভিতরের ঘরে থেকেছে। রাস্তায় কখনও কারও সঙ্গে কথা বলেনি। হোটেল-রেস্টুরেন্ট বা সিনেমায় যায়নি অভিভাবক ছাড়া। উপহার নেয়নি অনাত্মীয় পুরুষের কাছ থেকে। বাইরে থেকে ফিরতে সন্ধে হলে বরাবর তাদের কৈফিয়ত দিতে হয়েছে। এই রকম অনুশাসনের মধ্যে থেকেও তার দিদি লীলাবতীর জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কী ভাবে তা হয়েছিল তা শাশ্বতী জানে না। শুধু জানে, একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে লীলাবতীকে কয়েকজন শয়তান লোক গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। সারা রাত তারা লীলাবতীকে ব্যবহার করে খুব ভোরে ক্যালকাটা ফুটবল মাঠের বেড়ার কাছে ফেলে রেখে যায়, পৌষের শীত আর ঘাসের শিশিরের মধ্যে। লীলাবতীর জ্ঞান ছিল না, যখন তাকে কুড়িয়ে আনা হয়। তার তখন গা-ভরা জ্বর। মাস দেড়েক নিউমোনিয়া আর এক ধরনের আচ্ছন্নতার অসুখে ভুগে উঠবার পর সে যখন মাস দেড়েকের গর্ভবতী তখন সমীর সান্যাল নামে একজন উদার পুরুষ তাকে সব জেনে বিয়ে করে নিয়ে যায়। তাদের পরিবারে সেই প্রথম রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে হল, এবং সেই বিয়েতে কোনও নিমন্ত্রণও হয়নি। বরাবর রেজিষ্ট্রি বিয়ের বিরোধী তার বাবা সেই বিয়েতে সাক্ষী দিয়েছিল, আর সাক্ষী দিয়েছিল তার দাদা কালীনাথ। তারপর গত আট-দশ বছর আর লীলাবতীর কোনও খবর রাখে না তারা। সমীর সান্যাল বা লীলাবতী তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে তাদের বিপদে ফেলেনি। কোথায় কীভাবে আছে তারা কে জানে! কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকেই তাদের পরিবারের অনুশাসন অনেকটা ঢিলে হয়ে গেল। লীলাবতীর বিয়ে হয়ে গেলে বাবা এক দিন খুব গম্ভীরভাবে তাদের উঠোনে একটা গর্ত খুঁড়তে লাগল। প্রকাণ্ড গর্ত। তার ওপর লতাপাতা বাঁখারি দিয়ে একটা ছাউনি দিল। তারপর এক দিন তার মধ্যে ঢুকে জামা-কাপড় ছেড়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বসে রইল। পাড়ার লোকেরা ভিড় করে এল সেই দৃশ্য দেখতে। বাবা তার সেই গুহার মধ্যে বসে লোকের সঙ্গে

কথা বলত, নানা প্রশ্নের উত্তর দিত। বলত, দেখো, উদ্ভিদ জগৎ কত নির্বিকার, দেখো প্রকৃতির মধ্যে কোনও সমাজ নেই। আমি এইরকম নির্বিকার হতে চাই। কখনও বলত, দেখো, আমার ব্রহ্মতালু ভেদ করে একটা আমলকী গাছ গজিয়ে উঠবে। আমি ওইভাবেই আবার জন্ম নেব। তখন শাশ্বতীর বয়স আট কি নয়। বাবার সেই গুহার সামনে লজ্জায় কেউ যেতে পারত না বলে মা মাঝে মাঝে তাকে পাঠাত সেই গর্তের মুখ পাহারা দিতে। এক্কাদোক্কা কিংবা গুটি-খেলা ফেলে শাশ্বতী ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত সেই গুহার সামনে। কেউ উঁকি মারতে এলে দু'হাত ছড়িয়ে পথ আটকাত, যাবেন না। যদি কেউ প্রশ্ন করত কেন? অমনি ফিক করে হেসে ফেলত সে, বাবা যে ন্যাংটো!

সেই সময়ে তার গুহাবাসী বাবার সম্পর্কে কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক রটনা করেছিল যে, তিনি তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ, তাঁর মুখের কথা বিফলে যায় না। অনেকে আসত রেসের ঘোড়ার নম্বর বা লটারির টিকিটের ফলাফল জানতে। কিছু কিছু হয়তো বা মিলেও গিয়েছিল। তাই বাবাকে নিয়ে তখন বেশ হইচই চলছে পাড়ায়। অন্য দিকে ভেঙে যাচ্ছে তাদের পরিবার। তখন তার মা তাদের দুই ভাই আর দুই বোনকে নিয়ে দিশেহারা পাগল-পাগল। বি-এ পড়া ছেড়ে কষ্টেসৃষ্টে চাকরিতে ঢুকল কালীনাথ। বাবার আমল থেকে তারা চলে এল দাদার আমলে। অনেক গরিব হয়ে গেল তারা। হই চই করা আমোদপ্রিয় তার দাদা কালীনাথ, যাকে কোনও দিন সঠিক দাদার সম্মান দেয়নি শাশ্বতী, সেই কালীনাথ মাত্র বাইশ বছর বয়সেই হয়ে গেল তাদের অভিভাবক। চোখে রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমা, মুখখানা গম্ভীর, সারাদিন চাকরি আর টিউশানি আর রাতের কলেজে বি এ পড়তে পড়তে কালীনাথ হঠাৎ বুড়ো হয়ে গেল। তখন থেকেই কালীনাথ না-ছোড় একটা অম্বলের অসুখেও ভুগে আসছে। বাবা তার গুহায় বাস করল প্রায় বছরখানেক। তারপর সমতলে উঠে এল। বুজিয়ে দেওয়া হল সেই গর্ত! বাবা জামা-কাপড় পরতে লাগল। তবু, বাবা কোনও দিন আর পুরোপুরি ভাল হয়নি। চার-পাঁচ-ছয় মাস একরকম ভালই থাকে, তারপর আবার পাগলামি দেখা দেয়।

যদিও তাদের পরিবারটি ছিল নিরীহ শান্ত ভালমানুষদের পরিবার, তবু লীলাবতীর ঘটনার পর থেকেই তাদের পরিবারের অখ্যাতি রটে যায়। এই অখ্যাতি প্রবল সমস্যা হয়ে দেখা দেয় শাশ্বতীর মেজদি হৈমন্তীর বিয়ে দেওয়ার চেষ্টার সময়। যত বার হৈমন্তীর সম্বন্ধ এনেছে কালীনাথ তত বারই পাত্রপক্ষের কাছে বেনামা চিঠি গেছে, নয়তো কেউ-না-কেউ তাদের লীলাবতীর ঘটনার কথা জানিয়ে দিয়েছে, আরও জানিয়ে দিয়েছে যে, হৈমন্ত্রীর বাবা পাগল। পাত্রপক্ষ পিছিয়ে গেছে। ক্রমে বোঝা যাচ্ছিল যে, সম্বন্ধ করে স্বাভাবিকভাবে হৈমন্তীর বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। অন্তত যত দিন লোকে লীলাবতীর কথা একেবারে ভুলে না যায়। তাই দাদা এবং মা ভেবেছিল, যদি কেউ পছন্দ করে বা ভালবেসে বিয়ে করে, একমাত্র তবেই হৈমন্তীর বিয়ে সম্ভব। কাজেই তাদের পরিবারে মেয়েদের ওপর যে দীর্ঘকাল একটা অনুশাসন ছিল সেটা হঠাৎ আলগা হয়ে গেল। দাদা তার বন্ধুদের নিয়ে আসত বাসায়, আলাপ করিয়ে দিত হৈমন্তীর সঙ্গে, মোটামুটি ভাল ছেলে দেখে হৈমন্তীর প্রাইভেট পড়ানোর কাজে বহাল করা হল কয়েক বার, কলকাতার বাইরে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতেও বেড়াতে পাঠানো হল তাকে। হৈমন্তীর চেহারা ভাল ছিল না। সামনের দাঁত উঁচু, রং খুব কালো। প্রথম প্রথম স্বজাতি ব্রাহ্মণ ছেলেই জোগাড় করার চেষ্টা করছিল কালীনাথ। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে অন্য জাতেও হাত বাড়িয়েছিল। হৈমন্তীকে উপলক্ষ করেই তাই একদিন সহকর্মী আদিত্যকে বাসায় নিয়ে এল কালীনাথ। তাকে পরোটা আর অমলেট খাওয়াল। সে চলে গেলে মাকে ডেকে বলল, জাত-ফাত আর দেখো

না। এ বিরাট বড়লোকের ছেলে। খুব সৎ। তা ছাড়া ওদের টাইটেলটাও খুব গোলমেলে— ওরা রায়। ব্রাহ্মণ না কি অন্য কিছু তা চট করে বোঝাও যাবে না। মা কোনও উত্তর দেয়নি, অসহায়ভাবে চুপ করে ছিল।

এ-কথা ঠিক যে, তাদের পরিবারে যখন এ-সব ঘাটছিল তখন তাকে, শাশ্বতীকে, কেউ লক্ষ্যই করেনি। তার ওপর কোনও শাসন ছিল না। তবু শাশ্বতী ধরা দিল নিজের স্বভাবে।

নদীর কাছাকাছি ঘাস-ঢাকা মাটিতে যেমন একটা ভেজা ভাব থাকে তেমনই এক ভেজা-ভাব আছে তার শরীরে। অথচ তার শরীরের অনুভূতিগুলি খুব প্রখর। ছেলেবেলা থেকেই যদি কেউ তাকে আচমকা ছোঁয়, কিংবা গায়ে হাত দেয়, অমনি আপনা থেকেই তার শরীর কেঁপে ওঠে, গায়ে কাঁটা দেয়। শাশ্বতী জানে যে, তার শরীরে একটা শুদ্ধতা কিংবা পবিত্রতার ভাব রয়েছে, যেটা কোনও দিন নষ্ট করতে তার খুব কষ্ট হবে। তার তিনটে ডাক নাম আছে, মলু, ঠান্ডু আর সতী। গায়ের রং ময়লা বলে এক সময়ে বাবা তার নাম রেখেছিল মলিনা। সেই থেকে মলু। স্বভাবে ঠান্ডা বলে তার মা তাকে ডাকে ঠান্ডু। আর সকলে ডাকে, সতী। তার শরীর কিংবা স্বভাবের সঙ্গে তিনটে নামেরই কিছু মিল রয়েছে। সে স্বভাবে ঠান্ডা, লাজুক। যে-কোনও স্পর্শেই তার শরীর কেঁপে ওঠে। সম্ভবত সে-কারণেই, স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও সে পুরুষদের কাছাকাছি গেছে খুব কম। তার উপযুক্ত পুরুষ কে বা কেমন, এ-সব ভাবনা চিন্তা সে খুব কমই করেছে। কারণ সে বরাবর তার শরীর ও মনের ওই সহজাত পবিত্রতা বা শুদ্ধতাটুকুকে ভালবেসেছে, সে-শুদ্ধতা কোনও পুরুষের কাছে নষ্ট করতে তার খুব কষ্ট হবে। পাড়ার বখাটে ছেলেরা তার ওই পবিত্রতার ভাব লক্ষ করেই বোধ হয় সে হেঁটে গেলে 'সিস্টার নিবেদিতা! সিস্টার নিবেদিতা!' বলে চেঁচায়।

তার এই পবিত্রতার ভাবটুকু প্রথম নষ্ট করার চেষ্টা করে বোকা অভিজিৎ। তার প্রাইভেট টিউটর। অঙ্কে কাঁচা ছিল বলে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে কালীনাথ তার জন্য বি এস সি অভিজিৎকে ঠিক করে দিয়েছিল। অভিজিৎ অঙ্কে তুখোড় ছিল, আর সব বিষয়ে বোকা। কিছুদিন পড়ানোর পরই সে শাশ্বতীর প্রেমে পড়ে গেল। সপ্তাহে তিন দিন তার পড়ানোর কথা, লজ্জার মাথা খেয়ে সে আসত চারদিন কি পাঁচদিন। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত, তুমি দুপুরে ঘুমোও, না? তারপর দুঃখের ভান করে বলত, একজন সারা দিন রোদে রোদে ঘোরে, খেটে মরে, আর একজন ঘুমোয়! কখনও বা অঙ্ক না-মিললে সে শাশ্বতীকে মার দেওয়ার ভান করত, কানের লতি আলগোছে ধরে মাথায় ঠুস করে একটু থাপ্পড়। কখনও বা হঠাৎ চোখ ঘোলা করে বলত, দেখো তো আমার জ্বর হয়েছে কি না! কাল সারা বিকেল বৃষ্টিতে ভিজলাম! এ-সব বোকামির ফলে শাশ্বতীর ভালবাসা বেড়েছিল। অভিজিতের প্রতি নয়, তার নিজের শুদ্ধতার প্রতি। কারণ অভিজিৎ-এর কাছাকাছি সে তার শুদ্ধতাকে সবচেয়ে বেশি টের পেত।

তারপর অনেককাল আর পুরুষ ছিল না তার জীবনে। তার মেজদি হৈমন্তীকে উপলক্ষ করে যে-সব পুরুষ আসত তাদের কৌতূহলভরে দেখত শাশ্বতী। এদের মধ্যে কোন জন তার মেজদিকে পছন্দ করবে? ওই রকম কৌতূহল নিয়েই সে আদিত্যকে দেখেছিল। দূর থেকে, খুব বিষন্ন মুখে পরোটা আর অমলেট খাচ্ছিল আদিত্য। মাকে বলল, মাসিমা, আমার মন ভাল নেই। বাবার সঙ্গে ঝগড়া চলছে চার-পাঁচদিন ধরে। প্রথম দেখে আর কথা শুনে শাশ্বতী বুঝেছিল, আদিতা খুব সরল, তার মনে কথা থাকে না। আদিত্যকে তার মোটেই পছন্দ হয়নি। হৈমন্তী তার সঙ্গে অনেক কথা বলল, কিন্তু আদিত্য হৈমন্তীর সাজগোজ লক্ষ করল না, চোখে তেমন করে চোখ রাখল না। তারপরও সে অনেকবার গেছে শাশ্বতীদের বাড়িতে, কিন্তু কোনও দিনই সে বোধ হয়

বুঝতে পারেনি কেন কালীনাথ তাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। হয়তো আজও জানে না। তবে আদিত্য মিশুক ছিল, কথা বলত খুব। মাঝে মাঝে যেত তাদের বাড়ি, সবাইকে হাসিয়ে আসত কিছুক্ষণ। কখনও সে তার কৃপণ বাবার গল্প বলত, কখনও নকল করে দেখাত কীভাবে কালীনাথ অফিসে তার পেটের রোগের গল্প করে। বলার ভঙ্গিতে কত দিন তাদের সঙ্গে মা'ও হেসে গড়িয়ে পড়েছে। আদিত্য চলে যাওয়ার সময় তারা দুই বোন বারান্দায় বেরিয়ে আসত, চেঁচিয়ে বলত, আবার আসবেন। একদিন এই 'আবার আসবেন' শুনে আদিত্য থমকে দাঁড়িয়ে ইশারায় তাকে ডাকল। কাছে গেলে গলা নামিয়ে বলল, এসে কোনও লাভ আছে? যদি ভরসা দাও তবেই আসি। খামোকা এসে লাভ কী? যদিও পুরুষমানুষ খুব বেশি দেখেনি শাশ্বতী, তবু আদিত্যর কথাটা সে একপলকেই বুঝেছিল। তারপরেই একদিন আদিত্য একা তার সঙ্গে দেখা করল কলেজের সামনে, রাস্তায়...হৈমন্তীর আপত্তির কিছু ছিল না। একদিন বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে সে গুনগুন করে আদিত্যর ব্যাপারটা বলে দিল হৈমন্তীকে। হৈমন্তী একটুও আপত্তি করল না, অনেক পুরুষ দেখে সে তখন খানিকটা হকচকিয়ে আছে। কোনজন যে তাকে নেবে তা বুঝতে পারছিল না। কাজেই বিশেষ কারও ওপর তার পক্ষপাত থাকার কথা নয়।

এই আদিত্য। কখনও তাকে ছোঁয় না, খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে কাছে আসার চেষ্টা করে না, মাঝে মাঝে তার কথা ভুলে যায়। মন্দ লাগে না শাশ্বতীর। সে এই প্রথম পুরুষ দেখছে বোকা অভিজিতের পর। মাঝে মাঝে তার শরীরের সেই অমোঘ পবিত্রতাটুকুর কথা ভেবে তার মন খারাপ হয়ে যায়। আসলে বয়স। বয়সের দোষ। পাড়ার ছেলেরা তাকে 'সিস্টার নিবেদিতা' বলে ভেঙায়। কিন্তু সত্যিই তো আর সে সে-রকম কেউ নয়! শাশ্বতীদের কি নিবেদিতা হলে চলে! তাই সে সুন্দর পবিত্রতার কথা আজকাল ভুলে যায় শাশ্বতী। ট্রাম-বাসের ভিড়ে লোকজন গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, শাশ্বতী আর তেমন শিউরে ওঠে না। সে অনেকটাই ভুলে গেছে। ভুলে যাবে।

শাশ্বতী লক্ষ করল, রাসবিহারীর মোড়ের কাছে এসে গেছে তাদের ট্রাম, তবু বে-খেয়ালে অন্য মনে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আদিত্য। সে দাঁড়িয়ে আদিত্যকে বলল, নামবে না?

নামব। বলে হাসল আদিত্য।

নেমে বলল, কোন দিকে যাওয়া যায়?

আমি বাড়ি যাব। শাশ্বতী বলে।

বাড়িতে কে আছে তোমার?

কে নেই?

যে-ই থাক, আমি তো নেই!

আদিত্য হাত উঁচু করল একটা ট্যাক্সিকে। সেটা থামল না। 'শালা...' গাল দিল আদিত্য।

ট্যাক্সির কী দরকার! পয়সা কামড়াচ্ছে? শাশ্বতী বলে।

এখন বাসে-ট্রামে ভিড়।

চলো হেঁটে যাই। কোথায় যাবে?

লেক।

এইটুকু তো মোটে!

আদিত্য মাথা নাড়ে, দূর! অনেকটা রাস্তা।

দ্বিতীয় খালি ট্যাক্সিটা ধরল আদিত্য। পাশাপাশি বসে সিগারেট ধরাল। বলল, ললিতকে কেমন দেখলে?

তুমি এতক্ষণ ললিতের কথা ভাবছিলে?

আদিত্য হাসে, মাইরি সতী, ললিতটাকে আমি বড় ভালবাসতুম। বলে আদিত্য কী একটু চিন্তা করে, বলে, কিন্তু কীরকম ওর চেহারাটা দেখাল বলো তো আজ? ঠিক যেন ভগবানের বাচ্চা। ডিরেক্ট ভগবানের। তুমি লক্ষ করোনি?

আমি কি ভদ্রলোককে আগে আর দেখেছি নাকি?

আজ কেমন দেখলে?

ভগবানের বাচ্চা কেমন হয় জানি না তো!

ঠিক! আদিত্য হাসে, ওটা একমাত্র আমিই জানি।

তারপর চুপ করে থাকে।

কাছাকাছি কেউ সিগারেট খেলে গন্ধে শাশ্বতীর গা গুলোয়।

শাশ্বতী বলল, একটু সরে বসো। বাইরের দিকে মুখ করো।

আদিত্য ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকায়, আমার চেহারাটা কেমন? জিরাফের মতো?

এতক্ষণে শাশ্বতা হাসল। বলল, গায়ে মাংস লাগলে তোমাকে খারাপ দেখাবে না।

এখন দেখায়?

শাশ্বতী হাসে, কী জানি! চেহারা দেখি নাকি!

কী দেখো তবে?

চেহারা ছাড়াও অনেক কিছু থাকে।

দূর! আর কী দেখার আছে? মেয়েরা ছেলেদের আর কী দেখে? চেহারা কিংবা টাকা-পয়সা ছাড়া?

শাশ্বতী কপাল তোলে, দেখে না?

না। মাথা নাড়ে আদিত্য, বরং পুরুষরা দেখে। আজ আমি ললিতের চেহারায় যা দেখলুম, তুমি তা দেখোনি।

শাশ্বতী রেগে যায়। ঝেঁঝে ওঠে, থাকগে। আমার দেখার দরকার নেই।

আদিত্য হাসতে থাকে। তারপর আচমকা দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো গলা নিচু করে বলে, তুমি দেখোনি। কিন্তু আমি দেখেছি। তোমাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে।

শাশ্বতী কোনও উত্তর দেয় না। কিন্তু চমকে ওঠে। তার শরীর ঠিক আগের মতো এক অসহনীয় স্পর্শকাতরতায় কেঁপে যায়। কিন্তু ততক্ষণ ললিতের কথা তার সঠিক মনে ছিল না। কিন্তু চমকে উঠেই তার মনে পড়ল মুখখানা। তীক্ষ্ণ মুখ, চোখের দৃষ্টি গভীর মায়া-মমতায় জড়ানো। হয়তো আদিত্য ঠিকই বলেছে, মৃত্যুর আগে মানুষ সুন্দর হয়। ললিতকে আগে কখনও দেখেনি শাশ্বতী। কিন্তু এখন মনে পড়ল, মানুষটাকে সে সুন্দর দেখেছিল। কিন্তু এও ঠিক যে চেহারার সৌন্দর্য বলতে যা বোঝায় ললিতের তা নেই। বরং বিষণ্নতা আছে, আর আছে খুব দূরের কোনও চিন্তা। কাছেপিঠের লোকজন বা স্থানকে লোকটা ভাল করে দেখে না। আদিত্যর ও-পাশে বসে মাথা ঝুঁকিয়ে কথা বলছিল ললিত। কয়টাই বা কথা। আদিত্যর শরীরের আড়ালে

মুখখানা খুব ভাল করে দেখেওনি শাশ্বতী। তবু এখন মনে পড়ল সে-মুখে সাধু-সন্তের মতো কোনও সৌন্দর্য ছিল। শাশ্বতী চমকে উঠল। কিন্তু ভেবে দেখল, আদিত্য দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কথা বলছে। শাশ্বতীকে অত অল্প সময়ে ললিত কতটুকু দেখেছে? শাশ্বতী জানে যে তার চেহারায় হঠাৎ দেখে পছন্দ হওয়ার মতো কিছু নেই।

কথাটা শুনে সে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আদিত্যর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আদিত্য তখনও হাসছিল, বলল, তুমি যখন বলছিলে যে তোমার বাড়ি মাইকেল মধুসূদনের বাড়ির কাছেই ছিল, যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষতীরে তখন হঠাৎ ওর মুখ-চোখ কেমন হয়ে যাচ্ছিল। বিহ্বল ...হ্যাঁ, বিহ্বল কথাটাই ঠিক খাটে।

শাশ্বতী চুপ করে চেয়ে রইল।

খাপছাড়াভাবে আদিত্য বলল, ও শালা কবি।

একটু চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল আদিত্য, শালা মরে যাবে।

আদিত্য ঝুঁকে শাশ্বতীর একখানা হাত ধরার চেষ্টা করে। তারপর আবার হাত টেনে নিয়ে শাশ্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট পিট করে বলে, মাইরি, সতী, তুমি রাগ করলে না তো! আমি যা দেখেছি তাই বলছি। অন্যায় হল?

শাশ্বতী আস্তে মাথা নাড়ে, তুমি ভুল দেখেছ।

সিগারেটের ধোঁয়া গলায় রেখে আদিতা অস্পষ্ট স্বরে বলল, ললিতকে আমি চিনি। আমরা যখন একসময়ে মেয়েছেলে নিয়ে আলোচনা করতুম, কার কীরকম মেয়ে পছন্দ, তখন প্রায়ই ললিত শ্যামলা রঙের মেয়ের কথা বলত। বলত, বাঙালি মেয়ের খুব ফরসা সাহেবি রং ওর পছন্দ নয়। আর বলত, সে মেয়ের সুন্দর চোখ আর অনেক চুল থাকবে।

আদিত্য মিটমিট করে শাশ্বতীর দিকে তাকায়, তোমার সঙ্গে মিলে যায়।

শাশ্বতীর বুক কাঁপে হঠাৎ। কেমন ভয় করে ওঠে। বলে, কী সব যা-তা বলছ!

সামান্য বিস্বাদ মুখ করে আদিত্য, মৃদু গলায় বলে, যা-তা কেন? এর মধ্যে তো কোনও দোষ নেই। তুমি যখন বলছিলে 'আপনি ভাল হয়ে যাবেন' তখন ওর মুখ-চোখ ঝলমল করে উঠল।

দূর!

আদিত্য হাসে, অন্যমনস্কভাবে বলে, দোষ কী সতী? ওর যা চেহারা দেখলাম আজকে—একটা টপ চেহারা—এই চেহারা নিয়ে বেশি দিন টেকে না কেউ। ওর দিন শেষ। তোমাকে দেখে ও যদি আনন্দ পেয়ে থাকে, তাতে দোষ কী? বরং আমি তোমাকে ওর কাছে নিয়ে যাব...

ট্যাক্সিটা থামিয়ে হঠাৎ মুখ ফেরায় ট্যাক্সিওয়ালা। সে মুখটায় বসন্তের দাগ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে কালো রোদ চশমা— রুক্ষ মুখখানা ফিরিয়ে বলল, কোথায় যাব?

সোজা। বলল আদিত্য। ট্যাক্সিওয়ালা সামান্য হাসে, সোজা আর কোথায়? রেল লাইনের ও-পাশে ট্যাক্সি যাবে না।

শাশ্বতী দেখল কথায় কথায় তারা বালিগঞ্জ স্টেশনে এসে পৌঁছে গেছে। তাদের যাওয়ার কথা লেকের দিকে, গড়িয়াহাটা হয়ে। গড়িয়াহাটা কখন পেরিয়ে গেছে!

আদিত্য ঠান্ডা গলায় ট্যাক্সিওয়ালাকে বলল, সোজাই যাব, রেললাইনের ও-পাশে। চলুন।

শাশ্বতী আদিত্যকে খানিকটা চেনে। ওই যে ট্যাক্সিওয়ালা বলল যে রেল লাইনের ও-পাশে যাবে না, তাইতেই জেদ চেপে গেছে আদিত্যর। কাজ থাক বা না-থাক সে এখন রেললাইনের ও-পাশেই যাবে।

শাশ্বতী মৃদু ধমক দিল আদিত্যকে, কী হচ্ছে?

তারপর ট্যাক্সিওয়ালার রূঢ় মুখখানার দিকে চেয়ে নরম গলায় বলল, আপনি গাড়ি ঘুরিয়ে নিন। গড়িয়াহাটায় আমরা ট্যাক্সি ছেড়ে দেব।

আদিত্য হঠাৎ বিড়বিড় করে ওঠে, না। গেলে তুমি গড়িয়াহাটায় যাও। আমি সোজা যাব।

কেন?

এমনিই।

ট্যাক্সিওয়ালা শাশ্বতীর দিকেই চেয়ে ছিল। শাশ্বতীর মুখ-চোখ ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল অপমানে।

ট্যাক্সিওয়ালা বলল, আপনারা ঠিক করে নিন কোথায় যাবেন। আমি গড়িয়াহাটায় পৌঁছে দিতে পারি, কিন্তু রেললাইনের ও-পারে যাব না।

কেন? আমি পয়সা দেব না? আদিত্য চেঁচিয়ে বলে।

দিলেই কী! ট্যাক্সিওয়ালা ঝেঁকে ওঠে, ও-পাশে ঘিঞ্জি রাস্তা, ভিড়, রাস্তা খারাপ, আমাদের ঝামেলা পোয়াতে হয়। গাড়িতে চোট হয়ে গেলে সে পয়সা আপনি দেবেন?

চেঁচামেচি শুনে দু'-একজন লোক ট্যাক্সির জানালায় উঁকি মারে। অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে শাশ্বতী। তার ভয় করে। অভিমানে ঠোঁট কাঁপে তার। চোখে জল আসি-আসি করে। টলমলে চোখে সে দেখতে পায়, আদিত্য সামনের সিটের গায়ে থাপ্পড় মেরে বলছে, যেতে হবে, যেতে হবে। আর ট্যাক্সিওয়ালা মাথা নেড়ে বলছে, আমি যাব না। যা খুশি করুন।

যা কখনও করে না শাশ্বতী, তাই করল হঠাৎ। ঝুঁকে আদিত্যর উগ্র হাতখানা ধরল। শরীর কেঁপে উঠল তার, উত্তেজনার মধ্যেও। কাঁপা গলায় বলল, কী করছ তুমি? গাড়ি ঘোরাতে বলো।

আদিত্য একটুক্ষণ চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর শান্তভাবে ট্যাক্সিওয়ালার দিকে চেয়ে হেসে বলে, ঠিক আছে, গাড়ি ঘুরিয়ে নিন।

ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়।

গড়িয়াহাটায় ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে লেকের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আদিত্য হঠাৎ বলল, সতী, তুমি অত ভিতু কেন? ও শালাকে আমি ঠিক নিয়ে যেতুম রেললাইনের ও-পাশে কসবায়, কিংবা যেখানে খুশি।

তখনও শাশ্বতীর বুকে চাপ বেঁধে কণ্ঠরোধ করে আছে একটা অসহায় কান্নার ভাব। সে নাক টেনে স্খলিত গলায় বলল, সেটা খুব বাহাদুরি হত, না?

আদিত্য হাসে, বাহাদুরি নয়। কিন্তু ও যাবে না কেন?

অসুবিধে আছে বলেই যাবে না।

আবার চিড়বিড়িয়ে ওঠে আদিত্য, অসুবিধে ঘোড়ার ডিম।

রাগে লাল হয়ে যায় আদিত্যর ফরসা মুখ। শাশ্বতী লক্ষ করে। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটে তারা। একসময়ে হঠাৎ আবার হেসে ওঠে আদিত্য। বলে, বিপদে পড়লে তোমাকে খুব অদ্ভুত দেখায়। আজ দেখলাম।

শাশ্বতী উত্তর দেয় না।

আদিত্য আপন মনে বলে, খুব প্যাশনেট। কিন্তু এমনিতেই তুমি ভীষণ ঠান্ডা। তোমার উত্তেজনা নেই। না?

শাশ্বতী উত্তর দেয় না। কিন্তু তার সামান্য লজ্জা করে।

আদিত্য বলল, আজ আমি মানুষজনকে কেমন উলটোপালটা দেখছি। ললিতকে কেমন দেখলাম। হঠাৎ তোমাকেও! তোমার এত প্যাশন কোনও দিন দেখিনি!

অনেকক্ষণ ধরেই আদিত্য কী একটা কথা তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাইছে, শাশ্বতী বুঝতে পারছে না। ললিতের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর থেকেই আদিত্য অন্য এক রকমের ব্যবহার করছে তার সঙ্গে। অকারণ ঝগড়া করল ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল ললিতের তাকে খুব পছন্দ, বারবার জিজ্ঞেস করল ললিতকে সে কেমন দেখল। আদিত্যর সঙ্গে তার সম্পর্কটা মাত্র ছ'-সাত মাসের পুরনো। এই অল্প সময়ে সে আদিত্যকে খানিকটা চিনেছে, খানিকটা চেনেওনি। আজ, এখন আদিত্যকে তার খুব অচেনা লাগছিল। তার রহস্যময় কথাবার্তা ভালও লাগছিল না তার। আদিত্য আবার ঘুরে ফিরে ললিতের কথা উল্লেখ করায় সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রাস্তায় ভিড়। অন্ধের মতো এলোপাথাড়ি হাঁটছে লোকজন, গায়ে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। তবু ফুটপাথের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে শাশ্বতী বলল, তুমি কী বলতে চাও, স্পষ্ট করে বলো।

আদিত্য থতমত খেয়ে যায়। বলে, কী স্পষ্ট করে বলব?

তুমি একটা কিছু বলতে চাইছ, আমি বুঝতে পারছি না।

দূর! বলে হাসল আদিত্য। তারপর বলল, চলো।

হাঁটতে হাঁটতে আবার হাসিঠাট্টার ছলে আদিত্য বলে, দেখো, সতী, দেখো বিবেকানন্দের মূর্তি আর ওই দেখো রামকৃষ্ণ মিশন। ওই বাড়িটার ভিতরে কখনও গেছ তুমি? গেলে তোমার মনে হবে ঠিক আমেরিকার কোনও বড়লোকের বাড়িতে ঢুকেছ...

শাশ্বতী আদিত্যর মুখ একপলক দেখে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল।

আদিত্য কিছুক্ষণ আবোল-তাবোল বকে গেল। তারপর হঠাৎ ওপর দিকে হাত ছুড়ে বলল, দূর ছাই! তুমি এত চালাক কেন?

শাশ্বতী আদিত্যর মুখ একপলক দেখে নিল। আদিত্য ভ্রূ কুঁচকে আছে।

লেকের পারে ঘাস-জমিতে বসে আদিত্য বলল, ঠিক সতী, আমি তোমাকে একটা কিছু বলতে চাইছি।

কী সেটা? মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করে শাশ্বতী।

ললিতকে তুমি কেমন দেখলে?

সেই পুরনো প্রশ্ন? এ পর্যন্ত কয়েক বার জিজ্ঞেস করল আদিত্য।

শাশ্বতী অবাক হয়। বলে, আবার সেই এক কথা?

আদিত্য লজ্জা পেয়ে মুখ নামায়। শাশ্বতী দেখে আস্তে আস্তে ওর মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে।

মুখ নিচু করেই আদিত্য বলল, সতী, আমি ভীষণ হিংসুক। ছেলেবেলা থেকেই। আমি ব্যবসাদারের ছেলে, আমার মনে এতটুকুও মহত্ত্ব নেই।

শাশ্বতী সঠিক বুঝল না। তবু বলল, কী-সব বলছ?

ম্লান হাসে আদিত্য। তারপর বলে, সতী, আমাদের পরিবারে কোনও কালচার নেই, বাপ-দাদাদের মধ্যে আমিই প্রথম গ্র্যাজুয়েট। জোর করে পড়েছিলুম, নইলে ম্যাট্রিক ক্লাসের আগেই আমার ব্যবসাতে নেমে পড়ার

তাতে কী?

তাতে অনেক কিছু সতী। কিছুতেই আমার নিজেকে তোমার সমান বলে মনে হয় না। ফাঁক থেকে যাচ্ছে। কেবল মনে হয়, তোমার মধ্যে বংশানুক্রমিক একটা কিছু আছে যা আমি ধরতে পারছি না! তোমার সঙ্গে আমার জাত মেলে না।

শাশ্বতী স্তম্ভিতভাবে আদিত্যর ম্লান মুখ দেখে। তারপর আকুল হয়ে বলে, ছিঃ। এ-সব কী কথা? জাত আবার কেউ মানে নাকি আজকাল?

আদিত্য মাথা নাড়ে, সে-জাত নয়। কিন্তু মানুষের স্বভাব অনুযায়ী তো এক-একটা জাত থাকে। সেই জাত মিলছে না।

শাশ্বতী গম্ভীর হয়ে বলে, হঠাৎ একথা কেন?

কমপ্লেকস। আদিত্য উত্তর দেয়। একটু চুপ করে থেকে বলে, তুমি আর ললিত চায়ের দোকানে আমার দু'পাশে বসে ছিলে। খুব অল্পই কথা হয়েছে তোমাদের। যা কথা বলার আমিই বললুম, হাসিঠাট্টা করলুম। কিন্তু তোমরা দু'জনে আমার দু'পাশে বসতেই আমার মনে হয়েছিল তোমরা দু'জন এক জাতের। আমি তোমাদের সমান নই। আর তক্ষুনি আমার মনে হচ্ছিল, তোমরা, তুমি আর ললিত, পরস্পর নিঃশব্দে কথা বলছ। সে-কথা চোখ-মুখের কোনও ইঙ্গিতে নয়। সেটা হচ্ছিল আরও রহস্যময় সাংকেতিক কোনও সূত্রে, যা আমি বুঝতেই পারলুম না। সেটা বোঝার সাধ্যই আমার নেই, আমার জাত একদম আলাদা। অথচ তোমাদের মধ্যে তেমন কোনও কথাবার্তাই হয়নি, এমনকী তোমরা কেউ কাউকে খুব ভাল করে দেখোওনি। একবার তুমি কেবল ব্যাকুল হয়ে বলেছিলে, দেখবেন, আপনি ভাল হয়ে যাবেন, আর-একবার ললিত তোমার বাড়ি যশোরে শুনে আগ্রহ দেখিয়েছিল। ব্যস, এইটুকু। তবু আমার মনে হচ্ছিল, আমাকে মাঝখানে রেখে অনেক কথা নিঃশব্দে চালাচালি হয়ে গেল তোমাদের। আমি স্বার্থপর, ব্যবসাদারের বাচ্চা, ফালতু পার্টি, মাঝখানে বোকার মতো বসে রইলুম। সে-সব কথা ধরতেই পারলাম না। আমার সেই সূক্ষ্ম অনুভূতিই নেই। যা ললিতের আছে। তোমারও আছে। কিন্তু আমার নেই।

শাশ্বতীর গলা আটকে ছিল। কথা বলতে পারছিল না সে। আদিত্যর লাল আভার লাজুক মুখখানা গভীর তৃষ্ণা এবং বিতৃষ্ণায় দেখতে দেখতে তার চোখে জল এসে গেল। কিন্তু চোখের জল টের পেল না সে।

খুব কষ্টের সঙ্গে সে বলল, ও-রকম কিছুই হয়নি।

জানি। আদিত্য নরম সুরে বলল, কিন্তু আমার সন্দেহ হয়েছিল।

সিগারেট ধরায় আদিত্য। তারপর বলে, ললিতকে আজ অসম্ভব সুন্দর দেখেছিলাম আমি। তোমাকে সে কথা বারবার বললাম, কিন্তু তুমি স্পষ্ট স্বীকার করলে না। আমার সন্দেহ বেড়ে গেল। মনে হল, তুমিও ওর ওই অসম্ভব সুন্দর চেহারাটা ঠিকই দেখেছ, কিন্তু মুখে বলছ না। বলছ না কারণ সেটা তোমার গোপন কথা। তোমরা একে অন্যকে বুঝেছ, কিন্তু আমাকে সেটা বুঝতে দিতে চাও না।

শাশ্বতী কিছু বলতে চেষ্টা করে। পারে না।

আমি একটা ছোটলোক। আদিত্য বলে, আমি হিংসুক। কিন্তু সত্যি বলো সতী, ললিতকে তুমি কেমন দেখলে?

শাশ্বতী শিউরে ওঠে।

আদিত্য! হায় আদিত্য! আদিত্য এতক্ষণ ধরে না খুঁচিয়ে তুললে ললিতের মুখ শাশ্বতীর মনেই পড়ত না। আকুল হয়ে মাথা নিচু করে কাঁদে শাশ্বতী।

আদিত্যর গলা ভারী হয়ে এসেছিল। সে আস্তে আস্তে বলল, আমি ভীষণ নোংরামি করছি সতী। তবু তুমি বলো ললিতকে তুমি কেমন দেখলে আজ?

বলতে বলতে একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দেয় আদিত্য, আমাকে ছুঁয়ে বলো, সতী!

শাশ্বতী মুখ তুলল। তার দিকে বাড়ানো আদিত্যর হাতখানা দেখেই হঠাৎ শিউরে উঠল তার শরীর। তার সেই জন্মগত এক অদ্ভুত পবিত্রতা ও শুদ্ধতার দিকে বাড়ানো পুরুষের হাত। একটু থমকে যায় শাশ্বতী।

তারপর হঠাৎ আদিত্যর হাতখানা আকুল হয়ে চেপে ধরে দু'হাতে। শরীর ভয়ংকর কেঁপে ওঠে তার, চমকে ওঠে মন। দুরদুর করে কাঁপে পায়ের তলার মাটি।...ঠিক, এ-কথা ঠিক... ললিতকে সে সুন্দর দেখেছিল...সন্ত যোগীর মতো সুন্দর...

তবু শাশ্বতী ফিসফিস করে বলে, ললিতকে আমি একটুও সুন্দর দেখিনি। বিশ্বাস করো।

বারো

সে মিথ্যে কথা বলেছিল।

ভোর রাত্রে পাতলা ঘুমের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছিল শাশ্বতী। দেখল, ভীষণ অন্ধকারের ভিতর মেঠো পথ দিয়ে লণ্ঠন হাতে একটা লোক চলে যাচ্ছে। লোকটার শরীর দেখা যায় না, কেবল লণ্ঠনের ম্লান আলো তার রোগা, ধুলো মাখা, চলন্ত পা দু'খানার ওপর পড়েছে। লণ্ঠনের আলোয় রহস্যময়, ভৌতিক সব ছায়া নেচে যাচ্ছে। একই স্বপ্ন, দৃশ্য বারবার। যত বার চোখে একটু ঘুম আসে শাশ্বতীর, তত বার সেই মেঠো পথ দেখে, লণ্ঠনের আলোয় চলে যাচ্ছে দু'খানা পা। চমকে তার ঘুম ভেঙে গেল অনেক বার।

যত বার ঘুম ভাঙে শাশ্বতীর, তত বারই চোখ খুলে সে দেখে অন্ধকার ঘরে আবছা মশারির চাল দেখা যাচ্ছে। ভয়ে সিটিয়ে গিয়ে সে জোর করে চোখ বুজে ফেলে, শ্বাস বন্ধ করে থাকে অনেকক্ষণ। দিনের বেলা এই ঘরটা তার খুব চেনা, কিন্তু নিশুতি রাত্রে এই চেনা ঘরটা আর তাদের থাকে না। প্রেতাত্মাদের হাতে চলে যায়। মাঝরাতে হয়তো বা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে চোর, কিংবা ধর্মনষ্টকারী পুরুষেরা। তাই কোনও দিন মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে শাশ্বতী পরিষ্কার টের পায়, তাদের ঘরে এবং ঘরের বাইরে সর্বত্র একটা অপার্থিব অচেনা পরিবেশ। নিঃশব্দে কারা যেন ফাঁদ পাতছে, ভয় দেখানোর ষড়যন্ত্র করছে। তাই নিঃসাড়ে শুয়ে থাকে শাশ্বতী, নিশ্বাসেরও শব্দ করে না, বুকের হৃৎপিণ্ড ধকধক শব্দ করতে থাকে বলে অস্বস্তি বোধ করে। নিজেকে জড়সড় করে কাঠ হয়ে শুয়ে থেকে সে তখন কারও জেগে থাকার একটু শব্দ শোনার জন্যে অপেক্ষা করে। কারও একটি গলাখাঁকারি, কিংবা কোনও বাড়ির দরজা খোলার শব্দ, কিংবা যদি কেউ রাস্তা দিয়ে জুতো মশমশিয়ে হেঁটে যায়, এ-রকম যে-কোনও খুব তুচ্ছ একটু শব্দের জন্য সে কান খাড়া করে থাকে। কেউ জেগে আছে টের পেলে নিশ্চিন্ত হয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে।

প্রথম বার স্বপ্নটা দেখে শাশ্বতী তেমন কিছু বুঝতে পারেনি। ঘুম ভেঙে মাঝরাতের সেই ভয় হয়েছিল তার। হৈমন্তীর কাছাকাছি একটু সরে গিয়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রইল সে। একসঙ্গেই শোয় তারা, কিন্তু শাশ্বতী পারতপক্ষে কখনও হৈমন্তীকে ছোঁয় না। কেননা তার শরীর কাঁপে, শিরশির করে। তা ছাড়া হৈমন্তীর শরীরের একটা বিশ্রী ঘামার দোষ আছে। শীত-গ্রীষ্মে সবসময়েই ও ঘেমে তুকতুকে হয়ে থাকে। ছুঁতে একটু ঘেন্না করে শাশ্বতীর। আজও প্রথম বার শাশ্বতী ছোঁয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় বার আবার সে একই স্বপ্ন দেখল, লণ্ঠনের আলোয় মেঠো পথে দু'খানা পা হেঁটে যাচ্ছে। এবার, ভীষণ চমকে উঠল শাশ্বতী। একই স্বপ্ন দু'বার কেউ দেখে নাকি? ঘুম ভেঙে তার ভীষণ অবাক লাগল। দু'হাত মুঠো করে, দাঁত চেপে, চোখ বন্ধ করে সে হৈমন্তীর খুব কাছাকাছি সরে গেল। মাঝরাতের যে-পৃথিবী সেটা তাদের নয়, মাঝরাতের পৃথিবী চলে যায় চোর কিংবা অসৎ মানুষ, অশরীরী আর স্বপ্নের রহস্যময়তার হাতে। শাশ্বতীর বালিশ গরম হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পাশ ফিরে শুতে তার সাহস হল না। সে আস্তে আস্তে হৈমন্তীকে ঠেলা দিয়ে জাগানোর চেষ্টা করল। কিন্তু হৈমন্তীর ঘুম খুব গাঢ়। সে একটু বোকাসোকা ভালমানুষ, বুদ্ধি বেশি নেই বলেই বোধ হয় হৈমন্তী অত নিঃসাড়ে ঘুমোতে পারে। হৈমন্তী জাগল না। শাশ্বতী অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকল। তারপর সে ক্ষীণ, খুব ক্ষীণ একটু গানের রেশ

শুনতে পেল। অনেক দূরে, তাদের কলোনির বাইরে কিংবা যাদবপুর থেকেও দূরে কোথাও একটা মাইক বাজছে। সম্ভবত রাতজাগা কোনও অনুষ্ঠান। খুবই ক্ষীণ সেই শব্দ, মশা ওড়ার শব্দের চেয়েও মৃদু। তবু অনেকটা স্বস্তি বোধ করে শাশ্বতী ঘুমিয়ে পড়ে। আবার একই স্বপ্ন দেখে সে। আবার ঘুম ভেঙে যায়। ভয় পায় সে। তারপর বহু চেষ্টায় মাইকের সেই আন্দাজি শব্দটা শুনবার চেষ্টা করে। তারপর ঘুমোয়।

ভোর রাত্রে পাতলা ঘুমের মধ্যে সে আবার সেই মেঠো পথ, লণ্ঠন আর রোগা দু'খানা পা দেখতে পেল। হঠাৎ তীব্র ভয়ে চমকে উঠল তার বুক। ছটফট করতে করতে শাশ্বতী হঠাৎ জেগে উঠেই টের পেল তার নিজের গলায় একটা অদ্ভুত গোঙানির শব্দ হচ্ছিল এতক্ষণ। সে সজাগ হয়ে সেই গোঙানির শেষ একটু শব্দ শুনতে পেল। ভীষণ অবাক হয়ে চোখ খুলে রইল শাশ্বতী। তার শরীর অবশ, চোখ-মুখে একটা পোড়া-পোড়া জ্বালার ভাব, তালু বুক শুকিয়ে আছে তেষ্টায়। সে টের পেল বাইরে অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে, ঘরের টিনের বেড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে বাইরের একটা ফিকে সাদাটে ভাব চোখে পড়ে। টিনের চালের ওপর হয় শুকনো পাতা, নয়তো শিশিরের ফোঁটা পড়ার টুপ-টাপ শব্দ হয়। ভোর হয়ে আসছে, এখন পৃথিবী থেকে সরে যাচ্ছে অশরীরী প্রেতাত্মা কিংবা স্বপ্নের মানুষেরা। এখন আর ভয়ের কিছু নেই। তবু শাশ্বতীর বুকে তীব্র একটা ভয় বাঘের থাবার মতো বসে রইল। একই স্বপ্ন কেউ এত বার দেখে!

এ-স্বপ্নটার ভয়েই আর ঘুমোতে ইচ্ছে করল না তার। স্বপ্নটা এই ঘরের আনাচে-কানাচে অপেক্ষা করে ওত পেতে আছে। সে ঘুমোলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে আসবে। শাশ্বতী আস্তে আস্তে উঠে বসল। হৈমন্তীকে আর-একবার জাগানোর জন্য সে হাত বাড়িয়েছিল, হঠাৎ সেই শিরশির শীতভাবে তার শরীর কেঁপে ওঠে। আর হঠাৎ মনে পড়ে যায়, গত কাল, গত কাল বিকেলে সে একটা মিথ্যে কথা বলেছিল। আদিত্যকে, তার গা ছুঁয়ে।

ভোর রাত্রির শান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে স্থির হয়ে একটু বসে রইল শাশ্বতী। হৈমন্তীর শরীরের দিকে বাড়ানো হাতখানা টেনে আনল। তারপর দু'হাত কোলের ওপর রেখে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে চোখ বুজল। কথাটা সত্য ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কথাটা সে ইচ্ছে করে বলেনি। কাল বিকেলে হঠাৎ আদিত্য পাগল না হলে ললিতের মুখ তার মনেই পড়ত না। পড়লেও সে আস্তে আস্তে ক্রমশ ভুলে যেত সে ললিতকে কেমন দেখেছিল। কিন্তু আদিত্য ভুলতে দিল না, মনে পড়িয়ে দিল। আসলে মুখোমুখি ললিতকে সে কেমন দেখেছিল কে জানে! কিন্তু পরে যখন আদিত্য তাকে নানা কথার মার দিয়ে আস্তে আস্তে একটা কোণে ঠেলে নিয়ে গেল, যখন বারবার জিজ্ঞেস করল সে কেমন দেখেছিল ললিতকে, তখন, হঠাৎ তখনই শাশ্বতীর মনে হয়েছিল যে, সে ললিতকে সুন্দর দেখেছে— সন্ত-যোগীর মতো সুন্দর— অপার্থিব সেই রূপ। আশ্চর্য, আদিত্য তাকে খোঁচা না দিলে এ-কথাটা তার মনে পড়ত না! আর যখনই এই অতি সত্য কথাটা তার মনে এসেছে, ঠিক তখনই সে আদিত্যর গা ছুঁয়ে বলেছে যে, সে ললিতকে একটুও সুন্দর দেখেনি।

মিথ্যে কথা। সে মিথ্যে কথা বলেছিল।

কেউ ছুঁলে শরীর কেঁপে ওঠার যে বিশ্রী একটা অনুভূতি শাশ্বতীর ছিল এত কাল, সেটা আজকাল কমে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। আদিত্যর সঙ্গে মিশবার পরে সেটা আরও কমে গিয়েছিল। শাশ্বতী বুঝতে পারছিল, এবার তাকে শরীর দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কাল সন্ধেবেলায় যখন আদিত্য তাকে যাদবপুরের বাসে তুলে দিচ্ছে, তখন সেই এক-চাপ ভিড়ের বাসে ওঠার সময় অচেনা লোকজনের শরীরে লেগে ভয়ংকর শিউরে

উঠছিল তার শরীর। সে টের পাচ্ছিল তার প্রতিটি রোমকূপে খর বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। আবার আগেকার মতোই স্পর্শকাতর হয়ে যাচ্ছে সে। সারাটা সন্ধে তার চোখ-মুখ ভেজা-ভেজা ছিল, বুকে ঠান্ডা-বসার মতো একটা কান্নার ভাব ভার হয়ে ছিল। সন্ধেবেলা সে বাড়িতে ফিরে কয়েক বার বই খুলে অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করেছে, না পেরে হাজরাদের বড় মেয়ে শিবানীর সঙ্গে রাস্তায় পায়চারি করে গল্প করেছে অনেকক্ষণ, রাত্রে ভাল করে খেতে পারেনি, যদিও তার প্রিয় সোরা-মাছ রান্না হয়েছিল কাল, তারপর শোয়ার সময় রোজ যা করে শাশ্বতী, বালিশে আঙুল দিয়ে ঠাকুরদেবতার নাম লেখা, সেটা লিখতেও ভুলে গিয়েছিল।

সেই কারণেই সে কি দুঃস্বপ্ন দেখেছে! একই স্বপ্ন দেখেছে বারবার।

না। বোধ হয় তা নয়। ঠাকুরদেবতার নাম লিখেও অনেক বার ভয়ের স্বপ্ন দেখেছে শাশ্বতী। তা ছাড়া, এ-স্বপ্ন বোধহয় ভয়ের স্বপ্ন ছিল না। মেঠো পথে লণ্ঠন হাতে একটা লোক চলে যাচ্ছে, তার শরীর দেখা যায় না। কে লোকটা! কোথায়ই বা যাচ্ছে। কিছুই বোঝা যায় না। গ্রাম-দেশ কখনও দেখেনি শাশ্বতী। তবু তার স্বপ্নে কোথা থেকে এল ওই মেঠো পথ! না, স্বপ্নটা ভয়ের ছিল না। বরং রহস্যময়। বারবার না দেখলে এই স্বপ্ন তার মনেও থাকত না। তবে সে কেন বারবার দেখেছিল?

শাশ্বতী স্থির হয়ে বসে চেয়ে রইল। তার স্পর্শকাতর শরীরে শিউরোনো রোমকূপ, গায়ে জ্বরজ্বর ভাব, তালু-গলা শুকিয়ে আছে তেষ্টায়, চোখ জ্বলছে, পেট ডাকছে কলকল করে, তার রাতের খাবার হজম হয়নি। তবু শারীরিক অনুভূতিগুলো সে সঠিক টের পাচ্ছিল না। তার মনে পড়ছিল যে, গতকাল সে আদিত্যকে ছুঁয়ে একটা ভীষণ মিথ্যে কথা বলেছিল, আর সারা রাত ধরে সে একটা অচেনা-অজানা লোকের দু'খানা পা স্বপ্নে দেখেছে। মনে মনে কোনওটার সঙ্গে কোনওটাই তার মিলছিল না। কেবল মনে হয়, তার মনের গভীরে কোথাও এক অতি রহস্যময় সূত্রে সেই মিথ্যে কথাটার সঙ্গে স্বপ্নে-দেখা লোকটার একটা সম্পর্ক রয়ে গেছে।

নিজেকে সামলাতে পারছিল না শাশ্বতী। খুব অস্থির লাগছিল তার। ঘরের মধ্যে ভোর রাত্রির এক অদ্ভুত আলো-আঁধারি। মশারির সাদা গায়ে অস্পষ্ট সব ছায়া। বাইরে কখনও কখনও ভোরের কাক ডাকছে। এখনও তেমন আলো ফোটেনি বলে পাখিরা বাসা ছাড়েনি। নানা অস্পষ্ট চিন্তা, স্মৃতি, স্বপ্ন তার মাথার মধ্যে ঘুলিয়ে উঠছিল। অকারণ। আর, একটা ভয়।

সকালের দিকেই ঘুম শাশ্বতীর প্রিয়। কিন্তু ভয়ে সে ঘুমোতে পারল না। চুপচাপ বসে রইল। অনেকক্ষণ। তারপর পাশের ঘরের দরজায় ছিটকিনি আর আড়কাঠ খোলার শব্দ শুনল সে। মা।

এত সকালে সে কোনও দিন ওঠে না। আজ উঠে বাইরে এসে ভোরবেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। এখন শরৎকাল, সকালের দিকে সামান্য কুয়াশা হয়। একটু শীত করে। উঠোনজোড়া বাগান ভিজে আছে, সতেজ দেখাচ্ছে গাছপালা। ঝাঁকড়া জামরুল গাছটার পেশি-ফোলানো পুরুষ চেহারা, তার প্রকাণ্ড গা বেয়ে নেমেছে শিশিরের জল। অল্প কুয়াশার একটু আবছা তার ওপরে ডালপালা। রাস্তার ও-পাশে বাড়িগুলো দিনের বেলা রোদে যেমন দেখায় তেমন দেখাচ্ছে না এখন। পাতলা কুয়াশায় ডুবে যেন জলের তলাকার দৃশ্যের মতো দেখায়। কুয়াশার মধ্যে ছায়ার মতো ওড়াউড়ি করছে কাক।

শাশ্বতী দেখে উঠোনের এক ধারে বসে মা তোলা-উনুনের ছাই বের করছে। মা'র পরেই ঘুম থেকে ওঠে হৈমন্তী। মা তাকে না দেখেই হৈমন্তী বলে ভুল করে বলে, হৈম, সতীটার গায়ে চাপা আছে কি না দেখে আয়। আজকাল শীত পড়ে।

শাশ্বতী হাসে, উত্তর দেয় না। উঠোনে নামতেই ঠান্ডা মাটির শীত শরীর বেয়ে ওঠে। শিউরে ওঠে শরীর। মায়ের বুকের পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে উনুনের ছাই তুলে আঙুলে দাঁত মাজতে মাজতে শাশ্বতী তাদের বাগানটার কাছে চলে আসে। একটুক্ষণ গাছপালা দেখে।

হঠাৎ এতক্ষণ পর মা বলে ওঠে, ও মা! তুই?

শাশ্বতী মুখ ফিরিয়ে হাসে, উঠে পড়লাম।

এত সকালে! পেট গরম হয়নি তো? রাতে ঘুমিয়েছিস?

শাশ্বতী মাথা নাড়ে, না, কিছু না। এমনিই উঠলাম।

আর কথা হয় না। মা একমনে ঘুঁটে ভাঙে। শাশ্বতী দাঁত মাজতে মাজতে বেড়ায়। বারান্দার ওপর বেড়া দেওয়া একটা খুপরি। কালীনাথ ওটাতে থাকে। জানালার বেড়ার ঝাঁপটা তোলা। সেখান দিয়ে একবার উঁকি মেরে শাশ্বতী দেখল, কিছুই দেখা যায় না। কেবল মশারিটা। আজ অফিসে কালীনাথের সঙ্গে আদিত্যর দেখা হবে। আদিত্য কালীনাথকে কিছু বলবে কি? বলার মতো কিছুই ঘটেনি। তবু হয়তো আদিত্য বলবে, শাশ্বতীকে নিয়ে ললিতের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার কী রকম সব অনুভূতি হয়েছিল। আদিত্য সবাইকে সব কথা বলে দেয়।

অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মাজছিল সে, বে-খেয়ালে। মা বারান্দা ঝাঁট দিতে দিতে ঝাঁটাটা বারান্দার কোণে আছড়ে বলল, দাঁতগুলো ক্ষয় করে ফেলবি।

শাশ্বতীর খেয়াল হল সে অনেকক্ষণ দাঁত মাজছে। তাদের বাড়ির পিছন দিকে পুকুর। যাওয়ার রাস্তাটা জুড়ে গত বর্ষায় ঘন হয়ে উঠেছে কচুকন, যাওয়া-আসার সময়ে গায়ে লাগে। একটা পাতা গায়ে লাগতেই টপ করে এক ফোঁটা শিশিরের জল তার হাত বেয়ে নেমে যায়। শিরশির করে ওঠে শরীর। কাঁটা দেয়। আর জন্মে তুমি শজারু ছিলে, সতী নিজেকেই সেকথা বলে আর হাসে।

পিছনে পুকুর পর্যন্ত তাদের বাড়ির সীমানা। অনেকটা জায়গা। আটচল্লিশ সালের গোড়ায় এসে বাবা এ-জায়গাটার দখল নিয়েছিল। তখন বাবা ছিল বিষয়ী লোক। কোন জমিটা সরেস, কোনটা নীরেস তা সঠিক বুঝত। বাবা পুকুরের গা ঘেঁষে, দু'পাশে রাস্তা হওয়ার সম্ভাবনা আছে দেখে তবেই দখল করেছিল জায়গা। সাত-আট কাঠা জমি। বুক-সমান উঁচু ঘেরাপাঁচিলে ঘিরে নিয়েছিল জমি। তখন রিফিউজি কলোনিতে জমির কাড়াকাড়ি চলছে, কে কোথায় বসে ঠিক নেই। বাবা ঠিক বসেছিল। এখনও এই কলোনিতে তাদের বাড়িটাই সবচেয়ে সুন্দর জায়গায়। তাদের জমিতে ছ'টা নারকেল গাছ, পিছনে পুকুর, সামনে বাগান, দু'পাশে রাস্তা। যখন এই বাড়িটার জন্ম হচ্ছে তখনই জন্মেছিল শাশ্বতী, এই বাড়িতেই। বাড়ির পিছনে এই কচুবনের মধ্যেই গোয়ালঘরের মতো একটা আঁতুড়ঘর, তার জন্মের তিন-চার মাস আগে থেকেই তুলে রেখেছিল তার বিষয় এবং সতর্ক বাবা। জন্মের আট-নয় বছর পরেও ঘরটা দেখেছে শাশ্বতী, সেই ঘরটা তখন সত্যিই গোয়ালঘর। তার ছোট ভাই বাচ্চু জন্মায় শাশ্বতীর জন্মের প্রায় দশ বছর পর। মা-বাবার সেই বয়সে সন্তান হওয়াটা বেমানান। বাচ্চু হঠাৎ হয়ে গিয়েছিল। বাচ্চু হওয়ার সময়ে আর আঁতুড়ঘর তৈরি হয়নি, সে হয়েছিল শোয়ার ঘরেই। কারণ, তখন আর ঠাকুমা বেঁচে নেই, বাবা-মায়েরও নেই দেশগাঁয়ের সেই শুচিবাই। তারা অনেক পালটে গিয়েছিল। এখন আর সেই গোয়ালঘরটা নেই, গোরুটা মরে গেছে কবে। গাছগাছালি কেটে তৈরি

হয়েছিল ঘরটা, আবার সব গাছগাছালিতে ঢেকে গেছে। যেমন উঠোনে যাবার সেই গুহার মতো গর্তটার জায়গায় আবার তকতক করছে উঠোন।

মুখ ধুয়ে পুকুর থেকে উঠে আসবার সময়ে শাশ্বতী ঘাটের পথটুকু দেখল। স্বপ্নের সেই মেঠো পথের সঙ্গে এই পথটুকুর কোনও মিল নেই। সে-পথটা, সেই লণ্ঠনের আলোয় যতটুকু দেখেছিল শাশ্বতী, দিগন্তজোড়া মাঠের ভিতর দিয়ে গেছে। সেটা অনেক দূরের পথ। আশ্চর্য, কোথা থেকে কোথায় যে যাচ্ছিল লোকটা। তার মুখ দেখেনি শাশ্বতী। যদি দেখত, তবে কি চিনতে পারত শাশ্বতী! সে কি চেনা লোক?

স্বপ্নটার কথা মনে পড়তেই সুন্দর ভোরবেলায় আবার তার মন ভারী হয়ে গেল।

উঠোনে ঢুকবার মুখে শাশ্বতী দেখল সামনেই একটা বাধা। বাচ্চু ঘুমচোখে উঠে এসে বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে পথ জুড়ে পেচ্ছাব করছে।

শাশ্বতী বলল, অ্যাই!

ঘুম-জড়ানো বোকা চোখে বাচ্চু অবাক হয়ে চেয়ে আছে। ওর হাঁ-করা মুখ দিয়ে ভাপ বেরোচ্ছে। ওর বয়সের কথা কেউ খেয়ালই করে না। সকলের অনেক পরে জন্মেছে বলে সকলেই ওকে শিশুর মতোই দেখে। আদরে আদরে ও শিশুই রয়ে গেছে এখনও। খুব কচি মুখচোখ, বোধবুদ্ধি তেমন ফোটেনি।

শাশ্বতী দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল। তারপর হেসে বলল, এই বাচ্চু, দাঁড়া, দেখাচ্ছি! এই ধরলাম....

সে হাত বাড়াতেই বাচ্চু পা মাটিতে ঠুকে চেঁচায়, অ মা!

মা বারান্দা থেকে বলে, ঠান্ডু, ওকে ছেড়ে দে।

শাশ্বতী বলে, তুই ঘাটের রাস্তায় পেচ্ছাব করছিস কেন?

বাচ্চু প্যান্ট নামিয়ে পিছিয়ে গিয়ে হাসে, ইল্লি...

উঠোনে ঢুকতে ঢুকতে শাশ্বতী মনে মনে হিসেব করল। করে অবাক হয়ে দেখল, বাচ্চুর বয়স এখন দশের কাছাকাছি। লীলাবতীর ঘটনা যখন ঘটে তখন বাচ্চু খুব ছোট। সে ঘটনাটা আট কি নয় বছরের পুরনো হয়ে গেল। লীলাবতীর মুখ আর মনেই পড়ে না, বাচ্চু লীলাবতীকে ভাল করে দেখেইনি। বাচ্চু বয়স এখন দশের কাছাকাছি ভেবে একটু অবাক হয় শাশ্বতী। না, আর বাচ্চুর সঙ্গে তার ও-রকম খেলা করা উচিত না।

উঠোনে বাবা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে খুরপি। বাবা এখন বাগানে ঢুকবে, তারপর সারা দিন ঘুরে-ফিরে বাগানেই থেকে যাবে। গাছগাছালির কাছাকাছি। এখন গাছপালা ভালবাসে বাবা, যত্নে বাগান করে। কিন্তু একটা সময়ে, বাবা যখন বিষয়ী লোক ছিল তখন বাগানের জায়গায় বাড়ি করে ভাড়া দেওয়ার কথা ভেবেছিল বাবা। কিন্তু রিফিউজির দখল করা জমির ওপর গভর্নমেন্ট ছাদওয়ালা বাড়ি করতে দেয়নি বলে সেটা হয়নি। জমিটায় বাগান করেছিল লীলাবতী— তার হাতের কামিনী আর শিউলি গাছ এখনও রয়ে গেছে। মা'র ঠাকুর পুজোর ফুল দেয়। বাবা তার গর্ত থেকে উঠে আসবার পর মানুষজনের সঙ্গে কথা বলা কমিয়ে দিল খুব। গাছগাছালির খেলায় মেতে রইল। এখন বাবা গাছেদের সঙ্গে কথা বলে, সারা দিন ঘোরে তাদের কাছাকাছি। বাবার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে সেই আমলকী গাছটা শেষ পর্যন্ত আর বেরোয়নি। কিন্তু বাবার সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে খানিকটা বিশ্বাস করে কিছু কৌতুহলী লোক অনেক দিন তাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করেছে। বাবার মাথা থেকে গাছ বেরোয়নি দেখে হতাশ হয়েছে তারা। কিন্তু শাশ্বতী দেখে, বাবার শরীর গাছ হয়ে না গেলেও তার মধ্যে গাছগাছালির একটা স্বভাব এসে গেছে। নির্বিকার, নিরুত্তাপ, আবেগ নেই এতটুকু। সারা দিন প্রায়

বোবা হয়ে থাকে বাবা। অনেকেই হয়তো ভাবে, লীলাবতীর স্মৃতি জুড়িয়ে আছে বলেই বাবা বাগানটা নিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু শাশ্বতী জানে যে, তা নয়। কারও জন্যই আর তেমন কোনও বোধ নেই বাবার। কতকাল 'মলু' ডাকটা আর শোনেনি শাশ্বতী! আসলে, বাবা সেই গুহার গর্তে বসে গাছেদের মতোই নির্বিকার হতে চেয়েছিল বোধ হয়। সেই চাওয়াটা পূর্ণ হয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে পাগলামি দেখা দেয়। কিছু দিন পর আবার ঠিক হয়ে যায়। বাবা গাছেদের কাছে ফিরে যায়।

একমাত্র বাচ্চুর সঙ্গে ছাড়া বাবা স্বেচ্ছায় কারও সঙ্গেই কথা বলে না। কিন্তু বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে মাঝে মাঝে উত্তর পাওয়া যায়। অদ্ভুত সব উওর। লোকে এখনও বিশ্বাস করে বাবার ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যায়। হয়তো যায়। বাগানের বেড়ার পাশে পথের ওপর দাঁড়িয়ে এখনও অনেক লোক বাবার সঙ্গে কথা বলে, পরামর্শ চায়। অধিকাংশ সময়েই নীরব থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে বাবা উত্তর দেয়। লোকে বলে, সে-সব উত্তর মিলে যায়। কিন্তু শাশ্বতীরা জানে যে, বাবার কোনও যোগসিদ্ধ নেই, বাবা সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিল। মা'ও তাই জানে। তবু কখনও-সখনও শাশ্বতী লক্ষ করেছে মুশকিলে পড়লে মা বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, সমস্যার কথা বলে জিজ্ঞেস করে, তুমি কী বলো? তাদের লুকিয়ে জিজ্ঞেস করে মা, তবু তারা দেখেছে ব্যাপারটা।

বাবা তার দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাবা এখন বাচ্চুর জন্য অপেক্ষা করছে। বাচ্চু মুখ ধুচ্ছে বারান্দার এক কোণে। মুখ ধুয়ে প্যান্টের দু'পকেটে মুড়ি আর ছোট্ট কাস্তে কিংবা কোদাল হাতে বাচ্চু এসে সমবয়স্ক বন্ধুর মতো বলবে, চলো বাবা। তারপর দু'জনে নিঃশব্দে বাগানে ঢুকে যাবে। সাড়ে সাতটা-আটটায় উঠবে কালীনাথ, তখন মাটিমাখা হাত ধুয়ে বাচ্চু এসে পড়তে বসবে।

বাবার আশেপাশে উঠোনে একটু ঘুরে বেড়াল শাশ্বতী। আঁচলে মুখের জল মুছে নিল। বাবা কি সব প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারে? শাশ্বতীর বিশ্বাস হয় না। তবু তার ইচ্ছে করে বাবাকে দু'-একটা প্রশ্ন করতে। কী উত্তর দেয় দেখাই যাক না।

কিন্তু করি করি করেও ইতস্তত করে শাশ্বতী। সংকোচ হতে থাকে। হঠাৎ চোখে চোখ পড়তেই দেখে বাবা তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে-চোখে কিছুই ছিল না, তবু হঠাৎ তার মনে হল এক্ষুনি তার কী একটা গোপন কথা বাবা জেনে যাবে।

শাশ্বতী বারান্দায় উঠে এল। বাচ্চু তার যন্ত্রপাতি হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মুখোমুখি হতেই তাকে মুখ ভেঙিয়ে দৌড়ে নেমে গেল বাচ্চু। বারান্দা থেকে শাশ্বতী দেখল বাগানের বেড়ার গেট খুলে আগে আগে বাচ্চু, আর তার পিছনে বাবা ঢুকে যাচ্ছে। গেট বন্ধ করার জন্য বাবা একবার পিছু ফিরল। ফিরেই সোজা বারান্দায় তার চোখে চোখ রাখল। শান্ত চোখে বোধহয় সদ্য ওঠা সূর্যের আলোর একটু ঝিলিক দেখা গেল। কিন্তু শাশ্বতীর মনে হল, বাবার চোখ সকৌতুকে হেসে উঠছে। 'মানুষের দুর্বলতাগুলি আমি জানি।' বুক কেঁপে উঠল তার। সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

বাবা কি সত্যিই কিছু জানে? না কি সব ভুয়ো, ফক্কিকারি? তবু তার ইচ্ছে করে জিজ্ঞেস করতে রাত্রের দেখা স্বপ্নটার কথা, কিংবা আদিত্য আর ললিতের কথা, কিংবা তার নিজেরই কথা। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ভয় করে তার।

ঠিকে ঝি আজ কাজে আসেনি। একটু বেলা পর্যন্ত দেখে মা আর হৈমন্তী এঁটো বাসন কোসন নিয়ে ঘাটে যাচ্ছিল। পড়ার টেবিলে বসে খোলা বইয়ের সামনে জানালা দিয়ে বাইরে অন্যমনে তাকিয়ে ছিল শাশ্বতী।

মাকে ঘাটে যেতে দেখে উঠে এসে বাসনগুলো নিয়ে বলল, আমি আর মেজদি সেরে দিচ্ছি, তুমি রান্নায় যাও।

শাশ্বতী পড়াশুনো করে বলে মা কখনও তাকে ঘরের কাজে ডাকে না। হৈমন্তী পড়াশুনোয় ভাল ছিল না, স্কুল ফাইনালের পর আর পড়া হয়নি। হৈমন্তী একটু বোকাও। বাড়ির কাজে সেই থাকে মায়ের সঙ্গে। কাজেই শাশ্বতী আর এগোয় না। কিন্তু আজ তার অন্যমনস্ক এবং কোনও কাজে ব্যস্ত থাকতে ইচ্ছে করছিল।

ঘাটে হৈমন্তীর মুখোমুখি বাসন মাজতে বসে সে হঠাৎ আচমকা জিজ্ঞেস করল, তুই কখনও দুঃস্বপ্ন দেখিস?

হৈমন্তী বলল, দেখি।

কীসের?

অনেক রকম।

ভূতের?

না। আমি দেখি সাপের।

শাশ্বতী ঠোঁট ওলটায়, দূর! সাপের স্বপ্নে জ্ঞাতি বাড়ে। তাতে তোর কী?

হৈমন্তী একটু ভেবে বলে, কী জানি?

আমি কাল একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখেছি।

কী?

একটা লোক লণ্ঠন হাতে হেঁটে যাচ্ছে।

বলতে গিয়ে শাশ্বতী বুঝল, স্বপ্নটা তার কাছে যতখানি ভয়ের, অন্যের কাছে ততটা নয়। তাই সে আর বলল না।

হৈমন্তী হাসল, তোর মাথায় পোকা। একটা লোক লণ্ঠন হাতে হেঁটে যাচ্ছে, তাতে ভয়ের কী?

শাশ্বতী চুপ করে অনেকক্ষণ একটানা বাসন মাজল।

হৈমন্তী জিজ্ঞেস করল, কাল তোরা কোথায় গিয়েছিলি?

শাশ্বতী হৈমন্তীকে আদিত্যর সব খবর দেয়। কোথায় গিয়েছিল, কোন রেস্টুরেন্টে কী খেয়েছিল, কিংবা কোন হল-এ কী সিনেমা দেখেছে— সব। হেমন্তী খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে। তাকে উৎসাহ দেয়। খুবই সরল হৈমন্তী। শাশ্বতীর মাঝে মাঝে মনে হয়, হৈমন্তী তার দিদি নয়, ছোট বোন। সরল, বোকা, ভাল মেয়েটা।

শাশ্বতী হেসে বলল, ওর এক বন্ধুর অসুখ, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

কলেজ পালিয়ে?

হুঁ।

কেমন দেখলি! কী অসুখ?

ক্যানসার।

মেসোমশাইয়ের মতো?

মেসোমশাইয়ের তো শ্বাসনালীতে ছিল। এরটা পেটে।

বাঁচবে?

শাশ্বতী ঠোঁট ওলটায়, কী জানি?

কেমন দেখলি?

চেহারা ভালই। অসুখ বলে মনেই হয় না।

তা হলে বাঁচবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে হৈমন্তী

শাশ্বতী হাসে। তারপর বলে, লোকটা খুব চালাক। আমি ভদ্রলোককে সাহস দেওয়ার জন্য মেসোমশাইয়ের কথা বললাম, তারপর বললাম, দেখবেন, আপনি ভাল হয়ে যাবেন। উত্তরে একটু ঘুরিয়ে লোকটা বলল, আপনারা তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে ফেলুন, আমি যেন দেখে যেতে পারি।

আহা রে। হৈমন্তী বলল, কষ্ট হয়। কত বয়স?

বেশি না। ত্রিশ-বত্রিশ, কিংবা আর-একটু বেশি।

আদিত্যর মতো?

হ্যাঁ।

হৈমন্তী কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে, তারপর খুব মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করে, আদিত্য বিয়ের কথা কিছু বলে না?

একটু অন্যমনস্ক ছিল শাশ্বতী, এই কথায় চমকে উঠে হেসে ফেলল। তারপর ঘাড় নেড়ে বলল, বলে। যখন বাই ওঠে তখন বলে, এক্ষুনি চলো রেজিস্ট্রি করে আনি। আবার কখনও কখনও বিয়ের কথা ভুলে যায়।

তোরা রেজিস্ট্রি করবি?

করব।

কেন?

শাশ্বতী একটু ভেবে বলল, ওর সঙ্গে আমাদের জাত মেলে না, সামাজিকভাবে করলে মা-বাবা-দাদার নিন্দে হবে।

বলতে বলতে হঠাৎ মনে মনে শিউরে ওঠে শাশ্বতী। গতকাল বিকেলে আদিত্য জাতের কথা বলেছিল। সে জাত আলাদা। অন্য রকমের এক জাতিভেদ। আদিত্য তাকে বুঝিয়েছিল, কিন্তু সে ভাল বোঝেনি। কিন্তু এখন হৈমন্তীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার মনে হল, সে নিজেও অনেক দিন ধরেই জানে যে, আদিত্যর সঙ্গে তার জাত মেলে না।

হৈমন্তী বলল, দাদা তো ওর সঙ্গে আমারও বিয়ে দিতে চেয়েছিল, সামাজিকভাবেই। তোরা রেজিস্ট্রি করবি কেন?

করলে কী হয়?

হৈমন্তী বিষণ্ণ মুখে বলে,আমাদের বাড়ির দুটো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, অথচ আলো জ্বলল না, বাজনা বাজল না, আমরা সাজলাম না— দূর, ভাবতে ভাল লাগে না।

শাশ্বতী হাসে, আমার বোধ হয় বউভাত-টউভাত হবে না।

হৈমন্তী মৃদু গলায় বলে, আদিত্যর বাপ-মা রাজি হবে না, না?

শাশ্বতী ঠোঁট ওলটায়, কী জানি! মনে তো হয় না।

হৈমন্তী বড় করে শ্বাস ছাড়ে হঠাৎ! তারপর আচমকা একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে, পুরুষমানুষেরা কেমন হয় বল তো!

শাশ্বতী স্থির চোখে একটু হৈমন্তীকে দেখে। তারপর উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্ক থাকে একটু। আশ্চর্য যে এই প্রশ্নটা তারও মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরুষমানুষেরা কেমন হয়?

পুকুরের ও-পারে হাজরাদের বাড়ি। ঘাট থেকে শিবানী ডাকল।

সতী!

শাশ্বতী মুখ তুলে হাসল, কী রে!

বাসন মাজছিস! ঝি আসেনি?

না।

কলেজ যাচ্ছিস?

যাব।

আমি যাচ্ছি না।

কেন?

জামাইবাবু এসেছে। আজ ম্যাটিনি শো-তে সিনেমায় যাব।

কী ছবি?

কী যেন...বলে হাসল, শক্ত নাম। ভুলে গেছি। হিন্দি। দেবানন্দ ওয়াহিদা। তুই যাবি? টিকিট আছে।

না রে।

শিবানী হাসল, জানতাম, যাবি না। কলেজের পর কোথায় যাচ্ছিস?

কোথাও না।

ইস। শিবানী হাসল, জানি।

শিবানী ঘাট থেকে উঠে গেল। হৈমন্তী গুনগুন করে শাশ্বতীর কাছে শিবানীর নিন্দে করছিল, বেহায়া, পাড়া-বেড়ানি, আড্ডাবাজ। শাশ্বতী মন দিয়ে শুনল না। কেবল একবার হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বলল, আমাদের কেউ প্রশংসা করে না।

হৈমন্তী চুপ করে গেল।

কথাটা বলেই শাশ্বতীর মনে পড়ল যে, এখনও তাদের পরিবারের নিন্দের কথা আদিত্য জানে না। লীলাবতীর ঘটনা তাকে কেউ বলেনি। জানলে কী করবে আদিত্য? ভেবে পেল না শাশ্বতী। হয়তো হো হো করে হেসে বলবে, দূর। ও কিছু না। কিংবা হয়তো গম্ভীর হয়ে বলবে, একথা এত দিন বলোনি কেন? দুটোর যে-কোনওটাই করতে পারে আদিত্য। তার সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা মুশকিল। শাশ্বতীর মনে হয় অনেক আগেই তার আদিত্যকে লীলাবতীর ঘটনাটার কথা বলে দেওয়া উচিত ছিল। অন্য কারও কাছ থেকে শোনার আগে তার কাছ থেকে শুনলেই ভাল হত। কেন বলেনি সে?

সারা সকাল হৈমন্তী আর মা'র সঙ্গে ঘরের কাজ করল শাশ্বতী, মশারি তুলে বিছানা ঝাড়ল, ঘর মুছল, ঠাকুর পুজোর জল আনল পুকুর থেকে। বই নিয়েও বসল একটু। পড়া হল না।

পুরুষমানুষেরা কেমন হয়?

কালীনাথ ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় বসে বসে চা খাচ্ছে। তার সামনে মাদুর বিছিয়ে পড়তে বসেছে বাচ্চু। রান্নাঘরে হৈমন্তী। ঠাকুরঘরে মা। বাবা বাগানে একা।

শাশ্বতী পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠোনে এল। কয়েক পা এদিক-ওদিক হাঁটল। তারপর আস্তে বাগানের গেট খুলে ভিতরে ঢুকে গেল।

ঘন গাছপালার একটা আলাদা জগতের মধ্যে চলে এল সে। ভেরেন্ডাগাছের উঁচু বেড়ার আড়ালে তাদের বাগান। শান্ত। নিস্তব্ধ। ঠান্ডা। হাঁটতে গেলে গাছপালা গায়ে লাগে। সরসর শব্দ হয়। শিউরে ওঠে শাশ্বতীর শরীর। এখানে ততখানি আলো নেই। একটু ঝুপসি আলো-আঁধারি। এর মধ্যে বাবাকে প্রথম দেখতে পেল না শাশ্বতী। অনেকটা বড় তাদের বাগান। সে পায়ে পায়ে গাছপালার ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। বাচ্চুর তৈরি করা নুড়িপাথরের কৃত্রিম পাহাড়, তার পাশ দিয়েই গেছে আঁকাবাঁকা লাল সুরকির ক্ষুদে রাস্তা, রাস্তার মাঝখানে একটা চত্বরে পিচবোর্ডের তৈরি ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাফিক পুলিশটার গায়ে একটা সাদা কাগজ আঠা দিয়ে লাগানো, তাতে লেখা— বাবা ওই দিকে। নিচু হয়ে লেখাটা পড়ে শাশ্বতী হাসে, ট্রাফিক পুলিশটার ডান হাত যে-দিকে দেখিয়ে দিচ্ছে সে দিকে তাকিয়ে সত্যিই বাবাকে দেখল শাশ্বতী। গোলাপের ডাল মাটিতে পুঁতে তার ডগায় গোবরের ঢিবি লাগাচ্ছে বাবা। ট্রাফিক পুলিশটার দিকে তাকিয়ে আবার একটু হাসে শাশ্বতী। এটা বাচ্চুর বুদ্ধি। বাবা যখন যে-দিকে থাকে সে-দিকে ওটাকে ঘুরিয়ে রাখে। কিংবা হয়তো বাবাই ঘুরিয়ে দেয়, বাচ্চুর বাবাকে খুঁজতে সুবিধে হবে বলে।

গত তিন-চার মাস আর বাগানে আসেনি শাশ্বতী। গত বর্ষায় জঙ্গল বেড়ে গেছে। বাবার কাছে না গিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরল! বাবা তাকে লক্ষ করল না। তারপর ধীর পায়ে আস্তে সে বাবার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। অনেক—অনেক দিন হয় সে বাবার সঙ্গে কথা বলেনি। তার লজ্জা করছিল।

তারপর ঝুপ করে মাটিতে বসল সে। বলল, বাবা, এই সময়ে কেউ গোলাপের ডাল লাগায়? বর্ষাকালে লাগাতে হয়।

বাবা উত্তর দিল না। কিন্তু খুব ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে শান্ত চোখে তাকে একবার দেখে আবার চোখ ফিরিয়ে নিল।

শাশ্বতীর বুক ঢিবঢিব করে। বাবা কি বুঝতে পারছে যে সে আসল কথা বলার আগে একটা ভূমিকা করছে?

অনেকক্ষণ পর বাবা হঠাৎ তার প্রশ্নের উত্তর দিল। খুব আস্তে গলায় বলল, লাগানো যায়। একটু বেশি জল দিতে হয়।

একটু সাহস পায় শাশ্বতী। বলে, অনেক আগাছা হয়েছে। পরিষ্কার করো না কেন?

বাবা চুপ করে কাজ করতে থাকে। উত্তর দেয় না।

অস্বস্তিতে মাটিতে একটু পা ঘষে শাশ্বতী। জামরুল গাছটার ডালে ছোট্ট মৌচাক—মৌমাছি উড়ছে। ঘাসের ওপর দিয়ে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে হলুদ প্রজাপতি। পোকামাকড়ের শব্দ হয়। ঝিঁঝি ডাকে। শান্ত, সুন্দর, ঠান্ডা ছায়ায় ঝিম মেরে আছে বাগানটা। একটু দূর থেকে বাচ্চুর ট্রাফিক পুলিশ তার দিকেই আঙুল উঁচিয়ে আছে।

শাশ্বতী হঠাৎ শান্ত গলায় বাবাকে জিজ্ঞেস করে, বাবা, আমার কী হবে বলো তো! আমার ভবিষ্যৎ কী?

বাবা উত্তর দেয় না। কেবল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে শান্ত চোখে দেখে। চোখ ফিরিয়ে নেয়। শাশ্বতীর বুক কাঁপে। ভয় করে।

কাল রাতে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। শাশ্বতী বলল।

বাবা কিছু জিজ্ঞেস করল না।

তবু শাশ্বতী জোর করে বলল, একটা লোক লণ্ঠন হাতে মেঠো পথ দিয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটার মুখ দেখিনি, কিন্তু মনে হয় মুখ দেখলে আমি চিনতে পারতাম। বলে শাশ্বতী থামে, তারপর জিজ্ঞেস করে, লোকটা কে বলো তো!

বাবা উত্তর দেয় না। খুরপির ধার দিয়ে হাতের গোবর চাঁচে। হাতে মাটি মাখতে থাকে। ঘাসের ওপর হাত ঘসে।

শাশ্বতী বাবার দিকে একটু চেয়ে থাকে। তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, কাল আদিত্য আমাকে সন্দেহ করেছিল কেন? আমি ললিতকে সুন্দর দেখেছিলাম কেন? আমি কাল একটা মিথ্যে কথা বলেছিলাম কেন?

কিন্তু তার লজ্জা করল। বাবা সেই আগেকার মতো বাবা আর নেই। গাছের মতোই উদাসীন। ইচ্ছে করলে জিজ্ঞেস করা যায়। কিন্তু শাশ্বতী পারল না। তবু অনেকক্ষণ বসে রইল শাশ্বতী। তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে হাসল।

দূর! বাবা সত্যিই কিছু জানে না। বাবা পাগল।

সে একটা শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

চলে আসছিল শাশ্বতী। হঠাৎ শুনল বাবা খুব মৃদু স্বরে বলল, সাবধানে থেকো। পড়ে যেয়ো না।

সে চমকে ঘুরে দাঁড়াল। বাবা গোলাপ-ডালটার সামনে নিচু হয়ে বসে আছে, মাটির দিকে চোখ। না, শাশ্বতীকে নয়। বোধ হয় গাছটাকে বলছে বাবা। শাশ্বতী লক্ষ করে গোবরের ঢিবির ভারে গাছটা নয়ে পড়েছে মাটির দিকে। হ্যাঁ, গাছটাকেই সাবধান করছে বাবা, সাবধানে থেকো। পড়ে যেয়ো না।

শাশ্বতী মুখ ঘুরিয়ে নিল। সে বাচ্চুর ট্রাফিক পুলিশটাকে পার হল, চলে এল বাগানের গেটটার কাছাকাছি। গেট খুলে বেরিয়ে আসবার সময়ে তার এমনিই মনে হল, বাবা ওই কথা বলেছে শুধু গাছটাকে নয়। শুধু গাছটাকে নয়...

স্নান করতে যাওয়ার সময়ে সে মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে হৈমন্তীকে বলল, আজ সিনেমায় যাবি? আমার কলেজ যেতে ইচ্ছে করছে না। যাবি তো বল, দাদার কাছ থেকে টাকা চেয়ে রাখি।

হৈমন্তী হাসল, আমার সঙ্গে তোর ভাল লাগবে? লাগলে যাব।

স্নান করে এসে আবার কী একটু ভাবল শাশ্বতী। আজ কলেজে একবার আদিত্য আসতে পারে। এখন, কালকের পর তাদের একবার দেখা হওয়া দরকার। কালীনাথ বেরিয়ে যাচ্ছে দেখেও শাশ্বতী টাকা চাইল না।

হৈমন্তী জিজ্ঞেস করল, দাদাকে বললি না?

থাক গে, শাশ্বতী বলে, আজ কলেজেই যাই। কাল-পরশু দেখব।

কলেজে যাওয়ার সময়ে চলন্ত বাস থেকে শাশ্বতী একটা পোস্টার দেখল। দেবানন্দের সুন্দর মুখ হাসছে। শিবানীরা আজ সিনেমায় যাচ্ছে। চলন্ত বাস থেকে ছবিটার শক্ত নামটা পড়তে পারল না শাশ্বতী। পেরিয়ে গেল। সিনেমায় গেলেও মন্দ হত না। গেল না বলে হৈমন্তীর মন খারাপ হয়ে গেল বোধ হয়। কিন্তু কলেজে যাওয়াটাই আজ দরকার শাশ্বতীর। আজ কোনও একটা ঘটনা ঘটবে। তার মন বলছে।

তেরো

বস্তুত সেদিন কলেজে কিছুই ঘটল না।

টানা তিনটে পিরিয়ড করল শাশ্বতী, সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে। দু'-এক লাইন নোট টুকল খাতায়, বাদবাকি সময় অপটু হাতে কয়েকটা ছবি আঁকল। ছবিগুলো সবই পুরুষমানুষের মুখের। কিন্তু একটা মুখও সুন্দর হল না।

তৃতীয় পিরিয়ড তার ফাঁকা। ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে সে বারান্দা পেরোল আস্তে ধীরে। কমনরুমে ঢুকতে যাচ্ছে, এমন সময়ে রাকার সঙ্গে দেখা। রাকার পোশাক সবসময়ে ঝকমকে। সাত দিনে সাত রকমের শাড়ি পরে আসে। মেয়েরা ওকে খ্যাপায় মিস ওয়ার্ডরোব বলে। বাড়ির মোটর গাড়ি ওকে কলেজে পৌঁছে দেয়, নিয়ে যায়। ভারী হাসিখুশি মেয়ে রাকা। কখনও মুখ ভার করে থাকে না। অশ্লীল কথা বলে অনায়াসে সে, ঠিক পুরুষদের মতো।

তাকে দেখে রাকা দু'হাত বাড়িয়ে বলল, আরে গোমড়ামুখী, তোর এখন অফ পিরিয়ড না?

শাশ্বতী মৃদু হাসল, বলল, পর পর দু'পিরিয়ড অফ। তারপর এস. বি-র ক্লাস।

রাকা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল, তা হলে চল, আমার গাড়িতে একটু ঘুরে আসবি। দাদা গাড়ি নিয়ে এসেছে, একটু রেডিয়ো-স্টেশনে যাব। আজ আমার অডিশন। কী ভয় করছে রে! দ্যাখ বুকে হাত দিয়ে কেমন ধুপধাপ হাতির পা পড়ছে...বলতে বলতে শাশ্বতীর হাত টেনে বুকে চেপে ধরল রাকা, তারপর চোখ গোল করে জিজ্ঞেস করল, টের পাচ্ছিস!

শাশ্বতী কিছু বুঝল না, হাত টেনে নিয়ে বলল, তুই একা যা। আমার ভাল লাগছে না।

রাকা মুখে দুঃখের ভাব ফুটিয়ে বলল, একটা বন্ধুও যেতে চাইছে না। সব শালি আমাকে ইগনোর করে। এদিকে আমি যে কী ভীষণ ভয় পাচ্ছি।

শাশ্বতী জানে রাকার ভয়-ডর বলে কিছু নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে ভান করে। এর আগে বোধ হয় তিন-চারবার রেডিয়োতে অডিশন দিয়েছে রাকা। একবারও সুযোগ পায়নি। আসলে ছটফটে বলে কোনও কিছুই মন দিয়ে শেখে না ও। ক'দিন গান গায়, ক'দিন সেতার বা সরোদ শেখে, কিছু দিন নাচের স্কুলে গিয়েছিল, এক বছর নষ্ট করেছে আর্ট কলেজে, মাঝেমধ্যে কবিতাও লিখে ফেলে গাদা গাদা। তারপর আবার রাকা ছটফটে আড্ডাবাজ, আমুদে রাকা হয়ে যায়। কোনও শিল্পকর্মই তার ভিতরে গাম্ভীর্য আনে না। তার বিলিতি রঙের দামি টিউবগুলো পচে নষ্ট হয়, সেতারি সরোদ পড়ে থাকে, কবিতার খাতা হলদে হয়ে যায়, খামোখাই গানের স্কুলে মাসে মাসে মাইনের টাকা জমা পড়ে। আবার ঝোঁক চাপলে পনেরো দিনের মধ্যেই বড় গায়িকা কিংবা সেতারি কিংবা আঁকিয়ে হওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লাগে।

রাকা হঠাৎ মুখে-চোখে হাসি ফুটিয়ে বলল, আমার দাদাকে তোর মনে নেই? সেই যে একবার কলেজ ছুটির পর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলুম! তারপর কত দিন দাদা তোর চোখ আর চুলের প্রশংসা করেছে। আমাকে জিজ্ঞেস করেছে তোর চুল চোখ অরিজিনাল কি না। আজকালকার মেয়েরা তো চুল চোখ তৈরি

করতে পারে। আর আমার দাদাকেও তো তুই দেখেছিস! ও-রকম হ্যান্ডসাম ক'জন আছে? বলে চোখ নাচাল রাকা, শাশ্বতীর হাত ঝপ্ করে টানতে টানতে বলল, জীবনে উন্নতি করতে চাস তো শিগগির চল। আমি যখন ভিতরে অডিশন দেব, তখন তুই আর দাদা দু'জনে দু'জনকে অ্যাডমায়ার করবি। আয়...

ব্যাপারটা যে শাশ্বতী জানে না তা নয়। মাঝেমধ্যে রাকা তার দাদার কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে বলেছে। নিয়ে যেতে চেয়েছে তাদের বাড়িতে। শাশ্বতী যায়নি।

কোথায় যেন দুর্বলতা থাকে। থেকে যায়। মানুষে তা বুঝতে পারে, কিন্তু কিছু করার থাকে না। মাস দুই আগেই বোধ হয়, কলেজ ছুটির পর ওরা একসঙ্গে বেরোচ্ছিল। কলেজের গেটের সামনে একটা সবুজ রঙের হেরাল্ড গাড়ির বাফারে পা তুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক সাতাশ-আটাশ বছর বয়সের ভদ্রলোক। ফরসা টকটকে রং, বিশাল কাঁধ, পেশিবহুল দুখানা হাত। নিজের সৌন্দর্য দেখাতে জানেন ভদ্রলোক। পরনে ছিল গ্রে রঙের চাপা একটা দামি প্যান্ট, গায়ে চেক-ওলা একটা স্পোর্টস শার্ট। চোখে চমৎকার একটা সবুজ রোদ-চশমা। রাকা সব বন্ধুকে ডেকে তার দাদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। কয়েক মিনিটের মাত্র পরিচয়। তারপরই তারা ভাইবোনে হেরাল্ড গাড়িটার সামনের সিটে বসে, তাদের দিকে একটু মিষ্টি হেসে, হাত নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। রাকা আর তার দাদার সেই চলে যাওয়ার দৃশ্যটি আজও স্পষ্ট মনে আছে শাশ্বতীর। সেই গাড়ি থেকে হাত নেড়ে হেসে চলে যাওয়ার মধ্যে একটা অদ্ভুত আভিজাত্যের সৌন্দর্য ছিল। যে-সৌন্দর্য নিজেদের পারিবারিক জীবনে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি শাশ্বতী। সেই সৌন্দর্যটুকু আজও কাঁটার মতো ফুটে আছে মনে। কলেজের বন্ধুদের দেখানোর মতো গাড়ি নেই শাশ্বতীর, নেই অমন সুন্দর চেহারার স্মার্ট একটি দাদাও। যত বার 'হিংসে করব না' বলে ভাবে শাশ্বতী তত বারই নিজের কাছে নিজে হেরে যায়।

ওই যে একটু তার প্রশংসা করেছে ভদ্রলোক, যা সে রাকার মুখে শুনল, তাইতেই মনটা একটু ছটফটে চঞ্চল হয়ে গেল তার। এ তার মেয়েমানষি দুর্বলতা, সে জানে। তাই রাকা টেনে নিয়ে গেল, আর সেও 'যাব না, যাব না' বলতে বলতে চলে এল কলেজের বাইরে। এবং মনে মনে ভীষণ লজ্জা পেতে লাগল।

আজ হেরাল্ড গাড়িটা ছিল না। তার বদলে সাদা রঙের একখানা অ্যাম্বাসাডার মার্ক টু দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কটা গাড়ি আছে কে জানে। আজ রাকার দাদা বাইরে দাঁড়িয়ে নেই। স্টিয়ারিং হুইলে হাত দু'খানা অলসভাবে ফেলে রেখে, মাথা পিছনে হেলিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। রোদ-চশমায় ঢাকা চোখ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় মার্কিন টুরিস্ট।

তাকে দেখেই বোধ হয় টুক করে দরজা খুলে নামলেন ভদ্রলোক। রাকা কিছু বলার আগেই ঈষৎ হেসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করলেন, চিনতে পারছেন?

লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল শাশ্বতী। ঘাড় নাড়ল সম্মতির। হ্যাঁ, সে চিনতে পারছে।

রাকা কলকল করছিল ইতিমধ্যেই, ওকে ধরে নিয়ে এলাম দাদাভাই, একা যেতে আমার একটুও ভাল লাগে না। তা ছাড়া দেখি ওর লাক-এ এবার হয় কি না!

খুব খুশি হল রাকার দাদা, বলল, আরে, আসুন আসুন। আপনি গেলে তো কথাই নেই। আবার আমরা ভাইবোনে গাড়িতে করেই পৌঁছে দেব আপনাকে। আসুন...

কেন যেন শাশ্বতী বুঝতে পারছিল যে, তার যাওয়া উচিত নয়। তার মন চাইছিল না। তবু, সে বড় দুর্বল। কখনও কখনও প্রতিরোধের সমস্ত শক্তি চলে যায় তার। যে যা খুশি করিয়ে নিতে পারে তাকে দিয়ে। মিনমিন

করে সে কী একটু আপত্তি করল বটে। কিন্তু রাকার কলকলানি আর তার দাদার ভরাট গলার হাসিতে সেটুকু চাপা পড়ে গেল।

রাকার দাদাকে বেশ ছেলেমানুষের মতো দেখতে। ‘ছেলেটা’ বললেই মানায়, ‘ভদ্রলোক’ বলে উল্লেখ করতে বাধো বাধো লাগে। সামনের সিটে তারা তিন জন বসল। মাঝখানে রাকা। জানালার পাশে শাশ্বতী— লাজুক, নতমুখে।

গলায় আঁচল জড়িয়ে রাকা বলল, বাব্বাঃ, হাওয়া লাগাব না।সে-বার গানের মাঝখানে গলা ফেঁসে গিয়েছিল।

তার দাদা হাসল। ভারী সুন্দর চিকমিকে দাঁত দেখা গেল তার, যেন শ্বেতপাথরে তৈরি। বলল, তোর কোনও দিন হবে না। তোর ধৈর্য নেই। তারপর শাশ্বতীর উদ্দেশে বলল, জানেন, রাকার একদল গানের মাস্টারমশাই বাড়িতে আসেন, ওস্তাদ মানুষ, খুব নামডাক, সেই ভদ্রলোককে বসিয়ে রেখে ও বত্রিশ বার জল খেতে বাড়ির ভিতরে যায়, আর গিয়ে আমাদের সঙ্গে রাজ্যের ইয়ার্কি দিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করে আসে, ওস্তাদজি হাঁ করে বসে থাকেন।

যাঃ! বলে হেসে লুটিয়ে পড়ল রাকা, বলল, কী করব, তেষ্টা পায় কেন? মাইরি, গানের সময় আমার যত তেষ্টা, মাথা চুলকোনো, পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরা— কেমন যে করে!

গাড়িটা যখন বাঁক নিচ্ছে বড় রাস্তায় ওঠার সময়ে ঠিক তখনই আদিত্যকে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে আসতে দেখল শাশ্বতী। হাওয়ায় রুক্ষ চুল উড়ছে, শ্রীহীন মুখখানা ধুলোটে আর কেমন তেলতেল করছে শিরা-ওঠা প্রকাণ্ড কপালখানা। জামা-কাপড়ের ভাজ নেই। উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে তাকে। বড়লোকের গাড়িতে একটি সুন্দর পুরুষমানুষের কাছাকাছি বসে চলে যেতে যেতে দৃশ্যটাকে খুব করুণ লাগল শাশ্বতীর। সে একটু চমকে উঠেছিল প্রথমটায়। সামলে নিল। আদিত্য লম্বা লম্বা পা ফেলে যাচ্ছে তারই কলেজের দিকে। গিয়ে বেচারা হতাশ হবে। কিন্তু শাশ্বতী আর ফিরে তাকাল না। কী একটা জিজ্ঞেস করছিল রাকার দাদা। অন্যমনস্ক শাশ্বতী শুনতে পায়নি। এবার ঝুঁকে বলল, উঁ! সে কিছুতেই বলতে পারল না, বলতে তার ইচ্ছে করল না যে, গাড়ি থামান। ওই চলেছে আমার প্রেমিক, আমারই খোঁজে। আমি ওর কাছে যাব। এই সুন্দর মানুষটির কাছে ওই শ্রীহীন জিরাফের মতো লোকটাকে প্রেমিক বলে পরিচয় দিতে তার লজ্জা করল।

শাশ্বতী ঠিকই দেখেছিল। সত্যিই আজ বড় কুশ্রী দেখাচ্ছিল আদিত্যকে। চলন্ত গাড়ি থেকে একপলকে শাশ্বতী তবু ভাল করে দেখেনি। দেখলে দেখতে পেত, একদিনের মধ্যেই কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে গেছে তার, গাল বসে গেছে, চোখ গেছে কোটরে, দাড়ি কামানো হয়নি, স্নান হয়নি, ভাত খাওয়া হয়নি তার কাল রাত থেকে।

কাল বিকেলে শাশ্বতীর সঙ্গে সে যে অদ্ভুত ব্যবহার করেছিল সেই থেকেই মেজাজ ঠিক ছিল না। সন্ধেবেলা সে তাদের দুর্গের মতো বাড়িটিতে ফিরে প্রথম মহল পার হয়ে দ্বিতীয় মহলের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার বারান্দায় উঠেই একটা দেড়শো বছরের পুরনো দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। যে-দৃশ্যটা ধনতান্ত্রিকতার নিখুঁত একটি ছবি। চিক-দেওয়া বারান্দায় পাথরের মেঝেতে পাতা ছোট্ট গালিচার আসনে চওড়া পাড়ের শাড়ি পরা মা বসে ভারী জাঁতিতে সুপুরি কাটছে। কোলের কাছে নানা রকমের খোপওয়ালা পানের বাটা, প্রতিটি খোপে রয়েছে নানান মশলা। মা’র হাতে ঝকমক করছে ভারী সোনার গয়না, পিঠের আঁচল চাবির ভারে ঝুলে

আছে। আধো-ঘোমটায় ঢাকা মায়ের ঢলঢলে সুখী বোকা মুখখানা। মায়ের হাঁটুর কাছে বাবার চটিপরা পা নড়ছে। বাবা বসে আছে কাঠের জালিকাজ করা সিংহাসনের মতো দেখতে প্রকাণ্ড গদিওলা চেয়ারে, সামনে পাথরের টেবিল। টেবিলের ওপর রুপোর রেকাবে কাটা ফল, রুপোর গ্লাসে জল। পিছনে চাকর দাঁড়িয়ে খুব বড় হাতপাখায় বাতাস করছে।

দৃশ্যটা দেখে হঠাৎ আগাপাশতলা জ্বলে গেল আদিত্যর। একসময়ে কলেজ-জীবনে ললিত তাকে রাজনীতি শিখিয়েছিল। সেগুলো কোনও দিনই ভাল বোঝেনি আদিত্য। কিন্তু তার ফলে নিজেদের অবস্থার প্রতি একটা বিদ্বেষ গজিয়েছিল তার। তার ওপর রমেনকে দেখে সে শিখেছিল নিজেকে ঘেন্না করতে। সেইসব বিদ্বেষ ঘৃণা মনের কোন অন্ধকার জল ঘোলা করে তলানি থেকে উঠে এল।

সে ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় ছাড়ল নিঃশব্দে। তারপর শুয়ে রইল বিছানায়, অন্ধকার ঘরে। সে এই পরিবারে, এই বাড়িতে জন্মেছিল বলে নিজেকে ধিক্কার দিল অনেক। বিকেলে যা ঘটেছিল তার সবটুকু বিষ উঠে এল তার গলায়। সে বুঝতে পারল, এ-বাড়ির ছেলে হয়ে লেখাপড়া শিখতে যাওয়া তার উচিত হয়নি, ঠিক হয়নি শাশ্বতীর সঙ্গে প্রেম করতে যাওয়া। তার জাত আলাদা। শাশ্বতীকে নয়, আসলে তার সন্দেহ নিজেকেই । প্রতি মুহূর্তেই ভয়, শাশ্বতীর সঙ্গে বুঝি তারে মানায় না। সবসময়ে সন্দেহ, ললিত যেন তাকে কোথায় হারিয়ে দিয়ে রেখেছে, কিংবা রমেন বুঝি জন্ম থেকেই মহাপুরুষ, যার নাগাল তার সাধ্যাতীত। এইসব সন্দেহ তাকে কুরে কুরে খায়।

শুয়ে থেকে সে এই বিষজ্বালা টের পাচ্ছিল। গলার কাছে, জিভে দাঁতে উঠে আসছে বিষ। এক্ষুনি ঢালতে হবে কোথাও। নইলে সে রাগে, বিদ্বেষে, ঘৃণায় নীল হয়ে যাবে বুঝি।

ঠিক সেই সময়েই অন্ধকার ঘরে এল মা। চুড়ি বালার ঝন শব্দ করে ঠান্ডা হাতখানা কপালে রেখে বলল, খোকা, তোর শরীরটা ভাল নেই! শরবত খেলি না যে!

অমনি ফণা তুলল আদিত্য। ছিটকে উঠে বলল, চলে যাও, চলে যাও, আমাকে ছুঁয়ো না। তোমার গায়ে বন্দকি সোনার গয়না...

তার চিৎকার শুনে বাবা বারান্দা থেকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

ফুঁসে উঠল আদিত্য। উপর্যুপরি ছোবল মারতে লাগল চারদিকে। অন্ধের মতো। কী বলেছিল তা আর আজ খেয়াল নেই তার। বোধ হয় বলেছিল, আপনি কেন লেখাপড়া শেখেননি!...কেন কোনও দিন মূল্য দেননি মানুষকে?...কেন আত্মসম্মান ভাসিয়ে খদ্দেরদের 'বাবু' বলে ডাকেন এখনও?...কেন আপনার জন্য বন্ধুদের কাছে আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করবে?...

সে-সব উলটোপালটা কথার কোনও মানেও হয় না। কিন্তু তাতে অপমানের বিষটা ঠিকই ঢালতে পেরেছিল আদিত্য। তার বাবা কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলেন তার দিকে। ফলটল তখনও খাওয়া হয়নি।

তারপর তুমুল কাণ্ড হয়েছিল অনেক। চেঁচামেচি, কান্না, শরিকির অংশ থেকে জ্ঞাতিরাও চলে এসেছিল। বাবা চটি খুলেছিলেন মারতে। বহুকাল তিনি তাঁর এই শিক্ষিত ছেলেটিকে সমীহ করে চলেছেন। কিন্তু কাল রাতে আর পারেননি।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য চটিটা ব্যবহৃত হয়নি। বাবা বলেছিলেন, তোমার সবকিছু বদহজম হয়েছে। লেখাপড়াটড়া সব। তুমি রোগগ্রস্ত, কিন্তু সেটা টের পাচ্ছো না। এখনই দূর হও এ-বাড়ি থেকে।

কাল সারা রাত আদিত্যর কেটেছে ফাঁকা আস্তাবলে। মশা আর পোকার উপদ্রবে, আর নিজস্ব হলাহলে জেগে থেকেছে সারা রাত। মাইনের টাকা মাসের দশ তারিখের মধ্যে ফুরিয়ে যায় তার। এরপর থেকে মা দেয় হাতখরচ, মাসে প্রায় তিন-চারশো টাকা। কাল পকেটেও কিছু ছিল না। গড়িয়াহাটা থেকে ট্যাক্সিতে ফিরেছিল, ফলে অবশিষ্ট ছিল দু'-তিন টাকার মতো। নইলে গতকাল রাতেই সে বেরিয়ে পড়ত। পকেটে টাকা না থাকলে সে এখনও কোথাও যেতে ভরসা পায় না।

সকালে মা এসে চুপি চুপি পাঁচশো টাকা দিয়েছে তার হাতে, বলেছে, কোথাও গিয়ে দু'-দশদিন থেকে আয়। বাবুর রাগ কমলে আবার ফিরে আসিস। বড় রেগে আছে বাবু। আমি তোর সুটকেস-টুটকেস লুকিয়ে গুছিয়ে এনে দিচ্ছি। তুই বরং নিমতেঘোলায় তোর মেজোমামার কাছে গিয়ে থেকে আয় ক'দিন। কাছেই তো...

সুটকেস আর পাঁচশো টাকা নিয়ে সকালে বেরিয়েছে আদিত্য। সুটকেসটা রেখে এসেছে এক বন্ধুর মেসে, কলেজ স্ট্রিটে। তারপর সারা দিন ঘুরছে। কলকাতা শহরটাকে এমন ধূসর মরুভূমির মতো তার আর কখনও লাগেনি। নিজেকে মনে হয়নি এমন অসহায়। আসলে, দিনের শেষে নিরাপদ আশ্রয় বাগবাজারের সেই দুর্গের মতো বাড়িখানায় আর ফিরে যেতে পারবে না, অবচেতন মনে এই চিন্তাই তাকে ভীষণ ভিতু আর অস্থির করে তুলছে। এখন কোথায় যাবে সে, কীভাবে থাকবে? সে কি পারবে নিজস্ব চাকর ছাড়া? সে কি পারবে নিজস্ব আলাদা ঘর, রোজ চাদর বদলানো বিছানা, শোওয়ার আগে এক গ্লাস দুধ ছাড়া? সে কোনও দিন চেয়ে খায় না। মা নিজে বসে তার খিদে বুঝে খাওয়ায়। নতুন জায়গায় সে কী করে চেয়ে খাবে? তা ছাড়া এক ওই বাড়ির লোকজন আর দাসদাসীরাই সহ্য করে তার উগ্র মেজাজ, তাকে তারা বোঝে, আর কেউ বুঝবে কি? নিজের সম্বন্ধে এইসব অনিশ্চয়তা তাকে আরও অস্থির করে তুলেছিল সকাল থেকে। বন্ধুর নোংরা মেসে সে এক গ্রাসও ভাত খেতে পারেনি। কলাইকরা থালা দেখে বমি উলটে এসেছিল।

আজ অফিস করেনি আদিত্য। কেবল ঘুরেছে আর ঘুরেছে। কয়েকটা বাসারও খোঁজ করেছে সে। পায়নি। কলকাতায় বোধহয় কেউ আর ঘর ভাড়া দিচ্ছে না।

দুপুরের পর শাশ্বতীর অফ-পিরিয়ডটা কখন তা তার মনে ছিল। শাশ্বতীর রুটিন তার মুখস্থ। সেই সময়েই সে এসেছিল শাশ্বতীর কাছে। পেল না। কলেজের দারোয়ান বলল, একটু আগেই শাশ্বতী চলে গেছে। এক দিদিমণির গাড়িতে।

খুব ধীরে ধীরে বড় রাস্তার মোড়ে এসে আদিত্যে একটা সিগারেট ধরাল। ক্লান্ত লাগছিল খুব। গাড়িতে কোথায় গেল শাশ্বতী? এখন তাকে কাছে পেলে হয়তো একটু ভাল লাগত আদিত্যর।

আশ্চর্য এই যে, কোনওকালে কোনও অনিশ্চয়তাকে বোধ করেনি সে। বরাবর জানত সে যাই হোক, যাই করুক, তার পিছনে দুর্গের মতো বিশাল আশ্রয়টি আছে। স্বার্থপর লোভী লোকটি তার বাবা, তবু বটগাছের মতো তিনি আছেন মাথার ওপর। এখন সে তার পিছনে সেই দুর্গ আর গাছটিকে অনুভব করতে পারছিল না। শরতের বেলা পড়ে আসছে দ্রুত। একটু পরেই রাত নামারে কলকাতায়। অসহায় আদিত্য একা কোথায় যাবে!

সে ললিতের কথা একটু ভেবে দেখল। বন্ধুদের মধ্যে ললিত একমাত্র লোক যার কাছে যে-কোনও অবস্থাতেই যাওয়া যায়। গেলে দু'হাত বাড়িয়ে 'আয়' বলে টেনে নেবে ললিত। যাবে তার কাছে!

পরমুহূর্তেই সে আপন মনে মাথা নাড়ল। তা হয় না। কাল যা ঘটে গেছে তার পিছনের কারণ আসলে ললিতই। ললিতকে নিয়েই গণ্ডগোলটা লেগেছিল। শাশ্বতীর সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য তেতো হয়ে গেল সম্পর্ক, তারপর বাড়ির ওই ব্যাপার। সবকিছুর জন্যই ললিতকে দায়ী করা চলে। সেই কলেজ জীবনে কেন ললিত তাকে শেখাতে গিয়েছিল সাম্যবাদ! যদি না শেখাত তবে আজ সংস্কারবশতই সে তার লোভী স্বার্থপর বাবাকে একরকম করে মানিয়ে নিতে পারত। কেন বিষ ঢুকিয়েছিল ললিত?

ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল। গড়িয়াহাট ছেড়ে অনেক দুরে একা একা ভবঘুরের মতো হাঁটল আদিত্য। হিজিবিজি চিন্তা, অনিশ্চয়তা আর ভয়ের উলটোপালটা স্রোত তার মাথার ভিতরে ঘূর্ণিঝড় তুলছে।

অবশেষে রাত আটটা নাগাদ সে হাল ছেড়ে দিল। এসপ্ল্যানেডের একটা দোকান থেকে ফোন করল বাড়িতে, বাবাকে।

বাবার স্বর ভেসে এল, সেই পুরনো চেনা সতর্ক ভারী গলাটি, হ্যালো।

আমি আদিত্য বলছি।

একটু চুপ ওধারে। তারপর, কী চাও?

আদিত্য চোখ বুজল ক্লান্তিতে, শ্বাস ফেলে বলল, আমাকে ক্ষমা করুন।

বাবার গলা হঠাৎ খুব নরম শোনাল, সারা দিন তুমি কোথায় ছিলে? আমি আজ তোমার জন্যই দুশ্চিন্তা করেছি কেবল। রাতে শুয়েছিলে কোথায়?

আদিত্য সে-সব কথার উত্তর না দিয়ে বলল, আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আমাকে ফিরে আসতে দিন।

এসো, খুব তাড়াতাড়ি চলে এসো। এসে খাও, বিশ্রাম করো। আমাদের সকলেরই ভুল হয়, তাতে লজ্জার কিছু নেই। ...কোথায় আছ— কোথা থেকে টেলিফোন করছ বলো, গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

না, আমিই যাচ্ছি।

ট্যাক্সি নিয়ে এসো। টাকা না থাকলে চিন্তার কিছু নেই। আমি গেটের কাছে দাঁড়াচ্ছি, তুমি এলে ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে দেব। চলে এসো।

কথা শেষ হয়ে গেল। তবু টেলিফোন ছাড়ল না আদিত্য। ধরে রইল। ও-পাশে ধরে রইল বাবাও। কয়েক সেকেন্ড। তারা পরস্পরের ক্লান্ত শাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনল কেবল। তারপরই আদিত্য রেখে দিল টেলিফোন।

বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরল।

ওদিকে শাশ্বতী আজ একটা নতুন ধরনের বিকেল কাটাল।

রাকাদের গাড়িটায় ওঠার পর থেকেই সে একটা মৃদু উত্তেজনা বোধ করছিল। সে উত্তেজনাটা বেড়ে গেল যখন রাকা তাদের দু'জনকে রেখে ঢুকে গেল রেডিয়ো স্টেশনে।

তখন কিছুক্ষণ লজ্জায় মুখ নত করে রইল শাশ্বতী। রাকার দাদা চুপ করে একটুক্ষণ চেয়ে রইল অন্য দিকে।

তারপর প্রথম কথা বলল রাকার দাদা, এখানেই গাড়িতে চুপচাপ বসে থাকবেন, না কি কোথাও গিয়ে একটু চা খাবেন? রাকার আসতে বেশ দেরি হবে।

শাশ্বতী একটু চুপ করে থেকে বলল, ফিফ্‌থ পিরিয়ডে আমার একটা ক্লাস ছিল। ভাবছিলাম তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে ক্লাসটা করব।

রাকার দাদা কবজির ঘড়ি দেখে বলল, ক'টায় ক্লাস?

শাশ্বতী সময়টা বলতেই রাকার দাদা মাথা নেড়ে বলল, তা হলে মোটে আধ ঘণ্টা সময় হাতে আছে। অবশ্য আপনাকে দশ মিনিটেই পৌঁছে দিতে পারি... কিন্তু, খুব ইম্পর্ট্যান্ট ক্লাস কি?

শাশ্বতী একটু ইতস্তত করে বলল না, তেমন কিছু নয়।

তবে চলুন, কোথাও একটু বসি।

শাশ্বতী নতমুখে লাজুক একটু হাসি হাসল কেবল।

রাকার দাদা সুমন্ত এক মিনিটও দেরি না করে ঘুরিয়ে নিল গাড়ি।

এটা কেমন যে শাশ্বতীর এখন বেশ ভাল লাগছে! কেন লাগছে? সে নিজের মনে খুঁজে দেখল, কিন্তু কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পেল না। না কি কেবল বাধা নিয়মের বাইরে যাওয়ার মধ্যেই এক আনন্দ আছে। এ কি অবৈধ? অবৈধ কেন হবে! সে তো আর আদিত্যর কাছে বাঁধা নয়! না কি বাঁধা! কোনও এক অদৃশ্য বন্ধন রয়ে গেছে! আদিত্যর ক্লান্ত মুখখানা চোখে এক পলকে জন্য ভেসে উঠল তার। বহু দুর থেকে এসেছিল মানুষটা, তারই খোঁজে। সে অবহেলায় চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

সুমন্ত জিজ্ঞেস করল, গঙ্গার ধারে একটা সুন্দর চা খাওয়ার জায়গা আছে, নির্জন এখন। যাবেন?

শাশ্বতী ঘাড় নাড়ল। যাবে।

সকাল থেকেই তার মন বলছে, আজ একটা কিছু ঘটবে। সেটাই ঘটতে যাচ্ছে কি? ঘটুক, কোনও ক্ষতি নেই। আজ জীবনে এই প্রথম তার গা ভাসাতে ইচ্ছে করছে। গঙ্গার ধার ধরে যাচ্ছে গাড়ি। হাওয়ায় শাশ্বতীর আলগা বেণি থেকে কিছু চুল খুলে উড়ছে। আঁচল উড়ছে। চোখ বন্ধ করল শাশ্বতী। একটু বুঝি শরীর তলিয়ে দিল পিছন দিকে।

ওদিকে ভিড় করে জেটিতে বেঁধেছে জাহাজ। দুপুরের আকাশে তাদের ক্ষণস্থায়ী মাস্তুল দেখা যায়। গঙ্গার জলের ভাপ মুখে এসে লাগে। নৌকো স্থির হয়ে আছে মাঝ গাঙে, দুলছে বয়া। গঙ্গার ঘাট দেখলেই দূরকে মনে পড়ে। মনে পড়ে, বিদায়। প্রবল স্রোত আর তার ওপরে আকাশের দিগন্ত-প্রসার। একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দুর দুরান্ত এসে তছনছ করে দিয়ে যায় মানুষকে। নোঙর তুলে ফেলবার সাধ জাগে মনে।

রেস্টুরেন্টে, প্রায় গঙ্গার জলের ওপর মুখোমুখি দুই চেয়ারে বসে তারা চুপ করে গঙ্গা দেখল অনেকক্ষণ। কথা বলল না।

এ-সব জায়গায় শাশ্বতীকে কেউ কখনও আনেনি। আদিত্য বড় ঘরমুখো। তার সামনে বিপুল বিস্তার আর দূর আর দূরান্তের কথা ভাবতে ভাবতে একসময়ে শাশ্বতীর সাধ হল, সে একজন নোঙরছাড়া ভবঘুরে পুরুষের সঙ্গে একদিন এইখানে আসবে। তারপর এখান থেকেই সংসার ত্যাগ করবে তারা। আর ফিরবে না।

কয়েক মুহূর্ত পর চটকা ভাঙে শাশ্বতীর। সে টের পায় যে সে এক প্রায় অচেনা পুরুষের সঙ্গে একা একটা অচেনা জায়গায় বসে আছে।

সুমন্ত কফি আর স্যান্ডউইচ আনাল। অন্য পুরুষের সামনে খেতে বড় লজ্জা করে শাশ্বতীর। কিন্তু তার স্বভাব অনুযায়ী সে তো আজ চলছে না। তাই গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে সেই সুস্বাদু স্যান্ডউইচ খেতে ভালই

লাগল তার।

সুমন্ত প্রথমে কলেজ ইত্যাদির কথা জিজ্ঞেস করল, নিজের কলেজ-জীবনের কথা বলল কিছু কিছু। জিজ্ঞেস করল, শাশ্বতী রাজনীতি করে কি না। তারপর আচমকা ভীষণ ব্যক্তিগত প্রশ্ন করল সে, আপনি কি কারও সাথে এনগেজ্‌ড?

কথাটা বুঝতে একটু সময় লাগল শাশ্বতীর। হু হু করে বাতাস বইল অনেক, ছল ছল শব্দ করল জল, দূরে বাজল জাহাজের ভোঁ। সমস্ত হাতে নুনের কৌটো নিয়ে খেলা করতে করতে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল।

প্রশ্নটা বড় দেরিতে বুঝল শাশ্বতী। বুঝে উত্তর দিতে পারল না। মাথা নত করে রইল। রক্তের ঝাপটা লাগল মুখে।

অবশেষে সুমন্ত মাথা নিচু করে বলল, প্রশ্নটা করা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু আমার একটা সৎ উদ্দেশ্য ছিল।

সেটা কী শাশ্বতী জানতে চাইল না। অনুমান করল মাত্র।

সুমন্ত খুব লাজুক নয়। সরাসরি অনেক কথা বলতে পারে। বলল, রাকাকে আমি মাসখানেক আগে বলে রেখেছিলাম আপনার কাছ থেকে যেন কয়েকটা কথা জেনে নেয়। তার মধ্যে এই প্রশ্নটা একটা। রাকা অবশ্য আমাকে বলেছিল যে আপনি এনগেজ্‌ড নন, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ও না-জেনে কথাটা বলেছে। বলে হাসল সুমন্ত, রাকা বড্ড কম সিরিয়াস। কোনও ব্যাপাবেই গুরুত্ব দেয় না।

শাশ্বতী হঠাৎ, ধরা গলায় কোনওক্রমে বলল, আমি এনগেজ্‌ড এ-কথা তো বলিনি।

নন? ভীষণভাবে শরীর ঝাকিয়ে সোজা হয় সুমন্ত।

এখন কী বলবে শাশ্বতী? সে নিজেও যে বুঝতে পারছে না সত্যিই সে কারও সঙ্গে আবদ্ধ কি না!

সুমন্ত খুব সুন্দর করে হাসল। খুশির হাসি। তারপর ভরাট আত্মবিশ্বাসের গলায় বলল, তা হলে একদিন আমার প্রস্তাব যাবে আপনার কাছে। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, অবশ্য আরও কিছু জানার থেকে গেল। আপনারও, আমারও। কিন্তু প্লিজ, দয়া করে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবেন না। যদি কিছু জানার থাকে এক্ষুনি জেনে নিন।

কিন্তু শরীর ঝিমঝিম করল শাশ্বতীর। মৃদু মদের নেশার মতো অবশ হয়ে গেল তার হাত-পা। চুপ করে বসে রইল সে। কথা বলল না।

একটু পরেই ঘড়ি দেখে সুমন্ত বলে, চলুন, যাওয়া যাক।

তারপর অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে লাগল। রাকাকে রেডিয়ো স্টেশন থেকে তুলে নিল সুমন্ত। তারপর তারা গেল খুব বড় একটা রেস্টুরেন্টে। অদ্ভুত খাবার খেল সব। অজস্র কথা বলল রাকা। সুমন্ত হাসল খুব। আর সারাক্ষণ ঝিম ঝিম করল শাশ্বতীর শরীরের ভিতরটা।

সুমন্ত হয়তো কোনও ফাঁকে, হয়তো রেডিয়ো স্টেশনেই যখন রাকাকে আনতে লবি পর্যন্ত গিয়েছিল তখনই, কিছু বলে থাকবে। তাই রাকা এক ফাঁকে শাশ্বতীর কানে কানে বলল, তুই আমার কত নম্বর বউদি জানিস তো! তিন নম্বর! এই দাদা সেজো। তুই হবি আমার সেজোবউদি।

কথাটা শুনতে মোটেই ভাল লাগল না শাশ্বতীর। কিন্তু সে চুপ করে রইল। ভাল করে আজ কিছু বলতে পারছে না। সে এখনও বুঝতে পারছে না সে খুব সুন্দরী কি না। কোনও দিন কেউ তো বলেনি যে সে খুব

সুন্দর! নইলে কাল কেন ও রকম অদ্ভুত সন্দেহ করেছিল আদিত্য? বলেছিল যে তার জাত আলাদা! সকলেরই কেন এত মনোযোগ তার প্রতি? ভাবতে ভাবতে কেবলই ঘোলা হয়ে গেল মাথা।

ঘোর-ঘোর সন্ধেবেলায় বাড়ির কাছেই বড় রাস্তায় তাকে ওরা নামিয়ে দিয়ে গেল। তখন শাশ্বতী সত্যিই টলছে। রাকা গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, শিগগিরই আমরা একদিন আসছি দল বেঁধে কনে দেখতে। তৈরি থাকিস।

কত দ্রুত ঘটনা ঘটে যায়। কিছু করার থাকে না।

রাতে যখন বিছানায় শুয়ে ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ তখন শাশ্বতী অনুভব করল তার বুক ভরতি টলটল করছে ভালবাসা-আত্মসমর্পণ। কিন্তু কে নিতে পারে সেই মহামূল্যবান? আদিত্য না, সুমন্ত না। যারা তাকে চায় তারা কেউ না। যে পুরুষ তাকে যাচ্ঞা করে সে কিছুতেই তার নয়। সে হবে অন্য কেউ। হয়তো সে খুব উদাসীন। হয়তো সে খুব কর্মব্যস্ত একজন।

কিন্তু সে কে যে কে জানে!

আচমকা মনে ভেসে ওঠে কয়েক মিনিটের দেখা মৃত্যুপথযাত্রী একজনের দৃঢ় ধারালো মুখ। সে-মুখ ললিতের। আহা— যে বাঁচবে না। তবু মনে পড়তেই ঘুমের মধ্যেই অন্যমনে মুখ টিপে হাসে শাশ্বতী। হাসিটুকু ঠোঁটে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

চোদ্দো

অপরাহ্নে এক-একদিন উঠোনে একটা অদ্ভুত আলো এসে পড়ে। শালিখের পায়ের মতো হলুদ তার রং। পাঁচিলের ছায়া তুলসীমঞ্চ ছাড়িয়ে অর্ধেক উঠোন পর্যন্ত চলে যায়। পেয়ারা গাছে ফিরে আসে পাখির ঝাঁক। সেই অলৌকিক হলুদ আলো-আঁধারিতে মা কুঁজো হয়ে সড়সড় করে উঠোন ঝাঁট দেয়, বিড়বিড় করে কী যেন কথা বলে নিজের সঙ্গে।

দুপুরের ঘুম থেকে উঠে ললিত উঠোনের সিঁড়িতে বসে অলস দুর্বল শরীর আর ঝিম-ধরা মাথায় উঠোনের সেই অলৌকিক আলো দেখে বোকা-চোখে চেয়ে থাকে। মনে হয়— সে জেগেছে অন্য এক গ্রহের বিকেলে। এ সব চেনা পৃথিবীর দৃশ্য নয়।

ঝাঁট দেওয়া শেষ হলে মা ঘটি থেকে জলছড়া ছিটিয়ে দেয় সারা উঠোন। তুলসীতলায় প্রদীপ দেয়, শাঁখ বাজায়। ঠিক সেই সময়ে দূরে কোথাও বাচ্চা ছেলেদের খেলা ভাঙে, তাদের হাসি-চিৎকারের শব্দ ভেসে আসে। আর তখন, ললিতের চোখের সামনে স্বল্পস্থায়ী হলুদ আলোটি ক্রমে মুছে যায়। কোথা থেকে উঠোনে এসে পড়ে বিষন্ন সব ছায়া আর ছায়া। ভেজা মাটির গন্ধ মন্থর বাতাসে ভারী হয়ে ওঠে। ললিত দরজার কাঠে তার মাথা হেলিয়ে দেয়, হাঁটু মুড়ে বাচ্চা ছেলের মতো বসে থাকে। হয়তো তখন মা তাকে ডেকে বলে, ঘরে যা ললিত, এখন বড় হিম পড়ে। কিন্তু ললিত সে-কথা শুনতেই পায় না। কেননা তখন অপরাহ্ণের নিঃশেষ আলোয়, দীর্ঘ গাঢ় ছায়ার দিকে চেয়ে থেকে সে বহুবরের এক নিস্তব্ধতার কণ্ঠস্বর শোনে। তার সামনে ছোট্ট উঠোনটায় শব্দহীন ভাবে শেষ হয়ে যায় একটি দিন। দিন যায়। ললিতের দিন যায়। মহামূল্যবান এক-একটি দিন।

সন্ধ্যাবেলাতেই মায়ের রান্না শেষ হয়ে যায়। তখন মাঝে মাঝে মায়ে-পোয়ে লুডোর ছক ফেলে বসে। অদ্ভুত নিয়মে তাদের খেলা হয়। তারা কেউ কারও গুটি খায় না। যে আগে ঘরে পৌঁছয় তার জিত। এ তাদের নিজস্ব নিয়ম। কেউ বাধা দেয় না। তাদের ভুল ধরে না। তাই অদ্ভুত নিয়মে চলে খেলা।

কোনও দিন বা গলির সামনে পাড়ার রাস্তায় আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায় ললিত। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে দু'দণ্ড কথা বলে। সত্যদাসের মুদির দোকানের সামনে বাঁশের খাটার বাবা বেঞ্চে গিয়ে কোনও-কোনওদিন বসে। রান্না করতে করতে গিন্নিদের মশলা ফুরোয়। তাই তখন পড়া ফেলে বাচ্চা ছেলে কি মেয়েটাই আসে মায়ের জন্য এক পোয় তেল কি দু' আনার গরমমশলা নিতে। একটু সময় কাটিয়ে যায় ললিত। ছেলেবেলায় কত গেছে পড়া ফেলে মায়ের মশলা আনতে। সত্যদাসের দোকানে বাচ্চাদের ভিড় দেখে ললিত, সবাইকে চিনতে পারে না। মাঝে মাঝে সত্যদাসকে ডেকে বলে, ও মেয়েটা কে বলো তো!

ক্লাবের সামনে জটলা করে শম্ভু-সুবলরা। ললিত পারতপক্ষে সেদিকে যায় না। তাকে দেখলে ওরা এখনও সিগারেট লুকোয়। তাই সত্যদাসের দোকানে বসে রাস্তা দেখে ললিত। কখনও সেই রাস্তা ধরেই হা-ক্লান্ত, বিষণ্ণ, চিন্তিত মুখে কপালে ভাঁজ ফেলে তুলসীকে আসতে দেখা যায়। বড় খুশি হয়ে ওঠে ললিত। সারা দিন

সে মানুষের জন্য অপেক্ষা করে। যে-কোনও মানুষ আসুক তার কাছে। তুলসীর সঙ্গে কিন্তু আড্ডা জমে না। তুলসী গিয়ে রাজ্যের গল্প ফেঁদে বসে মায়ের সঙ্গে। বুড়োদের মতো সংসারী কথা বলে।

বাবার বাৎসরিক কাজের দিন ঠিক করতে এক দিন এসেছিলেন মাধব চক্রবর্তী। ললিতকে ডেকে বললেন, পৈতেখানা ফেলে দিয়েছিস, তোরা কী রে?

পৈতেটা ঠিক ফেলে দেয়নি ললিত। কবে যেন বহুকাল আগে পুরনো হয়ে ছিড়ে গিয়েছিল পৈতে, সেটা ছেড়ে ফেলেছিল। তারপর আর পরা হয়নি। ললিত চুপ করে থাকে।

মা খুঁজে-পেতে ঠাকুরের সিংহাসনের তলা থেকে একটা প্যাকেটের পৈতে বের করে বলে, ঠাকুরমশাই, গেরোন্থি দিয়ে রেখে যান। আমি ওকে পরাব।

তখন মাধব চক্রবর্তী ললিতকে গাল দিতে দিতে বসলেন গ্রন্থি দিতে। ললিত সুতো ধরল, মাধব চক্রবর্তী পদ্মাসনে বসে হাঁটুতে সুতোর প্যাঁচ দিতে দিতে হেঁকে বললেন, চণ্ডীখানা পড়িস? তোকে শিখিয়েছিলাম পড়তে!

তারপর আপন মনে হায় হায় করেন মাধব, আচমন ভুলে গেলি, গণ্ডূষ ভুলে গেলি... এরপর গায়ত্রী ভুলবি, গোত্র ভুলবি, কোন ঋষির পুত্র তা ভুলবি, শেষে বাপের নামও মনে পড়বে না...।

অনেকটা পর অবিরল হাসতে পারে ললিত।

মাধব চশমা তুলে তাকান, চণ্ডীখানা পড়িস ললিত। তোকে যে পকেট-চণ্ডীখানা দিয়েছিলাম, আছে সেটা?

ললিত ঘাড় নাড়ে। আছে।

পড়িস। চণ্ডীপাঠে রোগ সারে। আমি চল্লিশ বছর পড়ছি। দ্যাখ, আমার শরীরে রোগ নেই।

ললিতদের দেশের গ্রামে পুরুত ছিলেন মাধব। এখানে কাছাকাছিই থাকেন। এখন আসেন কালেভদ্রে। বাবা বেঁচে থাকতে কিন্তু রোজ সন্ধেবেলা মাধব তার লক্ষ্মীনারায়ণের পুজো সেরে আসতেন ললিতের বাসায় খবরের কাগজ পড়তে। চাদরে ঢাকা দিয়ে রেকারে আনতেন সামান্য প্রসাদ। ললিতের তখন টাইফয়েড চলছে। সারা বিকেল সে তার নলীর মতো ঘাড়খানা উঁচু করে মাধবের জন্য দরজার দিকে চেয়ে থাকত। মাধব এসে হাতে দিতেন আলোচাল-মাখা একটু কলা, একটি বাতাসা, এক টুকরো নারকেল কিংবা আখ। সেই প্রসাদটুকু কতক্ষণ ধরে রেখে রেখে টুক টুক করে পাখির মতো অল্পে অল্পে খেত ললিত, পাছে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়! সারা দিনে ওইটুকুই মাত্র কুপথ্য সে করতে পারত। প্রসাদ বলে মা কিংবা বাবা আপত্তি করত না। প্রসাদটুকু শেষ করে ললিত চিঁ চিঁ করে দুর্বল গলায় বলত, ঠাকুরমশাই, আপনার খাওয়ার গল্প বলুন। মাধব হাসতেন, তারপর ফেঁদে বসতেন গ্রামের এক কৃপণ বুড়িকে ভজিয়ে কীভাবে দেড় সের সর খেয়েছিলেন সেই গল্প। সেই সূত্রে আরও কত খাওয়ার গল্প এসে পড়ত। শুনতে শুনতে ঢোঁক গিলত লোভী ললিত, শূন্যমুখে স্বাদ পেত সেইসব খাবারের। 'ভাল হয়ে অনেক-অনেক রকমের খাবার খাব' ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ত সে। মাধবকে কী যে ভাল লাগত তখন!

এই সেই মাধব। কিন্তু মাধব এখনকার ললিতকে কী দিতে পারেন, যা ললিত কৃপণের মতো যত্নে নেবে হাত পেতে! আছে কি মাধবের কাছে কিছু, সেই অলৌকিক স্বাদযুক্ত প্রসাদের মতো? কিছু নেই। তবু ললিত স্নান করে পৈতে পড়ল। পরে নিজেকে শিশুর মতো বোধ করল সে। রুগ্ণ এক শিশু, যা-শিশুর মাধবের কাছে

রোজ এক প্রত্যাশা থাকত। ঠিক সেইরকম পৈতে পরে সে এই পৈতেটার কাছ থেকে কিছু একটা প্রত্যাশা করতে লাগল। হয়তো তা আরও কিছুদিনের জীবনীশক্তি, নিরাপত্তা, অভাবমোচন কিংবা এমনকী নারীপ্রেম।

দু'-একদিন এ-রকম শিশু হওয়ার নেশা তাকে পেয়ে বলল। পকেট-চণ্ডীখানা দুপুরে খুলে বসল সে। খুলল শেষের দিকের পাতা, যেখানে চণ্ডীপাঠের ফল দেওয়া আছে। সংকল্প ও পূজা করার পর একবার পাঠ করলে ও বলিদান করলে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে।... চৌদ্দবার পাঠ করলে স্ত্রী ও শত্রু নিজের বশ হয়ে থাকে... কুড়িবার আবৃত্তি করে পাঠ করলে মানুষ দুষ্টব্রন বা বিষফোঁড়া থেকে আরোগ্য লাভ করে। তার পর আছে "সংকট উপস্থিত হইলে, দুশ্চিকিৎসা ও ব্যাধিতে, প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হইবার সময়ে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিন প্রকার উৎপাত উপস্থিত হইলে, অতিপাতক হইলে, যত্নের সহিত একশোবার আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিবে। তাহাতে বিপদ নষ্ট হইয়া এই জন্মে মঙ্গল ও পরজন্মে পরমগতি লাভ হয়।"

পড়তে পড়তে কেমন একটা লোভ ঘনিয়ে ওঠে মনের মধ্যে। উত্তেজনা বোধ করে ললিত। আত্মবিস্মৃতের মতো উঠে বসে। অতীতের ললিতকে ভুলে গিয়ে পরিপূর্ণ এক নবজাতক শিশু হয়ে যাওয়ার চেষ্টায় সে গুনগুন করে পাঠ করতে থাকে, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ দেব্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ ব্যাসায় নমঃ, ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ...

পড়তে পড়তে নিজের চারধারে সেই রোমহর্ষকারী শৈশব টের পায় ললিত। যখন কেবল প্রত্যাশা আছে, আছে প্রসারিত দীর্ঘ আয়ু, নির্ভরতা আছে। যেন বা কোলের ললিতকে শক্ত হাতে বুকে আঁকড়ে আছে মা। আর ভয় নেই।

একবার শিশু হয়ে যেতে পারলে আর ভয় নেই। ভাবতে ভাবতে সারা দুপুর ঘরময় অস্থির পায়চারি করে, সিগারেট ধরায়। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে। আবার ফিরে এসে শ্রীশ্রীচণ্ডী খুলে বসে, বিড় বিড় করে বলে, এতকাল ধরে আমি যা শিখেছি সব ভুলিয়ে দাও। আবার নির্বোধ করে দাও। আবার যেন এইসব বিশ্বাস করতে পারি, ছেলেবেলায় যেমন করতুম।

এখন অনেকটাই সেরে গেছে বিমান। পাড়ার এক চেনা কম্পাউন্ডারকে ধরে ওর ব্যান্ডেজ পালটানোর বন্দোবস্ত করেছিল ললিত। ছ'-সাত দিনের মধ্যেই ব্যান্ডেজের সংখ্যা কমে গেছে অনেক। কেবল মাথার চারধারে একটি পট্টি এখনও আছে। ব্যান্ডেজ খোলার পর বিমানের মুখখানা দেখে খুব আবছাভাবে ললিতের মনে পড়েছে যে, এ-মুখ সে কোথাও দেখেছে। হয়তো কলেজের সিঁড়িতে উঠতে নামতে, কিংবা করিডোরে, পথসভার ভিড়ে, হয়তো রমেনের বাড়ির জমায়েতে। এর চেয়ে বেশি কিছু মনে পড়েনি। কলেজ জীবনে হাজারটা ছেলে ঘিরে থাকত ললিতকে, তাদের সকলের মুখ ভিড়ের মুখের মতো, একই রকমের দেখতে।

বিমানের খাবার দু'বেলাই টিফিন ক্যারিয়ারে করে পৌঁছে দিয়ে আসে ললিত। আজকাল বড় লজ্জা পায় বিমান, বলে, আমি বেশ ভাল আছি। বেঁধে খেতে আর অসুবিধে নেই। আর তোমাদের অন্ন ধ্বংস করার মানে হয় না।

ললিত হাসে, অন্ন ধ্বংস হয় আর কোথায়! তুমি তো এইটুকু খাও।

খাওয়ার পরে বিমান ললিতের টিফিন ক্যারিয়ার নিজেই মেজে দেয়। তারপর তারা কিছুক্ষণ মুখোমুখি বসে। সিগারেট ধরিয়ে গল্প করে।

কোনও দিন বিমান বলে, ললিত, তুমি কলেজে যে রকম বক্তৃতা করতে ঠিক সেরকম আবার শুনতে ইচ্ছে করে। এক দিন শোনাবে একটু?

ছেলেমানুষি দেখে ললিত হাসে। মাথা নেড়ে বলে, সব ভুলে গেছি হে।

কথাটা শুনে বিমান অনেকক্ষণ ভাবে। ভেবে চিন্তে বলে, সে-সব কথা কি তুমি প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে না ললিত? করলে কী করে ভুলে যাবে? তোমার সে-সব বক্তৃতা এমন মারাত্মক নেশা জাগাত আমার মধ্যে যে কত বার ভিতরে ভিতরে ওলট-পালট হয়ে গেছি। কখনও একা ঘরে আমি ঠিক তোমার নকল করে বক্তৃতা করতাম, চোখ বুজে কল্পনা করতুম আমাকে ঘিরে সামনে-পিছনে চারধারে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তারা মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে শুনছে আমার কথা। কথা শোনা শেষ হলেই তারা মারমার করে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তুমি তো জানো যে আমি কারও সঙ্গেই কথা বলতে পারতুম না। কিন্তু সে সময়ে আমি একজন বড়লোকের মেয়েকে পড়াতুম। বাচ্চা মেয়ে, সব কথা ভাল বুঝত না। তাই তাকে আমার লজ্জা ছিল না। তোমার বক্তৃতা শুনে আমার এমন নেশা ধরে গিয়েছিল যে সেই বাচ্চা মেয়েটিকে আমি মাঝে মাঝে নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের কথা বলতুম। বলতুম, একদিন সেইসব বঞ্চিত মানুষেরা তাদের সব সম্পত্তি কেড়ে নেবে। তারপর বিচার করবে, দণ্ড দেবে, ধবংস করবে তাদের। ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপের সুফল কী তা সেই মেয়েটি বুঝত না। কিন্তু তবু সে ভারী ভয় পেয়ে যেত। যেমন বাচ্চা মেয়েরা তাদের পুতুল কেউ কেড়ে নেবে শুনলে ভয় পায় ঠিক সেইরকম ভয় পেত। বুকের ফ্রক খামচে ধরে শুকনো মুখে চেয়ে থাকত। তার সেই ভয়টুকু আমি বেশ উপভোগ করতুম। অন্তত ওই একটা জায়গায় আমার বক্তৃতা বেশ সফল হত।

একটু চুপ করে থাকে বিমান, তারপর দুঃখের সঙ্গে বলে, কিন্তু হায়, তুমি সে-সব কথা ভুলেই গেছ!

সত্যিই যে ললিত সুৰ কথা ভুলে গেছে তা নয়। এখনও কথাগুলো মাঝে মাঝে তার ভিতরে ওড়াউড়ি করে। কিন্তু সেসবের আর কোনও দংশন নেই। ললিত তাই সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলে, কিন্তু সেসব কথা তো এখন আর তুমি বিশ্বাস করো না!

বিমান মাথা নাড়ে, না, করি না।

তবে আবার শুনতে চাও কেন?

এমনিই। তোমাকে আবার আমার ওরকম দেখতে ইচ্ছে করে। তোমার ধারালো মুখখানা উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। শক্ত হয়ে ফুলে উঠছে চোয়াল, পাকানো মুঠি তুলে ধরে শপথ করছ, তোমার শরীর নড়ছে চাবুকের মতো। সেইসব ভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতুম আমি। তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিলুম বলে তোমার কথাই আমার কথা হয়ে উঠেছিল। আবার তোমাকে সে-রকম দেখলে, হয়তো আবার আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করে ফেলব। তুমি কি সত্যিই ভুলে গেছ?

ললিত মৃদু ম্লান হাসে। বলে, ভুলিনি। কিন্তু তোমাকে সে-সব আর বিশ্বাস করাতে চাই না।

কেন চাও না ললিত?

ললিত উত্তর দেয় না।

বিমান আস্তে করে বলে, তবে কি এখন বুঝতে পেরেছ যে তুমি সে-সব কথা ভুল বলতে? তাই আমাকে বলতে চাও না?

ললিত কেবল মৃদু হাসে।

বিমান অনুচ্চস্বরে বলে, একথা ঠিকই যে তুমি ভুল বলতে। মানুষকে সমষ্টিগতভাবে দেখার মধ্যেই একটা বিরাট ভুল আছে। কিন্তু তুমি তাই দেখতে। দ্রুত সমাজ পালটানোর জন্য তুমি চেয়েছিলে বিপ্লব, আর বিপ্লবের জন্য জড়ো করতে চাইছিলে মানুষ। তাই তোমার কাছে সমষ্টিই বড় ছিল। ভিড়কে চিনেছিলে কেবল। বিচ্ছিন্ন মানুষটা ভিড় থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়ালেই তুমি আর তাকে চেনোনি। তাই না ললিত? অথচ যে-মানুষটা মিছিলে পতাকা বহন করে যায়, যে তার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিয়ে আসে সেই মানুষটাই হয়তো সময়ের চাষ ফেলে রাখে, বুড়ো বাপকে খাটায়, বীজধান খেয়ে ফেলে, অন্যের খেত থেকে ধান চুরি করে। দাঙ্গা করে জেল খেটে আসে, জোর করে কেড়ে নেয় বউয়ের গয়না, তখন তাকে কে দেখেছে ভাল করে? স্বভাববশত এ লোকটাই একদিন হয়তো তার সর্বস্ব হারায়। এ রকম হাজারটা লোক আসে তোমার বিপ্লবে। তাদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ থাকে, হিংসা থাকে, থাকে প্রতিশোধস্পৃহা, কাম ও মাৎসর্য। কিন্তু তুমি তার স্বভাব বিচার করো না। তোমার কাছে তার সর্বস্ব-হারানোটাই মহত্তর গুণ, তাই তুমি তাকে সর্বহারা বলে বুকে জড়িয়ে ধরো, বিপ্লবের অংশীদার করে নাও, সিংহাসনে বসাতে চাও তাকে কখনও ভেবেও দেখো না সর্বস্ব যে হারায় সে কী ভীষণ ডিসকোয়ালিফায়েড। কিন্তু মানুষকে সমষ্টিগতভাবে দেখতে শিখেছ বলেই তুমি মনে করো সমাজের ব্যবস্থাই তার সর্বস্ব হারানোর কারণ। সমাজ পালটালেই মানুষ পালটে যাবে। তাই না? তাই তুমি তাকে বিপ্লবে ডাক দাও, তাকে লোভ দেখাও যে তার সব অভাব দূর করে দেবে।

ললিত বাধা দিয়ে বলে, সবাই কি এই রকমের?

না। সবাই এই রকমের নয়। সত্যিকারের নিপীড়িতরাও আসে, আসে মুনাফাখোর বুর্জোয়ার চরও, আসে ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যাশী কিছু মানুষ। আমরা রোজ যে-সব নানা ত্রুটিযুক্ত মানুষকে চারধারে দেখছি তারাই। তুমি বিপ্লবের আগে তাদের সংশোধন করে নাও না, নির্বিচারে টেনে নাও বলে। কাজে লাগাও তার শক্তিকে। তোমার সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে এদের স্থুল শক্তি এবং হিংস্রতা। তুমি যথেষ্ট পরিমাণে এ দু'টিকে জাগিয়ে তোলে, ফলে জেগে ওঠে ব্যক্তিগত লোভ এবং প্রতিশোধস্পৃহা, ফলে সে খুব হিংস্রভাবে আক্রমণ করে, সমাজকে চুরমার করে দেয়। কিন্তু বিপ্লবের মাঝপথে সে হঠাৎ থেমে পড়ে, দ্রুত খুঁজতে থাকে মুনাফা, প্রবৃত্তির নানা তৃপ্তি— তার কাছে সেগুলিই বিপ্লবের ফসল। সে বহুকাল ভাল খাবার খায়নি, দুর থেকে ধনীদের জীবনযাত্রা দেখে ও রক জীবনযাত্রার যে লোভ তার বরাবর হয়েছে তা মেটেনি, সে কখনও কর্তৃত্ব করার সুযোগ পায়নি, মানুষকে নিপীড়ন করার মধ্যে যে আনন্দ আছে তা ভোগ করেনি। অথচ এই লোভগুলি তার দুর্জয়ভাবে রয়ে গেছে। তাই তখন তার মধ্যে জেগে ওঠে অমোঘভাবে বুর্জোয়ার শ্রেণীচরিত্র। কিন্তু পুরনো ধরনের বুর্জোয়াদের মতো তার হাতে পুঁজির কর্তৃত্ব থাকে না বলে সে আরম্ভ করে ক্ষমতা দখলের লড়াই। নিজের পালকের পাখি খুঁজে সে তৈরি করে প্রতিক্রিয়াশীল জোট। তখন আবার নতুন লড়াই শুরু হয় এই শ্রেণীর সঙ্গে, কিংবা এ-রকম একাধিক শ্রেণীর সঙ্গে। সে-লড়াইয়েও দু'পক্ষেই থেকে যায় বুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্রের লোক, শোধনবাদী এবং প্রতিবিপ্লবী। ফলে লড়াই আর শেষ হয় না। বহুভাগে ভেঙে যায় মানুষের আদর্শ, তৈরি হতে থাকে বহু দল। তখন, যারা মানুষের সত্যিকারের ভাল করতে চায় তারা নতুন

করে ‘মানুষ’ কথাটা নিয়ে ভাবতে শুরু করে। খুঁজতে শুরু করে মানুষের মূল। তারা দেখে সমাজ পালটালেও মানুষের প্রবৃত্তি পালটায় না— সেই দমননীতি, সেই ক্ষমতা দখল, সেই প্রতিবাদের পথ রোধ করা— যা কিনা ছিল বুর্জোয়ার শ্রেণীবৈশিষ্ট্য সেটাই অন্য চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে। তাই মূল থেকে পালটাতে হবে মানুষকে।

বিমান একটুক্ষণ ললিতের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, অবশ্য এখনও তুমি সেকথা ভাবতে শুরু করোনি। কিন্তু মনে হয়, তোমার ভিতরে ক্লান্তি এসেছে। ভিড়ের মুখ তুমি বোধহয় আর দেখতে চাও না। এবার হয়তো তুমি মানুষের মূল খুঁজতে শুরু করবে। আমিও খুঁজছি।

ভীষণ প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করে ললিতের। সে জানে এগুলো সব ঠিক কথা নয়। কিন্তু বিমান পাগল বলেই সে এর প্রতিবাদ করে না। চুপচাপ বসে শোনে। মৃদু একটু হাসে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে ফিরে আসে সে। ফেরার পথে প্রকাণ্ড একটা অশ্বথ গাছ আছে, তার তলায় বাঁধানো বেদি। সেইখানে একা চুপ করে বসে ললিত। টিফিন ক্যারিয়ারটা পাশে রেখে একটা সিগারেট ধরায়। এতকাল যে-সব কথার পোকাগুলো নির্বিবাদে এলোমেলো ওড়াউড়ি করত মনে, সেগুলো হঠাৎ দলবদ্ধ দংশন শুরু করে। মানুষকে ডেকে আবার কথা বলতে ইচ্ছে করে তার। জোট বাঁধতে ইচ্ছে করে আবার। সে সামনের শূন্য অন্ধকার জায়গাটার দিকে চেয়ে হঠাৎ মৃদুস্বরে বলে, কমরেডস্, আমি ভুলে গিয়েছিলাম সংগ্রামের কথা। আপনারা আমাকে মাপ করবেন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আবার আমি মানুষের মুক্তির সংগ্রামে ফিরে আসব, ভেঙে দেব প্রতিক্রিয়াশীল জোট, সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে মিলিত করব...

কিন্তু বড় ক্লান্তি লাগে। মাথা উত্তেজিত থাকে বলে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসতে চায় না। বিছানা গরম হয়ে ওঠে শরীরের তাপে। ললিত উঠে বাইরের সিঁড়িতে এসে বসে, সিগারেট খায়। বিড়বিড় করে বলে, শৈশবে ফিরে যাওয়া নয়, আমরা চাই তাড়াতাড়ি যৌবনকে পেতে। আমরা অতিক্রম করতে চাই অর্থনৈতিক শৈশব, রাজনৈতিক চেতনার শৈশব, আমরা চাই সমৃদ্ধির যৌবনকে....

ললিত ভাবে, একদিন সে যাবে অবিনাশের কাছে, গিয়ে বলবে, আমি আবার পার্টিতে আসতে চাই। তুমি ব্যবস্থা করে দাও। হ্যাঁ, কালকেই যাবে, কাল সকালেই। আর সময় নষ্ট করবে না।

কিন্তু সকালবেলা থেকেই অন্য রকম সব ঘটনা ঘটতে থাকে।

চা খেতে খেতে খবরের কাগজ দেখছিল ললিত। অনেককাল দেশের রাজনৈতিক খবরগুলোর কোনও খোঁজ রাখেনি সে। তাই মন দিয়ে পড়ছিল। এমন সময়ে সুবল এসে ডাক দেয়, ললিতদা, একটু কথা আছে। গলিতে আসুন।

গলির মুখে ললিতকে নিয়ে গিয়ে খুব উত্তেজিতভাবে বলল, ললিতদা, সেই মেয়েটাকে আমরা ট্রেস করেছি।

ললিত অবাক হয়ে বলে, কোন মেয়েটা?

সুবলের মুখ হঠাৎ রাঙ্গা হয়ে ওঠে, মাথা নামিয়ে নিয়ে বলে, ওই যে, যে-মেয়েটা আপনার বন্ধু বিমান রক্ষিতের কাছে আসে।

মেয়েটার কথা ভুলেই গিয়েছিল ললিত, বলল, সে মেয়েটা কী করেছে?

সুবল ক্ষীণ হাসে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, কী আবার করবে! পাড়ার মধ্যে একজন মেয়ে একটা ব্যাচেলারের কাছে আসে, ঘরের দরজা বন্ধ করে কথাবার্তা বলে, পাড়ার বাচ্চাকাচ্চা ছেলেমেয়েরা এ-সব দেখছে...এ তো ঠিক নয়, তাই আমরা একটু খোঁজ-খবর করেছি।

ললিত শুনে একটু লজ্জা পেল। বিমান তার সহপাঠী, বন্ধু। তার কাছে কে এক মেয়ে আসে তা নিয়ে বয়সে ছোট সুবলের সঙ্গে আলোচনা করতে তার ইচ্ছে হল না। শুধু বলল, কী খোঁজ পেলি?

দেখলাম বিরাট বড়লোকের মেয়ে। হিন্দুস্থান পার্কে ওদের বাড়ি। বাড়ির চারধারে কম্পাউন্ড আর বাগান, দু'-তিনটে গাড়ি আছে, কুকুর আছে, ছাদের ওপর পাথরের পরি...

বলতে বলতে সুবল উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে নিজে হয়তো উত্তেজনা টের পায় না। কিন্তু ললিত পায়। সুবলের চোখ চকচকে হয়ে আসে, কালো মুখটাতে কয়েকটা শিরা জেগে ওঠে আস্তে আস্তে বলে, মেয়েটা লেডি ব্রাবোর্নে পড়ে, গান জানে, ফাংশনে গায়। এ-রকম মেয়ের সঙ্গে ওই লোকটার কী সম্পর্ক? এ-লোকটা কর্পোরেশনের জমাদারদের টিপসই বাবু, গরিবের পয়সা ঘুষ খায়, রোগা হাড়গিলে চেহারা, এর সঙ্গে কি ও মেয়ের সম্পর্ক হওয়া উচিত? আপনার বন্ধু, তাই বেশি কিছু বলতে চাই না ললিতা, কিন্তু আমার মনে হয় লোকটা মেয়েটাকে ব্লাফ দিয়ে ভুলিয়েছে। বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে লাইফের মতো নিশ্চিন্ত, লোকটা সেই তালেই ছিল। কিন্তু বোধ হয় মেয়েটার অন্য কোনও লাভার ব্যাপারটা জেনে গুন্ডা দিয়ে ঠ্যাঙান দিয়েছে লোকটাকে। ও-সব ছিনতাই পাটির গল্প আপনি বিশ্বাস করেন? যারা ছিনতাই করে তারা এমন মরশুটে হাভাতে লোককে ধরবে কেন? ওরা লোক চেনে।

ললিত গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, তোরা এখন কী করতে চাস?

সুবল অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আপনার বন্ধু, তাকে আর আমরা কী করব? আপনি শুধু ওকে একটু সাবধান করে দেবেন, পাড়ার মধ্যে থেকে যেন এ-সব না করে। ওসব মেয়ের দিকে হাত বাড়ানো কি ওর উচিত? আপনিই বলুন না! ওদিকে মেয়েটাও হয়তো লোকটার হিস্ট্রি জানে না, এ-রকম তো হয় আজকাল, অচেনা লোক গিয়ে নানা রকম ব্লাফ দিয়ে বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে। তাই আমাদেরও উচিত মেয়েটাকে বাঁচানো। আমরা মেয়েটাকে সাবধান করে দেব।

ললিত কোনও উত্তর দেয় না। তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। অন্যমনস্কভাবে ঘরে চলে আসে। বিমানের জন্য নয়, সেই অচেনা মেয়েটার জন্যও নয়, বরং সুবলের জন্যই কেমন যেন চিন্তা হতে থাকে ললিতের। ওর চকচকে চোখ, কথা বলার উগ্র ভঙ্গি, অস্থিরতা—এর মধ্যে কী একটা যেন রয়েছে যা অস্বস্তিকর। বড়লোকের সুন্দর মেয়েটা বিমানের কাছে আসে, এটা কি সইতে পারছে না সুবল? না পারাই অবশ্য স্বাভাবিক। বিমান হাড়গিলে, রোগা, ভিতু, দুর্বল, জীবনে অসফল একজন মানুষ। এ-রকম লোকের কাছে কোনও মূল্যবান কিছু দেখলেই নিতান্ত নিরীহেরও ইচ্ছে করবে ওকে দু'ঘা থাপ্পড় দিয়ে জিনিসটা কেড়েকুড়ে নিতে।

শম্ভু-সুবলরা কি জানে যে, একসময়ে ললিতও বড় বাড়ির মেয়ে মিতুর জন্য পাগল হয়েছিল? মিতুকে বাসায় ডেকে এনে ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি করানোর অক্ষম চেষ্টা করেছিল ললিতের বোকা মা? আর, তারপর থেকে ললিত মুখ তুলে রাস্তায় হাঁটতে পারত না? ওরা কি জানে যে, এখনও মিতু বাপের বাড়িতে এসেছে খবর পেলে ললিত অস্বস্তি বোধ করে? না, শম্ভু-সুবলেরা জানে না। কী করে জানবে! ওরা তখন বাচ্চা ছেলে, হাফপ্যান্ট পরে লাল-নীল রবারের বল নিয়ে রাস্তা আটকে ফুটবল খেলে। জানলে কখনও সুবল

ললিতকে এমন নিষ্ঠুরের মতো বলতে পারত না, এ-রকম বাজে লোকটার সঙ্গে কি ও-রকম মেয়ের সম্পর্ক হওয়া উচিত? আপনিই বলুন না!

মিতুর কথা মনে পড়লেই এক নিস্তব্ধ পৃথিবীতে চলে যায় ললিত। যেখানে ললিতের ব্যর্থতাগুলি থরে থরে সাজানো রয়েছে। মিতু তাকে অবহেলা করে গেল, সে হল না সংগ্রামী মানুষের নেতা, হয়ে উঠল না সফল মানুষ। যৌবনের মাঝপথে বেলাশেষের হলুদ আলোটি এসে পড়েছে এখন। দূরবর্তী এক নিস্তব্ধতা আসছে তার দিকে। মূক করে দিয়ে যাবে তাকে। তাই মাঝে মাঝে অস্থিরভাবে মায়ের কাছে চলে আসে ললিত! মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে বলে, আমার মাথায় একটু হাত রাখো তো মা। একটু হাত রাখো।

মা মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, কেন রে?

ললিত বিড় বিড় করে বলতে থাকে, সব ভুলিয়ে দাও তো মা, ভুলিয়ে দাও তো। বুদ্ধি, স্মৃতি, অবিদ্যা, ভুলিয়ে দাও। আবার ছোট ললিত হয়ে কোলে ফিরে যাই...

পনেরো

পরদিনই কলেজে রাকা শাশ্বতীকে ধরল, আমার দাদাকে কেমন লাগল বল।

উদাসীন গলায় শাশ্বতী বলে, ভালই তো।

দাদা বলেছে তোর সঙ্গে একটা সিরিয়াস কথা আছে ওর। শিগগিরই এক দিন গাড়ি নিয়ে আসবে। আমরা গঙ্গার ঘাটে যাব তোকে নিয়ে। হ্যাঁরে তোদের কী কী কথা হল কাল?

শাশ্বতী কেমন ঠান্ডা বোধ করে নিজেকে। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না।

থার্ড পিরিয়ডে ক্লাস ছিল না। শাশ্বতী কমনরুমের জানালার কাছে বসে খাতায় হিজিবিজি মুখ আঁকছিল, যেমন সে প্রায়ই আঁকে। এমন সময় শিবানী এসে ডাকল, এই।

শাশ্বতী মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

শিবানী চোরাহাসি হেসে বলল, তোর তিনি এসে দাঁড়িয়ে আছেন গাছতলায়। শিগগির যা।

শাশ্বতী অবাক হল না। আজ আদিত্য আসবে, এমনটা সে আশা করেছিল। প্রায়ই অফিস থেকে পালিয়ে আসে।

অন্য দিনের মতো চমকে উঠে ছুটল না শাশ্বতী। খুব গড়িমসি করে খাতা বন্ধ করল, দাঁড়িয়ে ঠিকঠাক করল শাড়ি, কপাল থেকে সরাল কয়েক কুচি চুল। বুকের মধ্যে অকারণে একটু ধকধক করছে আজ। হয়তো সে আদিত্যর চোখে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারবে না।

গাছের ছায়ায় আদিত্য দাঁড়িয়ে আছে। গালের দাড়ি পরিষ্কার কামানো, পাটভাঙা ধুতি আর সাদা শার্ট পরনে, চুল আঁচড়ানো। এরকম পরিচ্ছন্ন তাকে বড় একটা দেখা যায় না। যেদিন দাড়ি কামায় সেদিন ময়লা জামা পরে সে, যেদিন পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে সেদিন চুল আঁচড়াতে ভুলে যায়। আজ সবকিছু একসঙ্গে করেছে সে। কাছে গিয়ে এমনকী পাউডারের একটু মৃদু গন্ধও পেল শাশ্বতী।

আদিত্য হাসে না, তার মুখ গম্ভীর। বলে, কাল কোথায় গিয়েছিলে?

একজন বন্ধুর সঙ্গে, রেডিয়ো স্টেশনে। শাশ্বতী চোখ নিচু করে বলে।

শুনলাম একটা গাড়িতে একটি ছেলে আর একটি মেয়ের সঙ্গে গেছ। ছেলেটি কে?

জবাবদিহি চাইবার সুরটা তার ভাল লাগে না, তবু শান্ত গলায় বলে, ও রাকার দাদা সুমন্ত।

খুব জরুরি কাজে গিয়েছিলে?

না। এমনিই, সঙ্গ দিতে।

একটু চুপ করে থাকে আদিত্য। মাথার পাট করা চুল থেকে একটা ঘুরলি আঙুলে পাকায়, তারপর হঠাৎ খুব অদ্ভুত গলায় বলে, কাল তোমার দেখা পেলে আমার একটা সর্বনাশ হত না।

শাশ্বতী চকিত চোখ তুলে আদিত্যকে দেখে। বলে, কী সর্বনাশ?

শ্বাস ফেলে আদিত্য বলে, বলব। এখানে তো বলা যাবে না। চলো কোথাও গিয়ে বসি।

শাশ্বতী ইতস্তত করে বলে, এস-বি’র ক্লাসটা রোজ কামাই হচ্ছে। ক্লাসটা করে যদি—

অধৈর্য হয়ে তাড়া দেয় আদিত্য, আঃ! বলছি জরুরি কথা আছে!

একটু কেঁপে ওঠে শাশ্বতী। আদিত্য এমন ধমকাতে পারে জানত না।

আদিত্য আবার ধমকায়, কী! যাবে?

শাশ্বতী মৃদু স্বরে বলে, চলো।

বালিগঞ্জ স্টেশনে যাওয়ার রাস্তায় বাঁ হাতি একটা রেস্টুরেন্ট আছে তাদের। প্রায়ই এখানে আসে তারা।

আদিত্য বসে অনেকক্ষণ মুখ নিচু করে রইল। শাশ্বতী প্রশ্ন করল না। কিন্তু তার বুকের ভিতরটা ধকধক করছিল ঠিকই।

আদিত্য আস্তে করে বলল, আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি সতী। বাবার ব্যবসায়ে নামব। কাল রাতে সব ঠিক হয়ে গেল।

শাশ্বতী বড় অবাক হয়। এ রকম কথা ছিল না তো! বরং শাশ্বতীর ধারণা ছিল, বাবার ব্যবসাকে ঘেন্না করে বলেই একদিন আদিত্য জোর করে চাকরি নিয়েছিল। তারপর শাশ্বতীর সঙ্গে প্রেম করার সময়েই আদিত্য বুঝতে পেরেছিল যে, কোনও দিনই শাশ্বতীকে তাদের বাড়ির লোক নেবে না। কাজেই, শাশ্বতীকে নিয়ে আলাদা ঘর বাঁধবে আদিত্য। সেইজন্যই চাকরিটা আদিত্যর খুব দরকার। এখন বাবার সঙ্গে ব্যবসায়ে নামলে পরিবার ভেঙে আলাদা হয়ে আসতে পারবে কি আদিত্য? বামুনের মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে গেলে মেনে নেবে কি ওর বাবা? না কি অত ভেবে দেখেনি আদিত্য!

শাশ্বতী এতসব প্রশ্ন করল না। একটু ধারালো গলায় বলল, ভালই তো। তোমার বাবাও এই চেয়েছিলেন। তুমিও সুবোধ ছেলের মতো কাজ করছ। এবার বাবার পছন্দমতো একটা বিয়ে করে ফেলো।

আদিত্য হঠাৎ রেগে যায়, এখনও তুমি সবটা শোনোনি। বাবার ব্যবসায়ে নামলে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না ভাবছ?

শাশ্বতী আদিত্য চোখে চোখ রাখে। শান্ত গলায় বলে, আমাকে তো তোমাদের পরিবার নেবে না! বিয়ে করলে তোমাকে আলাদা থাকতে হবে। বাবার ব্যবসায়ে তুমি পরিবার ভেঙে আসবে কী করে?

আদিত্য ভীষণ অস্থিরভাবে মাথার চুল টানে, ছটফট করে বলে, সে একটা ব্যবস্থা হবেই। বাবাকে আমি বুঝিয়ে বলব। পায়ে ধরব।

শাশ্বতী হঠাৎ বিদ্রূপে হাসে, বলে, ব্যবসায়ে নামলে তুমি তোমার খদ্দেরদের 'বাবু' বলেও ডাকবে তো?

আদিত্য হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলে, ডাকব। তাতে কী? আমার বাপ-ঠাকুরদা ডাকতে পারলে আমি পারব না কেন?

শাশ্বতী হঠাৎ শ্বাস ছেড়ে বলে, তা হলে সত্যিই তোমার সঙ্গে আমার জাত মিলবে না।

শুনে বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেল আদিত্য। কয়েকবার কথা বলবার চেষ্টা করেও চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ পর বিষণ্ণ গলায় বলল, সেইজন্যই তো বলছিলুম কাল আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। কিন্তু কলেজে এসে কাল যদি তোমাকে পেতুম তা হলে ঠিক একটা রাস্তা খুঁজে বার করতুম।

আদিত্য করুণ মুখে বসে থাকে চুপ করে। শাশ্বতীর করুণা হয় একটু। বলে, কী হয়েছিল কাল?

আদিত্য আস্তে আস্তে বলল, পরশুদিন সেই যে একটা ভুতুড়ে কাণ্ড করলুম তোমার সঙ্গে, তারপর থেকেই নিজের ওপর গেলুম ভয়ংকর রেগে। তুমি মাইরি কাঁদছিলে সেদিন বিকেলে! আমি কী সব যা-তা বলেছিলুম

তোমাকে! কিন্তু কী করব সতী, নিজেকে যে আমার ভীষণ সন্দেহ। কখনও ভুলতে পারি না আমি এমন এক বেনের ছেলে, যে পয়সার জন্য একদলের পায়ে ধরতে পারে। আবার পয়সা দিয়েই কিনে নেয় আর-এক দলকে। আমাদের গদিতে গিয়ে দেখতে পাবে বাবা ক্রীতদাসের মতো হাতজোড় করে, 'বাবু' ডেকে খুশি রাখছে খদ্দেরদের, চালু রাখছে লাভজনক ব্যবসা। আবার বাড়িতে গিয়ে সেই বাবাকেই দেখতে পাবে গম্ভীর হয়ে বসে আছে শ্বেতপাথরের টেবিলের সামনে জমকালো চেয়ারে, সামনে রুপোর রেকাবে দামি ফল, চাকরবাকর বাতাস করছে তাকে, তাকে খুশি করার জন্য ছোটাছুটি করছে দাস-দাসী, বন্ধকি সোনার গয়না পরে তার পায়ের কাছে বসে আছে মা। আমাদের পরিবারে কেউই বেশিদূর লেখাপড়া শেখে না, অক্ষরজ্ঞান হলেই পড়া ছেড়ে ব্যবসায়ে নেমে পড়ে। তারপর ঠিক ওইরকম ভাবেই শেখে আত্মসম্মান ভাসিয়ে, ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে রোজগার করতে, আর ঘরে এসে দেড়শো বছর আগেকার সামন্তের মতো সেই রোজগারের ফল ভোগ করতে। তুমি তো জানো না, আমার বাবার সেই পুরনো দিনের রীতি অনুযায়ী একজন রক্ষিতা আছেন শোভাবাজারের আলাদা বাড়িতে, যাকে আমরা 'মা' বলে ডাকি। এইসবই আমাদের পারিবারিক শিক্ষা। আমি এই রকম এক বেনের বাচ্চা। তাই সবসময়ে সন্দেহ হয় আমার মধ্যে কীসের যেন অভাব থেকে গেল। আমি বি এ এম এ পাশ করেও ললিতের মতো হতে পারলুম না, টাকা থাকা সত্ত্বেও হলুম না রমেনের মতো। ওরা ওদের পারিবারিক শিক্ষার গুণেই আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। ঠিক সেই কারণেই, তোমাকে ভালবাসি কিন্তু ভয়ে ভয়ে থাকি, পাছে কোনও দিন তুমি আমার শিক্ষার অভাব ধরে ফেলো। তাই ললিতের কাছে তোমাকে নিয়ে গিয়েই আমি ভয় পেয়েছিলুম তুমি তো জানো না, কী ভীষণ স্মার্ট ছেলে ছিল ললিত! আমার মতো বেনের বাচ্চাকে ও বানিয়েছিল কমিউনিস্ট। শিখিয়েছিল নিজের পরিবারকে ঘেন্না করতে। সেই কারণেই আমি বাবার ব্যবসায়ে যেতে পারিনি কোনও দিন। এ ললিতের জন্যই। কী যে বিষ ঢুকিয়েছিল ও! সেই ভয়ংকর ললিতের কী যে আকর্ষণ তা আমি জানি। তাই বারবার তোমাকে সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম, ললিতকে তুমি কেমন দেখেছিলে।

হঠাৎ শাশ্বতীর বড় ভয় করতে থাকে। ছলাৎ ছল করে তার বুকের ভিতরে লাফিয়ে উঠছে হৃৎপিণ্ড, রক্তের ঝাপটা লাগছে মুখে। এ-সব টের পাচ্ছে না তো আদিত্য?

আদিত্য টের পায় না। সে নিজের কথায় ডুবে থেকেই ম্লান হাসে। বলে, যাকগে সে-সব কথা। সেদিন, অর্থাৎ পরশু, তোমার সঙ্গে ওই কাণ্ড করে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন আমার মন-ভৰা বিষ। মনে হচ্ছিল তুমি আমাকে ভালবাসে না। ভালবাসো না, কারণ আমি ললিত বা রমেনের মতো নই, আমি এক আলাদা নিচু জাতের লোক। সেজন্য দায়ী আমার পরিবার। আমার বাবা, মা, আমাদের এই বিশাল দুর্গের মতো বাড়িটা। তাই সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে আমি সে-সবকিছুর ওপর রেগে গেলুম। বাবা তখন সদ্য রুপোর রেকারে কাটা ফল-টল নিয়ে জল খেতে বসেছে, পিছনে পাখা-হাতে চাকর, চারদিকে দাসদাসী, সেই অবস্থাতে আমি তার সামনে গিয়ে বললুম, আপনি লেখাপড়া শেখেননি কেন? শুনে লোকটা হাঁ হয়ে গেল। তারপর তুমুল কাণ্ড। পরশু রাতেই বাবা বাড়ি থেকে বের করে দিল। আমি সারা রাত ফাঁকা আস্তাবলে বসে মশা তাড়িয়ে কাল সকালে বেরিয়ে এসেছিলম। ভেবেছিলুম আর ফিরব না। কিন্তু সতী, কালই প্রথম বুঝতে পারলুম আমি বড় দুর্বল অসহায়, এত বড় কলকাতা শহরে আমি একটা যাওয়ার জায়গা ঠিক করতে পারলুম না। বন্ধুর মেসে কলাইকরা থালা দেখে খেতে পারলুম না, ওর বিছানায় শুতে গিয়ে ঘামের দাগ দেখে ঘেন্না হল। বুঝলুম আমি

অভ্যাসের দাস হয়ে গেছি। ওই দুর্গের মতো বাড়ির বাইরে সর্বত্র আমি পঙ্গু, অনুপযুক্ত। তোমার কাছে এলুম দুপুরে, তখন স্নান হয়নি, খাওয়া নেই। কিন্তু তোমাকে দেখলেই আমার অনেকটা সাহস ফিরে আসত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তুমি কাল ছিলে না। গড়িয়াহাটায় দাঁড়িয়ে যখন সন্ধে পার হয়ে গেল তখন রাতের কলকাতা বিপুল এক ভয়াবহ অচেনা জায়গা বলে মনে হয়েছিল। আমি ললিত বা তুলসীর কাছে যেতে পারতুম, কিংবা সঞ্জয়ের কাছে, কিন্তু কোথাও যেতে ইচ্ছে করল না। মনে হল ওরা সবাই এক আলাদা জাতের মানুষ, ওরা স্কুল-কলেজের বন্ধু বটে কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার জাত মেলে না। ভেবে দেখলুম, আমি বাড়ি ছেড়ে এসে ভুল করেছি। ও-বাড়ির বাইরে আমি এক একঘরে। তাই রাতে আবার লজ্জার মাথা খেয়ে, সম্মান বিসর্জন দিয়ে ফিরে গেলুম বাড়িতে। সবাই বুকে টেনে নিল। মা শিখিয়ে দিল, বাবুর পায়ে ধরে ক্ষমা চা।

চাইলে? শাশ্বতী উগ্র আগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

হাসল আদিত্য। বলল, সেই ছেলেবেলার পর থেকে বাবাকে কখনও আর প্রণাম করিনি। ঘেন্না করত। কাল পায়ে ধরলুম। বাবা বুকে টেনে নিল। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে গল্প করল আমার সঙ্গে। বলল, পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কেউ শান্তি পায় না। বলল, পারিবারিক জীবিকার চেয়ে সম্মানজনক আর কিছু নেই। আমি অনেক রাত পর্যন্ত ভাবলুম। অনেক ভাবলুম আমি। দেখলুম, ও-বাড়িতে থাকতে গেলে অন্য রকম এক মানুষ হয়ে, বাইরের মানুষের মতো হয়ে থেকে লাভ নেই। তাতে আমার মনুষ্যত্বের কোনও উন্নতি হবে না, আর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক হবে ক্রমেই বিষাক্ত। তার চেয়ে আমি বরং এখন এই পরিবারেরই একজন হয়ে উঠি। আমার একটু শিক্ষাদীক্ষা আছে, ভাল বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ পেয়েছি আমি, কাজেই আস্তে আস্তে আমি হয়তো একদিন এই পরিবারে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারব। ব্যবসাকে করে তুলতে পারব সম্মানজনক লেন-দেন। আমার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, নিজেদের সম্মান দিতে শিখবে, মানুষের মূল্য দিতে শিখবে। তারা কেউ বন্ধকি সোনার গয়না পরবে না, একই সঙ্গে দু'দলের সঙ্গে 'হুজুর' এবং চাকরের সম্পর্ক বজায় রাখবে না, তারা হবে না টাকায় কেনা মানুষ। এইরকম সব অনেক ভাবলুম আমি। শেষে অনেক রাতে বাবাকে বললুম, আমি ব্যবসায়ে নামব। সতী, আমি এই সর্বনাশটুকু করে ফেলেছি। এখন বলো, আমি ঠিক করেছি কি না!

শাশ্বতী মাথা নিচু করে ছিল। টেবিলের কাচে আঙুল দিয়ে আঁকছিল মানুষের মুখ। কথা বলল না।

অধৈর্য আদিত্য ঝুঁকে তার হাত ধরতে গেল। শাশ্বতী চট করে তুলে নিল হাত। বলল, প্রশ্নটা তো থেকেই যাচ্ছে।

কী প্রশ্ন?

আমি।

একটু চুপ করে থেকে শাশ্বতী বলল, আমাকে নিয়েই আবার তোমাদের পরিবারে গোলমাল দেখা দেবে, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হবে তোমার। তাঁরা অসবর্ণ বিয়ে মানবেন কেন?

আদিত্য ছেলেমানুষের মতো বলল, আমি বাবাকে রাজি করাবই।

যদি রাজি না হন?

আদিত্য একবার বলতে যাচ্ছিল, তা হলে আমি চাকরি ছাড়ব না। ব্যবসা ছাড়ব। কিন্তু বলার আগে সে একটু ভাবল। ভাবতে লাগল।

ভাবতে ভাবতে কয়েক দিন কেটে গেল আদিত্যর। আবার তার চুল হয়ে গেল এলোমেলো, রুক্ষ, জামার কলার উলটে থাকে, দাড়ি কামানো হয় না। অন্যমনস্কভাবে অফিসে যায়। চেয়ারে বসে থাকতে পারে না, ঘুরে বেড়ায় এ-টেবিল ও-টেবিল। ক্যান্টিনে গিয়ে চা নিয়ে একা বসে থাকে অনেকক্ষণ। অফিস থেকে বেরিয়ে অনেক দুর হাঁটে। তিন-চারদিন সে শাশ্বতীর সঙ্গে দেখা করল না।

ওদিকে শাশ্বতী মাঝে মাঝে একা তার খাতা খুলে বসে। একটা ধারালো তীক্ষ্ণ নাকবিশিষ্ট মুখ সে কয়েক দিন ধরে আঁকার চেষ্টা করছে। পারছে না।

এ দিন ফার্স্ট পিরিয়ড শেষ করে ইকনমিক্সের ক্লাসে যাচ্ছে শাশ্বতী, এমন সময়ে রাকা এসে ধরল, আজ দাদা আসবে। সাড়ে চারটেয় টাইম দিয়েছে। আজ কিন্তু আমি যাব না, তুই একা যাবি। দাদার সিরিয়াস কথা আছে তোর সঙ্গে।

খুব অবাক হল শাশ্বতী। বলল, কে আসবে বললি?

রাকা থমকে যায়, ভ্রূ তুলে বলে, ও মা, দাদাকে ভুলে গেছিস নাকি?

সত্যিই শাশ্বতী ভুলে গিয়েছিল। ওই খুব রূপবান যুবকটিকে তার একদম মনে ছিল না। বোধহয় সুমন্তর রূপের মধ্যে মনে রাখার মতো কিছু নেই। সে কেবল সুন্দরমাত্র কিন্তু তা পথ আটকে ধরে না। তার দিকে একবার তাকিয়ে চলে যাওয়া যায়। তাই শাশ্বতী ভুলে গিয়েছিল।

শাশ্বতী মুখে বলল, ওঃ। কিন্তু আজ আমার বড় কাজ আছে। আজ সময় হবে না।

সে কী! দাদা যে খুব আশা করে আসবে!

শাশ্বতী ইতস্তত করে। সে বড় নরম মেয়ে। সহজ কৌশলগুলো সে প্রয়োগ করতে জানে না। অসহায়ভাবে বলে, কী করব তা হলে?

ও-সব কাজফাজ বাদ দে। একাজটা অনেক জরুরি। আজ খুব সম্ভব দাদা তোর কাছে প্রপোজ করবে।

কেমন অবশ লাগল শাশ্বতীর। খিল ধরে এল হাত-পা।

কমনরুমে এসে সে একা একা ছটফটে মন নিয়ে বসে রইল, ইকনমিক্সের ক্লাসে গেল না। এলোমেলো ভাবনায় ভেসে যেতে লাগল সে। বুক কাঁপতে থাকল, ঘাম দিল শরীরে। এখন সে কী করবে!

দুপুরে যখন টিফিন ক্যারিয়ারটি হাতে নিয়ে বেরোতে যাচ্ছিল ললিত, ঠিক সেইসময়ে আদিত্য গিয়ে হাজির। উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেহারা, চোখের দৃষ্টি অস্থির, মুখ শুকিয়ে গেছে।

ললিত বলল, কী রে! অফিস নেই?

আদিত্য দু'হাত বাড়িয়ে ললিতের কাধ ধরে বলল, লোলিটা, আমার কয়েকটা কথা শুনবি? খুব জরুরি কথা!

এমনিতে আদিত্য খুব হাসি-খুশি, আমুদে। তাই ওর রোগা শুকনো গম্ভীর চেহারাটা দেখে ঘাবড়ে গেল ললিত। বলল, আয়, ভিতরে আয়।

আদিত্য ভিতরে এসে প্রথমেই সটান বিছানা নিল। উপুড় হয়ে শুয়ে রইল অনেকক্ষণ। ললিত ওকে ডাকল না। অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর ওর পাশে বসল। গায়ে হাত দিয়ে ডেকে বলল, এই, কী কথা বলবি যে!

ডাকতে গিয়েই ললিত টের পেল, আদিত্য কাঁদছে। খুব মৃদু শরীর কাঁপছে তার। মুখ ঢেকে রেখেছে। তবু কান্না ললিত চেনে।

সে বিহ্বল বোধ করে বোকার মতো বসে রইল একটুক্ষণ। তারপর আবার ডাকল, কী হয়েছে বলবি তো! এই আদিত্য—

আদিত্য উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ ওইভাবে শুয়ে রইল।

মা ঘরে এসে চোখ কুঁচকে বলল, ওটা কে রে শুয়ে! ললিত, ও কে?

ললিত মাকে ঘর থেকে পাচার করার জন্য উঠতে যাচ্ছিল, সে সময়েই আদিত্য মুখ ফেরাল। ম্লান একটু হেসে বলল, মাসিমা, আমি আদিত্য। একটু চা খাওয়াবেন মাসিমা?

মা হাসে, তোর হয়েছে কী, শুয়ে আছিস যে! দেখে এমন চমকে গিয়েছিলুম। উঠে বোস, আমার উনুনে এখনও আঁচ আছে, চা করে দিচ্ছি।

উঠে শোকতাপা মানুষের মতো হাঁটু জড়ো করে তার ওপর মুখ রেখে বসল আদিত্য। বলল, লোলিটা, সতী আমাকে ভালবাসে না।

শুনে স্তব্ধ হয়ে রইল ললিত। এতক্ষণ তার অবচেতন মন এইটাই প্রত্যাশা করছিল।

একটু সময় নিল ললিত। তারপর বলল, কী করে বুঝলি?

আদিত্য তেমনি বসে থেকে উদাসী গলায় বলে, ওর সঙ্গে আমার জাত মিলছে না।

একটু অবাক হয়ে ললিত বলে, এত দিন প্রেম করে এখন তোর শাশ্বতী জাতের কথা তুলেছে?

না-না। ও বরং উলটোটাই বুঝিয়েছিল। আমিই প্রথম জাতের কথা তুলেছি।

ললিত মৃদুস্বরে বলে, তা হলে তই জাত মানছিস আদিত্য? কেন রে, এত দিন পর হঠাৎ জাতের চিন্তা কেন?

আদিত্য দীন ভঙ্গিতে তার হাঁটুর ভিতরে মাথা গুঁজে দিয়ে বলে, আমি বেনের বাচ্চা, আমি আমার বাপ-দাদাদের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট। আমার বংশের কালচারের সঙ্গে ওদের মেলে না। আমাদের জাত আলাদা।

শুনে বড় কষ্ট হল ললিতের। আদিত্যর এই দুর্বল দিকটার কথা ললিত অনেক দিন ধরে জালে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আদিত্যর বড় দুর্বলতা রয়ে গেছে নিজের পরিবারকে নিয়ে।

ললিত স্নেহের একখানা হাত বাড়িয়ে আদিত্যর মাথায় রাখল। বলল, কী হয়েছে খুলে বল। তোদের কি ঝগড়া হয়েছে?

একটু ভেবে আদিত্য বলল, ঠিক ঝগড়া নয়, তবে অনেকটা ও-রকমই।

কী নিয়ে?

আদিত্য শ্বাস ফেলে বলল, প্রথমে শুরু হয়েছিল তোকে নিয়ে।

আমাকে! ভীষণ অবাক হয় ললিত।

তোকে নিয়েই প্রথম জাতের কথা উঠেছিল। যেদিন তোর কাছে সতীকে নিয়ে আসি সেদিনই আমি লক্ষ করেছিলুম যে তোর সঙ্গে ওর জাত মেলে। আমার সঙ্গে মেলে না।

তার মানে? ললিত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

ধপ করে আবার শুয়ে পড়ে আদিত্য। বলে, কী জানি, আমি কিছুই গুছিয়ে বলতে পারি না। লোলিটা, তুই রাগ করিস না। আমার মনটা ঠিক নেই। আমি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি।

ললিত চুপ করে থাকে।

মা চা দিয়ে গেল। বলল, ভাত খেয়ে বেরিয়েছিস তো?

হ্যাঁ, মাসিমা।

তারপর বসে চায়ে চুমুক দিয়ে, যেন বড় স্বাদ পেয়ে, চোখ বুজল আদিত্য। বলল, কয়েক দিনে অনেক নাটুকে কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি চাকরি ছেড়ে বাবার ব্যবসাতে নামছি। তাতেই সতীর সঙ্গে আরও গোলমাল পাকিয়ে গেছে। এবার ও নিজেই বলছে যে, ওর সঙ্গে আমার জাত মিলবে না।

আদিত্য একটু দম ধরে থেকে তারপর বলে, আরও একটা ব্যাপার আছে। মাঝখানে একদিন সতী তার এক বন্ধু আর বন্ধুর দাদার সঙ্গে রেডিয়ো স্টেশনে গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল আমি জানি না। সেদিনই কলেজে ওকে খুঁজতে গিয়ে আমি পাইনি। কিন্তু আবছাভাবে আমার পরে মনে পড়েছে, যখন ওর কলেজের কাছে বড় রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে ঢুকছিলুম, তখন উলটো দিক থেকে একটা সাদা রঙের গাড়ি খুব ধীরে ধীরে আমাকে পার হয়ে গেল। তখন আমার মন খুব অস্থির ছিল, স্পষ্ট করে দেখিনি, তবু পরে আমার মনে হয়েছে, গাড়ির সামনের সিটেই ওরা তিন জন ছিল। একটি সুন্দরমতো ছেলে, তার পাশে একটি মেয়ে, আর জানলার ধারে সতী। আমার মনে হয়, সেদিন সতী আমাকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু ডাকেনি। পরে সতী আমাকে নিজেই বলেছে সেদিন সে কোথায়, কার সঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু বলেনি যে, সেদিন গাড়ি থেকে সে দেখেছিল আমায়।

না-ও দেখতে পারে।

আদিত্য দৃঢ় মুখে মাথা নেড়ে বলে, আমি সিওর। ও আমাকে দেখেছিল। ডাকেনি।

একটু শ্বাস ছেড়ে আদিত্য বলে, আজ একটু আগেই আমি ওর কলেজে গিয়েছিলাম। বকুল গাছটার তলায় আমি রোজ দাঁড়াই ওর জন্য। সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে শিবানী নামে ওর এক বন্ধু চানাচুর কিনতে এসে আমাকে দেখে একটু হেসে এগিয়ে এল। শিবানী মেয়েটা সতীর বাসার কাছেই থাকে, একটু বেশি কথা বলে আর কী, আমার সঙ্গেও আলাপ আছে। শিবানী নিজেই যেচে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে বলল, ওদের রাকা নামে কে এক বন্ধু আছে, তার দাদার সঙ্গে নাকি বিয়ের কথা চলছে সতীর। সতী রাজিও হয়েছে। রাকা নিজেই বলেছে শিবানীকে। আমার মনে হচ্ছে, এই রাকা আর রাকার দাদাই সেই গাড়িওলা পার্টি। শিবানীর কাছে এ-সব শুনে আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। সতীর সঙ্গে দেখা না করেই সোজা চলে এসেছি তোর কাছে।

হঠাৎ ললিতের শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে যায়। থর থর করে কেঁপে ওঠে সে। রাগে, ঘেন্নায়, আক্রোশে। কেন এমন হবে? কেন এমন হতে থাকবে?

সে হাত বাড়িয়ে আদিত্যর হাত চেপে ধরে বলল, তুই ছাড়বি কেন? ছাড়িস না আদিত্য। হয়তো তোর ভুল হচ্ছে। আর যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে—

আদিত্য ক্লান্তমুখে বলে, তবে কী?

তবে তোকে আজই বিয়ে করতে হবে। রেজিষ্ট্রি।

আদিত্য অবাক চোখে চেয়ে থেকে বলে, কী বলছিস!

একটা সময়ে ললিতের মাথা যন্ত্রের মতো কাজ করত। যখন ইউনিয়নের গোলমাল, কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দাবি-আদায়ের বৈঠক কিংবা এ-রকমই কোনও কাজের চাপ পড়ত, তখন সংকটের মুখে অন্ধ-কষা যন্ত্রের মতো নির্ভুল কাজ করত তার মাথা। তার মুখে কয়েকটা নিষ্ঠুর লাইন জেগে উঠেছে, চকচক করছে উগ্র চোখ। সে আদিত্যর কথার উত্তর না দিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে তুলল, বলল, ওঠ, এখন অনেক কাজ করতে হবে।

আদিত্য বোকার মতো উঠে দাঁড়িয়ে বলে, কীসের কাজ! তুই কী করতে চাস?

ললিত সংক্ষেপে বলল, আজই রেজিষ্ট্রি। আর দু'-তিন ঘণ্টার মধ্যে।

আদিত্য আবার বসে পড়ে, দূর! তা হয় না। সতী রাজি হবে না।

হতে হবে।

লাভ কী? ও আমাকে ভালবাসে না।

তোকে সে-কথা বলেছে?

না। কারণ, সতী সেটা নিজেও এখনও জানে না। কয়েক দিনের মধ্যেই ও টের পাবে যে ও আমাকে ভালবাসে না।

এত দিন বাসল কী করে? এটা কি ইয়ার্কি?

আদিত্য অন্যমনস্ক চোখে ললিতকে একটু দেখল। তারপর বলল, না, ইয়ার্কি নয়। ললিত, শোন একটা ছোট গল্প। আমাদের বাড়ির মেয়েদের তো জানিস, গায়ে তাদের রোদ লাগে না। সেই আমাদের বাড়ির মেয়ে, আমার খুড়তুতো বোন মান্তু একবার প্রেমে পড়েছিল কালো ন্যাংলা মতন একটা ছেলের। সে-ছেলেটা আমাদের বাড়িতে খবরের কাগজ দিত। কোনদিন কোন ভোরবেলায় বোধহয় মান্তু দোতলার চিকের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেছিল, আর সে সময়েই ছেলেটা সাইকেলে বসে খবরের কাগজ ছুড়তে যাচ্ছিল বারান্দায়, সেই সময়েই তারা দু'জন দু'জনকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারপর রোজ ও রকম দেখা হতে লাগল তাদের। আমরা কিছু জানতুম না। শেষ পর্যন্ত সেই ন্যাংলা ছেলেটার জন্য মান্তু একদিন মাঝরাতে ছাদ থেকে দড়ি ঝুলিয়ে নেমে পালানোর চেষ্টা করেছিল। আমরা ধরে ফেললাম। কাকা তাকে জুতোপেটা করে ঘরে তালা দিয়ে রাখল। ভারী আশ্চর্য হয়েছিলুম আমরা, আমাদের মতো বাবুদের বাড়ির মেয়ে কী করে ও-রকম একটা ছেলেকে পছন্দ করে! কিন্তু এখন বুঝি সেটা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নয়। সেটা কেবল একটা রহস্য ভেদ করার আগ্রহ। চারদিকে যা-সব প্রেম-ট্রেম দেখি তার অধিকাংশই পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নয়, তার মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা নেই, আছে ওই রহস্যভাঙা, আছে রোমহর্ষ। হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায় তাকেই সই। বাঙালি মেয়েরা তো খুব একটা পুরুষমানুষ দেখে না! সতীও তাই। ঘরকুনো, পুরুষ দেখলে উপায়। আমিই ছিলুম ওর প্রথম পুরুষ। আমাকে নিয়েই ওর রহস্য ভেঙেছে। ও কোনও দিন ভালবাসেনি আমাকে। বাসবেই বা কেন। ওর সঙ্গে কি আমার জাত মেলে?

আদিত্য ম্লান হাসে, নিজেকে সেই হকার ছেলেটার মতো লাগছে আমার। সেই ছেলেটা হয়তো পরে রোজ এসে দূর থেকে আমাদের দোতলার বারান্দার দিকে চেয়ে থাকত। দেখত খালি বারান্দা, ভোরের বাতাসে কেবল চিকটা দুলছে।

ললিত থরথর করে কাঁপে। তার শরীর দুর্বল, পা কাঁপে, মাথা টলমল করে। প্রবল রাগে খ্যাপাটে গলায় সে বলে, নতুন বা পুরনো কোনও বর্ণাশ্রম আমি মানি না। আমি সব ভেঙে দিয়ে যাব। ওঠ।

লোলিটা, তুই খেপে গেছিস।

ললিতের দুটো চোয়াল বদ্ধমুষ্টির মতো ফুলে ওঠে। সে কেবল বলে, ওঠ। আর-একটু পরেই তোর রেজিস্ট্রেশন।

আদিত্য মাথা নিচু করে ভাবে।

ললিত তাড়া দেয়, কী হল!

ও রাজি হবে না। দেখিস।

হবে। আমি রাজি করাব।

কাজটা ঠিক হবে না।

না হোক। তবু করতেই হবে।

আস্তে আস্তে ললিতের উদ্ধত, ফণাতোলা চেহারার সামনে আদিত্য নরম হয়ে আসে। ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবে। গম্ভীর দেখায় তাকে। তারপর বলে, সাক্ষী কে হবে?

আমি হব। আর দু'জন জোগাড় করছি।

আর বিয়ের নোটিশ?

আমার চেনা রেজিস্ট্রার আছে। ওটা ম্যানেজ করে দেব।

হঠাৎ যেন দমকা হাওয়ায় আদিত্যর সব বিষণ্ণতা উড়ে যায়। সে পুরনো দিনের মতো হাসে। বলে, তুই খুব ডেঞ্জারাস।

ললিত সে-কথার উত্তর দেয় না। আপন মনে কী যেন একটু বিড় বিড় করে। হয়তো নিজের ব্যর্থতাগুলির কথা নিজেকে শোনায়। হয়তো প্রতিশোধের কথা নিজেকে মনে করিয়ে দেয়।

বিমানের ঘরের দরজা খোলা ছিল। চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে ছিল সে। তাদের পায়ের শব্দে চোখ খুলে উঠে বসল, এসো। আমি সময় গুনছিলাম। খুব খিদে পেয়েছে।

ললিত আদিত্যকে দেখিয়ে বলল, একে চেনো?

একপলক আদিত্যকে দেখেই বিমান বলল, চিনি। আদিত্য রায়। বাগবাজারে তোমাদের বাড়ি, না?

আদিত্য হাসল, তুমি সব মনে রেখেছ!

আমি সবাইকেই মনে রাখি। কিন্তু আমাকে সবাই ভুলে যায়।

আদিত্য মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু আমি ভুলিনি। ললিতকে জিজ্ঞেস করো, তোমার নাম শুনেই চিনেছি। তারপর আদিত্য বিমানের মুখে মায়ের দাগগুলো লক্ষ করে বলে, ইস্, ছিনতাই পার্টির লোকেরা তোমাকে খুব মেরেছে তো?

বিমান মৃদু হাসে।

আদিত্য তেজি গলায় বলে, তুমি তাদের পেটে লাথি মারলে না কেন?

মেরেছি। তৃপ্ত স্বরে বিমান বলে।

মেরেছ! সাবাস! বলে আদিত্য হাসে। বিমানের বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে চার দিকে চায়। তার গলায় হাসিঠাট্টার সুর ফিরে আসে। বলে, তুমি মাইরি জ্ঞানী লোক, কত বই তোমার!

মেঝেতে বসে একটা অ্যালুমিনিয়মের থালায় খাচ্ছিল বিমান। কাঙালের মতো বসার ভঙ্গি। তাড়াতাড়ি খাচ্ছে, স্পষ্ট বোঝা যায় ওর খুব খিদে পেয়েছে। ললিত ওকে খানিকটা খাওয়ার সময় দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, তোমার শরীর কেমন?

ভাল। অনেক ভাল।

চলাফেরা করতে পারছ?

বিমান মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

একটা কাজ করতে পারবে?

কী?

একটা বিয়ের সাক্ষী দেবে? রেজিষ্ট্রি বিয়ের?

বিয়ে! কার? বিমান অবাক চোখে তাকায়।

আদিত্য একটু হেসে বলে, আমার। মাই ম্যারেজ টু-ডে।

যাবে? ললিত আবার বিমানকে জিজ্ঞেস করে।

বিমান হাসে। ঘাড় নেড়ে বলে, যাব। কখন?

আমরা একটু পরে এসে তোমাকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে যাব।

বিমান মাথা নেড়ে সম্মতি দেয়, বলে, বাঃ। আজ কপাল ভাল। বিকেলে আজ খুব খাওয়া হবে, কী বলে?

হবে। অন্যমনস্কভাবে বলে ললিত, আজ তোমার ঘরেই আমরা ফিস্ট করব। মুরগি কিনে আনব।

বিমান হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আদিত্যকে বলল, এত সহজে বিয়ে করা যায়, আমি জানতুম না। আমার ধারণা ছিল, বিয়ে করতে অনেক সময় আর বিবেচনা লাগে।

আদিত্য মাথা নিচু করে আস্তে বলল, আমারও লেগেছে।

লেগেছে? বিমান হাসে, তবে তোমার সাক্ষীর জোগাড় নেই কেন? তা ছাড়া, রেজিষ্ট্রি বিয়ে তারাই করে যাদের সামাজিক সম্পর্কে গোলমাল আছে।

আদিত্য ভ্রূ কোঁচকায়, তুমি কি সাক্ষী দিতে ভয় পাচ্ছ?

না, না। সুন্দর করে হাসে বিমান, কিন্তু আমি যখন বিয়ে করব তার অনেক আগে থেকে আমি নিজেকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করব তার জন্য। আমার বিয়ের সময়ে সবকিছু প্রস্তুত থাকবে, এমনকী প্রকৃতিও।

একটু থেমে বিমান বলে, আমি একটি মেয়েকে ভালবেসে, তার জন্য পাগল হয়েই বিয়ে করতে ছুটব না। কারণ, যারা এ-রকম বিয়ে করে তাদের সত্যিকারের বিয়ে হয় না। বিয়ের কারণ ভিন্ন।

আদিত্য সামান্য লাল হয়ে বলে, তুমি কীসের জন্য বিয়ে করবে তা হলে?

বিমান খাওয়া থামিয়ে রেখে বলে, বিয়ে সমাজকে সন্তান দেয়। তাই আমি দেখব কীভাবে আমি সমাজকে সুসন্তান দিতে পারি। ব্যক্তিগত প্রেমের চেয়ে সমাজ অনেক বড়।

তুমি প্রেম মানো না?

বিমান হাসে, প্রেমটা ঠিক বোঝা যায় না। ওটা খুব ধোঁয়াটে ব্যাপার। কখনও আছে, কখনও নেই। কিন্তু প্রেম থাক বা না থাক, বিয়েতে সন্তান আছেই। প্রকৃতি আমাদের প্রেমের ধার ধারে না। সে আমাদের দিয়ে যন্ত্রের মতো তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নেয়। আমরা যতখানি প্রেমিক, তার চেয়ে ঢের বেশি প্রজনন-যন্ত্র।

চকমকে চোখে হাসে বিমান। আমাদের একটা অ্যালসেশিয়ান মাদি কুকুর ছিল। বাবা সেটাকে বাজে কুকুরদের সঙ্গে মিশতে দিত না। দরকার মতো সেটাকে নিয়ে যাওয়া হত মিত্তিরদের মদ্দা অ্যালসেশিয়ান কুকুরটার কাছে। বছর বছর চমৎকার বাচ্চা হত। তেজি, স্বাস্থ্যবান। একবার সেটা বাজে জাতের কুকুরের সঙ্গে মিশেছিল, সেবারকার বাচ্চাগুলো হয়েছিল কুচ্ছিত, ভিতু, পেটুক। জন্মবিজ্ঞানের নিয়ম রয়েছে। মানুষের ভিতরেও এ-রকম বর্ণের তফাত আছে। কিন্তু মানুষ জন্মবিজ্ঞানের কোনও নিয়ম মানে না। যেমন খুশি বিয়ে করে, সমাজে সব একাকার করে দিতে থাকে।

আদিত্য তর্কের জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল। ললিত তা হতে দিল না। হাত ধরে টেনে আনল রাস্তায়, বলল, এখন ও-সব কথা থাক। আমাদের কাজ আছে অনেক।

ললিত চেঁচিয়ে বিমানকে তৈরি হতে বলে চলে এল।

ফিরে এসে আদিত্য ললিতের মাকে বলল, মাসিমা, মাই ম্যারেজ টু-ডে।

কী বললি? মা জিজ্ঞেস করে।

আদিত্য হাসে। বলছিলুম, আপনি বড় ভালমানুষ।

মা হেসে বলে, পাগল! এবার একটা বিয়ে কর।

ললিত গজগজ করে, তোমার কেবল এক কথা।

আদিত্য হো-হো করে হাসে, সেই কথাই তো বলছিলুম মাসিমা, আপনি ভালমানুষ বলে বুঝতে পারলেন না।

বারোটার মধ্যেই তারা তৈরি হয়ে ট্যাক্সি ডেকে আনল। বেরিয়ে পড়ল তিনজন। আদিত্য একটু সংশয়ের গলায় জিজ্ঞেস করে, প্রথমে কোথায় যাবে?

ললিত ওর কাঁধে হাতের একটু চাপ দিয়ে বলল, আগে তোকে একটু ভদ্র পোশাক পরাই। দাড়িটাও কামিয়ে নে। তারপর দেখা যাবে।

দূর। আদিত্য বলে, এ-পোশাকই ভাল। আমি সাজব না।

কিন্তু অবশেষে সবই করতে হল আদিত্যকে। ধুতি, রেডিমেড সিল্কের পাঞ্জাবি, গেঞ্জি, রুমাল কেনে হল। দোকানের ট্রায়ালরুমে ঢুকে সেগুলো পরে বেরিয়ে এল আদিত্য। ললিত হেসে বলল, সাবাস!

কিছু ফুল, শাশ্বতীর জন্য একটা শাড়ি কিনতে কিনতে সোয়া দুটো বেজে গেল প্রায়। একটা পেট্রল পাম্পে ট্যাক্সি থামিয়ে সঞ্জয়কে ফোন করল ললিত, অফিসে থাকিস। খুব দরকার। যাচ্ছি।

আড়াইটের পাঁচ মিনিট আগে ট্যাক্সিটা শাশ্বতীর কলেজের সামনে বড় রাস্তায় এসে থামে। আদিত্যকে ঠেলা দিয়ে ললিত বলে, নাম।

পাগল!

নামবি না?

দূর! আমাকে দেখলে হয়তো মুখ ফিরিয়ে নেবে। তুই যা!

ললিত ভ্রূ কুঁচকে বলল, অত মেয়ের ভিড়ে কি চিনতে পারব! মোটে তো একবার দেখা।

বলেই সে মনে মনে একটু চমকে ওঠে। সে কি মিথ্যে কথা বলল না? আসলে শাশ্বতীকে লক্ষ জনের ভিতরেও সে চিনতে পারবে।

আদিত্য মাথা নাড়ে, পারবি। তুই না পারলেও ও পারবে। কলেজের সামনে ওই বকুল গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়া। ওখানে একটা চানাচুরওয়ালা বসে, সতী ওর রোজকার খদ্দের। একটু পরেই একটা পিরিয়ড শেষ হবে।

ললিত আস্তে আস্তে হেঁটে এসে বুড়ো চানাচুরওয়ালাটার পাশে গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়। কিন্তু হঠাৎ বড় অস্বস্তি হতে থাকে তার। কেন যেন বুক কাঁপতে থাকে। কেন যেন দুর্বল লাগে নিজেকে। মনে পড়ে শ্যামলা সুন্দর কোমল একখানা মুখ, মায়াবী চোখে চেয়ে বলছে, দেখবেন, আপনার অসুখ সেরে যাবে।

সেই কথাটাই যেন গুনগুন করে ফিরে আসছিল তার কানে।

হঠাৎ দিকবিদিক জুড়ে প্রবল ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে, যেন পাতাল থেকে উঠে আসে সেই শব্দ, আকাশ থেকে নেমে আসে।

চমকে উঠল ললিত। সিগারেটটা আঙুল থেকে খসে পড়ে গেল।

ষোলো

নিজের এই দুর্বলতা অসহায়ভাবে লক্ষ করল ললিত। আশ্চর্য হয়ে গেল। কোথা থেকে এই দুর্বলতা আসছে? সে তো শাশ্বতীর প্রেমিক নয়! একবার মাত্র কয়েক মিনিট দেখা হয়েছিল তাদের, আর আজ একটু পরেই আদিত্যর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যাবে। বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে এসেছে ললিত, এখন সে আর অল্পবয়সি যুবা নয়, যখন মিতুকে দেখলে কেঁপে উঠত বুক; তখন কাঁপা আঙুল থেকে সিগারেট পড়ে যাওয়াও বিচিত্র ছিল না। এখন কি আর সে-রকম কিছু হয়? সে নিজের অস্থিরতার জন্য, দুর্বলতার জন্য অসহায় বোধ করে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। পায়ের কাছেই জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ে ছিল। চটি দিয়ে ঘষে ঘষে সেটার নাড়িভুঁড়ি বের করে ফুটপাথে মিশিয়ে দিল সে। এবড়োখেবড়ো বকুল গাছটার গায়ে জোরে চেপে ধরে রইল হাত।

অনেক দিন আগে তাদের বাসার ছোট্ট উঠোনটায় সে বাবার সঙ্গে ক্রিকেট খেলছিল একদিন সকালবেলায়। বাবা লুঙ্গি পরে তুলসীগাছের বেদিটাকে স্ট্যাম্প করে ব্যাট করছিল, ললিত করছিল বল। অসমান উঠোনে ডিউজ বলটা লাফিয়ে উঠছিল বারবার, ললিত বাহাদুরির জন্য প্রাণপণ জোরে বল ছুড়ছিল। সেটা কোনও এক সময়ে বাবার পায়ের হাঁটুর নীচে হাড়ে লেগেছিল, ললিত টের পায়নি। খেলার শেষে সে ঘরে এসে দেখল বাবার পায়ে হাড়ের ওপর থ্যাঁতলানো চামড়া ফেটে হাঁ হয়ে ফুলে কালশিটে পড়ে আছে, মা হাঁটুগেড়ে আইওডিন লাগাতে লাগাতে তাকে বলল, দ্যাখ, কী করেছিস! ললিত আশ্চর্য হয়েছিল। অত জোরে বল লাগাতেও বাবা একটুও চেঁচিয়ে ওঠেনি, 'উঃ আঃ' করেনি, শান্তভাবে খেলা শেষ করে ঘরে এসেছে, তাকে বুঝতেও দেয়নি। ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু ললিতের মনে ছবিটা আঁকা হয়ে আছে। পরবর্তীকালে যত বার ব্যথাবেদনা পেয়েছে ললিত তত বারই চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে বাবার সেই ঘটনাটুকুর কথা মনে পড়ে গেছে। অমনি ললিত ব্যথার বা ক্ষতের স্থান চেপে ধরে সহ্য করেছে। ক্রমে এইটেই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তার। ছেলেবেলা থেকেই। তার বন্ধুরা বলত, ললিতের ব্যথা লাগে না। ললিত জানত সে অনেকের চেয়ে বেশি সহ্য করতে পারে। নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য সে অনেক বার সিগারেটের আগুনে তার চামড়া পুড়িয়ে দাঁত টিপে সহ্য করেছে। শরীর থেকে সে শুরু করেছিল, তারপর ক্রমে ক্রমে নিজের চেষ্টায় সে মনের দুঃখগুলিকেও গোপন করতে থাকে। শরীর আর মন তো খুব দূরের সম্পর্ক নয়। সবাই জানে ললিত কাউকে তার দুঃখ দুর্দশার গল্প বলে না, তার নাকি-কান্না নেই। নিজের দুর্বলতাগুলিকে ঢেকে রাখতে জানে ললিত। একমাত্র মিতুর ঘটনাটা ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু তাতেও ললিতের দোষ ছিল না, মায়ের চোখ তাকে ধরে ফেলেছিল। সেইটে ছাড়া ললিতের দুর্বলতার আর কোনও অখ্যাতি নেই। হাসপাতালে গিয়ে সে যখন প্রথম বুঝতে পারল তার ক্যান্সার হয়েছে, তখন প্রথমটায় ভেঙে পড়েছিল ললিত। কিন্তু তাকে সামলে দিল তুলসীর চোখ। বায়োপসির ফলাফল জানার পর তুলসী তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। সামলে গেল ললিত, এক ঢোঁকে কান্না গিলে ফেলে হেসেছিল। মনে মনে ঠিক করা ছিল তার, এই শেষ যন্ত্রণাটুক সে শান্তভাবে সহ্য করবে। তার চেনা লোকেরা তাদের জীবনে উদাহরণ করে নেবে ললিতের সহনশীলতা। সে সেই কারণেই প্রাণপণে সহ্য করে যাচ্ছে। সে ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলেনি 'আমাকে বাঁচান', সে বন্ধুদের জড়ো করে বলেনি 'আমার মাকে

দেখিস—আমি চললাম', এমনকী এখনও তার ঈশ্বরে অবিশ্বাস অটল রয়েছে, সেই অবিশ্বাস ভেঙে সে তারকেশ্বর কিংবা কালীঘাটে মানত করতে ছোটেনি। সেদিন শাশ্বতী যখন তার মেসোমশাইয়ের ঘটনা তাকে বলেছিল, তখনও ললিত তাকে ঘুর কথায় বুঝিয়ে দিয়েছিল তার কোনও উদাহরণের দরকার নেই। ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। সে বরং মাঝে মাঝে ভেবে দেখেছে বাঁচার চেয়ে মরাটাই বরং তার বেশি দরকার। যারা তার বিপক্ষে, যারা তার শত্রু, কিংবা যারা তাকে ভালবাসেনি তারা সবাই দেখুক ললিত কত শান্তভাবে মরে যেতে পারে।

তাই এখন এই রহস্যময় দুর্বলতার দেখা পেয়ে বড় অসহায় বোধ করে ললিত। সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এতক্ষণ সে তো ঠিক ছিল। একটু আগে সে আদিত্যকে বিয়ে করতে রাজি করিয়েছে। সব ঠিক আছে। তবে এটা কী? এটা কেন? সে তার হাত থেকে খসে-পড়া সিগারেটটার ছিন্ন-ভিন্ন অংশটা চেয়ে দেখল। তারপর মনে মনে গাল দিল নিজেকে, ইডিয়ট!

ঘণ্টা পড়ার একটুক্ষণের মধ্যেই তার চারপাশের রাস্তা রং-বেরঙের মেয়েতে ছেয়ে গেল। প্রথমটায় একটি দিশেহারা বোধ করল ললিত। কোনও দিকে তাকাতে তার লজ্জা করছিল। সে কেবল আবছা ভাবে দেখতে পাচ্ছিল তার চার পাশে ভিড় করে গুনগুন কথা বলতে বলতে ঘুরছে মেয়েরা। মাঝখানে সে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে। কি বলবে এর মধ্যে তার আধচেনা, একবার দেখা শাশ্বতী কোন জন।

চারজন মেসে চানাচুরওয়ালার কাছে হেঁটে এল। তাদের মধ্যে একজন আকাশি-নীল শাড়ি পরা। আসতে আসতে ও থেমে গেল হঠাৎ। একটু দূর থেকে ললিতের দিকে চেয়ে বলল, আপনি?

ললিত দেখল, শাশ্বতী।

হঠাৎ খুব নির্জন হয়ে গেল চারপাশের পৃথিবী। যেন একটা কাচের ঘরের মধ্যে তারা দু'জন মাত্র দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক মুহুর্তের জন্য মাত্র। তারপরেই ললিত কাচের ঘর ভেঙে দিল। হাত জোড় করে স্বাভাবিক গলায় বলল, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। জরুরি।

ললিত জানল না, সেই মুহূর্তে কী ভীষণ বুক কাঁপল শাশ্বতীর। থর থর করে কেঁপে উঠল তার অস্তিত্ব। মুখে ঝাঁপিয়ে এল রক্তস্রোত। তবু, বাইরে স্বাভাবিকই থাকল সে। যেন আগে থেকেই জানত শাশ্বতী এমনভাবে মাথা নেড়ে বলল, চলুন। তার তিন বন্ধু একটু অবাক চোখে তাদের দেখছিল। শাশ্বতী বন্ধুদের বলল, দাঁড়া আসছি।

একটু দূরে আর একটা গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল দু'জন। ললিত বেশি ভূমিকা করল না। বলল, আদিত্য সকাল থেকে পাগলামি করছে। ওর সন্দেহ আপনি ওকে আর পছন্দ করেন না।

শাশ্বতী ভ্রূ কুঁচকে শুনল। তারপর মুখ নামিয়ে বলল, জানি। ওর মাথায় পোকা ঢুকেছে। কিন্তু আমি কী করব?

ললিত মৃদু বিষণ্ণতার হাসি হাসে, আদিত্যর খ্যাপামি উঠলে অনেক দূর গড়ায়। আর, খুব সামান্য ব্যাপারেই ওর খ্যাপামি দেখা যায়। নইলে ও সত্যিই ভাল মানুষ। খুব ভাল।

ললিতকে নস্যাৎ করে দিয়ে শাশ্বতী ঠান্ডা গলায় বলে, আমি ওকে জানি।

ললিত লজ্জা পায়। তারপর সামলে নিয়ে আস্তে করে বলে, ও আমার সঙ্গে এসেছে। মোড়ে ট্যাক্সিতে বসে আছে। আপনি একটু ওর কাছে চলুন। তারপর আপনাকে আমাদের সঙ্গে একটু এক জায়গায় যেতে হবে। খুব দূরে নয়। সন্ধের আগেই আপনাকে আমরা বাসায় পৌঁছে দেব।

কোথায়?

ট্যাক্সিতে বলব।

শাশ্বতী তার শাড়ির আচল তুলে একটা কোণ দাঁতে চাপে, খুব অন্যমনস্ক দেখায় তাকে। বলে, বলবেন না কেন? কোথায় যাচ্ছি তা আমার জানা দরকার।

ললিত বিপদের গন্ধ পেয়ে যায়। মুখখানাকে করুণ করে তোলার একটু চেষ্টা করে সে। বলে, সঙ্গে আদিত্য থাকবে। আপনার ভয় কী?

শাশ্বতী পরিষ্কারভাবে হাসে, ও অদ্ভুত সব কাণ্ড করে। আমার ভাল লাগে না। ভয় করে।

ললিত মৃদু হাসে, এখন ভয় নেই। ও খুব অনুতপ্ত। আপনার সঙ্গে ভাব করতে চায়।

আড়ি তো হয়নি!

ললিত কপাল তুলে বলে, হয়নি? আশ্চর্য! ও যা বলছিল তাতে মনে হয় ওর সঙ্গে আপনার খুব ঝগড়া হয়ে গেছে।

শাশ্বতী মাথা নেড়ে জানায়, না।

তবে? ললিত জিজ্ঞেস করে।

শাশ্বতী বয়ঃসন্ধির লাজুক মেয়ের মতো হাসে, সেটা একটা ভুতুড়ে কাণ্ড। কোনও মানে নেই।

কী?

আপনাকে বলা যায় না। এটা আমাদের—আমাদের একটা ব্যাপার।

ব্যাপারটা জানতে ললিতের লোভ হচ্ছিল। এখন একটু পরেই শাশ্বতী আদিত্যর গিন্নি হয়ে যাবে, তখন আর গতকাল কী হয়েছিল তা জানার চেষ্টাও করা যাবে না। কিন্তু তার আগেই এই কয়েকটা মুহূর্ত, যতক্ষণ কুমারী আছে শাশ্বতী, যতক্ষণ সে আইনত কারও নয়, ততক্ষণ সেই অল্প একটু সময়ে গতকালের কথা জেনে নিলে হত!

কিন্তু ললিত নিজেকে সংযত করে দিল।

সে শাশ্বতীকে বলল, চলুন প্লিজ।

ট্যাক্সির জানালা দিয়ে জিরাফের মতো গলা বের করে ছিল আদিত্য। তাদের দেখেই ভিতরের আবছায়ায় সরে গেল। ললিত শাশ্বতীকে নিয়ে এসে ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরল। বলল, দেখুন, কেমন বর সেজে বসে আছে আদিত্য। সুন্দর দেখাচ্ছে না!

শাশ্বতী বোকার মতো অবুঝ চোখে একবার ললিতের দিকে তাকাল। ট্যাক্সিতে উঠল না, দাঁড়িয়ে রইল।

ললিত তাড়া দিল, উঠুন। তাড়াতাড়ি, লোকে আপনাকে দেখছে। ভাববে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

স্পষ্টই অস্বস্তি বোধ করল শাশ্বতী। ইতস্তত করে তারপর উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঝপ্ করে দরজা বন্ধ করে দেয় ললিত। সামনে ড্রাইভারের পাশে সে আর বিমান পাশাপাশি বসে। নতুন গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট কেনা

আছে আদিত্যর পকেটে! ললিত ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা দে। আর, তোরা কথা বল।

আমি কী বলব! আদিত্য মৃদু গলায় বলে।

ললিত মৃদু হাসে। একপলকে দেখে শাশ্বতী গাড়ির সিটের ওপর রাখা খবরের কাগজে জড়ানো রজনীগন্ধার গুচ্ছ আর লাল-সাদা গোলাপের তোড়া অবাক চোখে দেখছে। সিটের পিছনে শাড়ির মোড়কটা আর আদিত্যের ছাড়া জামা-কাপড় নতুন কেনা পাঞ্জাবি আর ধুতির খালি প্যাকেটে ভরে রাখা। আদিত্যকে ললিত বলল, শাড়িটা ওর হাতে দে। আদিত্য বাঁ হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে শাশ্বতীর দিকে বাড়িতে ধরল। শাশ্বতী চেয়ে রইল, হাত বাড়াল না। আদিত্য ঝুপ করে ওর কোলে ফেলে দিল মোড়কটা।

এইটুকু দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিল ললিত। অনেকটা নিশ্চিন্ত লাগছে এখন। শাশ্বতীকে কলেজে পাওয়া না গেলে মুশকিল হত। এখন কাজটা আধাআধি মিটেই গেছে। আর একটু বাকি। কয়েকটা স্বাক্ষর মাত্র। সিগারেট ধরিয়ে সে নিচু গলায় বিমানকে বলল, শরৎকাল, তবু দেখে, এখনও গরম গেল না। নাও, সিগারেট। বলে প্যাকেটটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল। আচমকা বিমান বলল, তুমি কি খুব উত্তেজিত?

কেন? অবাক হয়ে ললিত জিজ্ঞেস করে।

ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাওনি।

ওঃ হো! বলে ললিত আর-একবার মুখ ঘোরায়। আদিত্য বাইরের দিকে চেয়ে আছে, শাশ্বতী কিছুই না বুঝতে পেরে স্তম্ভিতভাবে বসে। ললিত মৃদু হেসে বলল, এ হচ্ছে বিমান রক্ষিত আমাদের বহু পুরনো বন্ধু, আর বিমান, এই হচ্ছে শাশ্বতী...

শাশ্বতী এ-সব কথা শুনতেই পেল না। সে প্রবল উত্তেজনা চেপে কষ্টে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

ওর গলার স্বর শুনে মায়া হয়। যেন বাচ্চা মেয়ে ভয় পেয়ে কথা বলছে।

বিমান তার ব্যান্ডেজ-বাঁধা মাথাটা কষ্টে পিছন দিকে একটু ঘোরাল। বলল, কেন, আপনি জানেন না?

শাশ্বতী শ্বাসরোধ করে মাথা নাড়ে, না।

এরা কেউ জানে না, অনেক দিন আগে, শাশ্বতী যখন ছোট, তখন তার দিদি লীলাবতীকে কেউ বা কারা কলেজের রাস্তা থেকে এইরকম ভাবেই হয়তো ট্যাক্সিতে তুলে নিয়েছিল। কোথায় কোন অচেনা জায়গায় যে তারা নিয়ে গিয়েছিল লীলাবতীকে। না, এরা কেউ শাশ্বতীর অচেনা নয়, তার পাশেই বসে আছে আদিত্য, হাত বাড়িয়ে তাকে ছোঁয়া যায়। আদিত্যকে ভালবাসে শাশ্বতী। ভালবাসে। কিন্তু এরা কেউ জানে না যে এখন, এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে, এরা তিন জন অচেনা পুরুষ তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসে ট্যাক্সিতে তুলেছে। নিয়ে যাচ্ছে অচেনা এক রহস্যময় জায়গায়। এরা তার ধর্ম কেড়ে নেবে, নষ্ট হয়ে যাবে তার আজন্মের প্রিয় এক পবিত্রতা। একবার তার ইচ্ছে হল ট্যাক্সিওয়ালার কাঁধে টোকা দিয়ে বলে, ভাই ট্যাক্সিওয়ালা, আমি এদের কাউকে চিনি না, এরা আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। পায়ে পড়ি, তুমি গাড়ি ঘোরাও, আমাকে বাসায় পৌঁছে দাও। আমি অবুঝ মেয়ে, এখনও পবিত্র আমি, দয়া করো।

কিন্তু ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার হাত-পা। গলায় স্বর ফুটছে না। তার পাশে ফুল, কোলের ওপর কাগজের প্যাকেট থেকে উঁকি মেরে আছে খুব ঝলমলে একখানা শাড়ি। সে এর অর্থ খানিকটা বুঝতে পারল,

আর খানিকটা বুঝতে চাইল না।

এরা কেউ জানে না যে, শাশ্বতীর বড় ভয় করছে। রজনীগন্ধার উগ্র গন্ধ গোলাপের সঙ্গে মিশে গিয়ে বাতাস বিষিয়ে গেছে এখন। তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ... না, সে এদের কাউকেই চেনে না, কাউকেই না...এরা তিন জন অচেনা পুরুষ, আর সে একজন পবিত্র অবুঝ সরল মেয়ে—এরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে? শাশ্বতীর বড় ভয় করছে।

বিমান তার মাথার ব্যান্ডেজের তলা দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে মাথা চুলকোয়। ব্যথায় মুখ বিকৃত করে। খুব অন্যমনস্ক দেখায় তাকে। সে হঠাৎ গলা নামিয়ে ললিতকে বলে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

কী?

এটা?

কেন?

অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা করে বিমান। তারপর সিগারেট ধরানোর অছিলায় মাথা নিচু করে ফিসফিস করে বলে, মেয়েটা আদিত্যকে ভালবাসে না।

শুনে ট্যাক্সিওয়ালা চকিতে একবার তাদের দিকে তাকায়।

দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে থাকে ললিত। ট্যাক্সি পার্ক সার্কাসের ছ'কোনা চত্বরে এসে হু হু করে ঘুরে গেল বাঁয়ে। ধরল পার্ক স্ট্রিট। সোজা সুন্দর রাস্তা। বড় সুন্দর কতগুলি জায়গা ছিল পৃথিবীতে পার্ক স্ট্রিটের মতো! সুন্দর জায়গা ছিল পৃথিবী! বেঁচে থাকা কী রকম ভাল। পার্ক স্ট্রিট ধরে যেতে হঠাৎ গুমরে মুচড়ে ওঠে মন ললিতের। কত সুন্দর রোমাঞ্চকর সব ঘটনা ঘটতে পারত জীবনে, আরও বহুদিন বেঁচে থাকলে!

ললিত! আদিত্য শুকনো গলায় ডাকে।

ললিত ফিরে দেখে, আদিত্যর মুখ অল্প লাল। কিছু একটা বলার চেষ্টা করে আদিত্য, কিন্তু উত্তেজনায় প্রথম চেষ্টায় সেটা বলতে পারে না। ললিত লক্ষ করে ওর গায়ের নতুন পাঞ্জাবির বুকে এখনও দাম লেখা টিকিটটা লাগানো, এতক্ষণ তারা কেউ লক্ষ করেনি। সে হাত বাড়িয়ে বলে, বুকের টিকিটটা ছিঁড়ে ফ্যাল!

কীসের টিকিট! বলে আদিত্য নিজের বুকের দিকে চেয়ে টিকিটটা দেখে, আরও ঘাবড়ে যায়। এক হাতে টিকিটটা খুঁটে তুলতে চেষ্টা করে সে, তারপর গলা ঝেড়ে আস্তে বলে, ওকে বলে দে।

কী?

আমরা কোথায় যাচ্ছি।

শাশ্বতী স্মৃতিহীন বোকার মতো চেয়ে থাকে। 'ফিট'-এর পর প্রথম জ্ঞান ফিরলে যেমন মুখ-চোখের ভাব হয়, তেমনি।

ললিত হঠাৎ খুব স্বাভাবিক গলায় শাশ্বতীকে বলে, এত ঘাবড়ে যাওয়ার কী আছে? আপনাদের তো একদিন না একদিন বিয়ে হতই। আজ শুধু আইনের দিকটা সেরে রাখা।

তবু শাশ্বতী বুঝতে পারে না। আইনের দিক! কীসের আইন! কার সঙ্গে তার একদিন না একদিন বিয়ে হওয়ার কথা ছিল?

আপনারা কথা বলুন। তাড়াতাড়ি কথা বলে নিন। সামনেই আমার এক বন্ধুর অফিস, আমি আর বিমান নেমে যাব। অল্প সময়। তার মধ্যেই আপনারা কথা বলে নিন। ললিত বলল।

কথা! শাশ্বতী ভেবেই পায় না কী কথা, কার সঙ্গে কথা।

আদিত্য যদি তার অচেনা পুরুষ হত তবে শাশ্বতী চেঁচিয়ে বলতে পারত, আমাকে নামিয়ে দাও, পায়ে পড়ি। সে বাইরের লোকজনকে উদ্দেশ করে গলা বাড়িয়ে ডাকতে পারত, এরা আমাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। বাঁচাও। কিন্তু তা তো নয়! তার মনে পড়ে সে হৈমন্তীকে বলেছিল যে একদিন খুব শিগগিরই তারা রেজিষ্ট্রি বিয়ে করবে। কিন্তু ভুল, বড় ভুল বলেছিল শাশ্বতী। কেন ভুল? না, শাশ্বতী তা জানে না। সে কেবল আবছাভাবে এইটুকু জানে যে, সকলেই সকলের জন্য নয়। কেউ কেউ কারও জন্য থেকে যায় এক জন্ম। সকলেই সকলের জন্য নয়। তবু ভুল লোক দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। সামলানোর সময় পাওয়া যায় না। ভুল ঠিকানায় চলে যায় ভালবাসার চিঠি। আর ফেরত আসে না।

এক রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছিল শাশ্বতী। একটা লোক লণ্ঠন হাতে মাঠঘাট ভেঙে খুব দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে। তার মুখ দেখা যায় না, কেবল পা দু'খানায় পড়েছে লণ্ঠনের আলো। তবু মনে হয়েছিল সে বড় প্রিয়জন শাশ্বতীর, সে এক উদাসী মানুষ। দূরগামী। আজ জেগে থেকে সে সেই দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করল। যেন, তার একান্ত প্রিয়জন কেউ তাকে ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে।

সে একবার উদ্ভ্রান্তের মতো আদিত্যর দিকে তাকায়। সেই লোক, সেই লোক কি আদিত্য? না, স্পষ্টই বোঝা যায় সে আদিত্য নয়। নতুন পাঞ্জাবি-পরা আদিত্য জড়সড় হয়ে বসে আছে। বাইরের দিকে মুখ, সদ্য কামানো গালে আলো চকচক করছে, কানের কাছে সেলুনের সাবানের শুকনো সাদা দাগ। এ স্বপ্নের কোনও মানুষ নয়। আশ্চর্য এই যে, একে, এই নিতান্ত সাদামাটা আদিত্যকে কত ভালবাসার কথা বলেছে শাশ্বতী, সব দিতে চেয়েছে তাকে! কিন্তু ভুল লোক, একেবারে ভুল লোক, আদিত্য তার স্বপ্নের কেউ না। শাশ্বতী ভালবাসে খুব দূরের যাত্রা একজন মানুষকে, যে সঙ্গীহীন একা একা খুব বড় প্রকান্ড এক ধু-ধু মাঠ রাতের অন্ধকারে পার হচ্ছে। চেনা আদিত্যকে এখন আর চেনে না শাশ্বতী। সেই অচেনাকে চেনে। সেই অচেনা কি ওই ললিত! হবেও বা। শাশ্বতী সঠিক জানে না কিছুই।

পার্ক স্ট্রিট। অচেনা জায়গা শাশ্বতীর। ট্যাক্সি হঠাৎ থেমে আসে। চমকে ওঠে সে। ট্যাক্সি বাঁক নেয়। ধীর হয়ে আসে। থেমে যায়।

ললিত মুখ ফিরিয়ে হাসল আপনি এখনও রেগে আছেন! এবার কথা বলুন। ও বেচারা খুব মনমরা হয়ে আছে।

লালিত বিমানকে নিয়ে নেমে গেল। জানালা দিয়ে ঝুঁকে বলল, আমরা মিনিট পনেরোর জন্য যাচ্ছি। আপনারা বোঝাপড়া করে নিন।

শাশ্বতী হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে বলে, আমি নামব।

কেন?

শাশ্বতী উদ্ভ্রান্তের মতো চেয়ে থেকে বলল, আমি যাব না।

মুহূর্তেই চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে ললিতের। সে নিঃসংকোচ স্থির দৃষ্টিতে শাশ্বতীর অদ্ভুত ফ্যাকাসে মুখখানা দেখে। গোলমালটা কোথায় তা সে এখনও জানে না। কিন্তু জানার দরকারও নেই। অনেক দিন আগে সে ছিল অল্পবয়সি এক অসহায় ছেলে, যখন মিতুর জন্য সে রাস্তায়-ঘাটে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত হাঁ করে। মিতু ফিরেও তাকায়নি। মিতু তাকে গোপনে বড় অবহেলা করে গেছে। এখন আর মিতুর জন্য কিছুই অবশিষ্ট

নেই তার, কেবল সেই তখনকার কমবয়েসি ললিতের জন্য তার এক মায়া আছে। পুরুষের অপমান কিংবা দুঃখ সে বোঝে। বোঝে প্রতিশোধ। মনে মনে কঠিন হয়ে গেল ললিত। আদিত্য নামে এক বন্ধুর জন্য নয়, কেবলমাত্র একজন পুরুষের জন্য একটা কিছু সৎ কাজ তার করে যাওয়া দরকার। একটু আগেও হয়তো শাশ্বতীর জন্য মায়া হচ্ছিল তার। কিন্তু এখন হঠাৎ তার ভিতরে এক আহত পুরুষ বাঘের মতো গর্জন করে উঠল।

মুখে মিষ্টি হাসল ললিত। বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখবেন। কোনও ভাবনা নেই। আমরা আজ রাতে আদিত্যর পয়সায় মুরগি খাব, আপনি কি তা চান না?

কিছুই বুঝতে পারল না শাশ্বতী। পাগলা বোকা চোখে চেয়ে রইল।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রকাণ্ড একটা হলঘর। তার ভিতরেই পার্টিশান দেওয়া খোপে সঞ্জয়ের অফিস। তারা ঢুকতেই ব্যস্ত সঞ্জয় মুখ তুলে বলল, কী ব্যাপার?

একটা ঝামেলা ঘাড়ে করে এনেছি। তোকে যেতে হবে।

কোথায়? সঞ্জয় সই করতে করতে বলে।

সাক্ষী দিতে। আজ আদিত্যর বিয়ে, ওরা নীচে ট্যাক্সিতে বসে আছে। খুব দ্রুত বলে ললিত। তার হাঁফ ধরে যায়।

জানতাম! সঞ্জয় শ্বাস ফেলে বলে, আমার যে ক'টা বন্ধু আছে, এক শালারও মাথার ঠিক নেই।

ললিত দম ফেলার সময় দেয় না। হাত বাড়িয়ে বলে, টেলিফোন ডিরেক্টরি শিগগির—

তারপর বসে মোটা বইখানা টেনে তাড়াতাড়ি পাতা ওলটাতে থাকে ললিত। আপনমনে বলতে থাকে, ডাক্তার বাগচী... ডাক্তার বাগচী... ম্যারেজ রেজিস্ট্রার...

সঞ্জয়ের উলটো দিকের চেয়ারে কালো মোটামতো একটা লোক বসে ছিল। ললিত তাড়াহুড়োয় তাকে লক্ষ করেনি। সেই লোকটা হঠাৎ ললিতের কানের কাছে মুখ এনে বলল, আমার হাতে একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আছে। যাবেন?

ললিত চমকে উঠে চেয়ে প্রথমে চিনতে পারে না লোকটাকে, তারপর বলে, আরে! লক্ষ্মীকান্ত!

লক্ষ্মীকান্ত হাসে, ম্যারেজ পার্টির জন্য ভাল ঘরও আছে আমার হাতে। নিরিবিলি। বর বউ রাত কাটাতে পারে স্বচ্ছন্দে। ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে দেব। কম ভাড়া।

ললিত তাকে হাত ধরে টেনে তোলে, চলো, তোমার চেনা রেজিস্ট্রারের কাছে। কিন্তু নোটিস দেওয়া নেই, আর মেয়েটা আপত্তি করতে পারে। কান্নাকাটিও করবে হয়তো, কান দিলে চলবে না। পারবে?

লক্ষ্মীকান্ত মিটমিট করে হেসে বলে, মেয়েরা সহজে রাজি হয় না, এ তো জানা কথা। পারব।

ব্যান্ডেজের তলায় আঙুল চালিয়ে আর-একবার কপাল চুলকোনোর চেষ্টা করছিল বিমান। ললিতের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, তোমাকে ভীষণ অস্থির দেখাচ্ছে। তোমার হাত কাঁপছে।

ললিত চমকে ওঠে হঠাৎ। ঠিক, তার হাত কাঁপছে। গুরগুর করছে বুকের ভিতরটা। দুপুরে সামান্যই খেয়েছে ললিত, কিন্তু হজম হয়নি। কলকল করে তার পেট ডাকছে। নিজের ব্যস্ততা আর অস্থিরতা লক্ষ করে লজ্জা পায় ললিত। বলে, সময় বেশি নেই। ব্যাপারটা আজকেই করতে হবে।

লক্ষ্মীকান্ত বলে, মোটে সোয়া তিনটে। অনেক সময় আছে। দরকার হলে রাত দশটায় করে দেব।

সঞ্জয় মুখ তুলে বলে, একটু বোস। আমি কাজ ক'টা সেরে নিই। সাক্ষী-ফাক্ষী দিয়ে আর অফিস ফিরব না কেটে পড়ব তোদের সঙ্গে।

ললিত অস্থির মন নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। একবার উঠে জানালার কাছে যায়। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে অচল হয়ে। ট্যাক্সির জানালার কাচের ওপর ছোট্ট শ্যামলা হাতের আঙুল, কবজি, আর হাতঘড়িটা দেখা যাচ্ছে। শাশ্বতী। আবার ফিরে আসে ললিত। অস্থির বোধ করে। সময় নেই। আর সত্যিই খুব একটা সময় নেই। তার নিজের সময় ফুরিয়ে আসছে।

চেয়ারের পিছনে মাথা হেলিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে। চোখ বোজে। ওরা সত্যিই কথা বলছে কি? কে জানে! সে ওদের পনেরো মিনিট সময় দিয়ে এসেছে। সময় আছে। নিজের হাতঘড়ি দেখে ললিত। এখনও অনেক সময় আছে। সে চোখ বুজে থাকে। শুনতে পায় লক্ষ্মীকান্ত নিজে থেকেই বিমানের সঙ্গে পরিচয় করে নিচ্ছে, খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করছে বিমানের জীবন-বিমা করা আছে কি না! ললিত মৃদু একটু হাসে। কত ধান্ধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে লোক। ওইভাবে বেঁচে থাকতে হঠাৎ তার শরীর শিরশির করে ওঠে। বেঁচে থাকা কী রকম ভাল। কত ভাল।

মিনিট কুড়ি বাদে সঞ্জয় উঠল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সঞ্জয় বিমানকে বলল, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো! ললিতের খেয়াল হল অস্থিরতায় সে দু'জনের চেনা করিয়ে দেয়নি। বিমান তার সুন্দর গলায় উত্তর দিল, রমেনের বাড়িতে। রমেন গান গাইত, চোখ বন্ধ করে হাঁটত, চোখ বেঁধে দিলেও বলে দিত ঘরের কে কোনখানে বসে আছে। আমি সেখানে যেতাম। সঞ্জয় বলে, ওঃ হো, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনিই, আপনার নাম বিমান না?

ললিত আর কোনও কথা শুনতে পেল না। সে ওদের চেয়ে কয়েক পা এগিয়ে নামতে লাগল।

শাশ্বতী অবিকল সেইভাবেই বসে ছিল যেভাবে ললিত তাকে দেখে গেছে। যেন গত কুড়ি মিনিটে সে একটুও হাত-পা নাড়েনি। নিশ্বাসও নেয়নি। সঞ্জয় আর লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গে পরিচয় করানোর সময়ে একটুও হাসল না শাশ্বতী। কথা বলল না। হাত দুটো জড়ো করল কেবল। বুকের কাছে তুলে ছেড়ে দিল, হাত দু'খানা কাঠের টুকরোর মতো পড়ে গেল।

বোঝা গেল আদিত্য অনেক সিগারেট খেয়েছে। ট্যাক্সির ভিতরটা ধোঁয়ায় অন্ধকার।

সঞ্জয়ের গাড়িতে উঠল লক্ষ্মীকান্ত আর বিমান। ট্যাক্সির সামনের সিটে পুরনো জায়গায় বসল ললিত। সঞ্জয়ের সাদা গাড়িটা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আগে আগে।

ললিত একবার মুখ ফিরিয়ে শাশ্বতীকে বলল, আপনারা কথা বলেননি?

শাশ্বতী বেভুল তাকিয়ে রইল শুধু।

হাসল ললিত, আপনমনে বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আর তখন শাশ্বতী দেখছিল এক অচেনা শহরের অদ্ভুত রাস্তাঘাটের ভিতর দিয়ে কয়েকজন ধর্মনষ্টকারী অচেনা পুরুষ তাকে এক রহস্যময় জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। যেমন অনেক বছর আগে নিয়ে গিয়েছিল তার দিদি লীলাবতীকে।

আর তখন সঞ্জয়ের গাড়িতে পিছনের সিট থেকে হাত বাড়িয়ে বিমান সঞ্জয়ের পিঠে টোকা দিল। বলল, ওই মেয়েটা আদিত্যকে ভালবাসে না।

বাসে না? সঞ্জয় বিস্মিত হয়।

না। মাথা নাড়ে বিমান, বিড়বিড় করে বলে, আমি জানি।

তা হলে? সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে।

বিমান একটু ভাবে, তারপর তার ধীর গম্ভীর গলায় বলে, কিন্তু ললিতের ইচ্ছে বিয়েটা হোক।

তারপর একটু ভেবে বলে, কিন্তু আমি জানি, সকলের সঙ্গে সকলের বিয়ে হয় না। বিয়ের একটা নিয়ম আছে। বিয়েটা খুব পবিত্র জিনিস। ভুল বিয়ে দুঃখী, অলস, অকর্মণ্য এবং বিশ্বাসঘাতক মানুষকে পৃথিবীতে নিয়ে আসে। এবং তার জন্য, ভুল বিয়ে যারা করে তারা সমাজের কাছে দায়ী থাকে। তাদের বিচার হওয়া উচিত।

লক্ষ্মীকান্ত মাথা নেড়ে বলে, ঠিক!

সঞ্জয় মৃদু হাসে। বিমানটা পাগল।

ভিতর থেকে লক্ষ্মীকান্ত বুড়ো ম্যারেজ রেজিস্টারের সঙ্গে তার গোপন কথাবার্তা বলে বেরিয়ে আসে।

পাশাপাশি তিনটে আরামদায়ক বড় সোফার একটিতে আদিত্য আর শাশ্বত খুব ফাঁক হয়ে বসেছে। অনাটাতে ললিত আর সঞ্জয়। তৃতীয়টায় বিমান, তার পাশে লক্ষ্মীকান্ত এসে বসল।

শাশ্বতীর এখনও কোনও সাড়া নেই। সে খুব বিস্মিতভাবে চারধারে চেয়ে দেখছে। আদিত্য মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে আছে।

সঞ্জয় দু'-একবার হাসিঠাট্টা করার চেষ্টা করে চুপ করে ছিল। ললিত হঠাৎ একসময়ে বলল, সব শেষ! বাঃ!

রেজিস্ট্রার তার মোটা চশমার কাচের ভিতর দিয়ে তাদের দিকে চেয়ে দেখল। প্রকাণ্ড খাতা খুলল, বের করল কর্ম। নিঃশব্দে লিখতে লাগল।

নিস্তব্ধ ঘর।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার তার ঘড়ঘড়ে গলায় জিজ্ঞেস করল, দু'জনের নাম?

ললিত বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হল না। মৃদু একটু শব্দ করে খুব আস্তে শাশ্বতী কেঁদে উঠল। অনেকক্ষণ তার সংবিৎ ছিল না। কিন্তু এখন সে হঠাৎ বুঝতে পারছে। তাকে কোথায় কেন এনেছে ওরা।

চমকে সোজা হয়ে বসে আদিত্য। সঞ্জয় উঠে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ললিত চেয়ে থাকে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল বিমান। সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের টেবিলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলল, ভদ্রমহিলা কাঁদছেন। উনি বিয়ে করতে রাজি নন।

লক্ষ্মীকান্ত শাশ্বতীর সামনে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে বলতে থাকে, দিদি, আমারও বউ রাজি ছিল না। এই দেখুন, আমার কালো মোটা চেহারা, বিচ্ছিরি। কিন্তু এখন আমার ছ'-ছ'টা বাচ্চা, বউ কত খোঁটা দেয়, তবু আমরা সুখে আছি... দিদি, রাজি হয়ে যান, সব ঠিক হয়ে যাবে...সব ঠিক হয়ে যাবে...

বুড়ো ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার তার প্রকাণ্ড খোলা খাতাখানার দিকে অসহায় চোখে চেয়ে থাকে।

বিমান খোঁড়াতে খোঁড়াতে ললিতের কাছে এসে গলা নিচু করে বলে, আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। রাজি করিয়ে আনব। তোমরা অপেক্ষা করো।

ললিত কথা বলে না। চেয়ে দেখে বিমান খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিছনে জড়সড় ভিতু শাশ্বতী।

তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু বিমান আর শাশ্বতী ফিরল না।

গভীর ক্লান্তির সঙ্গে ললিতের চোখ বুজে আসে। বদহজমের টক ঢেঁকুরে হঠাৎ তার গলা বুক জ্বলে যায়। মুখে জল আসে। হাসপাতালে ওষুধপত্রের যত গন্ধ পেয়েছিল ললিত, হঠাৎ সেইসব গন্ধ তার নাকে আসতে থাকে। হিক্কার মতো একটা শব্দ করে সে। মুখ চেপে ধরে রাখে। তারপর কোনওক্রমে জিজ্ঞেস করে, বাথরুমটা—বাথরুমটা কোন দিকে?

সতেরো

তাকে নীচে ফুটপাথে নিয়ে এল মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা রোগা অচেনা লোকটা। এটা কোন জায়গা ঠিক বুঝতে পারছিল না শাশ্বতী। উলটো দিকে একটা বড় পার্ক। তাতে বিশাল বিশাল পামগাছ, অনেক লোকের ভিড়, যেন কোনও মিটিং হচ্ছে। পার্কটার একটা গেটের ওপর সাইনবোর্ড—বহুবাজার ব্যায়াম সমিতি। এটা কি বউবাজার? কে জানে! শাশ্বতী কলকাতার অনেক অংশই চেনে না।

মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা লোকটা খুব উত্তেজিতভাবে গলা নামিয়ে বলল, আপনি পালিয়ে যান।

বড় সুন্দর লোকটার গলা। ভরাট, দানাদার, যেন খুব স্বাস্থ্যবান সুন্দর চেহারার পুরুষের গলা।

কিন্তু কোথায় পালিয়ে যাবে শাশ্বতী? কার কাছ থেকে?

সে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করে, এটা কোন জায়গা?

লোকটা তার দিকে চোখ গোল করে তাকায়, জায়গাটা চেনেন না? ওই তো ওয়েলিংটন স্কোয়ার, যেখানে মিটিং হয়। আর এই ধর্মতলা স্ট্রিট।

না, শাশ্বতী চেনে না। সে আঁচলে চোখ দুটো একবার চেপে ধরে।

লোকটা তেমনি উত্তেজিত গলায় বলে, ট্যাক্সি ডেকে দেব? বেশি দেরি করবেন না। ওরা ঠিক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আপনার মন ঘুরিয়ে দেবে। আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান।

হঠাৎ দূর স্মৃতিতে যেন শাশ্বতীর মনে পড়ে আদিত্য নামে একটা লোক, আদিত্য নামে একজন ছিল। শাশ্বতী তাকে বলেছিল ভালবাসবে। কিন্তু বাসা হয়নি, ঠিকমতো বাসা হয়নি। এখন সেই আদিত্য তিনতলার ওপর বসে আছে একটা সোফায়, তার পরনে সদ্য কেনা জামা-কাপড়, মুখে লজ্জার ভাব, হাতে ফুল। কিন্তু এখন আদিত্যকে অনেক দূরে ফেলে এসেছে শাশ্বতী। শাশ্বতী ফিসফিস করে ধরা গলায় বলে, একা একা ট্যাক্সিতে চড়তে আমার ভয় করে। তা ছাড়া আমার কাছে পয়সাও নেই।

আমার কাছেও নেই। বলে হাসল বিমান। তারপর বলল, তা হলে বাসে যান। ওই যে বাস-স্টপ।

শাশ্বতী ব্যাপারটা তখনও সঠিক বুঝতে পারছিল না। অগোছালো ঘরের মতো হয়ে আছে তার মন। সে বিমানের দিকে ভ্রূ কুঁচকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলে, আমি একা যেতে পারব না। আমার শরীর কেমন করছে!

বিমান ওপরের ব্যালকনিটা দেখছিল। সেখানে সঞ্জয় দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে সিগারেট, খুব অন্যমনস্ক চোখে দূরে দেখছে। বিমান শাশ্বতীকে চোখের ইঙ্গিত করে চাপা গলায় বলল, সরে চলুন। সঞ্জয় দেখতে পাবে।

খানিক দূর ভিড় ঠেলে হাঁটল তারা। নিঃশব্দে। বিমান খোঁড়াতে খোঁড়াতে আগে আগে। শাশ্বতী পিছনে। শাশ্বতী হাঁফিয়ে গেল অল্পেই। ফুটপাথের ধারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, আমার পা ব্যথা করছে।

বিমান মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করে, বসবেন?

শাশ্বতী মাথা নেড়ে জানায়, বসবে।

বিমান বলে, তবে একটু চলুন। কাছেই।

ধর্মতলা স্ট্রিট ধরে ধীরে হেঁটে তারা চাঁদনির কাছে চলে এল। গলিঘুঁজির মধ্যে একটু ঢুকে একটা চায়ের দোকান। বিমান তাকে নিয়ে সেই খুপরি দোকানে ঢুকে একটা কাঠের সরু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে গেল। জায়গাটা গুদামঘরের মতো বদ্ধ। কিন্তু নির্জন, নিঃশব্দ। শাশ্বতী বোধহীন চোখে দেখছিল। কোথা থেকে কোথায় এসেছে সে, সঙ্গের এই অদ্ভুত লোকটাই বা আসলে কে কিছুই বুঝতে পারছিল না। কিন্তু শাশ্বতীর আলাদা ইচ্ছে বলে কিছুই নেই এখন। তার একটু ঘুম পাচ্ছে, একটু তেষ্টা পাচ্ছে, খুব ক্লান্ত লাগছে—এই কয়েকটা শারীরিক অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই টের পাচ্ছিল না সে। এখন কেউ একন তাকে চালিয়ে নিয়ে যাক।

একটা ছোট টেবিল, আর দু'খানা চেয়ার তার দু'দিকে ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই ঘরটায়। এক ধারে দড়িতে ঝোলানো ময়লা জামা-কাপড় আর গামছা, মেঝেতে গোটানো কয়েকটা সরু পাতলা বিছানা দেখে মনে হয় এখানে গরিবদুঃখী লোকেরা থাকে, এটা তাদের শোয়ার একটা আস্তানা। ঘরের কোণে বস্তা, তেলের টিন, ঝুড়িভরতি আলু আর আনাজ। দোকানের ভাঁড়ার। বোঝা যায় এ-ঘরটা বাইরের খদ্দেরদের জন্য নয়। ঘরটা নিচু, এক পাশে কেবল একটা জানালা। বিকেলের এক ফালি লাল রোদ এসে শাশ্বতীর পা ছুঁয়ে রইল।

মুখোমুখি বিমান বসল। এইবার শাশ্বতী লক্ষ করে দেখল বিমানকে। বিমানের চোখে-মুখে তীব্র উত্তেজনা জ্বলজ্বল করছে, ঠোঁটে টেপা একটু হাসি, যে-হাসিটা চেপে রাখতে বিমানের কষ্ট হচ্ছে, ওর মুখখানা লাল, টেবিলের ওপর রাখা হাতখানা কাঁপছে। জ্বলজ্বলে চোখে তার দিকে একটু তাকিয়ে থাকে বিমান। তারপর হঠাৎ ঝুঁকে চাপা গলায় বলে, জীবনে এই প্রথম—না, না, এই দ্বিতীয়বার আমি একটা কিছু করলাম, জানেন? একটা ভাল কিছু। আমার ভিতরটা ফেটে যেতে চাইছে।

বলে বিমান আপনমনে আনন্দে বিভোর হয়ে হাসে। ওর সমস্ত শরীর রি-রি করে কাঁপতে থাকে।

যেন ডাকাতদলের হাত থেকে শাশ্বতীকে উদ্ধার করে এনেছে একজন সাহসী গোয়েন্দার মতো, এ-রকমই হয়তো নিজেকে মনে হচ্ছিল বিমানের।

আস্তে আস্তে শাশ্বতীর অবোধ অবুঝ ভাবটা কেটে যেতে থাকে। সে পরম ক্লান্তিতে ঘাড় হেলিয়ে একটু চোখ বুজে থাকে। হঠাৎ তার নাক-মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে লজ্জায়, ভয়ে। শিউরে কেঁপে ওঠে সে। হঠাৎ সে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করে, আমি কি সই করেছি?

কোথায়?

ওইসব কাগজে? তখন আমার কিছু ঠিক ছিল না মাথার। কী করেছি মনে নেই।

বিমান ঝকঝকে চোখে হয়ে হাসে। মাথা নেড়ে বলে, না। কিন্তু আপনি খুব কমজোরি, আর-একটু থাকলে ওরা আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নিত।

শাশ্বতী জিজ্ঞেস করে, কেন?

বিমান উত্তেজিতভাবে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু বেশি উত্তেজনায় তার কথা আটকে যায়। বলে, মানুষ অনেক সময়ে মানুষের ভালটাই ভাবে, কিন্তু করতে গেলে উলটো করে ফেলে।

শাশ্বতী একটা শ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে।

সদ্য ঘুম থেকে ওঠা একটা বাচ্চা বয় খালি গায়ে হাই তুলতে তুলতে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। বিমান জিজ্ঞেস করে, কী খাবেন?

কিছু না। শাশ্বতী উত্তর দেয়।

একটু চা?

না। মাথা নাড়ে শাশ্বতী, আমার বমি হয়ে যাবে। আমি শুধু একটু জল খাব।

জল। বিমান উত্তেজিত ভরে ছেলেটাকে বলে, এক গ্লাস জল— শিগগির!

ছেলেটা বোকা চোখে তাকিয়ে থেকে মন্থর পায়ে চলে যায়। বিমান ছেলেটার যাওয়ার ভঙ্গিটা চেয়ে দেখে, তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে শাশ্বতীকে বলে, কী মজা! ওরা আমাদের কোথাও খুঁজে পাবে না।

বলে আপনমনে একটু হাসে।

শাশ্বতী হাসে না। তার খুব ক্লান্তি আর হতাশা বোধ হয়। সে জানে, আজ হোক কাল হোক আদিত্য তাকে খুঁজে বের করবে। ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার আর তিনজন সাক্ষীর সামনে তাকে বোকার মতো বসিয়ে রেখে এসেছে সে। সে আর ফিরে যাবে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকবে আদিত্য। অপমানে লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে, চিড়বিড় করবে রাগে। তারপর আজ হোক কাল হোক, হয় বাসায় নয় তো রাস্তায়-ঘাটে কোথাও কিংবা কলেজের সামনে ওত পেতে থেকে শাশ্বতীকে ধরবে আদিত্য। তখন কী হবে শাশ্বতী জানে না। কিন্তু আদিত্য খুঁজে বের করবেই তাকে। করবেই। সহজে ছেড়ে দেবে না। শাশ্বতী জানে।

জল খেয়ে শাশ্বতী বলল, এবার যাব।

চলুন। বলে বিমান উঠে দাঁড়ায়।

শাশ্বতী ইতস্তত করে বলে, চা খেলেন না? এতক্ষণ আমরা এখানে বিনিপয়সায় বসলাম! একটা কিছু খাওয়া উচিত ছিল।

না, না। বিমান বলে, এ আমার অনেক কালের চেনা লোকান। কলেজে পড়ার সময়ে এখানে আমি আর রমেন আসতাম। এই ঘরটা তখন থেকেই আমাদের জন্য আছে। আপনার ওই চেয়ারটায় রমেন বসত। আমরা অনেকক্ষণ এখানে কাটিয়ে যেতাম। আমি এখনও প্রায় আসি।

ও। শাশ্বতী বলে।

কাঠের সরু সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে নেমে আসে তারা। বড় রাস্তায় এসে শাশ্বতী বলে, আপনার কথা ওর কাছে কোনও দিন শুনিনি তো! আপনি ওঁদের কীরকম বন্ধু?

বিমান মাথা নাড়ল, আমি ওদের বন্ধু নই। এক সময়ে এক ক্লাসে পড়তাম, মুখ-চেনা ছিল।

শাশ্বতীর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে যে, তা হলে সে এদের দলে জুটল কী করে! লজ্জায় জিজ্ঞেস করল না।

কিন্তু বিমান নিজের থেকেই বলল, আজ হঠাৎ অনেক বছর বাদে আদিত্যর সঙ্গে প্রথম দেখা। ললিত ওকে আমার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আদিত্যকে আজ এত দিন বাদে প্রথম দেখার দিনেই ললিত ওর বিয়েতে সাক্ষী দিতে বলল আমাকে। আসলে আমার মনে হয়, ললিতের ধারণা ছিল, এই গোলমেলে বিয়েতে আমার মতো একটা পাগল-টাগল নিরীহ গোবেচারাকে সাক্ষী দিতে ডাকাই নিরাপদ। সেয়ানা বন্ধুরা সাক্ষী দেওয়ার আগে অনেক প্রশ্ন করবে, সব ব্যাপার জানতে চাইবে, এবং গোলমাল দেখলে পিছিয়ে যাবে।

শাশ্বতী অনেকক্ষণ বাদে এইবার হাসল। জিজ্ঞেস করল, আপনি কি পাগল?

হ্যাঁ। বিমান গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে, মাঝে মাঝে আমার মাথার গোলমাল হয়।

কেন?

বিমান আঙুল তুলে শাশ্বতীকে আকাশটা দেখিয়ে বলল, আমার মাথায় আকাশ ঢুকে যায়। তখন মাথার মধ্যে খুব যন্ত্রণা হয়। আমি পাগল হয়ে যাই। কিন্তু সবসময় আমার পাগলামি থাকে না।

শাশ্বতীর দিকে চেয়ে একটু বুঝদারের মতো হাসল বিমান। বলল, এখন আমি পাগল নই। আমি জানি মেয়েরা পাগলদের ভয় পায়। কিন্তু আপনার কোনও ভয় নেই। একটু আগেই আমি সুস্থ মানুষের মতো একটা কাজ করেছি, আপনাকে নিয়ে এসেছি ওদের কাছ থেকে। আদিত্য এক পাত্র বিষ খেতে যাচ্ছিল, আমি ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সেটাও আজ বুঝবে না। দেখা হলে ও আমার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করবে।

শাশ্বতী আবার হাসে। বলে, আমি কি বিষ?

না। মাথা নাড়ে বিমান, এমনিতে আপনি বিষ নন। ঘি আর মধু আলাদা আলাদাভাবে বিষ নয়, কিন্তু মেশালে বিষ। ঠিক সেই রকম। ভালবাসা-টাসা আমি খুব ভাল বুঝি না। কিন্তু এইটুকু বুঝি যেমন তেমন বিয়ে হওয়া ভাল নয়। কিন্তু এখন কি আপনি বাসে উঠবেন? বাসে খুব ভিড়। অফিস ভাঙার সময়।

মন্থরগতিতে বোঝাই বাস-ট্রাম চলেছে। সামনেই চৌরাস্তায় ধীরে ধীরে সৃষ্টি হচ্ছে একটা ট্র্যাফিক-জ্যাম।

শাশ্বতী উদ্বিগ্ন চোখে দেখল। বলল, ওঠা যাবে না।

তা হলে?

শাশ্বতী হাসল, এখন হঠাৎ আমার খিদে পাচ্ছে আবার।

বিমান বলল, তবে চলুন ওই দোকানটায় ফিরে যাই। ওখানে বললে কইলে বাকিতে খাওয়া যাবে। কিন্তু খাবার খুব বাজে। আমি ওখানে আসি কেবল নিরিবিলিতে বসার জন্য, আর পয়সা না থাকলে বাকিতে খাওয়ার জন্য। যাবেন?

না। শাশ্বতী মাথা নাড়ে, ওই গুদাম ঘরে আমার দম আটকে আসছিল। তা ছাড়া ওটা তো আসলে একটা শোয়ার ঘর, পুরুষেরা শোয়। আমার ভাল লাগে না।

বিমান তার বাঁ পকেট থেকে ছেঁড়া পুরনো মানিব্যাগটা বার করে পয়সা হিসেব করে বলল, তিরানব্বই পয়সা আছে মোটে।

শাশ্বতী বলল, আমার কাছে এক টাকার মতো।

বিমান একটু ভেবে বলল, তা হলে কোনও মাদ্রাজি দোকানে চলুন। সস্তায় খাওয়া হবে।

একটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সিনেমা হল পেরিয়ে যাচ্ছিল তারা। হলঘরের সামনের ফুটপাথে ঠান্ডা হয়ে আছে। শীতে কেঁপে উঠল শাশ্বতী। তারপর বলল, বড় রাস্তা দিয়ে যেতে ভয় করছে। ওরা যদি গাড়িতে এই রাস্তাতেই ফেরে।

ঠিক। বিমান দাঁড়িয়ে পড়ল।

তারপর বড় রাস্তা ছেড়ে গলিঘুঁজির মধ্যে হাঁটতে লাগল তারা। পৃথিবীময় অচেনা মানুষ, অন্ধের মতো গায়ে ধাক্কা দিয়ে উলটোপালটা হেঁটে যাচ্ছে নাম-পরিচয়হীন মানুষেরা। অচেনা রাস্তাঘাট, চোরাগলি, শাশ্বতী কোনও দিন এই সব জায়গা দেখেনি। এই অচেনা জায়গায় ভিড়ের মধ্যে সে একজন অজানা পুরুষমানুষের সঙ্গে কোথায় কোন রেস্টুরেন্টে চলেছে! কিন্তু তার একটুও ভয় করে না। পথ-চলতি লোকেরা মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা বিমান, আর তার সঙ্গে তাকে যেতে দেখে কৌতূহলে তাকাচ্ছে। কিন্তু শাশ্বতীর খুব একটা লজ্জা করে

না। বরং তার মন এখন ঝরঝরে পরিষ্কার, বন্ধনহীন। জ্বর সেরে গেলে শরীর যেমন দুর্বল আর শীতল মনে হয়, তেমনি লাগছে তার। একটু হয়তো বা দুর্বল। কিন্তু জ্বর নেই। জ্বর আর একটুও নেই। তার খুব ভাল লাগছে, সে যেন এখন সেই ফ্রক-পরা ঝুঁটি-বাঁধা শাশ্বতী, বাবার সঙ্গে পুজোর জামা কিনতে বেরিয়েছে।

আবার কাঠের সিঁড়ি, আবার দোতলা। তবে এ-রেস্টুরেন্টটা অনেক বড়, আর লোকজনের খুব ভিড়। টেবিলের সামনে লোকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে জায়গা খালি হলে বসবে। সমস্ত ঘরটায় একটা টক গন্ধ, আর বাসনকোসন ধোয়ার খুব শব্দ হচ্ছে।

বিমান নিচু গলায় বলে, ভয় নেই। কম পয়সায় লোকে খায় বলে এত ভিড়। এখানে কেবিন আছে। অনেকক্ষণ বসা যায়।

একটু অপেক্ষা করে কেবিন পাওয়া গেল। দুটো দোসা আনতে বলল বিমান। তারপর শাশ্বতীর দিকে চেয়ে হাসল। বাচ্চা ছেলের মতো অহংকার তার মুখে। শাশ্বতীকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, আপনার কোনও ভয় নেই। আমি এখন পাগল নই। পাগলামি আসার আগেই আমি টের পেয়ে যাই। তখন আমার কাছাকাছি যারা থাকে তাদের সাবধান করে দিই যে, আমি আর কয়েক দিনের মধ্যেই পাগল হয়ে যাব।

শাশ্বতী বাচ্চা মেয়ের মতো একটু হাসে। পরমুহূর্তেই বিষণ্ণ হয়ে গিয়ে বলে, আমার বাবাও মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যায়।

পাগল? খুব অবাক হয় বিমান, কী রকম?

শাশ্বতী আস্তে আস্তে বলতে লাগল তার বাবার কথা। বলতে তার ভাল লাগছিল, মন মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল তার। সে কখনও চোখের জল মুছল, কখনও হাসল।

বিমানকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। হাত কাঁপছিল তার। প্রথমে কিছুক্ষণ সে কথা বলার চেষ্টা করেও পারল না। তারপর কষ্টে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আমরা যারা পাগল তারা কী রকম তা ঠিক বোঝানো যায় না। আমরা সকলেই এক রকমের পাগল নই, বুঝলেন! আমরা যে যার নিজের মতো করে পাগল। না, আমি ভবিষ্যৎ কিছু দেখতে পাই না, কিন্তু যখন আমার মাথায় আকাশ ঢুকতে থাকে আর মাথার যন্ত্রণায় আমি কষ্ট পেয়ে কাতরাই তখন মাঝে মধ্যে আমি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখি। প্রকাণ্ড একটা জায়গা— সেই জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, সূর্য চাঁদ তারা কিছু নেই, সেইখানে বিরাট খোলা জায়গায় হাজার হাজার মানুষ। অন্ধকারে অসম্ভব গোলমাল করে তারা, চিৎকার করে, এর সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। আছড়ে পড়ে মানুষ, আবার উঠে দাঁড়ায়। রাস্তা খুঁজে না পেয়ে হাতড়ে চলে, কোথায় চলেছে জানে না। কখনও তারা চেঁচিয়ে বাবা মা ভাই বন্ধুর নাম ধরে ডাকে, কাঁদে, আবার কখনও কেউ পা মাড়িয়ে দিয়েছে বলে ঝগড়া করে। মারপিট ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা যায়। দাঁত ঘষার শব্দ, গালাগালের শব্দ! অন্ধকারের মধ্যে এইসব ঘটতে থাকে। কিন্তু তখন আমার মাথায় আকাশ ঢুকছে বলে যন্ত্রণায় আমি বেশি কিছু বুঝতে পারি না। চোখ খুলে ঘোর অন্ধকার দেখি। আর দেখতে পাই আমার গায়ের ওপর দিয়ে মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু তারা আসলে কোথাও যায় না, ঘুরে-ফিরে অন্ধকারে আবার একই জায়গায় ফিরে আসে, তারপর ভুল এবং নিরর্থক পরিশ্রম বুঝতে পেরে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে! হাঁফায়। ককিয়ে কেঁদে ওঠে। খুব মজার সেই দৃশ্য।

শাশ্বতী আস্তে করে হেসে ওঠে, মুখে রুমাল চাপা দেয়।

বিমান হাসে না। গম্ভীরভাবে বলে, যুদ্ধের সময়ে যখন হাতিবাগানে বোমা পড়ল তখন আমরা কলকাতা ছেড়ে পূর্ব বাংলায় পালিয়ে গিয়েছিলাম। গোয়ালন্দের স্টিমার পার হয়ে রাত্রিবেলা ট্রেনে ওঠার সময়ে অন্ধকারে ঠিক ওই রকমই একটা ধাক্কাধাকি, গোলমাল আর দিশেহারা অবস্থায় পড়েছিলাম আমরা। মা আমাকে নিয়ে ছেঁচড়ে একটা কামরায় উঠেছিল, আমাদের মেঝেয় ফেলে গায়ের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠেছিল মানুষ, থেঁতলে দিয়ে গিয়েছিল আমাদের। তার ওপর বাবা দাদা আর আমার ছোট বোনটা যে কোথায় গিয়েছিল ছিটকে তা কে জানে! সেই আতঙ্ক আর ভয়, আর সেই অন্ধকার এখনও আমার মধ্যে রয়ে গেছে। এক-একবার মনে হয়েছে আমার পাগলামির সময়ে আমি সেই দৃশ্যটাই দেখি। কিন্তু তারপর ভেবে দেখেছি যে, আসলে তা নয়। গোয়ালন্দের যাত্রীদের একটা উদ্দেশ্য ছিল, তারা ট্রেনে উঠে যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এই অন্ধকার জায়গায় লোকগুলোর আসলে কোনও উদ্দেশ্য নেই, এরা জানেই না কোথায় গেলে কী হবে, এত হাঁটাচলা, এত পরিশ্রমের অর্থ কী। তাই আমি এর একটা অর্থ করলাম যে, আসলে এই যে মানুষ জন্মাচ্ছে পৃথিবীতে, বেঁচে থাকছে, কাম-ক্রোধ-লোভের হাত ধরে চলেছে, এরা তো আসলে জানে না কেন জন্ম, কেন এই জীবন, মৃত্যুই বা কেন! তাই পৃথিবীতে সবসময়েই রয়েছে এক ঘোর অন্ধকার, কিন্তু মানুষ সেটা বুঝতেই পারে না। তাদেরই মন থেকে অন্ধকার ছড়িয়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে। তাই রেলগাড়ির হ্যান্ডেল ধরে যেতে যেতে ঝুলন্ত মানুষ দেখতে পায় না তার মাথা লক্ষ্য করে ষাট মাইল বেগে ছুটে আসছে ইলেকট্রিকের পোস্ট, দেখতে পায় না রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ কখন ট্রাফিকের লাল বাতি সবুজ হয়ে যায়। বুঝতে পারে না, লম্বা ঘাসের ভিতরে চিকন-শরীর সাপ চলে আসছে কাছাকাছি, তারা কখনও দেখে না চারপাশের জীবাণু-জগৎ, শরীরে উঠে আসছে কষ্টকর রোগ। যতটুকু দেখে মানুষ ততটুকু আসলে কিছু নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু আছে, যা সে দেখতে পায় না। তাই আমার পাগলামির সময়কার ওই দৃশ্যে সূর্য নেই, চাঁদ নেই, তারা নেই। ওই দৃশ্যে আমি এক অদ্ভুত সত্যকে দেখতে পাই, যা আর কেউ দেখে না। ঘোর অন্ধকার একটা পৃথিবীতে জন্মান্ধ মানুষেরা হাঁটছে।

বিমান শাশ্বতীর চোখ দেখে হঠাৎ হেসে বলল, না, না, আমি এখন ঠিক আছি। কোনও ভয় নেই। আপনার বাবা এক রকমের পাগল, আমি আর-এক রকমের। কিন্তু কিছু কিছু পাগল আছে যারা সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি কিছু দেখতে পায়। হয়তো সেইসব পাগলদের কিছু কিছু অনুভূতি প্রখর হয়ে ওঠে, অন্য অনুভূতিগুলো ম্লান হয়ে যায়।

বিমান উৎসুক চোখে শাশ্বতীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর ছেলেমানুষের মতো সরল হাসি হাসল, এই যে একটু আগে আদিত্য আপনাকে আইনের প্যাঁচে বিয়ে করার চেষ্টা করছিল, ওটাও এক রকমের অন্ধকারে হাঁটা। ও কেবল বোঝে ওর প্রবল ভালবাসা আছে। কিন্তু সেই ভালবাসা কত দূর সাহায্য করে মানুষকে বিয়ে কি কেবল ভালবাসারই একটা ঘটনা? তার আগে-পরে কিছু নেই? ও হঠাৎ আজ দুপুরে এসে দু'-একটা কথাবার্তা বলেই বলল, আমার বিয়েতে সাক্ষী দেবে চলো। মনে মনে আমি চমকে উঠলাম। বিয়ে করা কি এতই সহজ, এত দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ। সাক্ষীরও ঠিক নেই, প্রস্তুতি না হঠাৎ বিয়ে! মনে মনে আমি তখনি ঠিক করলাম আমি সাক্ষী নতে রাজি হব। সঙ্গে থাকর ওদের। দরকার যদি হয়, যদি বুঝি জোড় মিলছে না তা হল শেষ সময়ে গোলমাল করে দেব।

বলে বিমান উজ্জ্বল মুখে হাসল, আমি গোলমাল করে দিয়েছি। না? আপনাকে রাজি করানোর অছিলায় বের করে না-আনলে ওরা ঠিক আপনাকে দিয়ে সই করিতে নিত। তাই না?

শাশ্বতী ভীত মুখে চেয়ে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

বিমান শব্দ করে হাসল। তাদের সামনে সদ্য রেখে যাওয়া প্লেটে দোসা ঠান্ডা হতে লাগল। বিমান বলল, বিয়েটা আসলে কী তা আমি আদিত্যকে একটু বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তখন ও ভালবাসায় এত ঠাস-ভরাট যে, ওর মধ্যে কথটা ঠিক ঢুকল না। ওর পক্ষে তখন এটা বোঝা সম্ভবই ছিল না যে, প্রকৃতি আমাদের কাছ থেকে সন্তান চায়, সমাজ চায় প্রকৃত মানুষ। একটা বিয়ে মানেই মানুষের একটা ধারা, আবহমানকালের একটা মনুষ্যস্রোত। তাই না? প্রতিটি স্বামী-স্ত্রীই এ-রকম একটা স্রোতের উৎস। সেই স্রোতটার কথা খেয়াল রাখতে হয়, কেবল ক-এর সঙ্গে খ-এর দেখা হয়ে গেল— তারপর ভালবাসা—গভীর ভালবাসা—বিয়ে—এ-রকমভাবে হয় না। চাষাও জানে কোন জমিতে কী রকম চাষ, সে জানে ভাল জমিতে খারাপ বীজ জ্বলে যায়, ফসল হয় না। কিংবা রুগ্‌ণ ফসল হয়। আপনি কি চান এ-রকম সন্তান, যে আপনার চেয়েও নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ, যে আরও অন্ধ, পৃথিবী যার কাছে আরও ঘোরতর অন্ধকার?

শাশ্বতী লজ্জা পায়। তার মুখে রক্ত ছুটে আসে। চোখ নামিয়ে নেয় সে।

বিমান সামনে ঝুঁকে তার একখানা হাত স্পর্শ করেই হাত সরিয়ে নেয়। বলে, লজ্জা পাবেন না। বরং মনে করে নিন আপনি অবুঝ একটি মেয়ে, আর আমি আপনার বাবার মতোই একজন কেউ। আমি আপনাকে শেখাচ্ছি কীভাবে হাঁটতে হয় অন্ধকারে। দেখুন, আমি চাই আমার সন্তান আমার চেয়ে চক্ষুষ্মান হোক, পৃথিবীর এই অন্ধকার যেন তাকে দিশাহারা না করে। তাই না? কিন্তু একটি মেয়েকে গভীর ভালবেসে বিয়ে করলেই কি সে-রকম সন্তান পাওয়া যাবে? না। কারণ, প্রকৃতির নিয়ম মানুষের ভালবাসার ধার ধারে না। ঠিক বীজ ঠিক জমিতে না পড়লে বীজ জ্বলে যায়। আমরা অকর্মণ্য, বিশ্বাসঘাতক, ভ্যাবলা, অলস, চোর মানুষ নিয়ে আসি পৃথিবীতে। সমাজ টলমল করে। তাই না? ওই দোকানটায় যে বাচ্চা ছেলেটা ছিল তাকে লক্ষ করেছেন? আমি ওকে প্রায়ই লক্ষ করি। মানুষকে আড়াল থেকে লক্ষ করা আমার প্রিয় স্বভাব। ছেলেটাকে দেখি একটা কথা বললে বুঝতে অনেক সময় নেয়, গজের মাঝখানে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে, চুরি করে খায়, মালিক মারলে ঠিক জন্তুর মতো চেঁচায়, আবার পরমুহূর্তেই মারের কথা ভুলে যায়। আমি ওকে দেখেছি ওই ঘরের এক কোণে বসে গায়ের ওপর পড়া একটা টিকটিকিকে ধরে তার শরীর থেকে ল্যাজটাকে খুব অন্যমনস্কভাবে টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। তারপর সেই টিকটিকিটাকে হাতে কচলে ডেলা পাকিয়ে ফেলে দিল এক ধারে, হাতের রস রক্ত মাথায় মুছে নিল। কী করছে তা ভাল করে খেয়ালই করল না। আমি কখনও মুরগির মাংস খাইয়েছি, কখনও ক্যাডবেরির চকোলেট, জিজ্ঞেস করেছি, কেমন রে? ও উত্তর দিয়েছে, ভাল। আবার ও যখন পাউরুটির গুঁড়ো আর গুড় দিয়ে জলখাবার খায় তখনও জিজ্ঞেস করেছি, কেমন রে! ঠিক একই রকমভাবে বলেছে, ভাল। খাওয়ার সময়ে ওকে দেখবেন, ও স্বাদ বুঝতে পারে না। খেয়ে যায়। আমি রেগে গিয়ে ওকে বলি, হয় তুই সিদ্ধপুরুষ, নয় তো গোবর। আজ আপনার জন্য জল এনে ও গ্লাসটা ধরে দাঁড়িয়েই ছিল, আপনি হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা না নিলে ও দাঁড়িয়েই থাকত। ওটা টেবিলের ওপর রেখে যে ওর সরে যাওয়া উচিত সেটা ও বোঝেই না। আমি জানি ওর মাথার মধ্যে বোধ নেই, বুদ্ধি নেই, কেবল কুয়াশার মতো একটা ধোঁয়াটে ব্যাপার আছে। এই জীবনের মাথামুন্ডু ও কিছুই বোঝে না, এক অদ্ভুত অচেনা রহস্যময় জগতে ও আন্দাজে আন্দাজে চলেছে।

ঘোর অন্ধকার পৃথিবীতে জন্মান্ধ মানুষ। উনুনের ধারে ওর নোংরা বিছানায় বেড়ালের থাবার নীচে ও ঘুমিয়ে থাকে, খিদে পেলে চুরি করে খায়, কখনও সততার অর্থ বোঝে না।

বিমানের মুখ আঠাঘামে চকচক করে। দ্রুত কথা বলে সে হাঁফিয়ে পড়ছে, তবু থামতে চায় না, ঝুঁকে বলে, কোথা থেকে আসছে এইসব অন্ধ মানুষেরা? কোথা থেকে? এরা ভুল বিয়ের মন্দ উৎপাদন নয়?

বিমান আপনমনে একটু হাসে, মাথা নেড়ে বলে, ওর মা-বাবা দূরদর্শী ছিল না। দূরদর্শী হলে তারা তাদের অতীতের বংশধারার দিকে লক্ষ রাখত, ভবিষৎ সমাজের কথা ভাবত, চট করে বিয়ে করত না। কিন্তু বস্তুত তারাও ছিল অন্ধ মানুষ, ঘোর অন্ধকার পৃথিবীতে আন্দাজে-আন্দাজে তারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছে, খিদে পেলে খেয়েছে, তৃপ্ত হয়েছে রতিক্রিয়ায়, কোনওটারই অর্থ বোঝেনি। আমি মাঝে মাঝে কাগজে দেখি রেসের ঘোড়ার বংশগতি ছাপা হয়, যাতে রেসুড়ে মানুষ বুঝতে পারে কোন ঘোড়ার কী জাত। ভাল কুকুর, ভাল গোরুর জন্যও আছে এক রকমের পদ্ধতি। সেখানে শ্রেণীভেদ মানা হয়, ভালবাসা নামে কিছু নেই। কেবল মানুষেরই আছে ভালবাসা, আজ দুপুরে আদিত্যর মুখে-চোখে আমি এইরকম একটা অন্ধ উন্মত্ত ভাব দেখেছি। অন্ধের মতো ও যাচ্ছে, আর একজন অন্ধ ললিত ওকে পথ দেখাচ্ছে।

বিমান একটু চুপ করে থাকে, তারপর দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলে, কারখানায় একটা স্ক্রু তৈরি করতেও কত যত্ন লাগে, কত সতর্কতা। অত যত্নে খুব কম মানুষই উৎপাদিত হয়। তাই না?

শাশ্বতী লাজুক হেসে বলল, আপনি খেয়ে নিন।

বিমান কোমল চোখে শাশ্বতীর দিকে চেয়ে একটু হাসে। তারপর দোসার টুকরো ভেঙে মুখে দেয়। ধীর গলায় বলে, আমরা যারা পাগল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কখনও-সখনও এমন কিছু দেখি, যা আর কেউ দেখে না। ঠিক বলছি না?

শাশ্বতী মাথা নাড়ে, ঠিক।

গভীর তৃপ্তিতে হাসল বিমান। নিজের মুখটা শাশ্বতীকে দেখিয়ে বলল, কয়েক দিন আগে আমাকে দুটো লোক খুব মেরেছিল। বলতে গেলে সেই মার খাওয়াটাই আমার জীবনের প্রথম সাহসের কাজ। আর, দ্বিতীয় সাহসের কাজ আজকেরটা। এই প্রথম আমি একটা কিছু করতে শুরু করেছি। নিজেকে আমার খুব ভাল লাগছে আজকাল। খুব ভাল।

যখন দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা তখন সন্ধে হয়ে গেছে। এসপ্ল্যানেডের আকাশে মরা আলো। শাশ্বতীর পাশে পাশে খুঁড়িয়ে কষ্টে হাঁটে বিমান। কৌতূহলী লোকজন তাদের দেখে।

বিমান হঠাৎ নরম গলায় জিজ্ঞেস করে, ললিতের সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ?

শুনে শাশ্বতী সামান্য কেঁপে ওঠে। তারপর নিচু গলায় বলে, মাত্র এক দিনের আলাপ।

এক দিনের! সামান্য অবাক হয় বিমান। তারপর মাথা নেড়ে বলে, কিন্তু দেখলাম টেলিফোন ডিরেক্টরির পাতা ওলটাতে ওর হাত কাঁপছে, দু'আঙুলে সিগারেট ধরে রাখতে পারছে না। খুব অস্থির দেখাচ্ছিল ওকে। আমি ভেবেছিলাম, ও আপনাকে গভীরভাবে চেনে। হয়তো কোনও কারণে আপনার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়।

হঠাৎ থেমে আসে শাশ্বতীর পা। বুক কেঁপে ওঠে। তারপরেই আবার সে স্বাভাবিক হাঁটতে থাকে। কোনও কথা বলে না।

আঠারো

বুড়ো ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার দেখিয়ে দেয়, বাথরুম ওই দিকে। ললিত দৌড়ে যায়। বেসিনের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে।

বেসিনের ওপর দেয়ালে আয়না। বমি করার পর মুখ তুলে ললিত দেখে তার জলে ভেজা মুখখানা ফ্যাকাসে। মোটাসোটা লক্ষ্মীকান্তর পাশে তাকে এতটুকুন দেখাচ্ছে। কালো বিশাল হাতখানা দিয়ে তার কপাল ধরে রেখেছে লক্ষ্মীকান্ত, যাতে দুর্বল মাথা টলে না পড়ে যায়। ফরসা কপালের ওপর কালো আঙুল।

এখন একজন আধমরা লোককে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ললিত। এ শরীর আর তার নয়। তার যে শরীর ছিল এটা কখনও আলাদাভাবে টের পায়নি ললিত। এখন সে তার হালকা ছিপছিপে শরীরটাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করে।

লক্ষ্মীকান্ত মায়া-মমতার চোখে তার দিকে তাকায়। ভেজা হাতে কানের পিঠে আর ঘাড় ভিজিয়ে দেয়, এইবার একটু ভাল লাগছে না দাদা, অ্যাঁ?

ভাল। বেশ ভাল।

লক্ষ্মীকান্তর হাত ছাড়িয়ে একা হাঁটার চেষ্টা করে ললিত। পৃথিবী টলে যায়।

বাথরুমের দরজায় সঞ্জয় দাঁড়িয়ে ছিল। ললিত মুখোমুখি হতেই সঞ্জয় হাত বাড়িয়ে বলল, আয়। এখন কেমন লাগছে?

এক হাত থেকে আর এক হাতে চলে গেল শরীর। সঞ্জয় বগলের তলায় কাঁধ দিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে ললিত হঠাৎ লক্ষ করে যে সঞ্জয়ের চেয়ে সে লম্বা। অন্তত ইঞ্চিখানেক। কিন্তু এখন আর তাতে কিছু আসে যায় না। বরং এক ইঞ্চি লম্বা হয়েও তার লজ্জা করছিল। একজন মানুষের পক্ষে যুবাবয়সে এর চেয়ে বেশি আর কী লজ্জার থাকতে পারে যে, সে আর একজনের কাধেঁ ভর দিয়ে হাঁটছে?

সঞ্জয় চাপা গলায় বলে, ব্যাপারটা কীরকম বুঝছিস? মেয়েটা কি কেটেই পড়ল! প্রেস্টিজ-ফ্রেস্টিজ আর... কী ব্যাপার বল তো!

ঘরে ঢুকতেই বুড়ো ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে, আপনার কী হয়েছে বলুন তো! আমি ডাক্তার।

ডাক্তার! ঘরে ধারে অথচ ডাক্তারির চিহ্ন নেই। ওষুধের কোনও গন্ধও না। স্টেথস্কোপটাই বা কোথায়! হঠাৎ ললিত দেখতে পেল টেবিলের ওপর জার্নালের স্তূপ। ডাক্তারই হবে।

হয়তো প্র্যাক্টিস বেশি নেই। কিন্তু ললিত কিছুতেই এখন লোকটাকে ম্যারেজ-রেজিষ্ট্রার ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না। ধুতির ওপর ঝোলানো শার্ট, ফুলহাতার লিঙ্ক বোতাম, বুকপকেটে ঠাসা কাগজপত্র আর ছোট ডায়েরি। তোবড়ানো শুকনো মুখ, যে-মুখ মনে থাকে না। চশমা জোড়াই যেন লোকটার চোখ, আলাদা চোখ নেই।

ললিত দুর্বল হাতখানা বাড়িয়ে ধরে। লোকটা লাজুক মিনমিনে গলায় বলে, আমি অবশ্য চোখের ডাক্তার, কিন্তু জেনারেল রোগ-টোগ বুঝতে পারি।

চোখ বুজে, ঘাড় হেলিয়ে মন দিয়ে অনেকক্ষণ নাড়ি দেখে জিজ্ঞেস করল, কোনও অসুখবিসুখ আছে? অম্বল-টম্বল?

গ্যাসট্রিক কারসিনোমা।

কী?

ক্যানসার।

একটা শ্বাস ফেলার শব্দ হয়। অতি সম্মানের সঙ্গে ধীরে ধীরে তার হাতখানা নামিয়ে দেয় লোকটা।

হতাশ লাগে ললিতের।

সাবধানে থাকবেন।

ললিত সোফায় গা ছেড়ে একটু হাসে।

ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার লক্ষ্মীকান্তর দিকে ফিরে বলে, কী, তোমার পার্টি কই?

দেখে আসি। লক্ষ্মীকান্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে যায়।

আদিত্য সোফার পিছনে মাথা রেখে দু' হাতে মুখ ঢেকে আছে। কপাল চকচক করছে ঘামে। মাথার চুল একটু আগে পাট করা ছিল, এখন আবার এলোমেলো।

সঞ্জয় সিগারেট ধরায়। পায়ে পায়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়।

অনেকক্ষণ পর লক্ষ্মীকান্ত ফিরে আসে, নাঃ, ধারে কাছে নেই!

বুড়ো লোকটা গম্ভীর হয়ে ঘড়ি দেখে, এক ঘণ্টা হয়ে গেল।

ললিত দেখছিল, সবুজ দেয়ালে রং চটে গেছে। একটা ভেজা নোনা ধরার গন্ধ। মাথার ওপর দুই ব্লেডের একটা পাখা চলছে, পুরনো আমলের পাখা, কিচকিচ শব্দ হয়। জানালা দরজার সবুজ পরদাগুলো ময়লা বিবর্ণ হয়ে গেছে। পুরনো আমলের ডেস্কে, কুমিরের গায়ের মতো খসখসে সোফার ঢাকনায়, চট বেরিয়ে আসা মেঝের লিনোলিয়ামে—সব জায়গাতেই ধুলো জমে আছে বলে মনে হয়। কিংবা ঘরটা অন্ধকার বলে ও-রকম ধুলোটে দেখায়।

এই ঘরে বিয়ে হয়। বর এসেছে বলে ঠেলাঠেলি পড়ে যায় না, শাঁখ না, উলু না, কিংবা নেই রোমাঞ্চকর চোখে-চোখে শুভদৃষ্টি। তবু বিয়ে হয়। হয়ে যায়। এই ধুলোটে জায়গায়। আধো অন্ধকার কৃত্রিম গোধুলিতে। চোরের মতন। 'রেজিষ্ট্রিই ভাল'—চিরকাল এই কথা বলে এসেছে ললিত। তবু এখন তার মন সায় দেয় না। একটু আগে শাশ্বতী বসে ছিল এই ঘরে। কেঁদেছিল। হায়, তার কড়ি খেলা হল না, আর একজন কুড়িয়ে দেবে বলে সে মাদুরের ওপর ঘট উপুড় করে ছড়িয়ে দিল না চাল, তাকে সম্প্রদান করল না কেউ, সে নিজে হেঁটে এল। এই ঘরে বড় বেমানান লাগছিল শাশ্বতীকে। যশোরে কপোতাক্ষতীরে ওর দেশ। কলকাতায় জন্মেছিল শাশ্বতী? হবেও বা। তবু বাংলার গভীর হৃদয়ে লুকোনো ছিল ওর মায়াবী গ্রাম, মধুসূদনের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। যশোরের কপোতাক্ষতীরে।

সে কেন আসবে—এখানে রুগি দেখা ঘরে, লজ্জাহীনার মতো সে কেন বলবে, 'আমরা বিয়ে করতে এসেছি। বিয়ে দাও!' বাংলাদেশে কে কবে শুনেছে এই কথা? 'বিয়ে করলাম।' এই কথা বলে রেস্তরাঁয় খেয়ে

বিছানায় চলে যায় বর-বউ? কোনজন শুনি না হাসিবে এই কথা? এখানে হয় না বিয়ে, কিছুতেই হয় না। পালাও শাশ্বতী, আমি একদিন সুন্দর বিয়ে দেব তোমার। ওই কি সাজ? হাতে কলেজ-ফেরত বইখাতা, পরনে সুতির শাড়ি, পায়ে চপ্পল? তমি, কপালে সিঁথিমৌর, হাতে গাছকৌটো নিয়ে সেজে এসো। অনেক দূর থেকে নৌকোয় কারে আসবে তোমার বর। কপোতাক্ষ বেয়ে, গভীর বাংলাদেশে মায়াবী এক গ্রাম জুড়ে বেজে উঠবে শাঁখ, উলুধ্বনি। কড়ি খেলার শব্দ হবে।

লক্ষ্মীকান্ত, আবার ঘুরে আসে, দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, নাঃ।

দেয়ালের গোল ঘড়িটায় পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিট।

ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের চশমা ঝিকিমিকিয়ে ওঠে, সে কী? সব জায়গায় দেখেছিলে? কাছাকাছি রেস্তরাঁয়? পার্কে?

সব। লক্ষ্মীকান্ত হাঁফায়।

সঞ্জয় আদিত্যের কাঁধে হাত রেখে বলে, জেগে থাক।

আদিত্য মুখের ওপর থেকে মুখটাকা হাত সরিয়ে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে একটু চেয়ে রইল সঞ্জয়ের দিকে। তারপর চার দিকে তাকিয়ে কাকে খুঁজল। আবার সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

ওর বোকা মুখখানার দিকে চেয়ে লোভ সামলাতে পারল না সঞ্জয়, বলল, ঘুমোচ্ছিলি? ঘুমোস না। ঘুমোলে সে এসে যদি ফিরে যায়? জেগে থাক রে, আশা রাখ।

খানিকক্ষণ সঞ্জয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ ঠাট্টাটা ধরতে পারল আদিত্য। মুহূর্তে লাল, ভীষণ লাল হয়ে যায় আদিত্যর মুখ। চাপা গলায় সে বলল, ওই শালা—ওই ললিতের সব দোষ—আমার প্রেস্টিজ—আমার প্রেস্টিজ—

ললিত অবাক চোখে দেখছিল, আদিত্যর এলোমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছে, রোগা ফরসা শরীরে তামার রঙের মতো একটা আভা। তার দিকে চেয়ে কী যেন বলছে আদিত্য! তারপরই লাফিয়ে এগিয়ে এল।

আদিত্যকে এগিয়ে আসতে দেখেও কিছুই ভাল করে বুঝতে পারছিল না ললিত। সে হয়তো তখন খুব তুচ্ছ কোনও কিছু ভাবছিল। তাই সে নিজের গালে আদিত্যর লম্বা আঙুলের চড় মারার চটাস শব্দটা শুনতেই পেল না। নরম সোফার ওপর তার দুর্বল শরীরটা একবার দুলে উঠেই গড়িয়ে পড়ল।

সঞ্জয় দৌড়ে এসে আদিত্যকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, কী হচ্ছে? আদিত্য ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর আচমকা হাঁটু ভেঙে বুকের কাছে পা তুলে সঞ্জয়ের তলপেটে একটা লাথি মারল সে। সঞ্জয় 'আঃক' শব্দ করে দু' ভাঁজ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

লক্ষ্মীকান্ত আদিত্যর হাত ধরে টেনে বলে, কী করেন দাদা, কী করেন? এঃ হেঃ—

উদ্ভ্রান্তের মতো দাঁড়ায় আদিত্য। খ্যাপা চোখে চারদিকে চায়। হাওয়ায় উড়ছে ওর রুক্ষ চুল। গায়ের ফরসা রং তামার রঙের মতো হয়ে গেছে।

তারপর কোনও দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে যায়। কেউ ওকে আটকায় না।

বুড়ো ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের চশমা থেকে আলো ঠিকরে পড়ে, কী হচ্ছে এ-সব—অ্যাঁ? কী হচ্ছে, লক্ষ্মীকান্ত?

লক্ষ্মীকান্ত ললিতকে ধরে বসায়, খুব লেগেছে, দাদা?

না। ললিত মাথা নাড়ে। উঠে বসে। কষ্টে একটু হাসে ললিত, আমি ঠিক আছি লক্ষ্মীকান্ত।

শরীরে কয়েক বার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠবার চেষ্টা করে, তারপর আস্তে আস্তে দাঁড়ায় সঞ্জয়। কুঁজো হয়ে পেটটা চেপে ধরে ব্যথা-বেদনার 'ইঃ' শব্দ করে। তারপর সোফায় বসে একটু হাঁফায়।

আশেপাশে অনেক কুঠুরি-অফিস রয়েছে। সেসব জায়গা থেকে ছুটে এসেছিল কিছু লোক। তারা উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে, জিজ্ঞেস করছে, 'কী হয়েছে দাদা,' 'কী ব্যাপার দাদা।' তাদের ছায়ার মতো দেখতে পায় ললিত। লক্ষ্মীকান্ত তাদের ঘরের বাইরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টায় দু' হাত ছড়িয়ে বলছে, 'কিছু না, কিছু না, মানুষে মানুষে কত রকমের হয়। আপনারা বাইরে চলুন, হাওয়ার রাস্তা দিন।' এর মধ্যে কোনও মেয়েকে না দেখে হতাশ হয়ে কালো বেঁটে একটা লোক চেঁচিয়ে বলল, 'বিষহরীটি কোথায়—অ্যাঁ? কাকে নিয়ে গড়াচ্ছে এত দূর? না কি কেবল পুরুষে পুরুষে!'

ললিত চারদিকে দেখে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে। সঞ্জয়ের মুখ লাল, কিন্তু সে ললিতের চোখে চোখে পড়তেই ক্লিষ্ট একটু হাসে। মাথা নেড়ে জানায় যে, সে ঠিক আছে। কিছু হয়নি।

কিছু হয়নি। খুব সাঙ্ঘাতিক কিছুই না! সব ঠিক আছে।

কিছুক্ষণ পর তারা সরু কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছিল। সামনে রেলিঙে হাতের ভর রেখে পেট চেপে কুঁজো হয়ে সঞ্জয়, পিছনে লক্ষ্মীকান্তর কাঁধে শরীরের ভার ছেড়ে ললিত।

সঞ্জয়ের গাড়িতে ললিত সামনের সিটে, সঞ্জয় পাশে বসল। পিছনে লক্ষ্মীকান্ত। সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা ললিতের দিকে বাড়িয়ে দেয় সঞ্জয়। ললিত মাথা তে বলে, থাক।

স্টিয়ারিঙে হাত রেখে একটু ইতস্তত করল সঞ্জয়। তারপর ললিতের দিকে বিব্রত চোখে তাকিয়ে একটু হাসল। কোনও প্রশ্ন করল না সঞ্জয়, কিন্তু ললিত বুঝতে পারে এবার সে ললিতের কাছ থেকে কিছু জানতে চাইছে। কেন এ-রকম হল! কী ব্যাপার!

বুক দুরদুর করে ওঠে ললিতের। সঠিক সেও তো জানে না কী ব্যাপার। জিজ্ঞেস করলে সে কী উত্তর দেবে ওদের?

কিন্তু সঞ্জয় ইচ্ছে করেই কিছু জিজ্ঞেস করল না। হয়তো ললিতের অসহায় মুখখানা দেখে তার মায়া হল একটু। হয়তো সে কিছু একটা আন্দাজ করে নিল। প্রশ্ন করল না। মাথার ওপরের ছোট্ট আয়নাটা ঘুরিয়ে সে নিজের মুখটা একটু দেখল। আপনমনে বলল, শালার এখনও মায়া দয়া আছে, বুঝলি! লাথিটা জোরে মারলে এতক্ষণে আমি হাসপাতালে, কিংবা লাথিটা তলপেটে না হয়ে আর-একটু নীচে লাগলে—মাইরি—

কথাটা শেষ করল না সে। গিয়ার দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

ওয়েলেসলি দিয়ে বিকেলের ভিড় ঠেলে ধীরে ধীরে যাচ্ছে সঞ্জয়ের গাড়ি। মন্থর ট্রামের জানালায় উদাসী মানুষদের বিষন্ন মুখ। ধুলোময়লা মাখা কলকাতার রাস্তায় হাঁটছে জীর্ণ মানুষেরা, মুখে রাগ, বিরক্তি, হতাশা, থুথু ফেলে চলে যাচ্ছে, সিনেমা হলের সামনে সঙ্গিনীর জন্য অপেক্ষা করছে একটি ছেলে, তার হাঁটুর কাছে মুখ তুলে একটা বাচ্চা ভিখিরির ছেলে, সে লক্ষ করছে না, ট্রাফিকের পুলিশ হাত বাড়িয়ে কার অদৃশ্য চুলের মুঠি ধরল, হঠাৎ থেমে দুলতে থাকে গাড়ি—

সঞ্জয় তার দিকে তাকিয়ে বলে, শরীর কেমন?

ললিত মাথা নাড়ে, ভাল। বেশ ভাল।

শালা বেজন্মা মেরে গেল। ধরতে পারলে শালাকে...

ললিত চুপ করে থাকে। দুরদুর করে বুক, পাখির মতো।

কিন্তু সঞ্জয় কথা ঘুরিয়ে নিল। চাপা গলায় বলল, অনেক দিন মারধর খাইনি, বুঝলি? পেটে চর্বি জমে গেছে, লাথিটা লাগতেই দম আটকে গেল। মনে হল, মরে যাচ্ছি। আসলে বয়স—বুঝলি! এই বয়সে চোট-ফোট লাগলে ভড়কে যাই...

সরে যাচ্ছে ট্রাফিক-পুলিশের হাত। গিয়ার বদলের শব্দ হয়। সঞ্জয় হাসে, বলে, লাথিটা লেগে দম আটকে যেতেই মনটা হায় হায় করে উঠল। কত কিছু বাকি রয়ে গেল জীবনে, কত রকমভাবে বাঁচা যেত! তখন আমি তাড়াতাড়ি ভেবে দেখছিলাম কোন কাজটা সবচেয়ে জরুরি যেটা আমি বাকি রেখে যাচ্ছি! হঠাৎ মাইরি আমার ভেতর থেকে একটা চ্যাঁচানি বেরিয়ে আসছিল, চার হাজার টাকা—চার হাজার টাকার চেকটা কোথায় গেল!

ললিত অবাক হয়ে বলে, কীসের চার হাজার টাকা?

সঞ্জয় চাপা গলায় বলে, তখন কি আমিই জানি কীসের চার হাজার টাকা! কিন্তু মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে আমি কেবল ওই চার হাজার টাকার কথা ভাবছি। তখন আমার পিকলুর মুখ মনে পড়েনি, রিনির কথাও না, কেবল ওই চার হাজার টাকার কথা। অথচ বুঝতে পারছি না কীসের টাকা। তারপর আস্তে আস্তে মনে পড়ে গেল। ...কী হয়েছিল জানিস?

হঠাৎ গলা খুব নিচু করে সঞ্জয়, প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমার যে ছোট্ট কোম্পানিটা আছে তার একটা বকেয়া পেমেন্টের জন্য পরশুদিন দাদার হাতে একটা চার হাজারি বেয়ারার চেক দিয়েছিলাম। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের চেক, দাদার আর আমার সই থাকে। আজ বেলা এগারোটা নাগাদ ফোন করে দাদা জানাল যে, পরশুদিন চেকটা দাদার পকেটমার হয়ে গেছে। বুকপকেটে রেখেছিল টের পায়নি। আজ ব্যাঙ্ক খোলার ঘন্টাখানেক পরে টের পেয়ে ছুটে গিয়েছিল ব্যাঙ্কে, কিন্তু চেকটা ক্যাশ হয়ে গেছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই। শুনে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে ফোন করলাম। এজেন্ট আমার চেনা লোক, তক্ষুনি ক্যাশ থেকে লোক ডেকে পাঠাল। আমি তাকে চেক-এর নম্বর দিয়ে বললাম যে, যে-লোকটা আজ চেকটা ক্যাশ করেছে তার চেহারাটা মনে আছে কি না। লোকটা স্পষ্ট কিছু বলতে পারল না, কিন্তু আবছাভাবে যা বলল তাতে চেহারাটা একজনের সঙ্গে মিলে যায়। যদি সেই লোকটাই চেক ক্যাশ করে থাকে তবে এটা নিশ্চিত যে, চেকটা দাদার পকেটমার হয়নি—বুঝলি! তা ছাড়া দাদা আবার সব জিনিসই তার মানিব্যাগে রাখে, এমনকী দেশলাইটা পর্যন্ত, তবে চেকটা বুকপকেটে রাখতে গেল কেন? তাই সারা দিন আমি মনে মনে চেকটা ট্রেস করার চেষ্টা করছিলাম, কোথা থেকে কীভাবে কার মারফত গিয়েছিল চেকটা, কীভাবে ধরা যাবে ব্যাপারটা। আর, যখন হঠাৎ আদিত্যর লাথি খেয়ে মরে যাচ্ছি তখন আমার সমস্ত মনপ্রাণ ওই চেকটার জন্য কেঁদে উঠল। কিন্তু বিশ্বাস কর, টাকাটার জন্য নয়, আমার মাসের রোজগার ওর চেয়েও বেশি। কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে চার চারটে হাজার টাকা আমার ঠকা রয়ে গেল, জিত হল না। আমার হাতের নাগালের বাইরে রয়ে গেল একটা অঙ্ক, যার উত্তরটা আমি মনে মনে মিলিয়ে ফেলেছি, অথচ পরীক্ষার শেষ ঘন্টা পড়ে গেল, খাতা টেনে নিচ্ছে গার্ড। চেঁচিয়ে বলছি, আর-একটু সময় দাও, আর-একটু, এই চার হাজার টাকার চেকটা ট্রেস করেই আমি চলে যাব—আর কিছু না—। মাইরি, এখন হাসি পাচ্ছে—শালা, অন্তিম মুহূর্ত এসে গেল, পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি, অথচ

কোনও ভালবাসার মানুষের কথা মনে পড়ল না? ওই চেকটার মধ্যে এমন কী রস ছিল যে, পিকলুর কথা, রিনির কথা মনে পড়ল না?

পার্ক স্ট্রিটে গাড়ি ঘুরিয়ে থামিয়ে ফেলেছিল সঞ্জয়। বলল, নামবি? একটু সেলিব্রেট করে যাই চল।

কীসের সেলিব্রেট?

আদিত্যর লাথিটার।

ললিত ম্লান হেসে মাথা নাড়ে, না। আমার ও-সব বারণ।

ঠিক তো! ভুলে গিয়েছিলাম। বলে জিভে আফসোসের চুক চুক শব্দ করে সঞ্জয়। গাড়ি ছেড়ে বলে, তা হলে চল তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আজ একটু লোড করতেই হবে। বডি পড়ে যাচ্ছে মাইরি!

বাসায় এসে ললিত শুনল তুলসী এসে ফিরে গেছে।

ওকে ধরে রাখলে না কেন মা?

অনেকক্ষণ বসে ছিল তো। সিনেমার টিকিট কাটা ছিল বলে চলে গেল। খুব খুশি ছিল আজ, বলল কোথাকার ফুটবল খেলায় ও গোল দিয়েছে।

গোল! কীসের গোল?

কী জানি।

তলপেটটা ফুলে ঢিবি হয়ে আছে। ভারী। যেন ন' মাসের বাচ্চা রয়েছে পেটে। দাঁতে দাঁতে টিপে হাসল সঞ্জয়।

লক্ষ্মীকান্তকে ছেড়ে দিল রাসবিহারীর মোড়ে।

গাড়ির স্টিয়ারিং ধরা এক হাতে, অন্য হাতে আবার ছোট আয়নাটা ঘুরিয়ে মুখ দেখে সঞ্জয়, বলে, কী মিস্টার সেন, খুব এক পেট হয়ে গেল তো? বুড়ো বয়সের চোট হে, সারতে সময় লাগবে। চাই কি প্রোস্টেস্ট গ্র্যান্ড পর্যন্ত গড়াতে পারে। সুখে নেই হে তুমি, যতই গাড়ি বাড়ি বউ ছেলে আগলাও, কোথা থেকে যে সংসারের লাথিটা আসবে, টেরই পারে না।

দাঁত চেপে হাসে সঞ্জয়। গাড়ি চালায়। পার্ক স্ট্রিটের দিকে।

সামান্য মাতাল হয়ে ফেরার পথে একজায়গায় গড়িয়াহাটার কাছে অন্ধকারে গাড়ি দাঁড় করায় সঞ্জয়। সিগারেট ধরায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তার ভালবাসার লোকজন বোধ হয় খুব কমই আছে পৃথিবীতে। যখন সে ভাবছিল এই তার শেষ মুহূর্ত—মরে যাচ্ছে সে—তখন তার রিনি কিংবা পিকলুর কথা মনে পড়তে পারত—কিংবা অনীতা—তার অন্ধ বোনটার কথা—হাতড়ে হাতড়ে কাছে এসে চুপ করে পাশ ঘেঁষে বসে থাকে—কিংবা মা—কিংবা যে-কেউ—কিন্তু মনে পড়েনি। কেবল একটা চার হাজারি চেকের কথা মনে পড়েছিল। আশ্চর্য। তবে পৃথিবীতে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কী? অ্যাঁ? কী? সেটা কি টাকা? একটু শিউরে উঠে মৃদু হাসে সঞ্জয়। ঠিক আছে। তবে তাই হোক। আমেন।

রোজই ভুল হয়ে যায়। এখনও কেনা হয়নি রিনির রোজি ড্রিম আর পিকলুর বিলিতি ফিডার। আজ কিনে নিল সঞ্জয় গড়িয়াহাটার প্রকাণ্ড দোকান থেকে।

বাসায় ফিরে দেখল বাইরের ঘরে গম্ভীর মুখে দাদা অজয় বসে আছে। সামনের টেবিলে খালি চায়ের কাপ, আর কাগজ-চাপার তলায় একটা নতুন চেক।

কী ব্যাপার!

অপরাধী মুখে দাদা বলে, এটা সই করে দে। পেমেন্টটা আটকে আছে।

এই লোকটা—অজয়—তার দাদা এক সময়ে ব্যাঙ্কের পিয়ন ছিল, খাকি পোশাক পরা লোকটা সাহেবদের সেলাম দিয়েছে অনেক। অনেক দিন আগে এ-লোকটাই তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল প্রায় অকারণে। সেই থেকে দরিদ্র সঞ্জয় আলাদা হয়ে গেল, এখনও আলাদা রয়েছে তাদের পরিবার। এখন লোকটার চোখে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের চকচকে চশমা, গায়ে নীল টেরিলিন, গাল কামানো, মাথায় অভিজাত গোলাপি রঙের টাক। তবু ব্যাঙ্কের পিয়ন ছিল, আর তাকে একবার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল বলে অজয়কে খাতির করে না সঞ্জয়, তার সামনেই সিগারেট খায়, মদের গন্ধ লুকোতে চেষ্টা করে না।

সঞ্জয় উত্তর দিল না। ধীরেসুস্থে জামা প্যান্ট ছেড়ে বাথরুম ঘুরে ডাইনিং টেবিলে এসে চায়ের সামনে বসল। অনেকটা সময় নিল সে।

তারপর বাইরের ঘরে এসে দেখল অজয় স্থিরভাবে বসে আছে। তাকে দেখে একটু নড়ল।

নিঃশব্দে চেকটা সই করে দিল সঞ্জয়।

একবার ইচ্ছে হল বলে যে, যে-লোকটা চেক ভাঙিয়েছিল তাকে চিনতে পেরেছে ব্যাঙ্কের ক্যাশ-ক্লার্ক। শুনে অজয় চমকে উঠে সাদা মুখে তাকাবে। কিংবা সঞ্জয় ইচ্ছে করলে বলতে পারে, উত্তরপাড়ায় বউদির নামে জমি কিনেছ, আমি কি জানি না?

জানে। সঞ্জয় সব জানে। অজয় বড় বোকার মতো ঠকিয়েছে তাকে। এত বোকার মতো যে হাসি পায়। ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয় না। অজয়কে নিরাপদে চলে যেতে দেয় সে।

তলপেট ভারী হয়ে আছে। কত দূর গড়াবে কে জানে। একদিন আমি সব ছেড়েছুড়ে দেব। বুঝলে রিনি। সব ছেড়েছুড়ে—তারপর সাধু হয়ে যাব রমেনের মতো। না, রমেনের মতো নয়। রমেন সবকিছুর মাঝখান থেকে হঠাৎ খেলা ভেঙে উঠে গিয়েছিল। আমি তত দূর পারব না। আগে কোম্পানিটা ট্রান্সফার করব অনীতার নামে—আহা, অন্ধ বোনটি—টাকা ছাড়া কে আর ওকে পথ দেখাবে? তোমার আর পিকলুর জন্য ব্যাঙ্কে রাখব কয়েক লাখ টাকা। তারপর—হ্যাঁ, তারপর সাধু হয়ে যাওয়া যায়। তারপর সাধু হওয়া শক্ত নয়।

উনিশ

সঞ্জয় যেদিন জোর করে মদ খাইয়ে দিয়েছিল তাকে, আর সে মাতাল হয়ে রাতে বাসায় ফিরেছিল, তার পরদিন সকালবেলায় ভিতরের বারান্দার এক কোণে দাড়ি কাটার সরঞ্জাম নিয়ে বসে ছিল তুলসী। রান্নার জায়গায় মৃদুলা কৌটো-টৌটো খুলে কী খুঁজছে। তুলসী সন্তর্পণে আয়নাটা একটু ঘুরিয়ে তার ভিতর দিয়ে মৃদুলার দিকে চেয়ে থাকে। কালোজিরে কিংবা সর্ষে খুঁজতে খুঁজতে মৃদুলা একবার হঠাৎ মুখ তুলে তাকায়। আয়নার ভিতর দিয়ে চোখাচোখি হতে মৃদুলা টপ করে চোখ নামিয়ে যে পাতকুয়ার মধ্যে ঝুঁকে পড়ল।

সকাল থেকেই কেউ কথা বলছে না তার সঙ্গে, মৃদুলাও না। বাড়িটা থমথম করছে। অথচ বারান্দায় রান্নার জায়গায় বউদি, ঘর জুড়ে দাদা আর খবরের কাগজ, সব যথারীতি, রোজকার মতোই।

পাশ দিয়েই বউদি বাথরুমে যাচ্ছে, তুলসী তাড়াতাড়ি আয়নার ওপর ঝুঁকে পড়ে।

বারান্দায় যখন বউদি নেই ঠিক সেই সময়েই মৃদুলা চা দিতে এল। তুলসী মৃদুলার একটা হাত খপ করে চেপে ধরে বলে, কাল রাতে কী হয়েছিল বলো।

ছাড়ো। জানি না।

পায়ে পড়ি, বলো।

ছিঃ, তুমি গুরুজন না!

আমি পাষণ্ড, ওই সঞ্জয় হারামজাদার দোষ। কী করেছি বলো।

অনেক কিছু। মাতালরা যা যা করে। আমাকে শিসও দিয়েছ।

মাইরি?

আজ সকালে দাদা বলেছে তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া উচিত, নইলে ছেলেমেয়েগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।

আমি চলে যাব।

কোথায়?

কোথাও। বাসা খুঁজছি।

একটু চুপ করে থাকে তুলসী। তারপর বলে, একদিন একটু খেলে কী হয়! সঞ্জয়রা তো রোজ খায়।

তুমি কি সঞ্জয়?

উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে না মৃদুলা, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

তুলসী দেখে আয়না থেকে বুড়োটে মুখটা চোর-চোখে চেয়ে আছে। হিসেব করলে এই শেষ ভাদ্রে তার মধ্যযৌবন। বয়স তেত্রিশ। কিন্তু বাস্তবিক মধ্যযৌবন বলে কিছু টের পায় না তুলসী। নিজের এই মুখখানা সে গতকাল, পরশু কিংবা দশ-পনেরো বছর আগে যে-রকম দেখেছিল, অবিকল সে-রকম দেখছে। আরও দশ বছর পরেও বোধ হয় একই রকম দেখাবে। এই হচ্ছে তুলসী—তুলসীচন্দন—কেবলমাত্র তুলসী হয়ে ওঠা

ছাড়া এর আর কোনও গতি নেই। না, সে সঞ্জয় নয়। তবু 'তুমি কি সঞ্জয়?' এ-প্রশ্নটা সারা দিন তার বুকে লেগে রইল।

আবার ঘুরে-ফিরে সুযোগ বুঝে কাছে এল মৃদুলা। ফিসফিস করে বলল, তুমি বরং পলাশপুরেই বাসা নাও।

দূর, ওখানে যা সাপ! কালকেই ক'জনকে কামড়েছে।

লোকে তো আছে!

দূর। সব হিংসুক—বোকা। আর কয়েক দিন দেখো না, কলকাতাতেই একটা কিছু—

মৃদুলা চলে যাচ্ছিল। তুলসী তার হাত টেনে বলে, কাল কোথায় গিয়েছিলাম জানো? গ্র্যান্ড!

হাসে তুলসী। আবার বলে, গ্র্যান্ড!

আবার উত্তেজনাহীনভাবে দিন কেটে যায়। কিছুই ঘটে না।

স্কুলে এসে একদিন তুলসী শুনল আজ খেলা আছে। জবর খেলা। টিচার্স ভারসাস স্টুডেন্টস। টিফিনের মধ্যেই টিম তৈরি হয়ে গেল। শিক্ষকদের ক্যাপ্টেন হরি চক্রবর্তী, এক সময়ে কলকাতায় সেকেন্ড ডিভিশনে কয়েকদিন খেলেছেন, বললেন, তুলসী, তুমি রোগা-টোগা আছ, ছুটতে পারবে—তুমি রাইট আউট। গতবারও রাইট আউট ছিল তুলসী, হাফটাইমের পর লাইনের ধারে নেতিয়ে বসে হাঁফিয়ে যাচ্ছিল। তবু ঠিক আছে। পাঞ্জাবিটা খুলে ধুতিতে মালকোঁচা মেরে গেঞ্জি গায়ে রাইট আউটেই দাঁড়িয়ে গেল সে।

ইচ্ছে করেই ছেলেরা আজ বুট পরে নামেনি। তবু তাদের খালি পাগুলোই লোহার মতো শক্ত। লাল-হলুদ জারসি তাদের গায়ে। যেখানেই যাচ্ছে বল সেখানেই লাল-হলুদের পা। ওদের গোলকিপার হাফিজ, ইলেভেন সায়েন্সের। তার গায়ে হলুদ গেঞ্জি, হাতে বল-ধরা দস্তানা, কপালে নামানো টুপির ঢাকনি, এ-তল্লাটের নাম-করা গোলকিপার। জলে শোল মাছ যেমন নড়ে-চড়ে তেমনি শূন্যে বাতাসের মধ্যে চলে যায় হাফিজ, পিংপং বলের মতো মাটিতে পড়ে লাফায়। হরি চক্রবর্তীর দুটো শট তুলে নিল মা যেমন শোয়ানো শিশুকে তুলে নেয়।

হাফ টাইম পর্যন্ত গোল-লেস।

এতক্ষণ মাঠে কোথাও ছিল না তুলসী। লাইন ধরে সে মাঝে মাঝে এগিয়ে গেছে, পিছিয়ে এসেছে আবার। তার দিকে বাড়ানো পাসগুলি তার কাছে পৌঁছয়নি, চলে গেছে লালহলুদের পায়ে। ওরাই তো সারা বছর খেলে, তাই বলটা ওদের পোষ-মানা, পোষা কুকুরের মতো লজ্জাহীন পায়ে পায়ে ছুটছে। সারা মাঠময় লাল-হলুদ, লাল-হলুদ ঝলকে যাচ্ছে দুপুরের রোদে। ডাঁটো শরীরের ঘাম ঠিকরে দিচ্ছে দুপুরের আলো। হরি চক্রবর্তী চেঁচিয়ে বলে, লাইনের বড় ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে তুলসী, কে এসো—পাস পায়ে যাবে না, ঢুকে এসে বল তৈরি করে নাও। তুলসী দেখে কখনও সবুজ ঘাসে, কখনও নীল আকাশের গায়ে সাদা বলখানা। খুব দুরে দুষ্পাপ্য বস্তুর মতো মনে হয়। তুলসী চেষ্টা করে না।

হাফটাইমে ভরপেট কোকোকোলা। তার শরীর হিস হিস করে। আরও ঝিমিয়ে পড়ে তুলসী। শরীরটা জুতের নেই। সেদিনের হুইস্কির ঝোঁক এখনও যেন একটা ঝিমুনির মতো রয়ে গেছে। গতকাল কত দূর মাতলামি করেছিল সে? সে কি শিস দিয়েছিল? আশ্চর্য! মৃদুলাকে শিস দেওয়ার কী আছে! শিস দিত সঞ্জয়, যেখানে মেয়েছেলে দেখত, সেখানেই দুটো আঙুল গোল করে মুখে পুরে দিত, চুঁ-হিঁ-হিঁ করে বেজে উঠত

আশ্চর্য শিস। তুলসী শিখেছিল, কিন্তু কোনও দিন দেয়নি। কারণ সে তো সঞ্জয় নয়! ...তার পা ছুঁয়ে চলে গেল বলটা ধীরে ধীরে লাইনের ও-পারে। থ্রো-ইন। কী খেলছে! সোজা বল— ধরতে পারলে না! তুলসী লজ্জা পায়। লোকটা বড় সিরিয়াস। ছাত্রদের সঙ্গে খেলা, তবু জান লড়িয়ে দাও। কে না জানে একটা না একটা সময়ে ওরা ঠিক গোল ছেড়ে দেবে! শিক্ষকরা জিতলে কাল ছুটি। ওরা জানে।

ওপর থেকে নেমে আসছে সাদা বলটা। তাকে লক্ষ করে। সুন্দর দেখায় বলটাকে। তুলসী অলসভাবে দেখে। বলটার পিছনে নীল আকাশ, নৌকোর পালের মতো মেঘ।

সে কে ধরবে ওই বলটা? কী স্বার্থ তার? সে তো সঞ্জয় নয়, যে অধ্যবসায়ী সঞ্জয় বউয়ের জন্য গোলাপি স্বপ্ন কিনে নিয়ে যায়, ছেলের জন্য কেনে বিলিতি ফিডার, বিকেলের অবসরে গ্রাউন্ডে গিয়ে বসে থাকে! কিংবা সে নয় ললিত, যে ললিত হাসপাতালের বিছানায় শোয়া—সাদা রোগা মুখখানায় নীল শিরা জেগে আছে, হাতের নলীতে ঢোকানো গ্লুকোজের ছুঁচ— জানে মরে যাবে, তবু ঠাট্টা করছে, তোর মুখটা গম্ভীর কেন রে তুলসী? তোর ভাবী বউটা কি কুচ্ছিত? মরবে তবু কেমন শান্ত! কিংবা সে নয় রমেন, যে রমেন গাড়ি চালাত, পিয়ানো বাজিয়ে গাইত পূর্ব বাংলার মাঝিদের গান, কিংবা রিলে রেসের শেষ ল্যাপ—এ ব্যাটনের জন্য হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কী সুন্দর সেইসব ভঙ্গি রমেনের! সে তুলসীই, আর কেউ নয়। সে একফি হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে ভরসন্ধেবেলা তার কাঁদুনে ছেলেকে 'ও-ও' করে ঘুম পাড়াবে, বাজারে গিয়ে পাশের লোকজনকে লক্ষ করে বলবে, এই বাজারে বাঁচা যায় না, বললেন, বাঁচা যায় না। তারপর একদিন পৃথিবীর বিশাল তার তাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে। তবে সে কেক ধরবে এই বলটা? কী স্বার্থ তার? আশ্চর্য অভিমানে তুলসী চেয়ে থাকে।

ঝলকে ওঠে লাল-হলুদ। সুঠাম চেহারার রঞ্জিত হাঁটুতে বলটা আটকে নেয়। তুলসী দেখে। এম-কম জগত্তারণ বলটা প্রাণপণে বুক দিয়ে আটকায়।

আশ্চর্য এই, বলটা তার কাছেই গড়িয়ে আসে। ধীরে ধীরে, বিনীতভাবে। অপরাধী ছাত্রের মতো এসে সামনে দাঁড়ায়। মাথা নিচু করে।

কী সংবাদ ভগ্নদূত?

তুলসী ছোটে। খুব জোরে নয়। তার পায়ে বল। লাইনের বাইরে থেকে ছেলেরা চেঁচায় স্যার, ম্যান বিহাইন্ড, ম্যান বিহাইন্ড—

এইভাবেই ছুটত রমেন, ইন-আউট ইন-আউট করতে করতে। কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে চলে যেত, তারপর হঠাৎ ঘুরে গুপ করে সেন্টার করত বল। কিংবা চিতাবাঘের মতো ডজ করতে করতে ঢুকে আসত।

সামনেই উড়ছে ছোট্ট লাল নিশান। কর্নার ফ্ল্যাগ। অনেক দূর চলে এসেছে তুলসী। এখনও তার পায়ে বল। কী করবে তা সে বুঝতে পারে না। এ অবস্থায় রমেন হলে কী করত? কালো বেঁটে বোটবেগুনের মতো চেহারা গোপীকান্ত ছুটে আসছে। তার গায়ে আগুনের মতো জ্বলছে লাল-হলুদ জারসি। ফার্স্ট ব্রাকেটের মতো বাঁকা পা দু'খানা। এত বাঁকা যে, পা জোড়া করে রাখলেও বোধ হয় মাঝখান দিয়ে বল গলে যায়।

সেই চেষ্টাই করল তুলসী। গোপীকান্তর দু' পায়ের ভিতর দিয়ে বলটা গলিয়ে দেবার। হল না। বল ধরে উড়িয়ে দিল গোপীকান্ত। হঠাৎ নিঃস্ব মনে হয় নিজেকে।

কিন্তু এ কেমন যে, সে চিরকাল সেই তুলসী? আজন্ম? আমৃত্যু?

গোল দেওয়ার জন্য সেন্টার লাইনের ও-পাশে চলে গেছে সব লাল-হলুদ খেলোয়াড়। বুড়ো মাস্টারদের নাচিয়ে পায়ে পায়ে টোকা দিচ্ছে বল। গোলের সামনে গিয়েও ফিরে আসছে। এ-পাশে ফাঁকা সবুজ মাঠ, সামনে কেবল পায়চারি করছে একজন ব্যাক। এ-তল্লাটের সেরা গোলকিপার হাফিজ পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, বংশীবাদক কৃষ্ণের মতো পা দু'খানা ক্রস করা, দাঁতে ঘাসের ডাঁটি চিবোয়।

হঠাৎ শূন্যপথে উড়ে আসে বল। ফাঁকা মাঠে।

ঝামেলা! তুলসী অলসভাবে এগোয়। লাল-হলুদ ব্যাক ক্লাস এইট-এর পীযূষ এগিয়ে আসে। হাফিজ ভঙ্গি বদলায়।

ফাঁকা মাঠ। উঠে আসে বল। আশ্চর্য, কাছে এসে প্রণামের মতো মাথা নিচু করে দেয় বলটা। বশংবদের মতো পায়ে পড়ে থেমে যায়। সামনে একা পীযূষ। তার লোহার ডাণ্ডের মতো পা। তুলসী ঘুরে তাকে কাটানোর অক্ষম চেষ্টা করে। পায়ে পা লেগে খটাং শব্দ হয়। তুলসী পড়ে গিয়ে ফের ওঠে। পীযূষ তখনও মাটিতে, উঠছে। বলটা তার পায়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে তুলসীর কাছে চলে আসছে, শিশু যেমন অচেনা লোকের কোল ছেড়ে বাপের কাছে ছুটে আসে।

তুলসীর পায়ে বল টেনে নেয়। ছোটে।

লাইনের বাইরে থেকে ছেলেরা চেচায়, ফাস্ট টাইম স্যার, ফাস্ট টাইম—!

তুলসী দৌড়ায়। আদি অন্তহীন ফাঁকা মাঠ। কেউ নেই। কিন্তু বুকে খিঁচ ধরে ওঠে একটা ব্যথায়। তুলসী হাঁফিয়ে পড়ে। মার-মার করে ছুটে আসছে পায়ের শব্দ, হাতি-ছোটার শব্দের মতো। ম্যান বিহাইন্ড!...সে কেন নয় রমেনের মতো কুশলী? সে নয় অধ্যবসায়ী সঞ্জয়, কিংবা আত্মবিশ্বাসী ললিত। সে তুলসী, কেন সে কেবল তুলসী?

ডান ধার থেকে তুলসী ঢুকতে থাকে। এক দুই করে লাল-হলুদ জার্সি এগিয়ে আসে। তুলসী বল নিয়ে ঘুরে যায়, মানুষের অলিগলি দিয়ে ছুটতে থাকে বুকে খিঁচ-ধরা ব্যথা। সে হাঁফায়। বল তার পায়ে বশংবদ লেগে আছে, গড়িয়ে যাচ্ছে।

ফার্স্ট টাইম স্যার—গোলে মারুন!

কিন্তু কোন দিকে গোল-পোস্ট ও তুলসী উদ্ভ্রান্তের মতো তাকায়। কোন দিকে গোলপোস্ট?... ওই তো তিন, বাঁশের গোলপোস্ট, বার বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে। ডান দিকে। একা হাফিজ।

বাঁ পা থেকে ডান পায়ে বল টেনে নেয় তুলসী। হঠাৎ ডান দিকে বেঁকে ছুটে যায়। সে কেন তুলসী? সে কেন চিরকাল সেই তুলসী?

লাল-হলুদ একজন, সামনে এসে ভুঁইফোঁড় দাঁড়িয়ে যায়। পা থেকে খসে যায় বল। লাল-হলুদের পায়ে চলে যায়। ছেলেটা মৃদু হাসে, মন্থর পায়ে এগোয়।...এ-অবস্থায় রমেন হলে কী করতঃ তুলসী ভেবে পায় না। সে দেখতে পায় ছেলেটার পা থেকে বল গড়িয়ে একটু এগিয়ে গেছে। ছেলেটা হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছে। খুব নিশ্চিন্ত ভাবভঙ্গি। হঠাৎ রেগে যায় তুলসী। খুব রেগে যায়। সে কাছেই রয়েছে, তার ছেলেটা তেল অত নিশ্চিন্ত? কেন সাবধান হচ্ছে না? অবহেলা!

হঠাৎ হালকা পায়ে ছুটে আসে তুলসী। ছেলেটার পা থেকে তিন-চার হাত দূরে বল গড়িয়ে যাচ্ছে। তুলসী টুক কার বলটা সরিয়ে নেয়। ছেলেটা বোকার মতো চেয়ে থাকে। তাকে সময় দেয় না তুলসী, দিশেহারার

মতো বাঁ দিকে ঘুরে এগোয়।

সামনেই গোলপোস্ট। হাফিজ দাঁড়িয়ে, হলুদ গেঞ্জি, চামড়ার দস্তানায় ঢাকা দু'খানা হাত— তৈরি—তার মুখে টুপির ছায়া—অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে ক্রুর চোখ। ফণা তুলে অল্প অল্প দোলে হাফিজ।

হাঁটু ভেঙে আসে। হাফিজের মুখোমুখি হঠাৎ মনে হয়, সে পারবে না। অসম্ভব।

বলে পা লাগার টুম শব্দ হয়। সে মেরেছে কি? হ্যাঁ, মেরেছে।

হাফিজ শূন্যে ভেসে যায়।

হঠাৎ বাতাস ছুটে এসে গায় লাগে।

গো-ও-ও-ও-ল! গো-ও-ও-ও-ল! গো-ও-ও—

মাঠের বাইরে ছেলেরা নাচছে। মাঠের ভিতরে ছুটে আসে ছেলের পাল।

হরি চক্রবর্তী জড়িয়ে ধরে, জগত্তারণ কাঁধে তুলে নেয়।

তুলসীর কাছা খুলে ঝুলতে থাকে।

কাল ছুটি।

বিকেলে দু'খানা সিনেমার টিকিট কাটে তুলসী। তারপর প্রথমেই গেল ললিতের বাসায়। গিয়ে শুনল, আদিত্য আর বিমানকে নিয়ে দুপুরে বেরিয়েছে ললিত। কী একটা ব্যাপার আছে ওদের। বলে গেছে বিকেলে নাকি ওরা মুরগি এনে ফিস্টি করবে। তুলসী তাই ললিতের মা'র সঙ্গে বসে একটু গল্প করল। তারপর এক কাপ চা খেয়ে উঠে পড়ে। বাসায় এসেই মৃদুলাকে তাড়া দেয়, তাড়াতাড়ি শাড়ি-টাড়ি পরে নাও। বুকপকেট থেকে সিনেমার টিকিট দু'খানা উঁচু করে দেখায়।

ও মা! মৃদুলা বলে। তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, মাত্র আমরা দু'জন? বাসার লোকে কী মনে করবে!

করুক গে। তুমি তাড়াতাড়ি করো। সময় নেই।

তুলসীকে খুব উত্তেজিত দেখায়। মাঝে মাঝে সে আপনমনে হাসছে।

সিনেমা হলের উলটো দিকে সুরুচি কেবিন। তুলসী বলল, চলো।

মৃদুলা ইতস্তত করে, দেরি হয়ে যাবে।

দূর। নিউজ রিল আগে শেষ হোক।

কবিরাজি কাটলেট কেটে গরম টুকরোটা মুখে দিয়ে তুলসী চোখ নামায়, কেমন?

মাংস ডিম আর ঘিয়ের স্বাদে মুখ ভরে যায়, মৃদুলা লজ্জায় হাসে, রোজ খেতে ইচ্ছে করে। বাসার রান্নায় এখন রুচি হয় না। ভাতের গন্ধে বমি হয়ে যায়।

রোজ খাওয়াব।

দূর। রোজ কি আসা হবে বাইরে?

কেন! বাসায় নিয়ে যাব!

মৃদুলা চোখ গোল করে, বাসায় এত লোক, সকলের সামনে?

তা কেন? লুকিয়ে নিয়ে যাব, রাতে শোয়ার সময়ে দরজা বন্ধ করে মশারির মধ্যে বসে খাবে!

মৃদুলা হাসে, তা কি হয়?

কেন হবে না? আপৎধর্মে সব হয়। সবাইকে অত খাতির করলে চলে না। দেশের বাড়িতে মাকে দেখেছি মশারির মধ্যে বাবা এনে খওয়াত। তখন ছোট ভাইটা পেটে—যে বাঁচল না। তুমিও খাবে।

মৃদুলার মুখ ঝলমল করে। উত্তেজনায় খাবারের স্বাদ পায় না তুলসী। চোখের সামনে অবিকল দেখতে পায় হাফিজকে—শূন্যে অসহায় হাত বাড়িয়ে ভাসছে। খেলার শেষে হেডমাস্টার বলছে, খুব অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল থেকে মেরেছিলে হে—হেরিয়েলি—ভেরি গুড—। গোলটার কথা ভাবতে ভাবতে আপনমনে শূন্যে তুলসীর পা উঠে যায়। নিজেকে সামলায় তুলসী। মৃদুলা দেখলে হাসবে।

ইন্টারভ্যালে প্যাকেটে পোট্যাটো চিপস ফেরি করছিল সাদা ইউনিফর্ম পরা ট্রে-হাতে একটা লোক। তুলসী হাত বাড়িয়ে বলল, দুটো দেখি।

মৃদলা মৃদু ঠেলা দিয়ে বলল, একটা নাও।

দূর

একটু পরে দাম নিতে ঘরে এল লোকটা। দেড় টাকা। শুনে চমকে উঠল তুলসী। মৃদুলা চোখ গোল করে ফিসফিস করে বলল, ও মা! এইটুকু আলুভাজা। কী গলাকাটা নাম গো!

তুলসী মৃদু হাসে, ঠিক আছে।

একদিন সে সঞ্জয়ের সঙ্গে গ্র্যান্ডে গিয়েছিল। সেই স্মৃতি থেকে সামলে নিল ব্যাপারটা। রোজ তো আর নয়। বরং আর কোনও দিন আগে থেকে দাম না জেনে সে পোট্যাটো চিপস কিনবে না।

বেরিয়ে আসার সময় তুলসী দেখে মৃদুলার চোখ লাল। সে জিজ্ঞেস করল, কেঁদেছিলে?

মৃদুলা ম্লান হেসে বলে, ইস, কী কষ্টের ছবিটা!

তুলসীর হঠাৎ বড় মায়া হয় মৃদুলার জন্য।

লবিতে প্রচণ্ড ভিড়, নাইট শোয়ের লোকেরা ঢোকার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ শিউরে কেঁপে উঠে তুলসীর হাতখানা চেপে ধরল মৃদুলা। বলল, দেখো দেখো, ওই লোকটা—ওই নীল জামা পরা—আমার ঊরুতে চিমটি কেটে পালাচ্ছে। ওকে ধরো—ওই যে—

কই? কোথায়? দিশেহারার মতো বলে তুলসী।

মৃদুলা তাড়া দিয়ে বলে, ওই যে—ও পালিয়ে যাচ্ছে—ছুটে ওকে ধরো।

তুলসী দেখতে পেল লোকটাকে। নীল হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট পরা, লম্বা কালো কালো বিশ্রী চেহারা। কিন্তু দেখেও দেখল না তুলসী। ওকে ধরে কী করবে সে? কী করতে পারে? ওই মস্ত লম্বা লোকটাকে কীভাবে বা ধরবে তুলসী? খুবই অসহায় বোধ করে সে। তবু অনিচ্ছার সঙ্গে এগিয়ে একটু এদিক-ওদিক দেখে ফিরে এসে তুলসী বলে, নাঃ, পালিয়ে গেছে।

অপমানে লজ্জায় মৃদুলার চোখ-ভরা জল, বলল, তোমার চোখের সামনে দিয়ে গেল, তুমি দেখতে পেলে না?

তুলসী দার্শনিকের মতো বলে, যেতে দাও। কত বদমাইশ মতলবাজ লোক রয়েছে পৃথিবীতে! সবাইকেই কি ধরা যায়! কত ধরবে তুমি, অ্যাঁ?

বাস-স্টপে এসে মৃদুলা চোখ মোছে। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, লোকটার মুখটা ঠিক দেখতে পাইনি। কিন্তু ঠিক বিভুর মতো। বিভুরও এই রকম বদমাশের মতো চেহারা। ওই রকম কালো লম্বা।

ধরতে পারলে আমি ঠিক চটি খুলে মারতাম।

রাত্রি। তুলসী শুয়ে ছিল। গা হাত পায়ে হাজারটা ফোঁড়া টনটন করে, হাত-পা নাড়তে কষ্ট হয়, দম নিতে বুক ফেটে যায়। মনে হয় খুব জ্বর আসছে।

মৃদুলা নরম হাতে তার হাঁটু টিপে দিতে দিতে বলল, কেন ওইসব খেলতে যাও! হাত-পা ভাঙলে, তখন?

তুলসী মৃদু কাতর ধ্বনি করে। তারপর আস্তে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, ওই লোকটা কি সত্যিই বিভু, তুমি ঠিক দেখেছিলে?

মৃদুলা ঠোঁট ওলটায়, কী জানি! মনে হয়েছিল তো। হনহন করে পালিয়ে গেল, মুখটা দেখা গেল না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে তুলসী, তারপর ঘুমোবার আগে উদাস গলায় বলে, কলকাতাটা বড্ড নোংরা, বুঝলে? একেবারে নোংরা শহর। সম্মান নিয়ে থাকা যায় না। এই ভিড়ভাট্টা গণ্ডগোলের মধ্যে—দূর, দুর—তার চেয়ে চলো পলাশপুরেই চলে যাই। ওখানে খেতখামার করব, বুঝলে? খেতখামার— একটা গোরু পুষব—কাছেই একটা ভেড়ি আছে—টাটকা মাছ—মাস্টারমশাই বলে ওখানকার লোক সম্মান করে খুব—গাঁয়ের মানুষ তো—সরল সোজা—

বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে।

ওদিকে শাশ্বতীকে বাসে তুলে দিয়ে সারা বিকেল বিমান এসপ্ল্যানেডে ঘুরে বেড়িয়েছে। ময়দানের ও-ধারে গড়ের পিছনে দেখেছে আশ্চর্য সূর্যাস্ত। তুলিতে আঁকা গোধূলির ছবি। না, ঠিক গোধূলি নয়, গোরু ছিল না, মানুষের পায়ে পায়ে উড়ছিল ধুলো। ফুচকাওলাকে ঘিরে মানুষের ভিড়, চ্যাপটা মাটির উনুনে ভুট্টা পোড়াচ্ছে দেহাতি মানুষ, মনুমেন্টের তলায় মিটিং। সে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। ট্রাম লাইনের ওপরে তারের জটিলতা, লক্ষ করল সে, কার্জন পার্কে বসে আছে অলস মানুষ।

সুন্দর এক দৃশ্য দেখল সে। প্রাইভেট বাসের হাতল ধরে পড়ো-পড়ো মানুষকে বুকে জড়িয়ে তুলে নিল বিশাল চেহারার পাঞ্জাবি কন্ডাক্টর। একটা বাচ্চা ভিখিরির ছেলেকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিল ট্রাফিক পুলিশ। কৃতজ্ঞতায় তার চোখে জল এসে গেল।

প্রতিটি মানুষকেই ডেকে একটি-দু'টি কথা বলতে ইচ্ছে করে। অচেনা মানুষের কাঁধে হাত রেখে কয়েক পা হাঁটতে সাধ হয়। তার চারদিকে অসহায় জন্মান্ধ সব মানুষ, জানে না কোথা থেকে কীভাবে এসেছে। জিজ্ঞেস করলে বড় জোর বাবার নাম বলতে পারে—তার বেশি কিছু নয়। এইখানে মিটিং করছে কিছু লোক, কী বলছে ওরা? বিমান এগিয়ে শোনে। শিগগিরই ধর্মঘট। বাংলা বন্ধ। ট্রেনের চাকা চলবে না। কারখানায় চাক্কি বন্ধ। অফিস ফাঁকা থাকবে। বড় রাস্তায় ফুটবল খেলা হবে। একদিন ছুটি।

ছোট্ট একটা মিছিল আসছে মিটিঙের দিকে। রোগা ক্রুদ্ধ মানুষেরা হাত তুলে চেঁচাচ্ছে, নিপাত যাক। —নিপাত যাক।

জন্মান্ধ মানুষ। জানে না বিদ্রোহ বিপ্লবের বীজ নষ্ট করে দেয়। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দাবি মিটলেই এরা ঝিমিয়ে পড়বে। রেলের চাকা চলবে। কারখানায় চাক্কি ঘুরবে। অফিসে বশংবদ মানযেরা মাথা নিচু করে ঢুকে যাবে। আজকাল আর তেমন মানুষের জন্ম হয় না, তেমন ল্যাংটা মানুষের, যে পৃথিবী কাঁপায়। যার দাবি-দাওয়া অভিশাপ নেই, যে দিতে আসে।

একটু আগেই সে একটা কাজ করেছে। খুব সাহসের কাজ। নিজেকে তাই খুব সজীব বলে মনে হয় তার। সে লোকের চোখে চোখ রেখে হাসে, তারপর তাদের পেরিয়ে হেঁটে যায়।

ট্রামে উঠে বিমান দেখল পিছন দিককার লম্বা সিটে প্রকাণ্ড চেহারার একটা লোক অনেক জায়গা নিয়ে বসে আছে। তার মুখে মদের গন্ধ, কড়া চোখে চার দিকের রোগা লোকগুলোর দিকে তাকাচ্ছে। সে একটু সরে বসলে তার পাশে একজন রোগাটোগা লোকের জায়গা হয়ে যায়। কিন্তু কেউ বসতে সাহস করছে না।

চোখে চোখ পড়তেই বিমান একটু হাসে, ভরাট সুন্দর গলায় বলে, একটু সরে বসুন।

লোকটা কেঁপে ওঠে। প্রকাণ্ড লোকটা কুঁকড়ে সরে যায়। বিমান আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বসে। দাঁড়ানো লোকগুলো ঈর্ষার চোখে তার মাথার ব্যান্ডেজ লক্ষ করছে। এরা হয়তো আজ বাসায় ফিরে বউয়ের কাছে বিমানের আশ্চর্য সাহসের গল্প করবে।

শরীরটা ভাল নেই। বড় রাস্তা থেকে বিমান একটা রিকশা নিল। ঘরের সামনে রিকশাটা ছেড়ে দেওয়ার সময়ে দেখল রিকশার গায়ে একটা পোস্টার। মৃদু রাস্তার আলোতে বিমান পড়ল, তাতে লেখা, দিন আনি দিন খাই, বাংলা বন্ধে উপোস যাই।

ওধারে যে মিটিং হচ্ছে, এধারে তারই প্রতিবাদ।

এটা কী? বিমান জিজ্ঞেস করে।

লোকটা কপালের ঘাম মুছে বলে, কী জানি বাবু। একজন লাগিয়ে দিয়েছে, বলেছে ছিঁড়ে ফেললে মাথা নামিয়ে নেবে। কী লেখা আছে ওতে?

লেখা আছে, তুমি দিন আনে দিন খাও, বাংলা বন্ধে তুমি উপোস যাবে।

লোকটা হাসে।

তুমি বাংলা বন্ধ চাও না?

কী জানি। লোকটা উদাস গলায় বলে।

ওর কেবল মনে পড়ে গত বর্ষার কথা। বর্ষাকাল রোজগারের সময়। যখন কলকাতায় রিকশা ছাড়া যানবাহন নেই। আবার এক বছর পর আসবে সেই সময়। তখনই বিপ্লব। মাঝখানে বাবুমানুষেরা যা খুশি করে নিক, কিছু যায় আসে না।

রাতের খাবার নিয়ে এল শম্ভু। সঙ্গে সুবল।

ললিতার শরীর খারাপ। খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

টিফিন ক্যারিয়ারটা ফেরত নিয়ে যাবে বলে ওরা বসে রইল। খাটের ওপর পাশাপাশি। মেঝেতে বসে নিঃশব্দে খেয়ে নিচ্ছিল বিমান।

হঠাৎ সুবল বলে, বালিগঞ্জের এ কে দত্তকে আপনি চেনেন?

বিমান মুখ ফেরাল, চিনি।

সুবল বলে, তার মেয়ে অপর্ণা, গান গায়, তাকে?

বিমান মাথা নাড়ে, চিনি, ছেলেবেলা থেকে।

আপনাদের সম্পর্কটা কী?

বিমান হাসে। তারপর তার সুন্দর ভরাট গলায় বলে, অপুর সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। ছেলেবেলা থেকে। ওদের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি একই গ্রামে, পাশাপাশি। ছেলেবেলায় আমি ভাল ছাত্র ছিলাম। সকলেই আশা করত আমি বড় কেউ একজন হয়ে উঠব। ওরা আমাকে তখন থেকে পছন্দ করে রেখেছিল।

আর, এখন? সুবল প্রশ্ন করে।

বিমান মাথা নাড়ে, এখন আর ওরা আমাকে পছন্দ করে না। কেননা, আমি তেমন কিছু হইনি। ওরা কথা ফেরত নিয়েছে। কিন্তু অপুর বোধবুদ্ধি পাকেনি, সে ছেলেবেলা থেকেই জানে একদিন আমি তার স্বামী হব। আমি তার চিরকালের খেলাঘরের পুতুলের বর। সে আমাকে ছাড়তে পারছে না। এখনও নেশার ঘোরে আমার কাছে চলে আসে। বুদ্ধি পাকলে আর আসবে না। ও এখনও বুঝতে পারছে না যে, আমি কিছু নই।

আর আপনি? আপনার কোনও দুর্বলতা নেই?

না। বিমান মাথা নাড়ে। আস্তে আস্তে বলে, আমি বিশেষ কোনও মেয়ের প্রতি দুর্বল নই। আমার দুর্বলতা সন্তানের প্রতি।

বিমান নিঃশব্দে খায়। তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলে, আমি অঙ্ক কষে বিয়ে করব। খুব ধীরেসুস্থে, ভেবেচিন্তে। তারপর পৃথিবীতে এমন একজন মানুষের জন্ম দেব, এমন একজন—

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে বিমান, কথা আটকে যায়! সময় নিয়ে সামলে ওঠে। ধীরে ধীরে বলে, এমন একজন, যে ঠিক আমার মতো নয়। সে আমার চেয়ে অনেক লম্বা-চওড়া হবে—অনেক সুপুরুষ—সে আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী হবে—চক্ষুষ্মান—সে নিজের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেখতে পাবে। সে জানবে সে কোথা থেকে এল—সে পৃথিবীতে কোনও দাবিদাওয়া নিয়ে আসবে না—সে দিয়ে যেতে আসবে—স্বভাবেই সে হবে ঐশ্বর্যবান। পৃথিবী এ-রকম একজন মানুষের জন্য বসে আছে।

কী করে আনবেন? সুবল জিজ্ঞেস করে।

ঠিক মতো বিয়ে করলে—দেখেশুনে, অঙ্ক কষে—

পারবেন? সুবল আর শম্ভু হাসে।

বিমান মাথা নাড়ে, কে জানে! আমি যদি না পারি তবে আমার ছেলে চেষ্টা করবে, কিংবা তার ছেলে। আমার বংশে এ-রকম চেষ্টা থেকে যাবে। ও-রকম একজন পৃথিবীতে আসতে আমাদের কত জন্ম কেটে যায়!

কার মতো হবে সেই ছেলে? কার্ল মার্ক্স, না স্বামী বিবেকানন্দ? সুবল জিজ্ঞেস করে।

কার্ল মার্ক্স, না স্বামী বিবেকানন্দ? কথাটা বুঝতে পারে না বিমান। কেবল বিড়বিড় করে। হ্যাঁ, কার্ল মার্ক্স, সেই দাড়িওয়ালা স্মিতমুখ সাধুসন্তের মতো লোকটা, যে বলছে যে, সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, মানুষের সপক্ষে। যে-লোকটা উলটে দিচ্ছে পৃথিবীর দান! অদ্ভুত মনোবল লোকটার। হ্যাঁ, কার্ল মার্ক্সকে চেনে বিমান। কিংবা বিবেকানন্দ! শিকাগো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে লোকটা কেবল গেরুয়া আলখাল্লা আর পাগড়ি মাথায় কাঠের প্যাকিং বাক্সে বসে রাত কাটাচ্ছে, তবু সোজা দাঁড়িয়ে বলছে, আমি তোমাদের ভ্রাতা, তোমরা আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনী। আমি জীবকে ঈশ্বর বলিয়া জানি। ঈশ্বরলাভই প্রতিটি জীবনের লক্ষ্য।...কিন্তু কার মতো হবে সেই মানুষ, কে জানে? বিমান বিড়বিড় করে, কিন্তু থই পায় না। বস্তুত পৃথিবীর কোনও মানুষের সঙ্গেই তার সেই স্বপ্নের মানুষটির অবিকল মিল নেই।

টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে ওরা চলে গেলে বিমান আপনমনে বলল, আজ রাতে আমি গীতা পড়ব। অনেককাল পড়ি না।

সুবল শম্ভুকে বলল, লোকটা বদ্ধ পাগল।

শম্ভু একটু চুপ থেকে বলে, এ কে দত্তকে তুই চিনলি কী করে?

বাড়ি পর্যন্ত গেছি মেয়েটাকে 'ফলো' করে। বাড়ির গেটে নামের ট্যাবলেট ছিল। সেই দেখে ফোন করেছিলাম।

কী হল?

ফোন করে বললাম যে, আপনার মেয়ে একজন খুব বাজে লোকের সঙ্গে মিশছে। ও-পাশ থেকে গমগম করে লোকটা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? আমার ফোন নম্বর জানলেন কী করে? বললাম, আমি সুবল মিত্র। বি-কম পাশ! ওই বাজে লোকটা যে পাড়ায় থাকে সেই পাড়াতেই থাকি, ফোন নম্বর পেয়েছি ডিরেক্টরিতে। লোকটা তবু ছাড়ে না, বলল ডিরেক্টরিতে পেলেন তো আমার নাম নিশ্চয়ই জানা ছিল। কোথা থেকে জানলেন? বলতে তো পারি না যে আপনার মেয়েকে 'ফলো' করেছিলাম, তাই অনেক কায়দা-কসরত করতে হল। বললাম, আপনি অত বড় ফার্মের মালিক, আপনাকে কে না চেনে? তখন বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে। বিমান রক্ষিতকে আমি চিনি। ব্যাপারটা দেখব। বলে ফোন রেখে দিল।

সুবলের বুক জ্বালা করে ওঠে। সে যে বি কম পাশ এ-কথা কেন বলতে গেল? আজকাল কি বি কম পাশের কোনও দাম আছে? খামোকাই সে বলেছে কথাটা, বোকার মতো।

বিমান রক্ষিত বেঁচে গেল। কারণ, অপর্ণা দত্তর সঙ্গে ওর প্রেম নেই। থাকলে? থাকলে—সুবলের গা হাত শিরশির করে ওঠে। কেন থাকবে? ওই বড় বাড়ি, যার চূড়ায় পাথরের পরি, অনেকখানি জমিতে বাগান, সে-বাড়ির মেয়ে কেন প্রেম করবে কর্পোরেশনের জমাদারদের হাজিরাবাবুর সঙ্গে? কেন করবে?

ওদিকে রাতের গাড়িতেই কলকাতা ছেড়ে গেছে আদিত্য। ভোররাত্রে বিহারের এক জংশন স্টেশনে নেমেছে সে। বেশ শীত। অল্প কুয়াশা।

স্টেশনের বাইরে বাঁধানো চত্বরে কয়েকটা টাঙ্গা, রিকশার সারি দাঁড়িয়ে আছে। রাত-জাগা কিংবা ভোরে-ওঠা লোকেরা ছোট দোকান থেকে ভাঁড়ে চা খাচ্ছে।

চারটে বেজে দশ মিনিট। এত ভোরে আদিত্য কখনও ওঠে না। এখনও ঘোর অন্ধকার চারদিকে। কোথায় যাবে ঠিক ছিল না। ট্রেনে এক বুড়ো লোক সঙ্গী ছিল। তার কাছেই জেনেছে যে, এইখানে থাকার মতে একটা ডাকবাংলো আছে।

সে একটা ছোকরা টাঙ্গাওলাকে ডাকবাংলোর কথা বলে জিজ্ঞেস করল, কেতনা লেগা?

দু' টাকা।

দূর। একটুখানি পথ।

চড়াই উতরাই আছে বাবু। পাহাড়ি জায়গা!

আদিত্য হাসল, আর যদি মাঝপথে টাঙ্গা থামিয়ে গলায় ছুরি দাও!

লোকটা হাসে।

টাঙ্গা দুলতে দুলতে চলে। একটা বিশাল উতরাই ভাঙতে থাকে।

আকাশের গভীর রং থেকে একটা আভা আসে। আদিত্য দেখে ডান দিকে একটা উপত্যকা নেমে গেছে। বাঁ দিকে দূরে পাহাড়। খোলা মাঠ বেয়ে আসছে বহু দূরের গন্ধমাখা বাতাস।

ভোরবেলা জায়গাটা সুন্দর দেখাবে। ভাবে আদিত্য।

এইখানে যদি আশ্রয় পায় তবে একা একা অনেক দিন থাকবে সে। অনেক দিন সে আর লোকালয়ে ফিরে যাবে না।

কুড়ি

রাত্রে ঘুমের মধ্যে অস্পষ্ট কথা বলে পাশ ফিরল শাশ্বতী। মৃদু একটু হাসল স্বপ্নের ভিতরে।

হৈমন্তীর গায়ের ওপর তার পা। হৈমন্তী ঠেলা দিয়ে বলল, এই, ঠিক হয়ে শো। আমার গায়ে ঠ্যাং তুলে দিচ্ছিস।

শাশ্বতী ঘুমের মধ্যেই তাকায়, তারপর বিড়বিড় করে অস্পষ্ট কথা বলে একটু। বোধ হয় বলে, তোমরা সবাই শাশ্বতীকে ক্ষমা কোরো। আমি কি ছাই বুঝি আমার মন! তোমাদের কাউকে যদি দুঃখ দিয়ে থাকি, ক্ষমা কোরো।

শাশ্বতী ভেবে রেখেছে, খুব শিগগিরই সে একদিন ললিতের সঙ্গে দেখা করবে। জিজ্ঞেস করবে, এতে আপনার কী স্বার্থ ছিল? কেন আপনি এমন কাজ করতে গিয়েছিলেন?

ললিতের সঙ্গে ঝগড়া করার মতো অনেক কথা শাশ্বতীর মনে পড়ে। কেন আমাকে মন বোঝার সময় দিল না! কেন ধরে-বেঁধে নিয়ে গেল ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের কাছে! কী স্বার্থ তোমার ললিত! না, অত পুরুষমানস মিলে জোর করে কোথাও ধরে নিয়ে যেয়ো না শাশ্বতীকে। বরং তাকে আর একটু সময় দিয়ো। আর-একটু মায়া কোরো শাশ্বতীকে। শাশ্বতী কি ছাই বোঝে তার মন! আর তুমি! শুনেছি, আজ টেলিফোন ডিরেক্টরির পাতা ওলটাতে তোমার হাত কেঁপেছিল। তুমি দু' আঙুলে সিগারেট ধরে রাখতে পারছিল না! আমার ওপর কীসের প্রতিশোধ তোমার! তুমি তো জানতেও না তুমি কী করে ফেলতে যাচ্ছ! তবু তুমি জোর করে কেন ঘটাতে চাইছিলে ওই অঘটন! তোমার মায়া দয়া নেই!

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিল সঞ্জয়। সামনে একটা গ্রিল দেওয়া ছোট বারান্দা আছে। সেখানে ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে পাশে খুদে টেবিলে হুইস্কি নিয়ে বসে ছিল। গরম লাগছিল খুব, শুতে ইচ্ছে করছিল না। তা ছাড়া তলপেটের ব্যথাটা কেমন একটা টানা দপদপানিতে দাঁড়িয়ে গেল। নড়তে-চড়তে লাগে। এ-রকম ব্যথা নিয়ে ঘুমোনো যায় না। তা ছাড়া ঘুম সামান্য একটু কমে গেছে সঞ্জয়ের। স্বাভাবিকভাবে বড় একটা ঘুম আসতে চায় না, কেবল হাই ওঠে, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে। চিন্তায় ভার হয়ে যায় মাথা। ঘুম এলেও অস্বাভাবিক সব স্বপ্ন দেখা দেয়। তার চেয়ে হুইস্কিই ভাল। শরীরে ব্যথা বেদনা আস্তে আস্তে মৃদু ঝিমঝিমির মধ্যে ডুবে যেতে থাকে। গাঢ় চুম্বনের মতো আঠা হয়ে লেগে আসে চোখের পাতা। আঃ, শান্তি। ঠিক বটে যে সেটা আসলে ঘুম নয়, অজ্ঞান হয়ে থাকা। কারণ, সকালে উঠে কখনও ঠিক ঘুমিয়ে ওঠার তৃপ্তি টের পায় না সে। মনে হয়, অজ্ঞান অবস্থা থেকে জ্ঞান ফিরল। সারা দিন আবার হুইস্কির জন্য শরীর সাপের মতো ফোঁসে, ছোবলায়।

বারান্দায় হাওয়া ছিল। স্নান এবং সামান্য একটু রুটি মাংসের পর হুইস্কির স্বাদই আলাদা। ধীরে ধীরে সময় নিয়ে খাচ্ছিল সঞ্জয়। রিনি আগে ধমকাত, কাঁদত, আজকাল গা করে না। শুধু বলে, বাথরুমে সাবধানে যেয়ো, আমার কাচের তলমারির গায়ে পাতো না। রাতে বিনি, পিকলু ঘুমোবার পর কয়েক মুহূর্তের জন্য এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। বলল, কী আজ কতক্ষণ চলবে?

শোওয়ার সময়েও রিনির ঠোঁটে লিপস্টিক। সঞ্জয়ের ইচ্ছে হল বলে, ঠোঁট ধোও না কেন? সবসময়ে লিপস্টিক মেখে থাকলে রঙের তলায় ঠোঁটের চামড়া সাদা হয়ে যাবে! কুষ্ঠ-ফুষ্ঠ কত কী হতে পারে, আজকালকার কেমিকালে বিশ্বাস কী

কিন্তু সঞ্জয় কিছু বলল না। উত্তরে রিনি তা হলে অনেক কথা বলবে, মদটদ খাওয়া নিয়ে, তার অতীত জীবন নিয়ে— ঝগড়াই লেগে যাবে হয়তো। দরকার কী? ও ওর মনে থাক। একটু লিপস্টিক বই তো নয়। মা সারা দিন পান খায়, তাই সকালে মুখটুখ ধোয়ার পর ঠোঁটের দু'পাশের কষে সাদা দাগ দেখা দেয়। ঘেন্না করে সঞ্জয়ের। রিনির লিপস্টিক থেকেও ও-রকম কিছু দাগ-ফাগ হওয়া বিচিত্র নয়।

ছিপছিপে শরীর, আঁট করে খুন-খারাপি রঙের শাড়ি পরেছিল রিনি, শরীরটা ওর এত সতেজ যে যেন চারপাশটাকে আক্রমণ করছে। চলায়-ফেরায় একটা ধনুকের মতো ছিটকে ওঠার ভাব আছে। আট-ন'মাস আগে ও যখন পোয়াতি ছিল তখনও ওর সতেজ ভাবখানা ছিল লক্ষ করার মতো। এখনও বোঝা যায় না যে বাচ্চা হয়েছে। কপালে লিপস্টিকেরই একটা গোল ফোঁটা দেয় রিনি, চুলের মধ্যে কোন অতল অরণ্যে ক্ষুদ্র একটু সিঁদুরের বিন্দু ছোঁয়ায়, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে কত কসমেটিক আনতে বলে সঞ্জয়কে, কখনও বলে না, সিঁদুর এলো। একদিন সঞ্জয় ঠাট্টা করে বলেছিল, আমার একটা খরচ বেঁচে গেছে, বাবা। সিঁদুরের। শুনে রিনি ম্লান মুখে বলেছিল, তুমি মেয়েদের ব্যাপারে কেন মাথা গলাও? স্বামীকে সিঁদুরের কথা বলতে নেই জানো? বিয়ের পর বছরে বোধ হয় সেরখানেক সিঁদুর লাগত রিনির। মাথা এ-ফোঁড়, ও-ফোঁড় করে কুড়ুলের কোপের মতো জমে থাকত সিঁদুর, সুন্দর টিকলো নাকের ওপর গুঁড়ো ঝরে পড়ত। আমি আর কুমারী নই, তোমরা কেউ আর আমাকে যাচ্ঞা কোরো না—এই কথা ঘোষণা করত সগর্বে। এখন আবার অনেকটা কুমারী হয়ে গেছে রিনি, সিঁদুর লুকোয়।

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, কারও প্রেমে পড়োনি তো? তোমাকে গিটার শেখাতে এক মাস্টার আসে না ছোকরা মতো? তাকে আমি দেখিইনি। রেডিয়োতে হিন্দি কিংবা রবীন্দ্রসংগীত বাজায় বলে শুনেছি। দেখতে কেমন? উম্যান-ইটার! দুপুরবেলায় আসে তো, না?

টিজ করতে ইচ্ছে করে। টিজ তবু কিছুই করেনি সঞ্জয়। তলপেটে আদিত্যর লাথিটা তখনও জমে আছে। কেন যে শালা বেড়েছিল লাথিটা কে বলবে! রোগা আধমরা ললিতটাকে চড়টা কষিয়েছিল জুতমতোই। কেন যে তা কে জানে? কী যেন নাম সেই কালো কালো মেয়েটার? শাশ্বতী না কী যেন, এমন কিছু সুন্দর নয় সে, বিয়ের বাজারে চালাতে গেলে নগদ দু'-তিন হাজারের ধাক্কা, তবু তার জন্যই খেপে গেল পাগল আদিটা। দুর শালা। রিনিকে বরং দেখে যা। দেখে যা উঁচু-নিচু কাকে বলে! কী রকম মোলায়েম ফরসা চামড়ায় বাঁধানো আমার বউ, দেখে যা। ওই কালো মেয়েটার জন্য কি খুব বেশি হুজ্জুত করা যায়! তবু মাইরি তুই কতকালের সব পুরনো দোস্তদের না-হক মাস্তানি দেখিয়ে গেলি! কোনও মানে হয়? ললিত বাগড়া দিচ্ছে? তো দিয়ে দে না ওই আধমরা ছেলেটাকে ওই কালো মেয়েটা! দু'-চারদিন ভোগ করে নিক। তারপর তো মরেই যাচ্ছে ও। ও মরে গেলে, মানুষের তো তখন আর কোনও স্বত্ব থাকে না, তখন ওর স্থাবর অস্থাবর আমরাই তো পাব রে! একটু উদার হলে দ্যাখ, কত ঝগড়া কাজিয়া এড়ানো যায়। তোরা কী রে!

রিনি এগিয়ে গিয়ে গ্রিল ধরে কিছুক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। ফাঁকা রাস্তা। হিন্দুস্থান পার্কে এ সময়টায় ভূত নামে। কেবল ও-ধারে একটা গ্যারাজের সামনে খাটিয়া পেতেছে এক বুড়ো দারোয়ান, নিশুত রাত চিরে

পাতকুড়ুনিদের অপার্থিব চিৎকার ভেসে আসে, মা গো—।

রিনি মুখ ফিরিয়ে বলে, শুনছ?

কী?

ওই যে চিৎকার! বড্ড ভয় করে।

রিনি অপ্রস্তুত হাসি হাসে। তারপর বোধ হয় একটু চালাক হওয়ার চেষ্টা করে বলে, কী রকম যেন শাপ-শাপান্তের মতো শুনতে লাগে। এমন বিচ্ছিরি গলা করে ডাকে যেন সর্বস্ব চলে গেছে—

খামোখাই দামি লিপস্টিক মাখে রিনি। বাজে খরচ! সঞ্জয় জানে গিটার শেখানোর মাস্টারের সঙ্গে রিনি প্রেম করে না। আঙুলে আঙুলে ছুঁয়ে গেলে সতীত্বের ভয়ে কুঁকড়ে যায়। ধুস।

সঞ্জয় সামান্য হেসে বলল, আমি এক সময়ে ওদের কাছাকাছি থাকতাম। কত রাত চিৎপুরের ফুটপাথে শুয়ে কেটেছে বইয়ের দোকানের তক্তার তলায়। দুই-এক বার অনেকটা ভিক্ষের মতো করে লোকের কাছে হাত পেতেছি। ওর একটা মজা আছে।

কী মজা?

আছে। এখন আর সেটা বোঝাতে পারি না। তবে সর্বস্ব চলে যাওয়া একটা আনন্দ আছে।

রিনি চুড়ির ঝনন শব্দ করে রাস্তায় মুখ ফেরাল। তারপর হঠাৎ বলল, আবার ও-রকম হতে পারো?

সঞ্জয় মাথা নাড়ল, না।

রিনি মৃদু হাসি-মুখ ফিরিয়ে বলে, পারো না? তবে যে বলো মজা আছে! আমাকে খ্যাপানো অত সোজা, না?

সঞ্জয় বলল, এখন পারি না তার কারণ অন্য। এখন যদি লুঙ্গি পরে খালি গায়ে গিয়ে ফুটপাথে মাদুর পেতে শুয়ে থাকি, তবু মনে হবে, রাতে চোর এসে আমার কী একটা চুরি করে নেবে। কী একটা যেন খোয়া যাবে আমার। কিছু খোয়া না গেলেও ওই রকম মনে হবে। স্বস্তি পাব না। কিন্তু যদি কোনও দিন সত্যিই সর্বস্ব চলে যায়, তা হলে—

রিনি হাই তুলল। তারপর পরিপূর্ণ শরীরখানা একটু আলসেমি জড়ানো ভঙ্গিতে মুচড়ে সঞ্জয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরে একখানা ড্রিম-ল্যাম্প জ্বলছে। তার আলো পড়ল ওর গায়ে। সাধু সন্ন্যাসীর মতো পবিত্র মুখ করল সঞ্জয়। বলল, তোমার গিটারটা একটু বাজাও না, শুনি! নতুন কী শিখেছ?

ঘুম পাচ্ছে।

ওঃ! তা হলে বরং গিয়ে ঘুমোও।

সঙ্গে সঙ্গে বেঁঝে ওঠে রিনি, আহা, আমি ঘুমোতে চাইলাম, আর উনি ঘুমোতে দিলেন। কেন, হুকুম করতে পারো না—না, আমি এক্ষুনি গিটার শুনতে চাই, নিয়ে এসো গিটার, আমার পায়ের কাছে বসে বাজাও—

সঞ্জয় হাত তুলে বলল, আস্তে। এ সময়ে জোরালো শব্দ শুনলে নেশা কেটে যায়।

অভিমানী মুখ করে রিনি বলে, যাও, বাজাব না।

শান্ত গলায় সঞ্জয় বলল, গিটারটা আনো।

সামান্য একটু আদর-কাড়া ঝগড়া করল রিনি। কিন্তু এতকাল পরে এই প্রথম তার বাজনা শুনতে চেয়েছে বলে সে চাপা আনন্দে একটু ঝলমলে মুখে সত্যিই গিটার নিয়ে সঞ্জয়ের পায়ের কাছে বসল। পিকলুকে যেমন

কোলে নেয় রিনি তেমনই কোল দিল যন্ত্রখানাকে।

কী বাজাব?

দেহাতি গান জানো?

রিনি হাসে, গাঁইয়া কোথাকার।

তা হলে যা খুশি বাজাও।

একটু টুংটাং করে রিনি সত্যিই বাজাতে লাগল। বিভোর হয়ে।

একটু আশ্চর্য হয়ে সঞ্জয় শুনছিল। সেই ওঠা-পড়াহীন বিষণ্ণ মেয়ে-কান্নার সুরে গান, ঠিক যেমন দেহাতি গান হয়। রিনি তাই বাজাচ্ছে। সঞ্জয় গানটা একটুও ধরতে পারল না। কিন্তু পড়ন্ত বেলায় এক পাহাড়ি নদী পার হয়ে রংচঙে কাপড় পরে মানুষ মেলায় যাচ্ছে। সাজপরা গোরু টেনে নিয়ে যাচ্ছে রঙিন গাড়ি। এ-রকম দৃশ্য তার চোখে ভেসে উঠছিল।

রিনি থামলে জিজ্ঞেস করল, এটা কি হিন্দি ছবির গান?

দূর!

তবে?

ছেলেবেলায় গানটা শুনেছিলাম। সেবার দেওঘরে বেড়াতে গিয়ে। সুরটা মনে ছিল, সেই থেকে বাজালাম।

কথাগুলো কী বলো তো।

রিনি হাসল।

গার্ডবাবু, গার্ডবাবু, সিটি না বাজা না, ঝান্ডি না দিখানা, পিলাটফারম ম রহ গৈল গাঁটারিয়া... গুনগুন করে গাইল রিনি।

হাসতে হাসতে সঞ্জয় টের পাচ্ছিল পেটের নীচে একটা ভারী বস্তু ঝুলছে। তলপেটটা। প্ল্যাটফর্মে গাঁটরি পড়ে রইল—হায় ঈশ্বর, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে! হে গার্ডবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, সর্বস্ব পড়ে আছে আমার প্ল্যাটফর্মে—

রিনি!

উঁ।

আজা, আর কিছু বাজিয়ো না। শুনতে ভাল লাগবে না। তুমি খুব সুন্দর শিখেছ, খুব সুন্দর—

রিনি হঠাৎ গলা বাড়িয়ে বলল, তবে প্রাইজ দাও।

প্রাইজ দিতেই যাচ্ছিল সঞ্জয়, হঠাৎ রিনি মুখ আচমকা সরিয়ে নিয়ে বলল, ইস ছাইপাঁশের গন্ধ! কী স্বাদে যে খাও—

রিনি উঠে চলে গেলে একা একা একটা ডিঙি নৌকোর মতো চেতনা ছেড়ে অচেতনতার দিকে ভেসে গিয়েছিল সঞ্জয়। কাল রাতে।

রাত প্রায় একটা পর্যন্ত বিমান গীতা পড়েছে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা তার কাছে। পড়তে পড়তে হুঁশ হল যখন মাথার পিছন দিকে একটা তীব্র যন্ত্রণা দেখা দিল হঠাৎ। চোখের ডিম দুটো টনটন করে উঠল। তখন বই রেখে বাতি নিবিয়ে দিল বিমান। কিন্তু শুতে গিয়ে বুঝল ঘুম আসবে না। ঘুম সম্পূর্ণ অসম্ভব একটা

ব্যাপার এখন। মাথার ব্যান্ডেজটার ওপর দিয়ে সে একটা রুমাল শক্ত কটকটে করে বেঁধে গিঁট দিল। তারপর খোলা হাওয়ায় ঘুরবে বলে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বট গাছের তলায় কতগুলো ছেলেছোকরা বসে আছে। তাদের পরনে সরু প্যান্ট, গায়ে রংচঙে শার্ট, মুখে সিগারেট আর হাতে মাটির ভাঁড়। রাস্তার আবছা আলোয় তাদের দেখা যায়। চা খাওয়ার মতো করে চুমুক দিচ্ছে ভাঁড়ে। একটু চা খেতে বিমানেরও ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সে কাছাকাছি কোনও চায়ের দোকান দেখতে পেল না। অল্প দূরে একটা পানের দোকান খোলা আছে কেবল। সে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিল অমনি একটা ছেলে উঠে এসে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, কী চাই!

বিমান একটু ইতস্তত করে বলল, একটু চা কোথায় পাওয়া যায়!

ছেলেটা খুব অবাক হয়ে বলল, চা!

পিছন থেকে কে একজন জিজ্ঞেস করল, কে রে?

ছেলেটা মুখ ফিরিয়ে বলল, চা চাইছে।

খ্যা-অ্যা-অ্যা করে একটা হাসির শব্দ হল। আর একজন বলল, নিয়ে আয়, চা খাইয়ে দিচ্ছি।

আর একজন বলল, হ্যাঁ, খাওয়াও আর কী! এমন পয়সার মাল কোথাকার কোন মড়াকে—

যাঃ, মদ কাউকে রিফিউজ করতে নেই, পাপ হয়। শচে, নিয়ে আয় ভদ্রলোককে—

মাথার মধ্যে তখন এমন একটা দপদপ রক্ত বওয়ার শব্দ হচ্ছে, আর এমন টনটন করছে দুটো চোখ যে বিমান ব্যাপারটা খুব ভাল বুঝতে পারল না। এরা তাকে মদ খাওয়াতে চাইছে। সে কখনও খায়নি। কিন্তু মাথা আর চোখের এই অসহ্য যন্ত্রণায় কিছু একটা করা দরকার। যদি খুব নেশা হয় তা হলে সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে।

ছেলেগুলো খুব খারাপ নয়, সে এগোতেই বাঁধানো বেদির ওপর একটু সরে বসে তার জন্য জায়গা করে দিল। বসার পর বিমান দেখলে এদের দলে, কী আশ্চর্য, একটা মেয়েও রয়েছে। মেয়েটার মুখ অন্য দিকে ফেরানো, তবু এক পলক দেখলেই বোঝা যায় মেয়েটা একেবারে রদ্দি। মুখে অতিরিক্ত পাউডার, খুব সস্তা ঝলমলে একটা শাড়ি। ছেলেগুলো ওর দিকে তাকাচ্ছেও না, খুব সম্ভবত আসর গরম করার জন্য ওকে নিয়ে এসেছে ভাড়া করে, তারপর সবাই ঠান্ডা মেরে গেছে। বিমান চোখ ফিরিয়ে নিল।

ভাঁড়ে প্রথম চুমুকটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্ত শরীর পেট থেকে জিব পর্যন্ত যেন নিঃশব্দে চেঁচিয়ে উঠল, না না, এ-জিনিস আমরা নেব না, এ-জিনিস আমাদের সঙ্গে খাপ খায় না। বিমান মুখের মধ্যে ঢোঁকটাকে রেখে বসে রইল, গিলতে পারল না। ফেলতেও না।

তার পাশ ঘেঁষে বসে আছে সেই সমবেদনাশীল ছেলেটা, যে তাকে ডেকে বসিয়েছে এইখানে। সে ছেলেটা তেমনই আদর করার মতো গলায় জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে?

বিমান ঢোঁকটা গিলে ফেলল। কাশির দমকে চোখে জল এসে গেল তার। অস্ফুটভাবে বলল, ভীষণ ঝাঁঝ আর তেতো-তেতো। এতে কী আছে?

কী জানি! শালারা কত কিছু মেশায়। কারবাইড থাকতে পারে কিংবা যে-কোনও পয়জন। কিন্তু ও-সব সয়ে যায়, ইম্যুনিটি ফর্ম করে গেলে কিছুই আর হয় না। আমি তো বিলিতি জিনিস কত খেয়েছি কিন্তু বাংলা মালের তুলনা হয় না। আহা, বাংলার মাটির জিনিস, বাঙালির হাতে তৈরি—

বলতে বলতে ছেলেটা কথা থামিয়ে গুনগুন করে গাইতে লাগল, বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার—

ও আমার সোনার বাংলা, আর-একজন আধ-চেতন সুরে গায়, তারপর হেসে ওঠে।

সেই সমবেদনাশীল ছেলেটা নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, কোথায় বেরিয়েছিলেন?

আমার বড্ড মাথা ধরেছিল।

খেয়ে নিন। মাথা যে আছে টেরই পাবে না।...কোথায় থাকেন?

কাছেই।

একা?

হুঁ।

ছেলেটা হাসল। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলল, তা হলে আপনার জন্য আরও ফাস্ট ক্লাস বন্দোবস্ত করতে পারি। ওই যে মেয়েটা, ওকে ঘরে নিয়ে যান। ও আপনার মাথা টিপে দেবে, পদসেবা করবে, ঘুম পাড়াবে। দারুণ এক্সপার্ট মেয়ে, নেবেন সঙ্গে? ভয় নেই, ওকে কিছু দিতে হবে না। টাকা-পয়সা যা দেওয়ার আমরা দিয়ে রেখেছি।

মেয়ে! মেয়ে দিয়ে বিমান কী করবে! শুনে সে ভীষণ চমকে ওঠে, ভয় পেয়ে বলে, না, না, তার দরকার নেই।

শুনে ছেলেটা ভীষণ হতাশ হয়। বলে, নিল না। মেয়েদের যা যা থাকে ওর সব আছে, বয়সও এমন কিছু বেশি হয়নি। কেবল আমাদের কাছে একটু পুরনো হয়ে গেছে। রোজ আসে তো, তাই। কিন্তু আপনার কাছে বেশ নতুন লাগবে। নিয়ে যান। বলে ছেলেটা মুখ ফিরিয়ে মেয়েটাকে ডেকে বলে, পারুল, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যাবে? যাও না, খুব ভাল লোক।

মেয়েটা ফিরেও দেখে না। আর বিমানের ভীষণ ভয় করে। সেই ছেলেটা বলে, নিন না। আপনার ভালর জন্যই বলছি।

বেদিটাকে ঘিরে আরও সাত-আটজন বসে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারে তাদের কারও মুখই ভাল দেখা যায় না। তাদের মধ্যে কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল, কে নেবে পারুলকে? কোন শালা? আজ পাল আমার।

এই কথা বলে ছেলেটা ও-পাশ থেকে উঠে পারুলের সামনে দাঁড়ায়। খস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে এক হাতে ধরে অন্য হাতে মেয়েটার থুতনি তুলে ধরে মুখ দেখার চেষ্টা করে। বলে, তুমি আমার নও?

মেয়েটা ঝটকা মেরে ছেলেটার হাত সরিয়ে দেয়। ছেলেটা তখন দেশলাইয়ের কাঠি ফেলে দু’ হাত বাড়িয়ে খিমচে ধরে মেয়েটাকে। রে-রে করে হাসে মেয়েটা ডানা ঝাপটানোর মতো শব্দ করে।

প্রকাশ্যে, একটু আধো-অন্ধকারে ব্যাপারটা চলতে থাকে। এ-পাড়াটায় ভদ্রলোক কেউ থাকে না, বটগাছের উলটো দিকে একটা পোড়ো মাঠ, তার ও-পাশে বস্তি। আশেপাশে দু’-একটা গরিব-গুরবোর দীন-দরিদ্র বাসা রয়েছে। কিন্তু কোনওখান থেকেই কোনও প্রতিবাদ আসে না, দূর থেকে ছুটে আসে না লোক। হয়তো ওই সব বাসায় যারা থাকে তারা অন্ধকারে জানালায় খড়খড়ি খুলে দৃশ্যটা দেখার চেষ্টা করছে নিঃশব্দে, হয়তো বউকে ফিসফিস করে বলছে, কী কাণ্ড হচ্ছে দেখেছ, সেই বদ ছেলেগুলো গো—একটা মেয়েকে। বউ হয়তো চাপা রাগের স্বরে বলছে, তা তোমার ওখানে দরকার কী? দিনকাল ভাল না, জানালা বন্ধ করে চলে এসো...

এবার ভাঁড়ের তরল পদার্থটার কোনও তেতো-কটু স্বাদ পেল না বিমান। ঢকঢক করে জলের মতো খেয়ে নিল। কিন্তু সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ চমকে মেঘ ডেকে উঠল যেন। কান মুখ চোখে ঝমঝম বাজনা বেজে উঠল। মনে পড়ে গেল বিকেলে সে একটা মেয়েকে বাঁচিয়েছে। সরল শিশুর মতো একটি মেয়েকে। মেয়েটা কাঁদছিল। সব মেয়েই কাঁদে। কেননা, মানুষের জন্মের রহস্য বাঁধা থাকে তারই আঁচলে। সে জানে, তাকেই সন্তানের ভার বহন করতে হবে, বহু কষ্টে জন্ম দিতে হবে। তবে সে কেন বহন করবে যেমন তেমন সন্তান? সে কেন চাইবে যে খুশি সন্তান দিয়ে যাক তার গর্ভে? বরং সে মনে মনে অপেক্ষা করে শ্রেষ্ঠ একজন পুরুষের, যাকে সে হয়তো কখনও পায়, কখনও পায় না, কিন্তু অপেক্ষা করে থাকে। যদি শত পুরুষেও তার দেহ ছিঁড়ে খায় তবু সে স্বভাবে থাকে একগামী, যাকে সে হয়তো কখনওই দেখেনি সেই শ্রেষ্ঠ একজন পুরুষ তার অন্তরে স্বামী হয়ে থাকে। তাই মেয়েমানুষকে না চিনলে তাকে কখনও ছুঁতে নেই। কিন্তু মূর্খ চাষার মতো বহুগামী পুরুষ মাটি না-চিনে বীজ ছড়িয়ে যায়। পৃথিবীতে কত মানুষ তাদের বিবাহিতা স্ত্রীদের বলাৎকার করে যায় নিজের অজান্তে। কখনও বোঝে না একটি প্রতিক্রিয়া কত দূর সর্বনাশ নিয়ে আসে।

বট গাছ ছাড়িয়ে একটু দুরেই অন্ধকারে বাতি নেবানো একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সিটা বোধ হয় এদেরই। ছেলেটা পারুলকে সেই দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অনিচ্ছায় যাচ্ছে পারুল, তাকে যেতে হবে বলে। সে টাকা নিয়েছে। অন্য ছেলেগুলো চুপচাপ বসে থাকে।

মাথার মধ্যে তীব্র যন্ত্রণায় হঠাৎ কেমন ভোঁতা হয়ে আসে। এক ডেলা মাটির মতো অর্থহীন লাগে মাথাটাকে। বিমানের হাত-পা অবশ হয়ে আসে। মাথা ঝিমঝিম করে। সে হঠাৎ পাশের ছেলেটাকে ফিসফিস করে বলে, আমি ওকে, ওই পারুলকে নিয়ে যাব।

ছেলেটা হেসে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে, গদা, পারুলকে ছেড়ে দে, এই ভদ্রলোক রাজি আছেন।

ছেলেটা বলে, ফোট, শালা। আজ পারুল আমার। আমার হাত কামড়ে দিয়েছে পারুল, খিমচে দিয়েছে গালে, তবু আমি ভালবাসায় জ্বলে যাচ্ছি।

শুনলেন তো, ও ছাড়বে না। আপনি যান, না, ওর সঙ্গে লড়ে কেড়ে নিন পারুলকে। যদি পারেন তবে আমরা সবাই ক্ল্যাপ দেব। যান না!

ছেলেটা তাকে ঠেলে তুলে দেয়।

বিমান উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু ঠিকমতো দাঁড়াতে পারে না। পা অবশ হয়ে আসে। সে আবার পড়তে পড়তে সামলে নেয়। এমন অশালীন, কুৎসিত একটা দৃশ্য সে আর কখনও দেখেনি। বহু পুরুষের মধ্যে একটি মেয়েকে নিয়ে টানাটানি। আজ বিকেলে সে একটি মেয়েকে বাঁচিয়েছে। যে-মেয়েটা বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু হায় ঈশ্বর, এই নষ্ট মেয়েটা যে জানেও না সময়মতো কেঁদে উঠতে। একটু পরেই ওর জোর নষ্ট হয়ে যাবে, আর তারপর—

হঠাৎ দু'হাত ওপরে তুলে বিমান চেঁচিয়ে উঠল, বাঁচাও—বাঁচাও—

কিন্তু কিছু হল না। গলার স্বর ফুটল না তেমন। হতাশভাবে ভীত চোখে বিমান দেখল অন্ধকারে ছেলেগুলো সবাই তার দিকে মুখ ফিরিয়েছে। তাদের সিগারেট জ্বলছে।

কিন্তু কেউ কিছু করার আগেই বিমান খুব ক্লান্তভাবে মাটিতে পড়ে গেল। চোখ বোজার আগের মুহূর্তে তার মনে হল, সে একা বড় অসহায়। বিপক্ষের শত্রুদল বড় প্রবল। এখন খুব শক্তিমান, খুব প্রকাণ্ড কেউ যদি তার

পাশে থাকত!

তারপর আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল বিমান।

খুব ভোরে তার ঘুম ভাঙল, সূর্যের প্রথম আলোটি চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিগুণ বেগে দপদপ করছে মাথার শিরা। ভাল করে চোখ খুলতে সময় লাগল অনেক। চেয়ে দেখল সে গাছতলায় পড়ে আছে। তার চারদিকে ভাঙা মাটির ভাঁড়, শালপাতা, কয়েকটা দেশি মদের বোতল, ধুলোয় জুতোর ছাপ। দু'-একজন কৌতূহলী লোক পথ চলতি না-থেমে তাকে দেখতে দেখতে চলে যাছে।

ঘরে ফিরে তালা খুলে ভিতরে ঢুকতেই সে একটা জিনিস টের পেল। বহুকাল বাদে তার মাথার ভিতরটা আবার ফাঁকা লাগছে। সে মাথা ঝাঁকাল, কিন্তু স্পষ্ট টের পেল মাথার ভিতরে আকাশের একটা অংশ ঢুকে আছে। বেরোচ্ছে না। আস্তে আস্তে বেলা বাড়তে লাগল, আর সে টের পেতে লাগল কোন সুদূর থেকে আকাশের শূন্যতা তুষারপাতের মতো নিঃশব্দে তার মাথার ভিতরে খসে পড়ছে।

খুব বিষন্ন গেল বিমান। আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই সে আবার কিছু দিনের জন্য পাগল হয়ে যাবে। পাগল হয়ে যাওয়ার আগে এই লক্ষণগুলো তার খুব চেনা। এখন পরিচিত সবাইকে এই খবরটা তার জানিয়ে দিতে হবে। তোমরা সবাই সাবধান থেকো, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

একুশ

আর-একবার ব্যর্থতার স্বাদ পেল ললিত। গভীর হতাশায় ডুবে যেতে লাগল। সে আর কোনও ঘটনাই ঘটাতে পারে না পৃথিবীতে।

দুপুরে খাওয়ার পর তীব্র অম্বল বর্শার ফলার মতো বুক চিরে উঠে আসছিল। একটু পরেই বমি হয়ে যাবে। ললিত কাত হয়ে শুয়ে, শরীরটাকে মুচড়ে, বালিশে মুখ ঠেসে বমিটা ঠেকানোর চেষ্টা করছিল। হাতে জ্বলে যাচ্ছে বৃথা সিগারেট, ঠোঁট পর্যন্ত আনতে পারছে না সে। বালিশে মুখ গুঁজে সে একটা অস্ফুট 'অঃ ক' শব্দ করে।

মা বাসায় নেই। কারও বাড়িতে গিয়ে বসেছে আড্ডয়। বুকের ভিতরটা ভরদুপুরে একা কেমন খাঁ খাঁ করে। দুপুর তার কোনও দিন কাটতে চায় না। কেমন ঝিম ধরে যায় মনে, বড় একা লাগে। দুপুরেই তার মিতুর কথা মনে পড়ে কিংবা মরবার কথা।

জানালার শিকের ভিতর দিয়ে ঘরে এসে মুখ বাড়িয়েছে পেয়ারা গাছের কয়েকটি পাতা। হাওয়ায় নড়ছে। সবুজ, কচি। নতুন জন্মেছে তারা, এখনও ধুলো বালি পড়েনি তাদের গায়ে। শিশুর মতোই নিস্পাপ দেখাচ্ছে। শিশুর মতোই যেন এক মুখশ্রী রয়েছে তাদের। ললিতের ইচ্ছে করে উঠে গিয়ে সে একটু ওদের আদর করে আসে।

পেয়ারাপাতার শিশুমুখ লক্ষ করে সে বড় অবাক হয়। বড় ভাল লাগে তার। সেই দিকেই স্থির চোখে চেয়ে থেকে, ক্লান্ত হয়ে ক্রমে তার চোখ বুজে আসে। তন্দ্রা এসে যাচ্ছিল তার। বমিট হয়তো শেষ পর্যন্ত হবে না।

এমন সময় টের পায়, খোলা দরজা দিয়ে কে যেন নিঃসাড়ে ঘরে এল। মা কি? না তো, মায়ের গন্ধ সে চেনে। চোখ খুলল না ললিত। অপেক্ষা করতে লাগল। মনে হচ্ছিল, মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কে যেন তাকে দেখছে। শ্বাশ বন্ধ করে রইল সে। যে এসেছে সে বোধ হয় পৃথিবীর কেউ নয়। সে এসেছে ওইপার থেকে, যে-পারে তাকে শিগগিরই যেতে হবে। চোখ খুললেই সে দেখবে একজন একটা টিকিট এগিয়ে ধরে রেখেছে তার দিকে, সে বলবে, তোমার টিকিট হয়ে গেছে, জাহাজ ছাড়তেও আর দেরি নেই।

কিংবা, যে এসেছে সে হয়তো আদিত্য। ললিত চোখ চাইলেই বলবে, ট্রেটার! শাশ্বতীকে ফিরিয়ে দে।

ললিত!

চমকে চোখ খুলল ললিত। আস্তে আস্তে উঠে বসল। ক্লান্ত গলায় বলল, বোসো বিমান।

বিমানের চোখ লালচে, রুক্ষ চুল, স্নান-না-করা ধুলোটে চেহারা। সে নিবিড়ভাবে ললিতের দিকে চেয়ে ছিল। শ্বাস ফেলে বলল, ললিত, আমি আবার পাগল হয়ে যাচ্ছি।

সে কী? ললিত অবাক হয়ে বলে, কী হয়েছে?

কী জানি! মাঝে মাঝে এমনিই এটা হয়, কোনও কারণ থাকে না। আবার কখনও কোনও একটা ধাক্কা খেলে এটা হয়। কাল অনেক রাতে আমি একটা ভাড়াটে মেয়েকে কয়েকজন গুন্ডা ছেলের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে বিমান বলে, কয়েক দিনের মধ্যেই আমার পাগলামি শুরু হবে। আমি টের পাচ্ছি।

ললিত নড়েচড়ে বসল। বলল, কাল বিকেলেও তুমি একজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলে, না বিমান?

মাথা নিচু করে একটু বসে থাকে বিমান। তারপর বলে, একে বাঁচানোটা তার চেয়ে শক্ত ছিল। কারণ এ বাঁচতে চায়নি। ওই যে বটগাছতলায় বাঁধানো বেদি আছে, ওখানে কয়েকজন ছেলের সঙ্গে সে বসে ছিল, অনেক রাতে, অন্ধকারে আমি তার মুখও দেখিনি।

ললিত বড় বড় চোখে চায়। বলে, আই বাপ, বিমান, ওটা যে শচীনদের আড্ডা, ওরা ওখানে চোলাই খায়।

বিমান মাথা নাড়ে, বলে, জানি। মেয়েটাকেও ওরা ভাড়া করে এনেছিল, আমি জানতাম। চা খেতে বেরিয়ে আমি ওদের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলাম! কিন্তু তারপর যখন একটা ছেলে সেই মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন— বুঝলে—তখনই আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। জানি মেয়েটা নিজের ইচ্ছেয় এসেছে, ওটাই তার কাজ তার রুজি-রুটি, তবু মনে হল সে যেন ভিতরে ভিতরে বেঁচে যেতে চাইছে, সেটা কেউ বুঝতে পারছে না।

ললিত জিব দিয়ে চুকচুক করে একটা আফসোসের শব্দ করে বলে, রাতারাতি তুমি পৃথিবী পালটে দিতে চাও?

বিমান একটা শ্বাস ফেলে বলল, আমার এ-রকম হয়। আগে আমি কত, নিরীহ ছিলাম, যা-কিছু চোখে পড়ত তা থেকেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের ভাবনা-চিন্তার মধ্যে ডুবে যেতাম। জানি তো আমি কেমন দুর্বল মানুষ! কিন্তু কাল রাতে আমি চেঁচিয়ে লোক ডাকছিলাম, বলছিলাম, বাঁচাও, কে কোথাও আছো—। কেউ এল না, কেউ সাড়াও দিল না। কিন্তু নিশ্চয়ই অনেকে সেই ডাক শুনেছিল। তবু কেউ আসেনি। কেন জানো? তারা সবাই আমারই মতো নিরীহ, চোখের সামনে অন্যায় দেখলে চোখ ফিরিয়ে নেয়, কেউ 'বাঁচাও' বলে চিৎকার করলে কানে হাত চাপা দেয়। আমি এতকাল সবাইকেই আমার চেয়ে সাহসী আর শক্তিমান ভেবেছি। কিন্তু বৃথা, কেউ তা নয়।

ললিত একটু হেসে বললে, কিন্তু আমি তোমার ডাক শুনতে পাইনি।

পেলে কী করতে? যেতে?

নিশ্চয়ই।

আর যখন গিয়ে দেখতে যে আমি কতকগুলো বাজে ছেলের হাত থেকে একটা নষ্ট মেয়েকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছি, তখন কী করতে? লড়াই করতে ওদের সঙ্গে?

না

বিমান উত্তেজিতভাবে ললিতের একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়, না! না। কেন

সেটা পণ্ডশ্রম হত। ওই ছেলেগুলো ওইরকম, মেয়েটাও ওইরকম, সেখানে আমাদের কী করার আছে?

নেই! বিমান হতাশ হয়, নেই কেন! তুমি কি ওদের সমর্থন কর

ললিত ভ্রূ কুঁচকে উত্তেজিত বিমানকে একটি দেখল। তারপর বলল, না, সমর্থন করি না। কিন্তু ওরা যে খুব একটা অন্যায় করছিল তাও তো নয়! কেউ যদি নিজের পয়সায় মদ খায়, ভাড়াটে মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে তাতে আমার কী? মদ খাওয়া বারণ নয়, প্রস্টিটিউটদেরও লাইসেন্স আছে—

ঠিক। কিন্তু তোমার মন কী বলে। কাল বিকেলে দেখছিলাম তুমি আদিত্য আর শাশ্বতীর বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছ। মেয়েটা বিয়ে করতে রাজি নয়, যে-কোনও কারণেই হোক সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। তবু তুমি তাকে গায়ের জোরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি মনে মনে বুঝতে পারছিলে এটা অন্যায়, তবু তুমি তোমার অহংকার আর নিরপেক্ষতা বজায় রাখছিলে। আমি এখনও জানি না ওই মেয়েটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী! তবু আমার বিশ্বাস তুমি ওর ওপর একটা ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে চাইছিলে। তাই অত জোর দেখিয়েছিলে তুমি। নিরপেক্ষতার ভান করেছিলে। তবু তোমার মুখ সাদা হয়ে যাচ্ছিল, তোমার হাত কাঁপছিল। কাল শাশ্বতীর জন্য আমার ততটা কষ্ট হয়নি, যতটা তোমার জন্য হচ্ছিল।

ললিত চোখ নামিয়ে বলল, তার সঙ্গে এ-ঘটনার সম্পর্ক কী?

বিমান মৃদু হাসল। বলল, কাল যদি আমিও তোমার মতো নিরপেক্ষ থাকতাম তা হলে আজ তুমি হাত কামড়াতে, চুল ছিঁড়তে, গাল দিতে নিজেকে। তুমি অত নিরপেক্ষ থেকো না, তা হলে একদিন তোমার ঘরে চোর ঢুকবে আর তুমি দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকবে।

ললিত মাথা নাড়ল, কিন্তু বলো, কালকের মেয়েটাকে তুমি বাঁচাতে চেয়েছিলে কেন?

বিমান নিজের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, যখন ওই ইতর ছেলেটা নষ্ট মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন মেয়েটার কোনও উপায় ছিল না। সে সতী নয়, ঘরের বউ নয়, চল্লিশ কি পঞ্চাশ টাকায় সে কেনা হয়ে গেছে, তার পছন্দ-অপছন্দ নেই, যে কিনবে সে তার। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে, সে-মেয়েটা এ রকম চাইছিল না। কেউ তাকে কিনে জিনিসপত্রের মতো যেমন খুশি ব্যবহার করুক, এটা কে চায়! আমার মনে পড়েছিল, বিকেলে শাশ্বতীকেও ভোমরা টেনে নিয়ে যাচ্ছিলে, সেও যাচ্ছিল, সে হয়তো সইও করত, কারণ সে বুঝতে পারছিল যে, তার উপায় নেই। না, না, তুমি রাগ কোরো না, শাশ্বতীর সঙ্গে আমি সে-মেয়েটার তুলনা করছি না। কিন্তু আমার কাছে দুটোই অনেকটা এক ব্যাপার। বিকেলে শাশ্বতীকে যেমন দেখেছি, রাত্রিবেলায় ওই মেয়েটাকেও ঠিক ওই রকম দেখেছিলাম, উপায়হীন বলে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কিছু লোক।

ললিত একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, তুমি পাগল।

বিমান গম্ভীরভাবে বলল, ঠিক। ললিত, যেদিন আমি দুটো ছিনতাইবাজ লোকের কাছ থেকে আমার ঘড়ি আর মানিব্যাগ কেড়ে নিলাম, সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমি এ-রকম কাজ আবার করব এবং করতে থাকব। আমার স্বভাবের নিয়ম পালটে গেছে। কিন্তু তার ফল এই হবে যে, একদিন কেউ আমাকে নিঃশব্দে সরিয়ে দেবে, কাজের বাধা হচ্ছে বলে। কে আমাকে রক্ষা করবে তখন? কে আমার সহায় হবে? মানুষের মধ্যে তেমন শক্তিমান কাউকে দেখি না। তার চেয়ে এই ভাল যে, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি...আঃ, কিছু দিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

বিমান একটুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল। মুখে মৃদু একটু হাসি। তার মাথার মধ্যে চমৎকার নীলাভ আকাশখানা আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছে। মাথার ভিতর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সব চিন্তা, স্মৃতি, ক্ষোভ।

ললিত অস্বস্তি বোধ করে। দাঁতে নখ কামড়ায়। তারপর একসময়ে বিমানের গায়ে হাত দিয়ে বলে, কী ভাবছ?

আকাশ। ধীর স্বরে এই কথা বলে চোখ খুলে বিমান একটু হাসে, বলে, আকাশের চিন্তাই ভাল। আর দু'-এক দিনের মধ্যেই আমার ভিতরটা আকাশে ভরে যাবে। চারদিকে কিছুই আর চোখে পড়বে না। তখন যে খুশি এসে কেড়ে নিক আমার ঘড়ি কিংবা মানিব্যাগ, যার খুশি জোর করে বিয়ে করুক শাশ্বতীকে, সেই বদ ছেলেগুলো যেমন খুশি বেলেল্লাপনা করুক পারুলের সঙ্গে, তাতে আমার আর কিছু যাবে আসবে না।

হঠাৎ ললিতের বড় লজ্জা করে। সে মুখ নিচু করে বলে, আমরা কী করতে পারি বলো!

বিমান মাথা নাড়ল। বলল, কিছু না। কাল রাতে আমার মনে হয়েছিল একজন খুব শক্তিমান মানুষের বড় দরকার, যিনি মানুষের এক ডাকে ছুটে আসবেন। ওই ছেলেগুলো বোমা মারে, ছোরা চালায়, আর ওই মেয়েটা ভাড়াটে। কে আসবে ওদের হাত থেকে ওই ন্যাকা ঢঙি মেয়েটাকে বাঁচাতে! সেটা হবে একটা হাস্যকর কাজ। কারণ, মদ খাওয়া বারণ নয়, বেশ্যাদেরও লাইসেন্স আছে। কাজেই আসতে চাইলেও বউ দরজা আটকে দাঁড়াবে, বাধা হবে ভয়, দুর্বলতা, কিংবা নিরপেক্ষ থাকার ইচ্ছা। কাজেই একমাত্র সেই লোকই ছুটে আসতে পারে যার ঘর-সংসার নেই, পরিবার পরিজন নেই। মানুষ ডাকলে সে নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। তেমন একজন মানষকে বড় দরকার—সবাই তেমন একজন মানুষের অপেক্ষা করছে—যার দিকে নির্ভর করে দু'হাত বাড়িয়ে বলা যায়, বাঁচাও—আমি শাশ্বতী—আমি পারুল—আমি ললিত—আমি বিমান—আমাকে বাঁচাও...

ললিত হাসে, কোথায় পাবে?

বিমানের চোখ চিকমিক করে, হঠাৎ বলে, যদি না-থাকে, তবে একজন কাউকে তৈরি করে নিতে হবে।

পাগল।

বিমান আস্তে আস্তে আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তারপর করুণ মুখ করে বলে, আমার একটা উপকার করবে?

কী?

পকেট থেকে অপর্ণাকে লেখা চিঠিখানা বের করে বিমান। বলে, এই ঠিকানায় মেয়েটাকে চিঠিটা পৌঁছে দেবে? ডাকে দিতে পারতাম, কিন্তু ওদের বাড়ির অভিভাবকেরা মেয়েদের নামে চিঠি এলে খুলে পড়ে, তারপর দেয়। তুমি দিয়ে আসবে ওর হাতে?

ললিত অবাক হয়, বলে, কী করে! আমি একটা অচেনা লোক, ওদের বাড়িতে—

বিমান বাধা দিয়ে বলে, না, বাড়িতে নয়। চিঠিতে একটা ফোন নম্বর দেওয়া আছে। আগে ওকে ফোন করো, কিন্তু নিজে কোরো না, পুরুষের গলা শুনলে ওরা অপর্ণাকে ডেকে দেবে না! তুমি বরং কোনও মেয়েকে দিয়ে ফোন করিয়ে। অপর্ণা ফোন হাতে নিলে তুমি কথা বলবে। বাড়ির বাইরে কোথাও একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিয়ো। খুব শক্ত না, তবে একটু ঝামেলার ব্যাপার। পারবে?

তুমি নিজে গেলে না কেন?

দূর! ওরা আমাকে ঢুকতেই দেবে না।

কেন

বাঃ, আমি—আমি পাগল না!

ললিত একটু ইতস্তত করল। তারপর হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল। বিমান বলল, চারটের পরে যেয়ো, তখন ও কলেজ থেকে ফিরবে।

চারটের একটু আগেই ললিত ঘরে তালা দিয়ে বেরোল। শম্ভুর ছোট ভাইটা একা একা সিঁড়িতে বসে সিগারেটের কুড়ানো প্যাকেট গুনছে। তাকে ডেকে বলল, মা কোন বাড়িতে গেছে জানিস?

ওই তো, হালদারদের বাড়ি।

ঘরের চাবিটা দিয়ে আসবি? বলিস, ফিরতে একটু দেরি হবে।

ঘাড় হেলিয়ে চাবিটা নিয়ে দৌড়ে গেল ছেলেটা।

ললিত খানিক দূর হাঁটল। তখনও গলা বুক ঢকঢক করছে অম্বলে। হাঁটতে গেলে পাঁ কাঁপছে। শ্বাস ফেটে যাচ্ছে মাঝে মাঝে আমি কি পারব শেষ পর্যন্ত? ভাবল ললিত। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে সে আনোয়ার শা রোড় পর্যন্ত হেঁটে গেল। বেরিয়ে এসে বাইরের রোদে হাওয়ায় চমৎকার লাগছে তার। কিন্তু শরীর দিচ্ছে না।

একটু দূরে ফিল্ম-স্টুডিয়োটার সামনে একটা ট্যাক্সি খালি হচ্ছে। পকেটে হাত দিয়ে সে টাকা কয়টা গুনে দেখল। পাঁচ টাকা আর কিছু খুচরো আছে। হয়ে যাবে। তারপর দূর থেকে অসহায়ভাবে দুর্বল হাত তুলল ললিত। মনে মনে বলল, হে ভগবান, ট্যাক্সিওয়ালাটা যেন আমাকে দেখতে পায়, আর অন্য কেউ যেন ওটাকে ধরে না-ফেলে।

ট্যাক্সিওয়ালাটা দেখতে পেয়েছিল তাকে। ধীর গতিতে সামনে এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সিতে উঠে নিশ্চিন্তে ঘাড় হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে হঠাৎ তার মনে পড়ল একটু আগে ট্যাক্সিটার জন্য সে ভগবান—অর্থাৎ ভগবান নামে একটা অলীক বস্তুকে ডেকেছে। সে একটু মৃদু হাসল। ট্যাক্সিটা সে পেয়েছে, তবে এবার কি ভগবানকে বিশ্বাস করবে? করতে মাঝে মাঝে বড় ইচ্ছে হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করা যায় না। বিশ্বাস করুক আর না করুক, তবু যদি ভগবানের ইচ্ছেয় সে ট্যাক্সিটা পেয়ে থাকে তবে তাকে তার একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তাই সে ফিসফিস করে বলল, ধন্যবাদ। তারপর নিজের কাছেই লজ্জা পেল।

গড়িয়াহাটার কাছে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল ললিত।

চারদিকে অনেক টেলিফোন করার জায়গা রয়েছে। কিন্তু এখন দরকার একজন মেয়েকে।

কিন্তু এখন মেয়ে কোথায় সায় ললিত! একটি বেশ ভদ্র, সভ্য, শান্ত এবং চালাক মেয়ে! ললিত আপন মনে একটু হাসল। তারপর মনে মনে বলল, মাইরি, ভগবান, একটা মেয়ে জুটিয়ে দাও দেখি, যে-মেয়ে কথা বলতে গেলেই ভ্রূ কোঁচকাবে না, তেড়ে আসবে না, বেশ দয়ালু গোছের একজন...

আশ্চর্যের বিষয়, পেট্রল পাম্পের জানালা দিয়ে টেলিফোন টেনে এনে বাইরে দাঁড়িয়ে ফোন করছে একটা মেয়ে। চোখে চশমা, হাতে বটুয়া, হলদে শাড়ি পরা, বেশ ধারালো বুদ্ধির চেহারা মেয়েটির। কথা বলতে বলতে হাসছে। মিষ্টি হাসিটি। ললিত নিঃশব্দে তার অদূরে গিয়ে বশংবদভাবে দাঁড়াল। অপেক্ষা করতে লাগল।

মেয়েটা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল, তারপর এক সময়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে এক পলক দেখে টেলিফোনে বলল, এই ছেড়ে দিচ্ছি, পিছনে লোক অপেক্ষা করছে... আচ্ছা!

মেয়েটি পয়সা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই ললিত পথ আটকাল।

প্লিজ যদি একটু উপকার করেন।

একটুও ঘাবড়াল না মেয়েটা। নরম মুখে বলল, বলুন।

একটি মেয়েকে একটু টেলিফোনে যদি ডেকে দেন। ওর গার্জিয়ানরা— মেয়েটি ঝিলিক দিয়ে হাসল, বলল, বুঝেছি। নাম্বারটা দিন। আর নামটা।

ললিত বলল, তারপর শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল। মেয়েটা দ্রুত অভ্যস্ত হাতে ডায়াল ঘুরিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, হ্যালো—অপর্ণা আছে?...আমি মীরা ওর সঙ্গে...

মেয়েটি মাউথপিসে হঠাৎ হাত চাপা দিয়ে ললিতকে তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, কলেজে পড়ে তো!

হ্যাঁ।

কোন কলেজে?

'হে ভগবান', ললিত মনে মনে দ্রুত বলল, 'কোন কলেজে?' হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল, সুবল বলেছিল লেডি ব্র্যাবোর্ন।

লে—লেডি ব্রাবোর্ন।

মেয়েটি মিষ্টি গলায় টেলিফোনে বলল, হ্যাঁ আমরা এক ক্লাসের মাসিমা।...কে, অপর্ণা? এই যে ভাই, কথা বলুন—আমি কিন্তু মীরা—

মিষ্টি একটু হাসল মেয়েটি। ললিত হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা নিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, ধন্যবাদ। মেয়েটি ঘাড় হেলিয়ে চলে গেল।

ও-পাশ থেকে খুব সতর্ক সরু একটা মেয়ে-গলা বলল, কী রে—মীরা?

ললিতের গলা কাঁপছিল, সে ঘাবড়ে যাচ্ছিল। বলল, আমি বিমান রক্ষিতের বন্ধু, আমার নাম ললিত।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল না।

বিমান একটা চিঠি দিয়েছে আপনাকে। সেটা কোথাও এসে আপনাকে নিতে হবে।

ইস, দ্যাখ তো, কী বিচ্ছিরি সময়ে বললি, চারটে বেজে গেছে, বিকেলে আবার আমার মিউজিক ক্লাস। কোথা থেকে ফোন করছিস?

অস্বস্তি বোধ করে ললিত বলল, গড়িয়াহাটা।

আচ্ছা, শোন মীরা, আমি যাচ্ছি তোর বাসায়, আর আধ ঘণ্টা পর, মিউজিক ক্লাসে যাওয়ার পথে।...ইস, তুই আজই লক্ষ্নৌ যাচ্ছিস আগে বলিসনি তো! হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল?...ফোন করে ভাল করেছিস পি এস-এর নোটটা না হলে একদম প্রিপ্যারেশন হত না...

ললিত হঠাৎ বুঝতে পারলে মেয়েটা তাকে সময় দিচ্ছে। এবার তাকে একটা জায়গার নাম বলতে হবে। সে দ্রুত চিন্তা করে বলল, হিন্দুস্থান মার্টের ভিতরে যে চায়ের দোকানটা আছে, ওইখানে। সাড়ে চারটে।

ইস, তোকে কি আর চিনতে পারব, যা মুটিয়ে ফিরবি লক্ষ্ণৌ থেকে!

ললিত ইঙ্গিত বুঝল। বলল, আপনার পোশাকটা বলুন। আমিই আপনাকে চিনে নেব।

পরশুদিন যা একখানা শাড়ি কিনেছি না রে, দেড়শো টাকাও বলবি সস্তা। জামদানির ওপর পিঙ্ক বাটিকের কাজ। আজ পরে যাব, দেখিস...আচ্ছা ছাড়ছি...কেমন!

টেলিফোন রাখার পর ললিত টের পেল তার কপাল ঘামছে।

আরও আধঘণ্টা সময় আছে। কিন্তু একটু যে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবে ললিতের সে সাধ্য নেই। তাই সে আস্তে আস্তে হেঁটে হিন্দুস্থান মার্টের নির্জন চায়ের দোকানটায় এসে বসল। এক কাপ চা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ তার মনে পড়ল একজনের একটা পাওনা সে এখনও চুকিয়ে দেয়নি। ঠিক সময়ে সে ঠিক মেয়েটিকে পেয়ে গিয়েছিল টেলিফোন করার জন্য, আর অপর্ণার কলেজের নামটাও মনে পড়েছিল ঠিক সময়ে। মৃদু একটু হাসল ললিত আপনমনে, তারপর একদম ফাঁকা রেস্টুরেন্টটায় একটু চোখ বুলিয়ে অনুচ্চ ফিসফিস স্বরে বলল, ধন্যবাদ, তুমি খুব ভাল।

উত্তেজনাটা বড় চমৎকার লাগছিল ললিতের। এখন তার ইচ্ছে করছে আরও বহুবার এইরম রহস্যময়ভাবে সাংকেতিক ভাষায় অচেনা মেয়েদের ফোন করে দুপুরবেলায় এ-রকম রোজ এসে বসে থাকে এ-রকম রেস্তরাঁয়, কারও জন্য অপেক্ষা করে। এ-রকম কত কিছু হতে পারত জীবনে, ঠিক যেন অলৌকিক কাণ্ড সব!

একটু অন্যমনস্ক ছিল ললিত। হঠাৎ সিগারেট ধরিয়ে মুখ তুলে দেখল চমৎকার শাড়ি পরা একটি রোগা ফরসা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। মুখখানা লম্বাটে একটু কিশোরীর মতো মুখশ্রী। চোখ দুটো বড়, কিন্তু একটু ভারী। খুব কাঁদলে যেমন চোখের চেহারা হয়। তবে এ-মেয়েটি কাঁদেনি, চোখ দুটোই ও-রকম। মুখের হাসিটুকু দেখে মনে হয় এ খুব বেশি হাসে না কখনও। আঁচল ডান ধার দিয়ে ঘুরিয়ে এনে সমস্ত শরীরটা ঢেকেছে।

একটু হেসে বলল, আপনিই ললিত?

ললিত মাথা নেড়ে বলল, বসুন।

বসল। তারপর একটু বিব্রত হেসে বলল, টেলিফোনে আমার কথা শুনে খুব হেসেছেন, না? কী করব বলুন, আমাদের বাড়ির ওইরকম নিয়ম।...কই, চিঠিটা দেখি।

দেড়-দুই লাইনের চিঠি, তবু বুকের কাছে তুলে নিয়ে ললিতের চোখের আড়াল করে গভীরভাবে পড়ল অপর্ণা। মুখখানা হঠাৎ বড় ম্লান হয়ে গেল। চিঠিটা ধরে রইল একটুক্ষণ। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনি ওর কীরকম বন্ধু? পুরনো?

যদিও মিথ্যে কথা, তবু ললিত বলল, অনেক দিনের। সেই কলেজ-লাইফ থেকে। মাঝখানে দেখাশোনা ছিল না, এখন কাছাকাছি বাসা।

ওঃ। ওকে কেমন দেখলেন?

খুব শকড।

কেন? মেয়েটা হঠাৎ ঝুঁকে তীক্ষ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল।

বলা উচিত হবে না, তাই গতকালের ঘটনা কিছু বলল না ললিত, শুধু বলল, ও অল্পেই উত্তেজিত হয়।

মেয়েটা একটু চুপচাপ থেকে হঠাৎ বলল, কিছুদিন আগে কে যেন টেলিফোন করে বাবাকে ওর নামে যা-তা কথা বলেছে। বলেছে ও নাকি আমাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, কে বলুন তো!

ললিত সামান্য শিউরে ওঠে মনে মনে। সুবলের কালো চকচকে মুখখানা মনে পড়ে, সে মাথা নেড়ে বলল, কী জানি!

হঠাৎ অপর্ণার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। স্খলিত গলায় বলল, ওকে যন্ত্রণা দিয়ে কার কী লাভ! আমার বাবা ইচ্ছে করলে ওর চাকরি খেয়ে ফেলতে পারেন, নানা রকম ট্রাবল দিতে পারেন। কাজেই বাবাকে যে জানিয়েছে তার কী লাভ? আমি ওকে এইটুক বেলা থেকে জানি, ওর মতো ভাল হয় না।

একটু চা বলে দিই!

না। অপর্ণা মাথা নাড়ল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি বাবার একমাত্র সন্তান। বাবার সব সম্পত্তি আমার। কিন্তু তাতে কারও কোনও লাভ নেই, আমি ওকেই ভালবাসি। আর কাউকে কখনও

ললিত হঠাৎ বলল, এ-সব কথা কেন বলছেন?

মেয়েটা চোখ নামিয়ে নেয়, টেবিলের নুনের কৌটোটা একটু নাড়াচাড়া করে। বলে, কী জানি! আমার কেবলই মনে হয় আমাদের যেন একটা বিপদ আসছে

বাইশ

ললিত একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কীসের বিপদ?

অপর্ণা প্রথমে উত্তর দিল না। নতমুখে টেবিলের কাছে তার সাদা প্রায় রক্তশূন্য একটি আঙুল দিয়ে কয়েকটা গোল চিহ্ন আঁকল। তারপর তার বয়সের তুলনায় ভারিক্কি বিষণ্ণ মুখখানা তুলে বলল, কয়েক দিন ধরে দেখছি আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে একটা কালোমতো ছেলে ঘুরে বেড়ায়। যেতে যেতে আমাদের বাড়ির ব্যালকনি কিংবা খোলা জানালার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। আমি যখন কলেজে যাই তখন দেখি সে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। কয়েক দিন তাকে কলেজের গেটের সামনেও দেখেছি।

চা খাওয়ার পর ললিতের অম্বলের ভাব বেড়ে যাচ্ছিল। ব্যথা করছিল বুক আর পিঠ। কেমন একটা ঘুম-ঘুম ভাব, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

অপর্ণার কথা শুনে সে একটু হাসল। বলল, তাতে কী? ও-রকম কত ছেলে পিছু নেয় মেয়েদের, তারপর বোধবুদ্ধি হলে আবার সরেও যায়। ওকে বেশি পাত্তা দেবেন না।

এ-কথা যখন বলছিল ললিত তখন তার অমোঘভাবে মিতুর কথা মনে পড়ছিল। মিতুও হয়তো নিজের বাবা মার কাছে বলত যে একটা ফরসামলতা রোগা ছেলে যাতায়াতের পথে দাঁড়িয়ে থাকে, কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো চেয়ে থাকে তাদের বাড়ির দিকে।

মেয়েটি ললিতের উপদেশ শুনল কি না বলা যায় না, বলল, পিছু-নেওয়া। ছেলে আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু এ-ছেলেটা ভীষণভাবে আমার কাছে আসার চেষ্টা করছে। একদিন দেখি আমাদের দারোয়ানের কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে সিগারেট ধরাল, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী একটু কথাও বলে গেল। পরে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ছেলেটা নাকি তার কাছ থেকে কয়েকটা ফুলের চারা চেয়েছিল। আমি দারোয়ানকে বারণ করে দিয়েছি ওর সঙ্গে কথা বলতে।

ললিত সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, তাতে কী? ওতে ভয় পাবেন না। মেয়েটির মুখে-চোখে একটু রক্তাভা দেখা যায়; নিশ্বাস চেপে খুব আস্তে আস্তে বলল, ছেলেটি আমাকে লক্ষ্য করে আমাদের মোটরগাড়ির মধ্যে একটা কাগজের দলা ছুড়ে দেয়। খুলে দেখি চিঠি। ভুল বানানে লেখা অজস্র আজেবাজে কথা। আমি কাউকে বলিনি। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস এই ছেলেটাই টেলিফোন করেছিল আমার বাবাকে। আমার কেমন যেন ভয় করে। এমন অবস্থা যে বাড়ি থেকে একা বেরোতে পারি না, ছেলেটা ভীষণ ডেসপারেট, কী জানি কী করে বসে! টেলিফোনে বাবাকে বলেছিল যে ওর বাসার কাছেই নাকি থাকে, একই পাড়ায়। সেটা জানার পর থেকে আমি আর ওর কাছেও যাই না।

পেটের মধ্যে কলকল শব্দ হচ্ছে। ছুঁচের মুখের মতো গলার কাছে খোঁচা দিচ্ছে অম্বল। হঠাৎ পেটের মধ্যে শব্দটা এত জোরে হল যে ললিতের ভয় হচ্ছিল মেয়েটা শুনতে পাচ্ছে।

ললিত উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, আমিও ওই পাড়ায় থাকি। যদি একা যেতে ভয় করে তবে আমার সঙ্গে চলুন, কোনও ভয় নেই। আপনি গেলে বিমান খুশি হবে।

মেয়েটা ম্লান হেসে বলল, কিন্তু ও যে বারণ করেছে।

ললিত বলল, কিন্তু একটু আগেই ও আমার কাছে এসেছিল। তখন দেখেছি ও নর্মাল। কথাবার্তা ভালই বলছিল। এখনও ভয়ের কিছু নেই।

মেয়েটি একটু চিন্তা করে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলুন।

অপর্ণাই তার অভিজাত ভঙ্গিতে কেবলমাত্র একটি তর্জনীর সংকেতে খালি ট্যাক্সিটা দাঁড় করাল।

দু'জন দু' কোণে বসল। মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। অপর্ণা বাইরের দিকে তাকিয়ে। আর ললিত তার বুক আর পেটের অস্বস্তিটা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একটু গা এলিয়ে সিটের পিছনে মাথা রেখে। বমিটা হয়তো হবে। এক গ্লাস জলের পর এক কাপ চা খেয়েছে ললিত। খাওয়াটা ঠিক হয়নি।

অপর্ণা মুখ ফিরিয়ে ললিতকে দেখে বলল, আপনার কি শরীর খারাপ? না।

একটু অন্যমনে চুপ করে থেকে অপর্ণা বলল, এখন আমাদের সময় ভাল যাচ্ছে না। কিছু দিন আগেই বাবার কারখানার কর্মচারীরা বাড়ির সামনে এসে জমায়েত হয়েছিল একদিন, বোনাস আর কাজের সিকিউরিটির জন্য। ইউনিয়নের লিডার এক ছোকরা এল বাবার সঙ্গে কথা বলতে। সে আমাদের বৈঠকখানায় বসে বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর সামনেই সিগারেট খাচ্ছিল। ফলে বাবা সেদিন ভীষণ রেগে যায়, আর নার্ভাস হয়ে পড়ে। সেই ঘটনার পরেই বিকেলের দিকে বাবার ব্লাড প্রেশার অসম্ভব বেড়ে যায়। রাত্রে। একটা স্ট্রোকের মতো হয়।

ললিত বলে, সে কী! ছেলেটা সিগারেট খেয়েছিল বলে?

অপর্ণা মৃদু একটু হাসল, উনি পুরনো আমলের লোক। কর্মচারীরা সামনে সিগারেট খাবে এটা উনি বরদাস্ত করতে পারেননি।

ললিতের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু সে বলল, কিন্তু এ-রকম হওয়াই তো স্বাভাবিক। দীর্ঘকাল পেটমোটা, অসৎ, অতিরিক্ত মুনাফাখোর মালিকদের সম্মান করতে করতে ওরা এই ম্যানারিজমকে আর বিশ্বাস করছে না।

এই অপ্রিয় কথাগুলো একজন মালিকের মেয়েকে তার বলার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কথাগুলো এমনিতেই বেরিয়ে এল। তাই একটু লজ্জা করছিল ললিতের।

অপর্ণা বাইরের দিকেই চেয়ে ছিল। ট্যাক্সিটা একটা ডবলডেকারের পিছু পিছু আস্তে আস্তে যাচ্ছে। অপর্ণা মুখ না-ঘুরিয়েই বলল, ইউনিয়নের ওই ছেলেটা আমাদের এক জ্ঞাতির ছেলে। যখন সে চাকরি চাইতে এসেছিল তখন বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস সে সিগারেট খাওয়ার দরকার বলেই সিগারেট খায়নি, সে খেয়েছিল ইচ্ছে করে, বাবাকে চটিয়ে দেওয়ার জন্যই।

ললিত একটু উত্তেজনা বোধ করে বলে, কিন্তু আমি কাগজে ছবি দেখেছি কুড়ি-একুশ বছরের বাচ্চা নিগ্রো ছেলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাদের দাবিদাওয়ার কথা বলছে। তার হাতে সিগারেট, সামনে মদের গ্লাস, খুব ইজি ভঙ্গি—

অপর্ণা হাসল, বলল, আমি ও-সব জানি না। আমি ছেলেবেলায় আমাদের কারখানার কর্মচারীদের কাকা কিংবা দাদা বলে ডেকেছি, তারাও বাবাকে কখনও জ্যাঠামশাই কখনও অন্য কোনও আত্মীয়তার সম্পর্কে

ডেকেছে। আমাদের মধ্যে খুব একটা দূরত্ব ছিল না। কিন্তু ওই ছেলেটা বাবার সামনে সিগারেট খেয়ে সেই দূরত্ব তৈরি করে দিল।

ললিত ভিতরে উত্তেজিত হয়েছিল, সেই উত্তেজনা তার গলার স্বরকে অজান্তে তীব্র করে দিল। বলল, দূরত্ব ছিলই। হয়তো বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না। দুটো শ্রেণী, তাদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ, কী করে তারা পরস্পরের কাছের লোক হয়?

অপর্ণা এ-কথার উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বিষন্ন মুখখানা ফিরিয়ে বলল, হলে ভাল হত।

ললিত হাসতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে তার পেটের ভিতর থেকে একটা 'ওয়াক' উঠে আসছিল। সে তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

অপর্ণা ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকায়। বড় সুন্দর দেখায় তাকে। বলে, আপনার কি কোনও কষ্ট হচ্ছে?

ললিত বলল, না, না। আপনি কথা বলুন।

অপর্ণা বলল, বাবাকে নিয়েই আমার ভয়। এখন বেশি উত্তেজনা তাঁর পক্ষে ভাল না। গতকাল রাত থেকে তাঁর কর্মচারীরা হাওড়ার কারখানায় তাঁকে আটকে রেখেছে। এখন পর্যন্ত তাঁর কোনও খবর আমরা পাইনি।

ললিত জিজ্ঞেস করল, কেন আটকে রেখেছে?

অপর্ণা মৃদু হাসিমুখে বলে, তিনি প্রায় নব্বইজনকে ছাঁটাই করেছেন।

ললিত একটু চমকে ওঠে, নব্বইজনকে! এই অভাব-কষ্টের দিনে!

অপর্ণা মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। বাবা নব্বইজনকে ছাঁটাই করতে চান না। ওই যে ইউনিয়নের ছেলেটা আর ও-রকম আরও জনাচারেক, এই মোট পাঁচ জনকেই বাবা তাড়াতে চাইছেন। কিন্তু সরাসরি ওই পাঁচ জনকে সরানো খুব মুশকিল। তাই নব্বই জনকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিয়েছেন তিনি। এখন আন্দোলন হবে, তর্কাতর্কি হবে, স্ট্রাইক চলবে। আর বাবা আস্তে আস্তে তাদের দাবির কাছে হার স্বীকার করতে থাকবেন। নব্বই জনের জায়গায় আশি জন, তারপর সত্তর জন, এভাবে সংখ্যা কমতে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত পঁচাশি জনকেই আবার কারখানায় ফেরত নেবেন, তারপর বলবেন তোমাদের দাবিদাওয়া প্রায় সবই মেনে নিলাম, কেবল ওই শেষ পাঁচ জনকে বাদ দাও। ওদের নিতে পারব না। তখন ইউনিয়ন দেখবে যে তারা মালিকের কাছ থেকে প্রায় সবটাই আদায় করে নিতে পেরেছে, তাদেরই জয় হয়েছে, আর স্ট্রাইক চালিয়ে যাওয়ার মানে হয় না, ছেলেপুলে পুজোর আগে না খেয়ে আছে, নতুন জামা-কাপড় কিনতে পারছে না, কাজেই তারা মিটমাট করে নেবে। কিন্তু বাবা ঠিক যে-পাঁচজনকে ছাঁটাই করতে চেয়েছিলেন, তাদেরই ছাঁটাই করবেন, কর্মচারীরা সেই ব্যাপারটা বুঝতেই পারবে না। তারা বৃহত্তর স্বার্থে নব্বইজনের জায়গায় পাঁচজনের ছাটাই মেনে নেবে।

ললিত একটু ছটফট করছিল ভিতরে ভিতরে। বলল, এটা তো শত্রুতা।

অপর্ণা হাসল, হ্যাঁ, ভীষণ শত্রুতা। আমাদের মধ্যে আর একটুও আত্মীয়তার ভাব নেই। কিন্তু আপনাকে এত কথা বলা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।

ললিত মুখ ফিরিয়ে নিল।

অপর্ণা মৃদু গলায় বলল, তবু বলছি, কারণ আমার মন একদম ভাল নেই। বাবার হাই ব্লাডপ্রেশার, তার ওপর এইসব উত্তেজনা। এখন যদি তাঁর একটা কিছু হয়ে যায়, আমি সেই কথাই ভাবছি—

ললিত চাপা গলায় বলল, তখন আপনি মালিক হবেন!

অপর্ণা শান্ত গলায় বলল, ঠিক। কিন্তু তখন আমি আর মা কী ভীষণ একা হয়ে যাব! তখন ওই সব কর্মচারীরা যদি আমাদের ঘেরাও করে রাখে! যদি বাসায় এসে হামলা করে! মা গো, সে-কথা ভাবতেই বুকের ভিতরটা শুকিয়ে যায়।

অপর্ণা আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায় একটুক্ষণের জন্য। তারপর খুব সংকোচে লাজুক গলায় বলে, তাই বাবা প্রাণপণে আমার বিয়ের জন্য চেষ্টা করছেন। বুঝতেই তো পারছেন কেমন পাত্র খুঁজছেন আমার বাবা! ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বংশপরম্পরায় যাদের মালিক হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে, এমন পাত্র। সে-ছেলে চরিত্রহীন বা মাতাল হলেও কিছু যায় আসে না, বাবা ও-সব বাছবিচার করবেন না। আর দু'-তিন মাসের মধ্যেই আমার বিয়ের ডেট ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি ও-রকম ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয় তা হলে কোনও দিনই আর কর্মচারীর সঙ্গে আমাদের শত্রুতা মিটবে না।

ললিত বলল, আপনি কী চান?

অপর্ণা একটুও না-ভেবে বলল, আমি চাই আমাদের মালিক আর শ্রমিকদের মধ্যে একই স্বার্থ কাজ করুক। পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া আর ভালবাসা থাক।

ললিত প্রাণপণে তার বমির ভাবটা আটকে রাখার চেষ্টা করছিল। সেই চেষ্টায় তার চোখে জল এসে গেল। সে একটু হাঁফাতে লাগল।

অপর্ণা জিজ্ঞেস করল, আপনার কী হয়েছে?

ললিতের ইচ্ছে হল অপর্ণার আগের কথাটার উত্তর দিয়ে বলে, এই দেখুন, এতকাল একসঙ্গে বাস করেও আমার শরীরটার সঙ্গে বোঝাপড়া বা ভালবাসা হয়নি, এ কেবল আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য জন্মেছে। এর সঙ্গেও আমার স্বার্থের মিল নেই।

কিন্তু সে-কথা না বলে ললিত বলল, শরীরটা ভাল নেই। কিন্তু আপনি কিছু ভাববেন না, ও ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি শ্রমিক-মালিকের এক স্বার্থের কথা কী যেন বলছিলেন! কী যেন, বোঝাপড়া আর ভালবাসার কথা!

অপর্ণা লাজুক মুখে মাথা নামিয়ে বলল, ওটা আমার একটা এমনিই খেয়াল। আসলে বোধ হয় আমাদের সঙ্গে কর্মচারীদের শত্রুতা কোনও দিন মিটবে না। কিন্তু ওদের শত্রু ভাবতে আমার ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে ওদের সব দাবিদাওয়া মিটিয়ে দিই। কিন্তু ভেবে দেখেছি, শত্রুতাটা এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছে যে, দাবি মিটিয়ে দিলেও ওরা খুশি হবে না। ভিতরে ভিতরে গুমরে উঠবে, কেন একজন লোক আমাদের মালিক হয়ে আছে! কেন তাকে আমরা সম্মান করব? কেন তার সামনে আমরা সিগারেট খাব না? একজন মানুষ এখন আর কিছুতেই অন্য একজন মানুষের অধীন হতে চায় না। কেননা মানুষ তারই অধীন হতে পারে যাকে সে ভালবাসে।

ললিত একটু অবাক হয়েছিল অপর্ণার কথা শুনে। একটি অল্পবয়সি মেয়ের কাছে সে এ-রকম কথা আশাই করেনি। কে জানে, এ-সব কথা হয়তো ওকে বিমান শিখিয়েছে, এ-কথা হয়তো ওর নয়। সে মৃদু গলায় বলল,

ব্যক্তিগত মালিকানার ওটাই তো দোষ। মালিকানা যদি রাষ্ট্রের হাতে যায়, যে-রাষ্ট্র সকলের স্বার্থে কাজ করে, তবে সেই রাষ্ট্রে এ-ব্যাপার হবে না।

অপর্ণা হাসল, আপনি কি কমিউনিস্ট?

ললিত উত্তর দিল না।

অপর্ণা মৃদু গলায় বলল, কমিউনিস্ট কি না এই প্রশ্ন করলে আজকাল অনেকেই চুপ করে থাকে। কিন্তু আমি জানি আপনি কমিউনিস্ট।

ললিত হাসল, কী করে জানলেন?

অপর্ণা বলল, অবশ্য আমার ভুল হতে পারে। তবু মনে হয় অনেক দিন আগে আপনার বন্ধু বিমানের কাছে আপনাদের কয়েকজনের কথা শুনতাম।

ললিত অবিশ্বাসের সুরে বলল, তাই নাকি?

অপর্ণা মৃদু হাসল, এক সময়ে ও আমাকে পড়ত। তখন ও কলেজের ছাত্র। খুব ভাল ছাত্র ছিল, কিন্তু কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারত না। বাবা ওকে অনেক বলে কয়ে আমাকে পড়াতে রাজি করিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম ও পড়াত না, চুপচাপ বসে থেকে বইপত্র নাড়াচাড়া করে উঠে যেত। কিন্তু আমি তখন বাচ্চা মেয়ে, ফ্রক পরি কাজেই বোধ হয় আমাকে ও বেশি দিন লজ্জা করল না। আস্তে আস্তে কথা বলতে শুরু করল, কিন্তু পড়ার কথা নয়। তখন ও মাঝে মাঝে ললিত নামে একজনের কথা বলত। সেই ললিত ছিল কমিউনিস্ট ইউনিয়নের নেতা, খুব চালাকচতুর চৌকস ছেলে। তাই যখন টেলিফোনে আপনি নাম বললেন, তখনই আমার সেই ললিতের কথা মনে পড়েছিল, তা ছাড়া আপনিও তো ওর কলেজের বন্ধু, কাজেই মনে হচ্ছে আপনি সেই ললিত। না?।

ললিত একটা অদ্ভুত শিহরিত আনন্দ বোধ করল। আশ্চর্য, কত দূরে কোথায় চলে গেছে তার পরিচয়। এই মেয়েটাও মনে রেখেছে তাকে! ললিতের বড় জানতে ইচ্ছে করে আরও কত দূরে। আরও কোথায় কোথায় লোকে তাকে মনে রেখেছে!

অপর্ণা ঘাড় হেলিয়ে তাকে একটু দেখল। তারপর রহস্যময় একটু হেসে বলল, আপনার বন্ধু একসময়ে আপনার খুব প্রভাবে পড়েছিল। প্রায়ই ব্যক্তিগত মালিকানা তুলে দিয়ে রাষ্ট্রগত মালিকানার কথা বলত। আমাকে বলত, তোমাদের কারখানার সব ক্যাপিটাল শেয়ারে ভাগ করে শ্রমিকদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। নইলে একদিন শ্রমিকদের রাষ্ট্রে তোমাদের বিচার হবে...এইসব কথা। আমি তখন ছোট মেয়ে, ওর কথা শুনে হাঁ করে চেয়ে থাকতাম, কখনও হাসতাম। কিন্তু মনে মনে ওর সব কথাই আমার সত্য বলে মনে হত—

কেন? ললিত হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

অপর্ণা সামান্য একটু রাঙা হয়ে বলে, খুব ছেলেবেলায় ওর সঙ্গে একবার আমার বিয়ের কথা হয়েছিল। ওরা আমাদের জ্ঞাতি, দেশে আমাদের বাড়ি ছিল ওদের বাড়ির পাশে। এ-সব ক্ষেত্রে অনেক সময়ে যেমন হয়, বাবা-মায়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিয়ে ঠিক করে রাখেন, আবার বড় হলে ভুলে যান, অনেকটা তেমনি। কাজেই ও যখন পড়াতে এল তখন আমি জানতাম যে এই লোকটাই একদিন আমার যথাসর্বস্ব।

বলেই চুপ করে গেল অপর্ণা।

ললিত হাসি চেপে বলল, বলুন।

অপর্ণা একটু ঘোর লাগা চোখে চেয়ে থেকে বলল, তাই ওর সব কথা আমি মনের মধ্যে গেঁথে নিতাম। কিচ্ছু ভুলতাম না। দেখুন না, আপনার নাম আমি আজও মনে রেখেছি।

ঠিক। ললিত ঘাড় নাড়ল।

অপর্ণা মৃদু হাসি হেসে বলল, আপনাকে দেখে ও একেবারে কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে আবার বাবার নিন্দে করত। বলত, আমাদের রক্তের মধ্যে বিষ থেকে যাবে এই মালিক স্বার্থের। তাই একদিন নাকি আমাদের মেরে ফেলা হবে!

শুনে আপনি রাগ করতেন না?

অপর্ণা মাথা নাড়ল, না। বরং ভয় হত খুব। ভাবতাম ও যা বলছে ঠিকই বলছে। আমার ইচ্ছে হত বাড়ি ছেড়ে, মা-বাবা ছেড়ে ওর কাছে চলে যাই। ও যেন আমাকে বাঁচায়। কিন্তু ওর এই মনোভাব বেশিদিন রইল না।

টালিগঞ্জ রেলব্রিজ পার হয়ে ট্যাক্সিওয়ালা মুখ ফেরাল, কোন দিকে যাবেন?

ললিত বলল, আর-একটু ভাই, তারপর আনোয়ার শা রোড—

অপর্ণার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তারপর?

অপর্ণা বলল, ও তখন আর-একজন বন্ধুর প্রভাবে পড়েছে। সেই বন্ধুটি ছিল জমিদার, পূর্ববাংলা কোথাকার যেন, পার্টিশানের পর সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে, তার নামটা কী যেন—

ললিত সাগ্রহে বলল, রমেন? রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী?

ঠিক। অপর্ণা উজ্জ্বল মুখে বলল, রমেন। সেই বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর একদিন আমাকে এসে বলল, দেখো, আমার এই বন্ধুটি বড় অদ্ভুত। কলকাতায় ওর যেসব প্রজা-ট্রজা আছে তারা এখনও ওকে খুব সম্মান করে, ওর বাসায় যায়, ওর খোঁজখবর নেয় ঠিক যেন আত্মীয়ের মতো। রাস্তায়-ঘাটে দেখা হলে প্রণাম বা নমস্কার করে, ট্রামে-বাসে সিট ছেড়ে দেয়। অথচ ওরা পুরুষানুক্রমে প্রজাদের শোষণ করে আসছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাতে কী হল? ও উত্তরে বলত, হয় ওর প্রজাগুলো দীর্ঘকাল ওদের সম্মান করতে করতে নিজেদের একেবারে দাস বানিয়ে ফেলেছে, নয়তো ওরা সত্যিই ওকে ভালবাসে। তারপর এসে বলল, না, ওর প্রজারা ওর সঙ্গে আন্তরিক ব্যবহার করে। এটা ঠিক ম্যানার্স নয়। মোটর অ্যাকসিডেন্ট করে ও বুকের একটা হাড় ভেঙেছে, সেই শুনে ওর এক প্রজা মা কালীর কাছে কালো পাঁটা মানত করেছে। কোন স্বার্থে সেটা সে করবে? এখন তো আর ওর জমিদারি নেই যে সেই প্রজার একটু সুবিধে করে দেবে! ওরা সত্যিই ভালবাসে ওকে। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কী করে দুটো শ্রেণী তাদের স্বার্থ ভুলে, এবং সমাজ-বিপ্লব ছাড়াই একে অন্যকে ভালবাসছে।

ললিত সামান্য গম্ভীরমুখে বলল, ওটা হয়তো একটা একসেপশন। হয়তো রমেনরা বেশি চালাক ছিল, প্রজাদের প্রিয় হয়ে তাদের আরও বেশি এক্সপ্লয়েট করার চেষ্টা করেছিল।

অপর্ণা মাথা নেড়ে বলল, সে যাই হোক। ও কিন্তু আপনার প্রভাব কাটিয়ে উঠল। আমাকে বোঝাত, ব্যক্তিগত মালিকানা জিনিসটা খারাপ নয়। যদি এ-রকমভাবে দুটো শ্রেণী একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে, যদি তারা পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হয়ে দাঁড়ায়, আর যদি ভালবাসে, ভালবাসা পায়, তা হলে জমিদার আর তার প্রজা চমৎকার কমিউন গড়ে তুলতে পারে। আমি তখন ওর কাছ থেকেই থা বলতে শিখেছি। বললাম,

আর রাষ্ট্রের মালিকানার কী হবে! ও ঠোঁট উলটে বলল, দুর, রাষ্ট্র তো এটা যন্ত্র। যন্ত্র কি কখনও ভালবাসতে পারে! মানুষ ভাতকাপড়ের চেয়েও মানুষের ভালবাসা বেশি চায়। রমেন আর তার প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। এখনও ওর প্রজাদের কেউ কেউ ছোট কর্তাকে না বলে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে না। জমি কিনবার সময়ে, চাষবাসের ব্যাপারে, রোগ-বালাইতে আগে আসে রমেনের কাছে তারপর উকিল ডাক্তার বা সরকারি লোকের কাছে যায়। রাষ্ট্র কি এতটা ভালবাসতে পারে! জমিদারের জায়গায় একদিন আসবে কমিউন বা ব্লকের অফিসার, কারখানায় আসবে সরকারি ডিরেক্টর, তাতে কি শ্রমিক বা প্রজারা খুশি হবে! তখনও তাদের একজন লোক চাই শোকে দুঃখে বিপদ বালাইয়ে কিংবা কেবল মন খারাপ হলেই যার কাছে ছুটে যাওয়া যায়, যাকে দেখলে বা যার কথা শুনলে বুক জুড়িয়ে যায় এমন কেউ একজন ভালবাসার লোক। রমেনরাও কি প্রজাদের কাছে তাই ছিল!

শুনে ললিত খুশি হল না, আস্তে করে বলল, কিন্তু অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্য থেকে গেলে শেষ পর্যন্ত এ ভালবাসা কি টেকে? কে গ্যারান্টি দিতে পারে যে রমেনের ছেলে রমেনের মতো হবে! তা ছাড়া মালিক-শ্রমিক সম্পর্কটাই তো ভয়াবহ, একে অন্যকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না।

অপর্ণা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, সেই জন্যই আমি এমন একটা স্বার্থ খুঁজছিলাম যাতে আমি আর আমার কর্মচারীরা সেই রমেনের মতো একে অন্যের প্রয়োজন হয়ে উঠি। আমি জোর করে মালিক হব না, কিন্তু ওরা আমাকে ওদের প্রয়োজনে ভালবেসে মালিক করে রাখবে, আমি ওদের সে-রকম স্বার্থ হয়ে উঠতে পারি কি না, এ-রকম একটা খ্যাপাটে ইচ্ছে আমার মাঝে মাঝে হয়!

ললিত হাসতে থাকে। বুক থেকে বমির ভাবটা সরে যাচ্ছে এখন। সে বলে, আপনার খুব মালিক হবার ইচ্ছে!

অপর্ণা ম্লান হাসে, না। আমার কেবল ওইটা পরীক্ষা করার ইচ্ছে যে, দুটো শ্রেণীকে তুলে না দিয়ে একে অন্যের স্বার্থ হওয়া যায় কি না! আসলে আমার এখন ওই রমেনের মতো একজন হতে ইচ্ছে করে।

অম্বলে ললিতের বুক জ্বলে যায়। সিগারেটে ডুবে থাকে সে। ট্যাক্সিটা ধীরে ধীরে আনোয়ার শা রোডে ঘুরে ঢুকে যাচ্ছে।

ললিত ধীরে ধীরে বলল, ওটা বোধ হয় আপনার দুর্বলতা। আপনি চাইছেন মালিকানা চলে গেলেও যেন আর-এক ধরনের মালিকানা এসে যায় হাতে। একটা শেষ সম্বল রেখে দিতে চান, তাই না?

অপর্ণা একটু উদ্ভ্রান্তের মতো চেয়ে থেকে বলে, রমেনও কি তাই চেয়েছিল?

ললিত ঘাড় নাড়ে, বোধ হয় রমেনের ব্যাপারটাও তাই। ওর মধ্যে বংশানুক্রমিক একটা জমিদারির ভাব থেকে গেছে। ওটা হেরিডিটারি, এড়ানো যায় না। জমিদারি কিংবা মালিকানা চলে গেলে মানুষ তখন নেতা হবার চেষ্টা করে। ভারতবর্ষের অনেক নেতাই এসেছেন অভিজাত সমাজ থেকে। মানুষ তাদের ত্যাগের মহিমা কীর্তন করেছে, কিন্তু কখনও ভেবে দেখেনি তারা সেই বংশানুক্রমিক আভিজাত্যের কাছেই নতুন রকমে মাথা বিকিয়ে দিল।

অপর্ণা অবাক হয়ে বলে, তা কেন? যে ভাল তাকে ভালবাসতে দোষ কী?

ললিত অধৈর্যের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে, তা হবে না। এমন সমাজ হয়তো তৈরি হবে যখন মানুষ মালিক বা জমিদারের এই ভালবাসাকে ঠিক বিশ্বাস করবে না। তাদের কাছ থেকে একটুও সম্মান পাবেন না আপনি।

তখন যে-কেউ সিগারেট খাবে আপনার সামনে, ইচ্ছে হলে সেই ছোকরা আপনার কাছে—

বলেই থেমে গেল ললিত। সে বলতে যাচ্ছিল 'আপনার কাছে প্রেম নিবেদন করবে। নির্ভয়ে।' কিন্তু সে-কথাটা বড় নিষ্ঠুর। বলার নয়।

অপর্ণার মুখ এখন নানা রঙে রঙিন। মুখের রেখা কেমন পালটে যাচ্ছে। হঠাৎ সে রুদ্ধশ্বাসে বলল, আমি সব ছেড়ে দিতেই তো চাই। আমার এ-সব একটুও ভাল লাগে না। এই কারখানা, স্ট্রাইক, কর্মচারীদের সঙ্গে শত্রতা, এ-সব মনে হলেই আমার বুক কাঁপে। ইচ্ছে করে চলে যাই কোথাও।

ললিত শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন?

অপর্ণা আস্তে করে বলে, সেই ছেলেবেলায় যেমন ওর কথায় ভয় পেয়ে ইচ্ছে হত এর সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, ঠিক তেমনিই একটা ইচ্ছে হয় আমার। ও আমাকে এই সব গোলমাল থেকে টেনে নিয়ে যাক। কিন্তু ও কেন পাগল হয়ে যাচ্ছে—ও কেন—বলতে বলতে ঠোঁট কেঁপে গেল অপর্ণার।

ব্যথিত মনে ললিত চুপ করে থাকে। সে নিজে যে কথাগুলো বলেছে সেগুলো অত্যন্ত নিষ্ঠুর। না বললেও হত।

কিন্তু এ-কথাটা সে কিছুতেই মনে মনে সহ্য করতে পারছিল না যে এই মেয়েটার রমেনের মতো হতে ইচ্ছে করে। কেন, রমেনের মতো কেন? এ-মেয়েটা তো রমেনাকে চেনেও না।

হঠাৎ খুব হীনের মতো একটা কাজ করল ললিত, যার জন্য পরে সে অনুতাপ করেছিল। সে হঠাৎ অপর্ণাকে বলল, রমেন তার প্রজাদের কাছে হয়তো দেবতা ছিল। কিন্তু নিজের স্ত্রীর কাছে? আপনি কি জানেন যে ওর বউ পালিয়েছিল বলে ও হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে গেছে?

ভীষণ অবাক হল অপর্ণা। বলল, নিশ্চয়ই বাজে মেয়ে! নইলে ও-রকম লোকের কাছ থেকে পালায়!

ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল সেই বট গাছটার তলায় যার চার দিকে বাঁধানো বেদি, যেখানে বিমান কাল ছেলেদের পাল্লায় পড়েছিল। ট্যাক্সি এই পর্যন্ত আসে, এরপর হেঁটে যেতে হয়। ললিত ভাড়া দেওয়ার জন্য পকেটে হাত দিয়েছিল, অপর্ণা ভীষণ রাঙা হয়ে বলল, না, না, ট্যাক্সিটা আমিই ডেকেছিলাম... খুব লজ্জা আর সংকোচের সঙ্গে বাধা দিয়ে অপরাধীর মতো নিজেই ভাড়াটা দিয়ে দিল।

করুণা! ললিত মনে মনে হাসল।

বিমান শুয়ে ছিল। ললিতকে দেখে উঠে বসবার চেষ্টা করে বলল, চিঠিটা দিয়েছ?

ললিত দরজায় দাঁড়িয়ে, পিছনে অপর্ণা। হেসে বলল, দিয়েছি। আর উত্তরটাও নিয়ে এসেছি।

কই? বলে হাত বাড়াল বিমান।

ললিত সরে গেল, তারপর জোরে হেসে উঠল।

কিন্তু ললিত বুঝতে পারল হাসিটা ওদের স্পর্শও করেনি। ধীর পায়ে অপর্ণা ঘরে এসে দাঁড়াতেই বিমানের সঙ্গে অপর্ণার চোখ পরস্পর গেঁথে গেল। নিস্পন্দ হয়ে রইল দু'জনে। কিন্তু সেই নিথরতার মধ্যেও তাদের মুখে যেন কয়েকটা রূঢ় কর্কশ রেখা কোমলতায় বেঁকে গেল। ইঙ্গিতময় ভাববাহী হয়ে গেল ঘরের বাতাস। ললিত বুঝল ওরা কথা না-বলে, চেষ্টাহীনভাবে পরস্পরকে গভীর ভালবাসা জানাতে পারে।

কষ্ট হল ললিতের। বিমানটা পাগল। আর এ একজন কারখানা-মালিকের মেয়ে। কিন্তু মনে হয়, ওরা দু'জনেই ভিখিরি—অকিঞ্চন—ওদের দু'জনের ওরা দু'জন ছাড়া আর কিছু নেই। দুটোই পাগল।

তার ইচ্ছে হল অপর্ণাকে ডেকে বলে, যদি কোনও দিন ভবিষ্যতের সমাজ মালিক পক্ষকে অবলুপ্ত করতে চায়, সেদিন আপনাকে ক্ষমা করা হবে, কেননা আপনি এই পাগলকে ভালবেসেছিলেন।

ললিত দু'জনকে ওই অবস্থায় রেখে বেরিয়ে এল। বাইরে থেকে দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিল সাবধানে।

তেইস

সেদিনের পর শাশ্বতী বেশ কয়েক দিন কলেজে গেল না। সে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কাজ করল, কোমরে আঁচল বেঁধে বাবার জমি কোপাল, বাচুর সঙ্গে ইচ্ছে করে করল ঝগড়া। প্রতি মুহূর্তেই তার ভয় হচ্ছিল, যে-কোনও দিন আদিত্য এসে হাজির হবে।

কিন্তু আদিত্য এল না। তিন দিন পর একদিন সন্ধেবেলা কালীনাথ অফিস থেকে ফিরে তাকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে, আদিত্যর সঙ্গে তোর দেখা হয়?

না।

কী হল, ক'দিন আফিসে আসছে না!

খবরটা শুনে বুকটা একটু ধক করল শাশ্বতীর। কী জানি, যদি সুইসাইড বা এ-রকম কোনও পাগলামি করে থাকে আদিত্য! ও কি অতখানি ভালবেসেছিল শাশ্বতীকে! কে জানে! যদি ও-রকম কিছু করে থাকে তবে চেনা লোকেরা এখন শাশ্বতীকে দেখিয়ে বলবে, এই বাজে মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়। শাশ্বতী তাই সারাক্ষণ মনে মনে বলে, আমি খুব সাধারণ বোকা মেয়ে একটি। আমার জন্য কেউ যেন আত্মহত্যা না করে, কেউ যেন বিবাগী না হয়—হে ভগবান!

কলেজে যাচ্ছে না বলে কেউ কোনও প্রশ্ন করে না। তাদের বাড়ি থেকে শাসন উঠে গেছে, কমে গেছে কৌতুহল। এখন যে যা খুশি করে, অন্যেরা দেখে নিস্পৃহভাবে। কেবল মাঝে মাঝে হৈমন্তী তাকে খোঁচায়, কী রে, ঝগড়া-টগড়া করেছিস নাকি!

না।

হৈমন্তী জিজ্ঞেস করে, তাদের তো দেখা হচ্ছে না কয়েক দিন।

শাশ্বতী উত্তর দেয় না।

হৈমন্তী কখনও কখনও আরও কৌতূহল দেখায়। বলে, তোরা যে রেজিস্ট্রি করবি বলেছিলি, তার কী হল?

শাশ্বতী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যমনস্কতার ভান করে।

একদিন বিকেলে কলেজ ফেরত সবুজ হেরাল্ড গাড়িখানা নিয়ে রাকা এসে হাজির। সঙ্গে তার দাদা সুমন্ত ছিল না, বাড়ির ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে এনেছে।

গাড়িওয়ালা লোক এ-বাড়িতে কখনও আসেনি। তাই একটু চাপা উত্তেজনা দেখা দিল বাড়িতে। বাচ্চু গায়ে জামা দিয়ে মিষ্টি আনতে গেল দোকান থেকে।

অবশ্য খাবারের প্লেট রাকা ছুঁলও না। তার মুখখানা খুব গম্ভীর, বিষণ্ণ। সাধারণত হাসি-খুশি থাকে বলে বিষণ্ণ রাকাকে বড় অচেনা লাগছিল। এবং সেজন্য মনে মনে ভয়-পাওয়া হরিণের মতো চঞ্চল, অস্থির বোধ করছিল শাশ্বতী।

যাওয়ার সময় বাগানের আগলটার কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাকা বলল, তুই যে এনগেজ্‌ড তা তো কই আমাকে বলিসনি! কলেজের অনেকেই জানে দেখলাম, কেবল আমি ছাড়া। শুনলাম ভদ্রলোকের নাম আদিত্য

রায়, কলেজে এসে প্রায়ই দেখা করেন তোর সঙ্গে!

শাশ্বতী আঙুলে আঁচল জড়ায়, মুখ নিচু করে থাকে। উত্তর দেয় না।

রাকা দুঃখিত গলায় বলে, দাদা শুনে খুব দুঃখ পেয়েছে। বলছিল, তুই নাকি ওকে কিছু ঠিক করে বলিসনি! রাকা উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে অনেকক্ষণ, তারপর মৃদুস্বরে বলে, কয়েক বছর আগে ওকে আর-একজন মেয়ে রিফিউজ করেছিল— তারপর খুব ড্রিঙ্ক করত দাদা, ষাট-সওর মাইল স্পিডে গাড়ি চালাত। একদিন সইতে না-পেরে ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল। স্বাস্থ্য ভাল বলে বেঁচে যায়। কিন্তু এবার ও খুব সিওর ছিল। প্রথমেই জেনে নিয়েছিল, তুই এনগেজ্‌ড কি না। এখন নতুন ধাক্কা খেয়ে ওর আবার কী হবে কে জানে! কয়েক দিন খুব অন্যমনস্ক দেখছি ওকে—

শাশ্বতী উত্তর দেয় না। কিন্তু তার ঠোঁট কাঁপে। বড় মায়া হতে থাকে তার সেইসব পুরুষের জন্য যাদের সে ভালবাসেনি। কেন ওরা তাকে অবহেলা করেনি! তোমরা কেমন পুরুষ! পৃথিবীতে কত কাজ আছে পুরুষের, কত রহস্যমোচন, কত আবিষ্কার, কত আদর্শ-প্রচার— তবু কেন একটি মেয়ের। জন্য— সামান্য, কালো, সাধারণ একটি মেয়ের জন্য সব দিয়ে দাও! এবং উদাসীন থেকো তোমরা, উদাসীন থেকো, মন বুঝতে সময় দিয়ো।

পাঁচ-ছ' দিন কেটে গেলে একদিন শিবানী এসে বলল, আজও কলেজে যাবি না! এস-বির ক্লাসে আজ পলিটিক্সের নোট দেবে।

একটু ইতস্তত করল শাশ্বতী। বাইরে যেতে এখন বড় ভয় করে তার। মনে হয়, অনেক রাগী, প্রতিশোধকামী পুরুষ তার অপেক্ষায় চারদিকে ওঁত পেতে আছে।

একটু চিন্তা করে শাশ্বতী বলল, চল যাই।

তারপর অনিচ্ছায় সে তৈরি হয়ে নিল।

বাসে বসে শিবানী জিজ্ঞেস করল, তুই তো রোজ কলেজ থেকে কাটিস, খুব সিনেমা-রেস্টুরেন্টে যাস, না?

শাশ্বতী উত্তর দেয় না।

খুব উড়ছিস! শিবানী দুঃখ করল। নিশ্বাস ফেলে বলল, আর দ্যাখ, অলক যে সেই চাকরি করতে গৌহাটি গেল, একটা চিঠি পর্যন্ত দিল না। পুরুষমানুষদের বিশ্বাস নেই।

শাশ্বতী চুপ করে রইল।

কলেজের স্টপেজ এসে গেল। নামবার জন্য বাসের পা-দানিতে নেমে একটু মুখ বাড়াতেই শাশ্বতী দেখতে পেল, কলেজের সামনে বড় রাস্তায় কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় লম্বা রোগামতো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে সেদিন ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে আদিত্য অপেক্ষা করছিল।

ওই লম্বা লোকটা কি আদিতা? দূর থেকে ঠিক বোঝা যায় না। আদিত্য হওয়া অসম্ভব নয়। তার হাত-পা অবশ হয়ে গেল, বুক কাঁপল ভীষণ।

শাশ্বতী পিছিয়ে আসে। বলে, আমি নামব না।

সে কী!

না। শাশ্বতী মাথা নাড়ে, আমি একটু অন্য জায়গায় যাব। কাজ আছে। কোথায়?

কোথায় তা শাশ্বতী তাড়াতাড়িতে ঠিক করতে পারল না। বলল, আছে।... তুই পলিটিক্সের নোটটা আমাকে দিস, আমি টুকে নেব।

আবার বাসের মধ্যে ফিরে এসে বসল শাশ্বতী। পয়সা বের করে কন্ডক্টরকে বলল, আমি রাসবিহারীর মোড়ে নামব।

মনে মনে ঠিক করল শাশ্বতী যে, রাসবিহারীর মোড় থেকে ফিরতি বাস ধরে বাড়িতে ফিরে যাবে। কিন্তু রাসবিহারীর মোড়ে এসে তার খেয়াল হল, এখান থেকে দক্ষিণমুখো কিছুটা গেলেই ললিতের বাসা। ঠিকানা জানে না শাশ্বতী, কিন্তু বাসাটা তার মনে আছে। সেদিন থেকেই ললিতের ওপর একটা রাগ তার রয়ে গেছে। সেই রাগটা থাকতে থাকতেই বোঝাপড়াটা মিটিয়ে আসবে নাকি শাশ্বতী! বেশি দেরি করার দরকার কী? বেশি দেরি করলে শাশ্বতীর রাগ থাকে না, সাহস কমে যায়।

কী করছে তার বিচার করল না সে। দক্ষিণ দিকে উনত্রিশ নম্বর ট্রাম ফাঁকা যাচ্ছে। শাশ্বতী উঠে পড়ল।

ললিতের জন্য বড় ভয় করে ললিতের মায়ের। দিন দিন কেমন ঘরছাড়া বিবাগীর মতো হয়ে যাচ্ছে ওর ভাবখানা। এক দিকে তাকিয়ে থাকে তো তাকিয়েই থাকে, বেলা বয়ে যায়।

সেই কবে একটা মাস্টারির চাকরি জুটিয়েছিল ললিত, এখনও তাতেই রয়ে গেল। উন্নতির কোনও চেষ্টা নেই। শুয়ে বসে সময় কাটায়, চায়ের দোকানে গিয়ে আদ্দেক দিন কাটিয়ে আসে। এই বয়স—এখন উদ্যোগী হয়ে, ছোটাছুটি করে কত কিছু করে ফেলে মানুষ! তা করবে না। কিছু বললেই বলে, আমরা তো দু'জন, ঠিক চলে যাবে দেখো। বাপের স্বভাব। ওর বাপ সারাটা জীবন খেলা-খেলা করে পাগল ছিল, বাড়ির মানুষকে চিনতেই পারত না। সে-লোকটা সারাটা জীবন কেবল আপ্তবাক্য বলে গেল।— পয়সাকড়ি দিয়ে কী হয়! ছুঁচের ফুটো দিয়ে বরং হাতি গলে যায়, তবু কোনও বড়লোক স্বর্গে যায় না। বাপ ছেলে দু'জনেরই ধারণা যে বড়লোক হওয়াটার মধ্যে কিছু নেই। তার চেয়ে এই ভাল, যেভাবে চলছে চলুক। ললিতের বন্ধুরা কিন্তু ওর মতো বোকা নয়। তারা সময় থাকতে যে যারটা গুছিয়ে নিচ্ছে। কেমন গাড়ি করে ফেলল সঞ্জয়, বিয়ে করল তুলসী! ললিতটাই মুখচোরা। কোথাও গিয়ে নিজের জন্য দাঁড়াতে পারে না, কেড়ে-কুড়ে আনতে পারে না নিজের ভাগেরটা। অথচ খুব অহংকারী। দেশের বাড়িতে যখন হরির লুঠ পড়ত, তখন ললিত দাঁড়িয়ে থাকত দূরে। ওর চোখের সামনে অন্য সব ছেলেমেয়ে মাটিতে পড়ে কাড়াকাড়ি করে বাতাসা কুড়োত। ও পারত না। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে এমন ভাবখানা করত যেন ও-সব ছোটলোকির মধ্যে নেই।

কেন ওর লোভ-টোভ এত কম! টাকাকড়ির দিকে ঝোঁক নেই কেন? রাস্তায়, গলিতে কত বয়সের মেয়ে হেঁটে যায়, ললিত চোখ তুলে তাকায় না। কিন্তু এ-বয়সে ও-রকম হওয়া কি ভাল! তরতাজা বয়স, এ-বয়সে বয়সের গুণ থাকবে না!

এইসব সারা দিন ভাবে ললিতের মা। বড় ভয় করে তার। আপনমনে বিড়বিড় করে।

শোওয়ার ঘরে হলুদের গুঁড়ো খুঁজতে এসেছিল মা। এমন সময়ে খুট খুট করে খুব ভয়ে ভয়ে কে যেন কড়া নাড়ল।

দরজা খুলতেই দেখা গেল ভিতু জড়সড় এক মেয়ে। হাতে বইখাতা, পরনে চমৎকার একখানা জয়পুরি ছাপা শাড়ি। শ্যামলা রং, সুন্দর মুখখানা। প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, ললিত...ললিতবাবু এইখানে

থাকেন?

আহা, ললিতের সঙ্গে বড় মানায়। ভাবে ললিতের মা।

তুমি কোত্থেকে আসছ?

মেয়েটি লাজুক মুখে বলল, যাদবপুর। ললিতবাবু নেই?

এই বেরোল। তুমি ঘরে এসে একটু বোসো। ডেকে পাঠাচ্ছি। বেশি দূরে যায়নি।

চপ্পল জোড়া বাইরে ছেড়ে ঘরে এল শাশ্বতী। ললিতের মায়ের ছোট্ট চৌকিটার একধারে এতটুকু হয়ে বসল। বাস-স্টপ থেকে অনেকটা হেঁটে আসতে হয়েছে রোদে, শাশ্বতী ছোট্ট দলা পাকানো রুমালে কপালের ঘাম মুছছিল।

ললিতের মা আদরের গলায় জিজ্ঞেস করল, গরম লাগছে?

লজ্জায় মাথা নাড়ল শাশ্বতী, না।

ললিতের মা একটু হেসে পাখাটা খুলে দেয়।

ললিতের মা দেখল, এখন যেখানে মেয়েটি বসে আছে ঠিক সেইখানে অনেক দিন আগে একদিন দুপুরে মিতু বসেছিল। ললিতের বড় পছন্দ ছিল তাকে। কিন্তু ওইখানে বসে মিতু কেঁদেকেটে অস্বীকার করে গেল। ললিতকে বিয়ে করতে রাজি হল না। এই চৌকিটা যেখানে মেয়েটি এখন বসে আছে, ওটা অলক্ষুণে চৌকি।

ললিতের মা বলল, তুমি এখানটায় ললিতের চৌকিতে এসে বোসো। এখানে বেশি হাওয়া লাগবে।

শাশ্বতী বাধ্য মেয়ের মতো উঠে ললিতের চৌকিতে গিয়ে বসল।

ললিতের মা মনে মনে বলল, ঠাকুর, ঠাকুর, দেখো এ যেন সেই হয় যাকে ললিত বিয়ে করবে। আহা, বড় লক্ষ্মীমন্ত মুখখানি। ললিতটা বড় মুখচোরা। কই, এত দিন বলেনি তো এমন একটা মেয়ের সঙ্গে তার ভাবসাব, চেনা-জানা হয়েছে? বোকা ছেলে, তুই কাউকে পছন্দ করলে আমি কি রাগ করব? তোর পছন্দ জেনেই তো মিতুকে আমি ডেকে এনেছিলাম। মিতু রাজি হল না, আমাকে কত অপমান করে গেল! কিন্তু তাতে আমি দুঃখ পাইনি। তোর বুকের ভিতরটা যে পুড়ে গিয়েছিল, তার চেয়ে কি ওইটুকু অপমান বেশি? আহা, ললিত এবার বেশ পছন্দ করেছিল। মিতু সুন্দর ছিল কিন্তু এর মতো লক্ষ্মীমন্ত ছিল না। বেশ রে ললিত, বেশ!

একটু চা খাও মা, সঙ্গে আর কী খাবে—দুটো চিঁড়ে ভেজে দিই!

না, না। লজ্জায় মাথা নাড়ে শাশ্বতী। কানের মাকড়ি ঝিকিয়ে ওঠে, কপালের ওপর এক থোকা চুল দোল খায়।

ছেলেমানুষ! কচি। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে ললিতের মা।

শাশ্বতী এই ছোট্ট ঘরখানা দেখছিল। নির্জন সুন্দর ঘরখানা, বাইরের কোনও শব্দ আসে না। জানালার ওপর ঝুঁকে আছে সবুজ, সতেজ একটা পেয়ারার ডাল। পাখি ডাকছে। ভিতরে ছোট্ট একটু উঠোন, এক পাশে তুলসীমঞ্চ। ঘরে আসবাবপত্র বেশি নেই। যা আছে তাতে বোঝা যায় এদের অবস্থা অনেকটা শাশ্বতীদের মতোই। তাই এই ঘরে বসতে খুব একটা অস্বস্তি হয় না। সমান অবস্থার মানুষের সঙ্গে মিশতেই স্বস্তি বোধ করে সে। এ-কথা ঠিক, শাশ্বতী কোনও দিন খুব বড়লোকের ঘরে বউ হয়ে যেতে চায়নি। বিশাল ঘরদোর, অনেক অদেখা আসবাব, বেশি চাকর-বাকর, এ-সব কোনও দিন ভাবতে ভাল লাগে না তার। মন খারাপ হয়ে

যায়। কোনও দিন বড়লোকের ঘরে গেলে শাশ্বতী হাঁফিয়ে উঠবে। সেখানে অনেক চকচকে জিনিসপত্রে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, মানুষগুলোকে পুতুলের মতো লাগে। যে-ঘরে আসবাবপত্র কম সেইখানে মানুষগুলোর ওপর বেশি করে চোখ পড়ে, সহজ লাগে।

ওপর দিকে চেয়ে শাশ্বতী দেখল বুড়োর মাথার মতো নড়বড়ে ফ্যানটা দুলছে। ওটার নভা দেখে একটু হাসল শাশ্বতী। ভুলে গেল যে সে ঝগড়া করতে এসেছে।

একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়ে এসে গণেশের দোকানের দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, ললিতদা, মাসিমা ডাকছে, একজন বসে আছে আপনার জন্য।

ললিত উঠল, বোধ হয় তুলসী-ফুলসী কেউ এসেছে।

ঘরের দরজায় পা দিয়েই শাশ্বতীকে দেখতে পেল ললিত। লাফিয়ে মোচড় দিয়ে উঠল বুক ধড়াস শব্দ হল শরীরের মধ্যে। হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে গেল বাতাস। পায়ের নীচে দুরদুর করে কেঁপে উঠল মাটি।

আপনি!

শাশ্বতী উঠে দাঁড়িয়েছিল। ললিতের ধারালো উজ্জ্বল মুখখানা একপলক দেখেই চোখ নামিয়ে নিল শাশ্বতী। কোনও রকমে বলল, আমি... আমি একটু এলাম।

তারপরেই সে অবাক হয়ে টের পেল তার আর কোনও কথা বলার নেই। কথা শেষ।

আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিল ললিত। ঘরে এসে সন্তর্পণে মায়ের চৌকিটাতে বসল।

শাশ্বতীর খুব ঝগড়া করার কথা। সে বলতে এসেছিল, কেন আপনি ওই কাণ্ড করতে গেলেন? তাতে আপনার কী স্বার্থ ছিল?

কিন্তু সে-কথা না বলে সম্পূর্ণ অন্য কথা বলল শাশ্বতী। বলল, সেদিন আমি ওখান থেকে চলে গিয়েছিলাম। আপনি তাতে রাগ করেননি তো!

উত্তরে ললিতের বলার কথা, কেন আপনি ও-রকম করলেন? ছিঃ ছিঃ, আদিত্য খেপে গিয়ে সঞ্জয়ের পেটে লাথি মেরেছে, আমাকে চড় মেরেছে। কেন আপনি আমাদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সামনে বে-ইজ্জত করলেন?

কিন্তু সে-কথা বলল না ললিত। বরং অপরাধীর মতো মুখ নামিয়ে বলল, না, আপনি ঠিকই করেছিলেন।...

শাশ্বতী হাসল। তার সাদা ছোট ছোট দাঁতে সকালের সতেজ রোদ আর পেয়ারা পাতার সবুজ রঙের একটা আভা ঝিকমিক করে গেল।

চায়ের কাপ আর চিঁড়ে ভাজার প্লেট হাতে মা ঘরে ঢুকল। মায়ের মুখে চোরা হাসি। বলল, ললিত, তুই একটু চা খাবি? করে দেব?

ললিত বলল, দাও।

মা শাশ্বতীকে চা-টা দেয়। বলে, একটু খাও। এবাড়িতে প্রথম এলে। খাও।

চা রেখেই ললিতের মা তাড়াতাড়ি চলে যায়। মনে মনে বলে, ঠাকুর, ঠাকুর...

মুখ নিচু করে বসে ছিল শাশ্বতী। হঠাৎ মুখখানা তুলে বলল, দেখবেন, আপনার অসুখ সেরে যাবে। আমার মেসোমশাইয়ের একদম সেরে গেছে...

যাবে! সেরে যাবে! হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে জল ছলছলিয়ে ওঠে ললিতের। আহা, যদি সত্যিই সেরে যায়!

শাশ্বতীর ছেলেমানুষের মতো সতেজ মুখখানা আত্মবিশ্বাসে কঠিন হয়ে যায়। সে বলে, দেখবেন...

ও-রকমভাবে যদি কেউ চায়, ও-রকমভাবে যদি কেউ বলে তা হলে কীভাবে মরবে ললিত? কীভাবে?

ঠোঁট কেঁপে ওঠে ললিতের। চোখে জল এসে যায়। দুর্বলতা! কই, এতকাল তো এ রকম দুর্বল লাগেনি নিজেকে?

নিজেকে সামলে নেয় ললিত। একটু চোরা-হাসি হেসে বলে, শুনলাম আপনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে!

শাশ্বতী ভ্রূ তোলে, আমার! সে কী?

শুনেছি। ললিত শ্বাস ছাড়ে। মৃদুস্বরে বলে, খুব আনন্দের খবর।

শাশ্বতী বুঝতে না পেরে বলে, কার কাছে শুনলেন? কার সঙ্গে ঠিক হল আমার বিয়ে?

ললিত একটু সন্দেহের গলায় বলে, আদিত্য বলছিল, আপনার কে এক বন্ধু, রাকা না কী যেন নাম, তার দাদার সঙ্গে।

শাশ্বতী থমকে যায়। সুমন্তর কথা তার মনেই ছিল না। কিন্তু সে-কথা কী করে আদিত্য জেনেছিল! সে-কথা কেন এল ললিতের কানে!

বড় লজ্জা করল শাশ্বতীর। সুমন্তর সঙ্গে সে একা গিয়েছিল গঙ্গার ঘাটের রেস্তরাঁয়, কথা বলেছিল অনেক। প্রশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু এ-কথা সে কাকে বোঝাবে যে দু' দিন আগেও সে ছিল বড় ছেলেমানুষ! সে কি ছাই বুঝতে পেরেছিল তার মন? এখন মনে মনে শাশ্বতী ক্ষমা চাইল, তোমাদের কাউকে যদি দুঃখ দিয়ে থাকি, তবে ক্ষমা কোরো। আমি বড় বোকা মেয়ে। আমাকে ক্ষমা কোরো।

মুখ নিচু করে শাশ্বতী বলল, ওটা ভুল খবর। ওই ভদ্রলোক চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি চাইনি।

কে জানে কেন, কথাটা শুনে হঠাৎ বুক হালকা লাগে ললিতের। এক দুর্বোধ্য আবেগে বুক ভেসে যেতে থাকে। সে অপলক চোখে তার সামনে জীবন্ত, তরতাজা এক দৃশ্য দেখে। ঘন চুলের ভিতর থেকে ঝিকমিক করছে কানের রিং, পরনে কালো-হলুদে মেশানো সুন্দর একখানা জয়পুরি শাড়ি, নিকোনো উঠোনের মতো পরিষ্কার ব্রণহীন মুখখানা। এখন যদি ললিত ওকে ভালবাসার কথা বলে! তবে কি ও লাজুক মুখ নামিয়ে সম্মতির হাসি হাসবে?

আত্মবিস্মৃত ললিত মুহূর্তকাল পরে নিজের সংবিতে ফিরে এল। শোষ-কাগজের মতো এক বিষাদ হঠাৎ শুষে নিল তার হৃদয়। সে চোখ ফিরিয়ে নিল।

শাশ্বতী মৃদুস্বরে বলল, শুনুন, আমার একটু কথা আছে।

কী

শাশ্বতী ইতস্তত করে বলে, আপনার বন্ধুকে আমি অনেক দুঃখ দিয়েছি। ওকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, আমি কোনও দিন ওকে ভালবাসিনি।

ও জানত। অন্য দিকে চোখ রেখে ললিত বলে।

শাশ্বতী একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমি খুব অন্যায় করেছি, না?

ললিত মাথা নাড়ল। না।

শাশ্বতী বিষন্ন গলায় বলে, ও হয়তো রেগে যাবে। শোধ নেবে। কিন্তু আমার যে কিছু উপায় ছিল না।

কথাটায় ললিত একটু বিচলিত হয়। তারপর সোজা তাকায় শাশ্বতীর দিকে। বলে, আপনি ঠিকই করেছিলেন।

শাশ্বতী মৃদুস্বরে বলে, ওকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, ও যেন কোনও পাগলামি না করে। আমার দাদার কাছে শুনেছি, দু' দিন ও অফিসে আসছে না। বড় ভয় করেছিল শুনে। যদি ও সুইসাইড বা ও-রকম কিছু করে—

ললিত হাসে। মাথা নেড়ে বলে, করবে না। ওকে আমি চিনি। আমি ওর বাড়িতে খবর নিয়েছি। ও কলকাতায় নেই। কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেছে।

শাশ্বতী ছলছলে চোখে বলে, যদি কিছু করে! তা হলে লোকে আমাকে দেখিয়ে বলবে, ওই বাজে মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া। এ-রকমই তো হয়, লোকে না জেনে নিন্দে করে। ওকে বলবেন, আমি খুব সাধারণ একটি মেয়ে, আমার মতো তুচ্ছ একজনের জন্য পাগল হওয়ার মানে হয় না। ও অনেক ভাল মেয়ে পাবে।

ললিত সরল, বোকা মেয়েটির দিকে তাকায়। তারপর বলে, সেদিনকার ব্যাপারটার জন্য আমিই দায়ী। আপনি কোনও বন্ধুর দাদাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন শুনে আমি রেগে গিয়েছিলাম।

শাশ্বতী একপলক ললিতের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে হাসল। বলল, হ্যাঁ, সেদিন আপনাকে খুব ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। মাথার চুল উড়ছে, লাল টকটক করছে মুখ, চোখ জ্বলছে— আপনাকেই আমি সবচেয়ে ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, রেগে গেলে আপনি ভয়ংকর কাণ্ড করতে পারেন। সেই ভয়ে আর-একটু হলে আমি হয়তো সই করে ফেলতুম।

ললিত লাজুক মুখে হাসল। বলল, মানুষ তো নিজের মুখ দেখতে পায় না, সেদিন আমাকে কীরকম দেখাচ্ছিল কে জানে! কিন্তু আমি চেয়েছিলাম বলেই আপনি সই করতেন? আপনার নিজের ইচ্ছের জোর নেই?

শাশ্বতী মৃদুস্বরে বলে, অতগুলো পুরুষ ঘিরে ধরলে ভয় লাগে না! কেমন অচেনা পরিবেশ, রাগী সব মানুষ, আর ওই বিশ্রী দম-আটকানো ঘর! এ-সব থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য হয়তো শেষ পর্যন্ত আপনারা যা বলতেন, তাই করতাম। আমার মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল। আপনাদের সেই ব্যান্ডেজ বাঁধা বন্ধু বের করে আনার পরও অনেকক্ষণ আমি বুঝতে পারিনি আমি সত্যিই সই করে এসেছি কি না।

বড় মায়া হয় ললিতের। সে একটু চিন্তা করে আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিও চাইনি যে, আপনাদের বিয়েটা ওইভাবে থোক। আপনি চলে যাওয়ার পর আমি চেয়েছিলাম যেন আপনি আর ফিরে না আসেন।

বলেই একটু ইতস্তত করল ললিত। বলল, কিন্তু আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করছেন?

শাশ্বতী হাসছিল। মৃদু চিকমিকে হাসি। মাথা নেড়ে বলল, বিশ্বাস করেছি। তারপর আচমকা বলল, কিন্তু কেন তা চেয়েছিলেন?

সত্যিই তো! সে কেন চেয়েছিল! তার তাতে কী লাভ? তবু তার মন চায়নি বিয়েটা হোক। বিশেষত ওইভাবে, ধুলোটে এক অফিসঘরে, সরকারি ভাষায় আধুনিক মন্ত্রপাঠ করে। সে চায়নি এই কাটাকাটা মুখের, শ্যামলা মেয়েটির বিয়ে হয়ে যাক। কিন্তু কেন? কী লাভ তার?

ললিত মিনমিন করে শুধু বলল, আমি ভেবেছিলাম, আপনি অন্য কাউকে ভালবাসেন।

সেকথার উত্তর দিল না শাশ্বতী। ব্যাগ আর কলেজের খাতা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, এবার আমি যাব।

বিদায়ের সময়ে কেউই জিজ্ঞেস করল না আবার দেখা হবে কি না। কিংবা কবে দেখা হবে!

ফেরার সময়ে বাসে একা একটি মন নিয়ে বসে ছিল শাশ্বতী। কত ভাবল সে। সে শুনেছে, ক্যানসার হলেও কেউ বেঁচে যায়, যেমন তার মেলোমশাই বেঁচে আছেন। ললিত তা হলে কেন মরে যাবে? মৃত্যুর মুখোমুখি ললিত কি এখন বড় একা! একা বলেই মাঝে মাঝে রেগে যায় নিজের ওপর! সেদিন ওকে লক্ষ করেছে শাশ্বতী। একদম পাগলের মতো দেখাচ্ছিল ওকে। ওর মন চাইছিল না, তবু জোর করে শাশ্বতীকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কেন ওর এত অহংকার? কেন শাশ্বতীকে অবহেলা করেছিল? মরে যাবে বলে? মৃত্যুরও কি অহংকার হয়! কিন্তু শাশ্বতীর আর ওর ওপর একটুও রাগ নেই। এখন পুরুষমানুষকে অনায়াসে বুঝতে পারে শাশ্বতী। সেদিন অতসব গন্ডগোলের মধ্যেও ললিতকে সে বুঝে গিয়েছিল।

মাঝে মাঝে শাশ্বতীর ভিতরটা ধক করে ওঠে আজকাল। ও কি মরে যাবে! কেন মরে যাবে! ক্যানসারের তো ওষুধ বেরিয়েছে, শাশ্বতী পড়েছে কাগজে! বেরোয়নি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বেরিয়েছে। তার মন বলছে। সে জানে।

দুপুরেই ললিতের মা গেল প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি। বুড়িদের আড্ডায় বিন্তি কিংবা লুডো খেলতে খেলতে বলল, কেমন সুন্দর লক্ষ্মীমন্ত একটা মেয়ে এসেছিল আজ তাদের গরিবের ঘরে। ওই মেয়েই হয়তো আসছে একদিন বউ হয়ে।

সারা ঘর খুঁজে দেখে ললিত। শাশ্বতী কিছু কি ফেলে গেছে! যার জন্য সে আবার কখনও ফিরে আসবে এই ঘরে! না, কিছুই না। ললিত স্থির হয়ে দাঁড়ায়। বিড়বিড় করে প্রশ্ন করে, কোনও দিন আসবে না আর!

তারপর সংবিৎ ফিরে পায়। বিন্দু বিন্দু জলের মতো এইসব পার্থিব দুর্বলতা লেগে আছে তার গায়ে। সে একদিক, সব জলকণা ঝেড়ে ফেলে মায়াবি হাঁসের মতো উড়ে যাবে।

উড়ে যাবে! ফিরবে না আর! দেখবে না অপরাহ্নের উঠোনে সেই অদ্ভুত হলুদ আলোটি! সতেজ পেয়ারাপাতায় শিশুর মুখের ছবি! মানুষের মুক্তির কথা ভাববে না আর। ভালবাসবে না!

কেবলই কি জড়বস্তু থেকে জন্ম নিয়ে জড়ে ফিরে যাওয়া! কিছু নেই আর! হায়, তবু কেন যে কেবলই মনে হয় ললিতের, এখনও তার জীবন অপরিমেয় বাকি রয়ে গেছে!

চব্বিশ

বর্ধমানের কয়েক স্টেশন আগে ডাউন লাইনের ধারে এক নিরালা জায়গায় সোঁদাল গাঁয়ের একজন লোক কলকাতার গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। দুঃখী লোকটা। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সে বেঁচে আছে, পৃথিবীতে, আজ তার শেষ দিন। রেল লাইন বাঁক নিয়ে চলে গেছে পশ্চিমের দিকে উদোম মাঠের ভিতর দিয়ে। নিস্ফলা মাঠের ও-পাশে প্রকাণ্ড সূর্য ডুবে যাচ্ছে। পূবে বহু দূর থেকে হরেন সাঁইয়ের ধানকলের শব্দ আসছে ঝকঝক। নাবাল জমিতে এখনও জমে আছে গত বর্ষার জল, ব্যাঙ ডাকছে। একটু আগে হালকা একটা মেঘ বৃষ্টি দিয়ে গেল। বেশ বিকেলটি, জলে-ভেজা মাঠঘাটে পড়ন্ত রোদ পাকা ফসলের মতো দেখায়। দুঃখী লোকটা দেখে। কাঁধের গামছাখানা দিয়ে চোখের জল মুছে নেয়। শেষ বিকেলটা বড় সুন্দর। যদি এমন সুন্দর হত জীবন, এমন ভর-ভরন্ত নিস্তব্ধ বিকেলটির মতো! কিন্তু তা তো হয়নি। বাবার ঋণ ছিল অনেক, জমি চলে গেল মহাজনের ঘরে। ভাগচাষে চলছিল দিন, কিন্তু পর পর দু' বছর অজন্মা। ধানের দর পড়ে গেল। হরেন সাঁইয়ের কলে ঝাড়াই হচ্ছে তারই রোয়া-কাটা ধান। এখন আর তার কোনও দুঃখ নেই, এক্ষুনি রেলগাড়ি চলে আসবে, বাড়বাড়ন্ত হোক সাঁইমশাইয়ের। ঝাড়া হাত-পা তার, কাঁদবার কেউ নেই, এক যদি বারুইপুরে মেয়েটার কাছে খবর যায়। তা সে-খবরও যাবে দুলকি চালে। পৌঁছতে পৌঁছতে মাসখানেক। তত দিনে হাওয়া-বাতাসে জলে-মাটিতে মিশে কোথায় চলে যাবে সে! তার খানিকটা চলে যাবে আকাশে, মেঘ হয়ে চোখের জল ফেলবে, তার আর খানিকটা মাটিতে মিশে বুকে করে নেবে সেই জল, তার আর খানিকটা হু-হু বাতাসের সঙ্গে ছুটে এসে ধানের আগা ছুঁয়ে চলে যাবে কোথায়! দুঃখী লোকটা তার চারধারে অলৌকিক বিকেলটা দেখে নেয়। ফলিডল কেনারও পয়সা ছিল না বলে সে আড়াই মাইল হেঁটে এসেছে রেলরাস্তা পর্যন্ত। উঁচু জমিতে দাঁড়াতেই ফুরফুরে হাওয়া লাগছে। বাতাসে এখন বড় আদর। সেই আদুরে বাতাসটাই একটা শব্দ নিয়ে আসে। গুরুগুরু শব্দ। দুরে রেলব্রিজে উঠে এল গাড়ি। তারপর পায়ের নীচে মাটি চড়াইয়ের বুকের মতো কাঁপে। মাইলখানেক দূরে বাঁকের মুখে পিঁপড়ের মতো কালো ট্রেনখানা উদোম মাঠের উপর দিয়ে চলে আসছে। ড্রাইভার সাহেব দেখে ফেলবে। লোকটা দু'কদম নেমে যায় ঢালু বেয়ে। উবু হয়ে বসে একটা বিড়ি ধরায়। খুব জোরে টানতে থাকে। বাঁকের ওপর দিয়ে পাক মেরে আসছে গাড়িখানা। বিড়ি ফেলে লোকটা উঠে দাঁড়ায়। গামছাখানা জড়িয়ে নেয় মুখে, তারপর দুই লাফে উঠে আসে ঢালু বেয়ে। গামছার আবছায়ার ভিতর থেকে এক বার কালো ট্রেনখানা দেখে, মার মার ঝোড়ো শব্দের মধ্যে চেঁচিয়ে মেয়ের নাম ধরে ডেকে বলে, ব-কু-ল, যা-আ-ই! বাতাসের একটা ধাক্কা লাগে জোর।

অনেক হিজিবিজি দেখতে পায় লোকটা। দেখে কোমরের ওপর দাঁড়িয়ে আস্ত একটা রেলগাড়ির কামরা। কিন্তু খুব ভার লাগে না। তার শরীরের ভিতর দিয়ে কুলকুল করে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে, ভিজে যাচ্ছে ঘাস মাটি। সে জলের জন্য একবার হাঁ করে। দু'বার তিন বার। মুখে কথা ফোটে না। ঘাড়টা কাত হয়ে যায়। অনেক মানুষের পা বৃষ্টির মতো মাটিতে পড়ছে। অনেক লোক—অনেক লোক—কথা বলছে। কিন্তু সে কেবল অঝোরে নদীর শব্দটা শোনে। তার শরীরের ভিতর থেকে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। সে জলের জন্য হাঁ

করে। কেউ তার কথা বুঝতে পারে না। আস্তে আস্তে বৃষ্টির জলে যেন ধুয়ে যাচ্ছে মুখগুলো! সে ভয়ে চেঁচায়, জল! কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না। হঠাৎ আবছায়ার মধ্যে কোথা থেকে সুন্দর একখানা মুখ তার মুখের ওপর নেমে আসে। বড় সুন্দর মুখ, দয়াল দু'টি জলভরা চোখ। লোকটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এইরকম, এইরকম একজন মানুষকেই সে তো সারা জীবন নিজের অজান্তে খুঁজছে! কখনও আলপথে লণ্ঠন হাতে যেতে যেতে, কিংবা যখন বর্ষার একবুক জলে নেমে ট্যাঁটায় গাঁথা বস্তুটি শোলমাছ না কেউটে না জেনে হাত ডুবিয়েছে জলে, কিংবা কখনও দিকশূন্য বৈশাখী দুপুরের ধু-ধু মাঠ আর অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে পৃথিবী ও আকাশের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেনি, কিংবা কখনও যখন বাইরের দাওয়ায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় হঠাৎ অস্পষ্টভাবে নিজের পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ি-পড়ি করেও পড়েনি, তখন সেইসব সময়ে সে তো আবছাভাবে একেই খুঁজে বেড়িয়েছে এত দিন! এই দয়ালু মুখখানা—আহা, যা পরের জন্য কাঁদে, সময়ে দেখা হল না গো, এ ঠিক নিয়ে যেত তাকে সেইখানে যেখানে ঈশ্বর আছেন। কচু পাতায় জল মুখ ভরে ঢেলে দিচ্ছে মানুষটা, চোখে-মুখে পড়ছে জলের ছিটে। লোকটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, তুমি কি অচেনা মানুষ! না গো। দুঃখী মানুষ তোমাকে দেখলেই চিনে নেবে। অন্ধকার নেমে আসে। সূর্যের মুখ ঢেকে দয়ালু মুখখানা তার দিকে চেয়ে থাকে। এই একজন মানুষ, যে তার জন্য কাঁদছে। লোকটা নিশ্চিন্তে চোখ বোজে।

আস্তে আস্তে তার মাথাটা কোল থেকে মাটির ওপর নামিয়ে দেয় রমেন। তারপর উঠে দাঁড়ায়। ঢালু বেয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসে নাবাল জমিতে যেখানে জল জমে আছে। হাতের রক্ত ধোয়, ধুতিটা ভিজিয়ে নেয়, মুখে জলের ছিটা দেয়। উঠে আসবার সময়ে দেখে লোকটার কাটা ডান হাতখানা পড়ে আছে। যত্নে তুলে নেয় সেটা, ভিড় ঠেলে মৃতদেহের কাছে রেখে দেয়। তারপর একটু দূরে এসে দাঁড়ায়। দিগন্তে নীল মেঘের রঙের একটা আস্তরণ, সূর্য দু'-আধখানা হয়ে অস্ত যাচ্ছে। রমেন নিঃশব্দে হেঁটে এসে নিজের কামরায় ওঠে।

কামরার ভিতরে ভিড়ের মানুষেরা তাকে রাস্তা করে দেয়। অন্যমনে সে এসে দাঁড়ায় তার পুরনো জায়গায় দুই বেঞ্চের মাঝখানে। শান্তভাবে।

সভয়ে তার কাছ থেকে সরে দোল একজন লোক, বলল, আপনার কাপড়ে এখনও রক্ত!

বেঞ্চ জুড়ে হোল্ড-অলের বিছানা পেতে বসে আছে একজন খিটখিটে চেহারার লোক। সঙ্গে তিনটে বাচ্চা আর গোলগাল বউ। রমেন প্রথম গাড়িতে উঠতে এই লোকটা তাকে জায়গা দিতে চায়নি, বলেছে, দেখছেন তো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছি, এর মধ্যে কোথায় বসবেন! সেই লোকটা এখন রমেনকে জিজ্ঞেস করল, লোকটা মরে গেছে?

রমেন মাথা হেলায়।

ইস। লোকটা বলে, তারপর হোল্ড-অলের একটা অংশ উলটান দিয়ে জায়গা করে দিয়ে বলে, আপনি বসুন।

আমি...মানে... আমার কোলেই লোকটা মারা গেছে। আপনার বিছানাপত্র ছোঁয়া যাবে।

তাতে কী? বৃহৎ কাষ্ঠাসনে দোষ নেই

রমেন বসল না।

দুর্গাপুর থেকে গাড়ি ছাড়ার শেষ সময়ে একটা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছেলে দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠেছিল। ওর দৌড় দেখে বোঝা গিয়েছিল যে, ছেলেটা দৌড়তে জানে। তার গায়ে হ্যান্ডলুমের চমৎকার একটা চেক

শার্ট পরনে কর্ডের প্যান্ট পায়ে হান্টিং বুট, কাঁধ থেকে একটা মাঝারি কিট ব্যাগ ঝুলছে। গায়ের রং ফরসা, একটু নিষ্ঠুর চৌকো ধরনের মুখ, চোখ দু'টি স্থির। স্থির কিন্তু শান্ত নয়। বরং একরোখা। একটি কিংবা দু'টি খুন করার পর মানুষের চোখ ও রকম স্থির হয়ে আসে। তখন চোখের পাতার একটা গাঢ় ছায়া পড়ে চোখের মণিতে। আর সেখানে, চোখের গভীরে ধিক ধিক করে একটা চোরা আলো।

ছেলেটা গাড়িতে ওঠার পর থেকেই হোল্ড-অলওলা লোকটার সঙ্গে তার ঝগড়া হচ্ছে। ছেলেটা বসার জায়গা চাইতেই লোকটার বউ বলল, কী করে জায়গা হবে? আমাদের বাচ্চা-কাচ্চা... এত জিনিসপত্র... ওঁর শরীর খারাপ। ছেলেটা মুখ বিকৃত করে ঘেন্নার চোখে, লোকটা তার বউ আর তিনটে বাচ্চাকে দেখেছিল একটু, কিছু বলেনি। ট্রেন ঘণ্টাখানেক লেট চলছিল, তাই হোল্ড-অলওলা লোকটা এক বার রমেনকে বলেছিল, গেরো দেখেছেন? পৌঁছতে প্রায় রাত হয়ে যাবে। আমি আবার থাকি বাঘাযতীনে, এলাকাটা ভাল নয়। অত রাতে ছিনতাই-ফিনতাই, তা ছাড়া ট্যাক্সিওয়ালাকেই বিশ্বাস কী? তখন দুর্গাপুরের ছেলেটি একটু আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হেসে বলল, আমিও ওই দিকেই যাব। আমাকে সঙ্গে নেবেন? আমি সঙ্গে থাকলে ভয় নেই। লোকটা বিব্রত চোখে ছেলেটাকে একটু দেখে মাথা নেড়ে বলল, না, না, তার দরকার নেই। ছেলেটা ঠাট্টার গলায় বলল, কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? লোকটা বলল, না, তা নয়। ভগবান দেখবেন। ঠিক পৌঁছে যাব। ছেলেটা একটু হাসল, ভগবান তো একটু আগেও ছিলেন, যখন আপনি ভয়ের কথা বলছিলেন! লোকটা সে-কথার উত্তর দেয়নি, রমেনের দিকে তাকিয়ে অন্য প্রসঙ্গ আনবার চেষ্টা করে বলেছে, আজ আমার আসার কথা ছিল না, জানেন! ঠিক ছিল পরশুদিন আসব। কিন্তু পঞ্জিকায় দেখেছি অমৃতযোগ ছিল আজ... যাত্রার সময়ে। তারপর একটু স্মান হেসে বলল, কাশীতে সেবার ভৃগুবিচার করালাম— দুর্ঘটনায় মৃত্যুর যোগ। তাই পঞ্জিকা না দেখে বেরোই না বড় একটা...। দুর্গাপুরের ছেলেটা দু'দিকে ব্যাঙ্কে দু'খানা লম্বা কেঠো হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, একটু ঝিলিক দিল তার হাসি। বলল, কেটে পড়ুন দাদা, কেটে পড়ুন। পৃথিবীতে জায়গা বড় কমে যাচ্ছে। ছ'জনের জায়গা দখল করে বসে আছেন, কুড়িজনের খাবার টেনে নিচ্ছেন...

ঠিক সেই সময়ে ইঞ্জিন থেকে তীব্র বাঁশি বেজে ধীরে ধীরে থেমে আসছিল গাড়ি।

সেই ছেলেটা এখন রমেনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। একটু অন্যমনস্ক ছিল রমেন, ছেলেটা তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, কেমন দেখলেন?

কী।

লোকটা যে মরে গেল! কোনও কষ্ট পেল না। ইনস্ট্যান্ট।

রমেন উত্তর দিতে পারল না। তার ঠোঁট একটু কেঁপে গেল মাত্র।

ছেলেটা নিচু গলায় বলল, আপনি খুব শক্‌ড্? প্রথম প্রথম ও-রকম হয়। কলকাতায় নেমে একটা বড় ব্র্যান্ডি খেয়ে নেবেন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি মানুষকে মরতে অনেক দেখেছি।

খুব ধীর চাপা গলায় রমেন বলল, জানি।

ছেলেটা খুব সামান্য একটু চমকে উঠল।

রমেন সরে এসে গাড়ির খোলা দরজার সামনে দাঁড়ায়। দরজায় মুখে ভিড়ে। দুটো লোক একে অন্যের বিড়ি থেকে আগুন ধরিয়ে নিচ্ছে, তাদের দু'জনের মুখের ঠিক মাঝখান দিয়ে ডুবে যাচ্ছে সূর্য।

মেঝেতে উবু হয়ে বসেছিল বেঁটে মতো একটা লোক। এত বেঁটে যে, আর দু'-এক ইঞ্চি ছোট হলেই বামনবীর হয়ে যেত। পরনে ময়লা হাফশার্ট আর ধুতি। সে ভিড়ের মধ্যে একটা ফাঁক দিয়ে রমেনকে দেখছিল। হ্যাঁ, ওই তো সেই লোক, যে ট্রেনে কাটা-পড়া মানুষটার মাথা কোলে করে বসে ছিল, অচিন মানুষের জন্য কেঁদেছিল, ওই তো সেই লোক! লম্বা লোকটা, ফরসা, গায়ে হাফ-হাতা পাঞ্জাবি—হ্যাঁ, ওই লোকটা। মরন্ত মানুষটা ওই মুখখানার দিকে চেয়ে মরে গেল। মরন্ত মানুষ লোক চেনে, ভুল হয় না। এ লোকটাকে দুঃখের কথা বলা যায়, এ বুঝবে ঠিক। সে একে বলবে গতবার তার কোলের ছেলেটা কীভারে মারা গেল। মিঠিপুর তার গাঁ, চব্বিশ পরগনায়। গতবার বান ডাকল রাত দুটোয়। ঘরে সে, তার বউ আর দেড় বছরের ছেলে। জলের শব্দে ঘুম ভেঙে দেখে ঘরের মেঝেয় হাজার সাপের মতো জলের খেলা। মুহুর্মুহু জল বেড়ে ওঠে, সে বউকে ডাকে, সামাল! গরিব মানুষ, জিনিসপত্র তেমন কিছু। ছিল না, যায় তো সেগুলো যাক, কিন্তু মানুষগুলো বড় আপন। বউকে বলল, আমার কোমর প্যাচায়ে ধর। বউ ধরল। ছেলে কোলে করে জলে নামল সে। ঘরে তখন তার কোমর-জল, বাইরে নামতেই গলা পর্যন্ত। তখন মাঠঘাট কিছু ঠাহর হয় না, অন্ধকার, অঝোর বৃষ্টি, বাতাস ডাকে, উথালপাথাল গাঁই-গাঁই জলের ডাক। লোকটা জলের মধ্যে টালমাটাল ছুটছিল, সঙ্গে কোমর-ধরা বউ, বুকে ছেলে। পশ্চিম দিকে বুড়ো বটের তলায় মহাবীরের থান, সেই জায়গাটাই সবচেয়ে উঁচু, সেখানে বাঁধানো বেদি আছে। শতখানেক গজ দূর। এই এক শ' গজ রাস্তা তার বুকে ধরা ছিল ছেলেটা, জলের তলায়। গলা-জল ভেঙে যখন গিয়ে উঠল বাবার থানে তখন খেয়াল করে দেখে, আরে, এ আমি করেছি কী? আঁ! বুকের মধ্যে জোরে চেপে ধরেছি ছেলে, দেখি তার মুখ ডুবে রয়েছে জলের মধ্যে! ছেলে শ্বাস নেয় নাই। অ্যাঁ?

লোকটা আপনমনে বিড়বিড় করল, এরে কবো? হ্যাঁ, এরে কওয়া যায়।

লোকটা হাত বাড়িয়ে রমেনের পা ছুঁয়ে ডাকে, ও কর্তা।

রমেন নিচু হয়ে লোকটাকে দেখে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, জল-টসটসে চোখ। একে দেখেছে রমেন। যখন ট্রেনে কাটা-পড়া লোকটা রমেনের কোলে মাথা রেখে মরে যাচ্ছে তখন এ-লোকটাই দৌড়ে গিয়ে কচু পাতায় জল এনে দিয়েছিল, রমেনের কানের কাছে বিড়বিড় করে বলেছিল, বাঁচিয়ে দিন, কর্তা, বাঁচিয়ে দিন। আপনি পারেন। হে ঠাকুর—

রমেন নরম গলায় বলে, কী?

লোকটা একটা বিড়ি বাড়িয়ে ধরে। তার আর কিছুই দেওয়ার নেই।

রমেন বিড়িটা নেয়। লোকটার মুখোমুখি উবু হয়ে বসে বিড়িটা ধরায়। লোকটা গলে যায় এই সোহাগে। বিড়বিড় করে তার দুঃখের কথা বলে। তারপর আস্তে আস্তে রমেনের বুকের কাছে ঝুঁকে আসে লোকটার মাথা, তীব্র, ফিসফিসানির সুরে লোকটা বলে, বলেন কর্তা, কেন বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেল! কী হয়েছিল আমার! কাঁধে তুলে নিলেই ছেলেটা বেঁচে যেত, কিন্তু কেন বুদ্ধি হয় নাই?

হাতে কচলে চোখের জল মোছে লোকটা। রমেনের সুন্দর মুখ স্তব্ধ হয়ে দেখে। তারপর বলে, তারপর থেকেই আমি বন্ধকি কারবার ছেড়ে দিলাম, ধর্মে-কর্মে মন দিয়েছি, তীর্থে যাই মাঝে মাঝে, ভিখিরিরে ভিক্ষে দিই, মানুষের বিপদ দেখলে মন কেমন করে, ছুটে যাই। কিন্তু আর লাভ কী? বুদ্ধিনাশে ছেলেটা মরে গেল। তার ওপর দেখেন আমি ঈশ্বরেচ্ছায় বামনবীর, আপনার মতো লম্বা হলে পর—কিন্তু ভগবান চান নাই—

মনে মনে মৃদু হাসে রমেন। লোকটা জানে না বামনবীরের মতো তার চেহারায় রূপ ঝরে পড়ছে। সত্য বটে, কখনও-সখনও আমাদের প্রিয়জন চলে যায়, তার শূন্যস্থানে অন্তরে চলে আসে দয়া, মায়া, কিংবা বিস্তার। লোকটা এখনও টের পায়নি। ছেলে না থাকায় দুঃখই ছেলে হয়ে তার কাছে আছে।

রমেন তার কাঁধে হাত রেখে চুপ করে বসে।

লোকটা বিড়বিড় করে, আপনার বড় দয়ামায়া। মরন্ত মানুষটার ভুল হয় নাই।

গাড়ির গতি কমে আসে। অনেক লাইনের জটিল ইয়ার্ডের ওপর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। হোল্ড-অলওলা লোকটা গলা বাড়িয়ে ডাকল, ও দাদা।

রমেন তাকাতেই হাতের প্লাস্টিকের জলের বোতলটা বাড়িয়ে দিয়ে ম্লান মুখে বলল, বারবার আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। সামনেই বর্ধমান, একটু জল এনে দেবেন দাদা, কাইন্ডলি! আপনি ইয়ংম্যান, ছুটে গিয়ে আনতে পারবেন, আমার সায়াটিকা—

আসানসোলে একে একবার জল এনে দিয়েছিল রমেন।

অভ্যাসবশত বোতলটার জন্য হাত বাড়িয়েছিল রমেন, কিন্তু হাতটা ফেরত নিল। দুর্গাপুরের ছেলেটা শিথিল চোখে তাকে দেখছিল। রমেন ছেলেটাকে দেখিয়ে লোকটাকে বলল, এঁকে দিন। ইনি এনে দেবেন। আমি মড়া ছুঁয়েছি।

লোকটা ইতস্তত করে। হঠাৎ ঘেন্নায় ছেলেটার মুখ বেঁকে যায়। রমেনের চোখে স্থির চোখ রাখে ছেলেটা। মৃদু একটু হাসল রমেন, বন্ধুত্বের হাসি। ছেলেটা হাসিটুকু ফেরত দিল না। রমেন মনে মনে বলল, আমি তোমার শত্রু নই।

ছেলেটা চোখ সরিয়ে নিয়ে লোকটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, দিন। এনে দিচ্ছি।

গাড়ি বর্ধমান পার হয়ে গেল। দুর্গাপুরের ছেলেটা জল এনে হোল্ড-অলওলার বেঞ্চে জায়গা পেয়ে গেছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রমেন দেখে অপরাহ্নের আলোয় প্রকাণ্ড একখানা আদি-অন্তহীন মাঠ দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে তাদের রেলগাড়ি। চষা জমির ছায়ার মতো আকাশে ফুটে আছে কোদালে মেঘ।

জানালার ধারে একটেরে সিটটিতে বসে ছিল বুড়ো একটা লোক। সে রমেনের ধুতিতে রক্তের ছোপ দেখছিল, লক্ষ করল রমেনের বিষন্ন মুখ। তারপর বলল, লোকটা বাঁচল না, না?।

রমেন মাথা নাড়ল।

লোকটা একটু চুপ করে থেকে বলল, চার দিকেই লোক মরে যাচ্ছে খুব। খাদ্যসমমা। এই বাজারে মানুষ বাঁচে?... আপনি কোথায় যাবেন?

কলকাতায়।

কলকাতায় কোথায়?

ঠিক নেই।

ঠিক নেই। সে কী? বাড়ি-বাসা নেই সেখানে?

রমেন একটু ইতস্তত করে বলে, ছিল, কাশীপুরে গঙ্গার ধারে আমাদের একখানা বাড়ি ছিল। শুনেছি সেটা উদ্বাস্তুরা দখল করে নিয়েছে। আমি কোনও বন্ধুর বাসায় উঠব।

ইস, বাড়িটা বেদখলে চলে গেল! আপনি এতকাল করছিলেন কী? আজকাল কি একটা বাড়ি করা সহজ! গঙ্গার ধারে ওই জায়গায় এখন বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা কাঠা!

লোকটা উদ্বিগ্ন হয় খুব। বলে, আদি বাড়ি ওইটাই?

না, রমেন বলে, আদি বাড়ি ময়মনসিং।

ময়মনসিং! লোকটা নড়ে-চড়ে বসে। ময়মনসিঙের কোথায়?

কালীবাড়ির কাছে।

কার বাড়ি?

রায় হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

লোকটা সোজা হয়ে বসে, তিনি আপনার কে হন?

দাদু।

লোকটা অনেকক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখে। স্থির চোখে। তারপর হঠাৎ ফিসফিস করে বলে, ছোটকর্তা! আপনি আমাদের ছোটকর্তা না?

বুড়ো লোকটার খোলা চোখে জল চলে আসে সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়, বসেন, বসেন—

রমেন তার কাঁধে হাত রাখে। লোকটা বিহুলভাবে বসে পড়ে। সে বুঝতে পারে না এর মানে কী! ছোটকর্তার ময়লা ধুতিতে রক্তের ছোপ, একটু আগে কাটা-পড়া লোকটাকে বুকে করে ধুলোয় বসে ছিল! গালে না-কামানো দাড়ি! মেঝেয় বসে একটা ভিখিরি মানুষের সঙ্গে বিড়ি খেল? কী করে হয়! সে ছোটকর্তাকে ঘোড়ায় চড়তে দেখেছে, বন্দুক চালাতে দেখেছে, সে দেখেছে ছোটকর্তা তেরো বছর বয়সে একা মোটর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায়। সেই বাড়ির দেউড়ির ওপর সিংহের মূর্তি, মাঠে পেখম-ধরা ময়ূর, বড় কর্তা বারান্দায় দূরবিন হাতে বসে আছে, ছোটকর্তা বুট পরে চামড়ার বল মারছে দেয়ালে। কী করে হয়!

আয় হায় রে, এ আপনার কী চেহারা ছোটকর্তা! জমি নাই—বাড়ি বে-দখল—আয় হায় রে—

রমেন তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়, কী বলবে ভেবে পায় না রমেন। কেবল তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

লোকটা কত বার সেই বাড়িতে ছুটে গেছে দায়ে দফায়! মুশকিল-আসান ছিল সেই বাড়ি। পাকিস্তানের পর যখন খালি হয়ে গেল বাড়িটা, লুট পড়ে গেল, তখন কত দিন তার বুক ব্যথিয়ে উঠেছে। কলকাতায় এসে কত বার অভাবে দুঃখে তার মনে পড়েছে ময়মনসিঙের সেই বড় বাড়ির কথা। ইচ্ছে হয়েছে, কাশীপুরে এক বার ছোটকর্তার কাছে যায়। আপনারাই চিরকাল আমাদের দেখেছেন, আমরা আর কোথায় যাব? কিন্তু আয় হায় রে— ছোটকর্তার এখন আর কিছু নাই। কেমন শূন্য লাগে তার, নিঃস্ব ভিখিরির মতো লাগে নিজেকে। কাশীপুরে ছোটকর্তা আছেন, এই বিশ্বাস নিয়েই সে এতকাল অনেক দুঃখে সান্ত্বনা পেয়েছে। কিন্তু এখন সে কী ভেবে সান্ত্বনা পাবে!

আমি মুকুন্দ ঘানিওয়ালা। মনে নাই? রমেন মাথা নাড়ে, মনে আছে।

সৎ জমিদার পিতার মতো। শাসনে রাখেন, সোহাগও করেন। নিষ্কর জমি দিয়ে দেন, বসত করান, ধর্মে-কর্মে মতি আনেন মানুষের। কী মানুষ ছিল সব, মাথা নুয়ে আসত আপনা থেকেই। তার চেয়ে কি এখনকার বি ডি ও-রা ভাল! না কি সরকারি লোকেরা! অনেক হয়রানির পর মুকুন্দ বুঝে গেছে, সব জোচ্চোর, ঠক।

এখন আর সেইসব স্বপ্নের মানুষেরা জন্মায় না, যাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই দুঃখের কথা নিঃশব্দে বলা হয়ে যেত।

নীরবে রমেনের হাতে বে-খেয়ালে হাত বুলোয় মুকুন্দ। বলে, সব চলে গেল, ছোটকর্তা! আমরা তবে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব?

রমেন ঠিক বলতে পারে না। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে, মুশকিলে পড়লে আমি আছি। আমার কাছে এসো।

কিন্তু সে বড় অহংকারের কথা। রমেনের মুখ ফুটে বেরোয় না। সে কেবল মুকুন্দের হাতে হাত রেখে ছোট্ট জায়গাটিতে ঘেঁষাঘেঁষি করে ওর পাশে বসে থাকে।

মাঝে মাঝে একটা বুড়ো ময়ূর, আর একটা পুরনো মোটর গাড়ির কথা রমেনের মনে পড়ে। কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু, সবুজ মাঠে ধূসর রঙের ময়ূরটা এক বোঝা পেখম টেনে আস্তে আস্তে চরে বেড়াচ্ছে, এই দৃশ্য মনে পড়ে। কিংবা লজঝড়ে পুরনো, ক্যাম্বিসের হুডওয়ালা তাদের গাড়িটা বৃষ্টির দিনে পাম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে।

কখনও বা মনে একটি-দু'টি ভিন্ন ছবি ভেসে ওঠে। প্রকাণ্ড একটা ভাঙা পিয়ানোর ওপর ধুলোর আস্তরণ, তার ওপর আঙুল দিয়ে রমেন তার নাম লিখছে, রায় রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। কিংবা মনে পড়ে প্রকাণ্ড দেউড়ির ওপর পুরনো জং-ধরা লোহার আর্চ, তাতে একটা চৌকো কাচের বাতি ঝুলছে, আর লোহার ফ্রেম বেয়ে লতিয়ে উঠেছে মাধবীলতা। কিংবা সেই নোনা-ধরা, শ্যাওলায় সবুজ দেয়ালগুলি, যা তাদের বাড়ির সীমানা ছিল, যার ওপর দিয়ে দু' হাত দু' দিকে পাখনার মতো ছড়িয়ে টাল খেতে খেতে চোখ বুজে কত দিন হেঁটেছে রমেন! কিংবা মনে পড়ে তাদের ভূতগ্রস্ত, প্রকাণ্ড বাড়িটার পশ্চিমের ভিতের কাছে একটা আতসকাচ হাতে দাদু বসে আছে।

এখন সেই বৃষ্টির দিন, আর পাম গাছের তলায় দাঁড়ানো তাদের সেই বুড়ো ভাঙা গাড়িটার ভিজে যাওয়ার কথা মনে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে সেই বুড়ো ময়ূরটার পেখমের বোঝা টেনে টেনে সতর্ক চলা, গ্র্যান্ড পিয়ানোর গায়ে লেখা তার পুরনো নাম, আর আতসকাচ হাতে বাড়ির পশ্চিমের ভিতের কাছে দাদুর বসে থাকার দৃশ্য মনে পড়ে গেল। তার চারধারে এখন একবার তাকিয়ে দেখলে কিছুতেই মনে হয় না যে, সে-সব সত্যিই একদিন ছিল, সেই ময়ূর, পুরনো গাড়ি, সেই গ্র্যান্ড পিয়ানো, কিংবা সেই দাদু। যেমন, মনে হয় না ছেলেবেলায় সত্যিই তাকে ওইভাবে তার নাম লিখতে বা বলতে শেখানো হয়েছিল, রায় রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

পঁচিশ

লোকটা বলেছিল, 'জানি'। কী জানে লোকটা? রাত আটটা নাগাদ হাওড়া স্টেশনে নেমে বিভু ভিড়ের মধ্যে লোকটার পিছু নেয়। লোকটার ডান হাতে সুটকেস, বাঁ বগলে শতরঞ্জিতে বাঁধা ছোট বিছানা, মফস্‌সলির মতো হাবভাব। কিন্তু ও কিছু একটা জানে। নিশ্চিত। গতকাল থেকেই বিভুর মন ভাল নেই। মানুষ কত সহজেই টুক করে মরে যায়! এই তো একটু আগে বর্ধমানের কাছে কাটা পড়ল একটা লোক, এই লম্বা লোকটা গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিল, কয়েক পলক এই লোকটার দিকে চেয়ে কাটা-পড়া মানুষটা মরে গেল। কী সহজ ব্যাপার! গতকাল আর-একটা লোক ঠিক ও-রকমই সহজভাবে মারা গেছে দুর্গাপুরে। ইউনিয়নের সেই লোকটা কীরকম ছিল কে জানে! বিভু তাকে চেনেও না। লোকটা সকালের শিফ্‌টে ডিউটিতে যাচ্ছিল, অল্প কুয়াশায় আবছা মাঠের ভিতর দিয়ে, একটা টিফিন-ক্যারিয়ার আর একটা থলে হাতে চলে আসছিল সে, সদ্য ঘুমভাঙা চোখে তখনও বোধ হয় বউ কি বাচ্চার মুখখানা ভাসছিল তার। অতশত জানে না বিভু, সে কেবল লোকটিকে আসতে দেখেছিল। লোকটা থেমে একটা বিড়ি ধরাচ্ছিল, বিভু হাতে বাঁধা বোমাটা টপকে দিয়ে দৌড় দিল। রেল লাইনের ওপারে দাঁড়িয়ে ছিল জিপ গাড়িটা, তাকে তুলে নিল। জিপ গাড়িতেই টাকার লেনদেন হয়ে গেছে। এখন পকেট গরম, বিভু ফিরছে কলকাতায়। কিন্তু তবু গতকাল থেকেই তার মন ভাল নেই। দুনিয়াভর এত মানুষ, তার মধ্যে দু'-একজন মরে গেলে কী হয়! কিছুই না, তেমন কিছুই হয় না। এই যে বর্ধমানের কাছে কাটা পড়ল লোকটা তার জন্য কী হয়েছে। ট্রেনটা আধ ঘণ্টা বা চল্লিশ মিনিট দেরিতে এসেছে, তার বেশি কিছুই হয়নি। কামরার মধ্যে মানুষেরা 'আহা, উঁহু' করছিল বটে, কিন্তু দুঃখের চেয়েও তারা বিরক্তই হচ্ছিল বেশি ট্রেনটা লেট হচ্ছে বলে। কেবল ওই লম্বা লোকটা যার হাতে টিনের সুটকেস, বগলে বিছানা, কেবল ওই লোকটাকেই অন্য রকম দেখেছিল বিভু। কাটা ছেঁড়া থ্যাঁতলানো হয়ে যাওয়া মানুষটাকে বুকে জাপটে ধরেছিল। বিভুর মনে ভাল লাগেনি। অত আদরের কী আছে? পৃথিবীর দু'-চারজন লোক কমে গেলে ক্ষতি কী? কালকের ইউনিয়নের সেই লোকটাই বিভুর প্রথম 'কেস' নয়। এর আগে আর একজন তার হাতে গেছে কলকাতায়। দু'বারই দুই ঘটনার সময়ে বিভুর একটা অদ্ভুত দৃশ্য মনে পড়েছিল। অনেক দিন আগে দেশের বাড়িতে বাবা খেতের কাজ করতে যেত। বেলাশেষে তার জন্য ভাত বয়ে নিয়ে যেত বিভু। একদিন ভাত দিয়ে ফেরার সময়ে আলপথে খেলতে খেলতে অন্যমনে ফিরছিল বিভু। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ভীষণ চিৎকার করে ডাকল, ভাই রে-এ। পিছন ফিরে সে দেখল একজন মুসলমান লোক লম্বা লাঠি উঁচু করে ধরে চেঁচিয়ে বলছে, ভাই রে, তুই এঁকেবেঁকে ছোট, এঁকেবেঁকে ছোট... আর তখন বিভু দেখতে পেয়েছিল চষা জমির ওপর দিয়ে তার পিছু নিয়েছে কাল-কেউটে... বিভু ছুটেছিল। আর তার ছায়ায় ছোবল মারতে মারতে পিছু পিছু সাপটা। 'ভয় নাই রে, এসে গেছি...' বলতে বলতে মাঠটা কোনাকুনি পার হয়ে এল সেই মুসলমান লোকটা, লম্বা লাঠির এক ঘায়ে সাপটাকে নিশ্চল করে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে সাপটাকে বলল, আর একটু হলিই আমার ভাইটারে খেয়েছিলি শালা...। অনেক দিন আগের সেই ঘটনা তবু দু' বারই বিভুর সেই দৃশ্যটা মনে পড়েছে। চষা নিষ্ফলা জমির ওপারে উঁচু আলের ওপর দাঁড়িয়ে শেষ বেলার ম্লান আলোর

ছায়ার মতো একজন মুসলমান লোক লম্বা লাঠি উঁচু করে তাকে চেঁচিয়ে বলছে, ভাই রে, তুই এঁকেবেঁকে ছোট, এঁকেবেঁকে ছোট... বিভুর মন ভাল লাগে না। গতকাল সকালবেলা লোকটাকে বোমা মেরে যখন জিপ গাড়ির দিকে দৌড়াচ্ছে বিভু তখনও হুবহু সেই দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছিল, নিস্তেজ বিকেলে তার পিছু নেওয়া সেই সাপ, দূরে আলের ওপর দাঁড়ানো সেই লাঠি-হাতে মুসলমান লোকটা চেঁচিয়ে বলছে, ভাই—রে-এ-এ—

এই লম্বা চেহারার লোকটা বলেছিল, 'জানে'। কী জানে ও? কেমন করে জানে?

হাওড়া স্টেশনের প্রকাণ্ড হলঘর আর চাতাল পার হয়ে সিঁড়িতে পা দেওয়ার মুখে সে পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে লোকটাকে স্পর্শ করল।

রমেন মুখ ঘুরিয়ে দেখল, দুর্গাপুরের সেই ছেলেটা।

কোন দিকে যাবেন? ছেলেটা জিজ্ঞেস করে।

রমেন মৃদু স্বরে বলে, যাদবপুরের দিকে।

আমিও, ওই দিকেই। ট্যাক্সি নেব, আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি। যাবেন?

না, বিভু যাদবপুরের দিকে যাবে না, সে যাবে বেহালা। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সে বরং ঘুরপথে লোকটাকে যাদবপুরে নামিয়ে দিয়েই যাবে। জানা দরকার এ-লোকটা কী জানে! কতটুকু জানে!

রমেন হাসল। তারপর মাথা নেড়ে জানাল, যাবে।

ট্যাক্সিতে ছেলেটা রমেনকে সিগারেট দিল। দু'-একটা মামুলি কথাবার্তা বলল। তারপর চুপ করে রইল।

বাইরে কলকাতা। আরও পুরনো আরও ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। যেন প্রাণপণে রুজ-পাউডার মেখে আছে এক বুড়ি ট্যাঁশ মেম! ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে নিয়েছে বাজার করার চটের থলে। মাঝে মাঝে ঝলসে ওঠে ট্রাফিকের সুন্দর হলুদ বাতিটি। বিধাতার মতো আত্মবিশ্বাসে হাত বাড়ায় মোড়ের পুলিশ। মতলববাজ মানুষের চোখ জোনাকি পোকার মতো জ্বলে উঠেই ভিড়ের মধ্যে নিবে যায়।

রমেন বাইরের দিকে চেয়ে ছিল।

ছেলেটা তার দিকে একটু ঝুঁকে বলল, আমার চেহারা দেখে কিছু বোঝা যায়?

রমেন একটু নড়ল। তারপর তার স্বচ্ছ সুন্দর মুখখানা ফেরাল ছেলেটির দিকে। নরম গলায় বলল, চেহারায় মানুষের কর্মের কিছু কিছু ছাপ থাকে।

আমার আছে?

রমেন মাথা নাড়ল, আছে।

আছে। তবে আছে। অধৈর্য বিভু সিগারেট বাইরে ছুড়ে দেয়। তার চেহারায় ছাপ পড়ে গেছে। আসলে এ-সবের জন্য দায়ী একটি মেয়ে। মৃদুলা। দেখতে এমন কিছু সুন্দর ছিল না। রং ময়লা, গালে এক-আধটা ব্রণ, নাক ভোঁতা। তবু কী যে টান ছিল তার। বিভু কথা বলতে পারেনি কোনও দিন, তার বুক কাঁপত। সে বিয়ে করতে চেয়েছিল, মৃদুলার বাপ জাত দেখাল। তারপর সরিয়ে নিয়ে গেল মৃদুলাকে কোথায়! তার হাতের বাইরে। আক্রোশে বিভুর সমস্ত শরীর ঝিনঝিন করে, মাথায় রক্ত উঠে আসে ছল ছল করে। তার কাছে মানুষের মূল্য কমে যায়। পৃথিবীতে এত মেয়ে আছে, তার মধ্যে সে একজন সামান্য মৃদুলাকে চেয়েছিল—যার নাক ভোঁতা, গালে ব্রণ, রং ময়লা। সে ওই ব্রণগুলিতে আদরের হাত বুলিয়ে দিত, ঠোঁট ছোঁয়াত চাপা নাকটিতে, নিজের গায়ে মেখে নিত ওর ময়লা রং। কত কথা মৃদুলাকে বলবার জন্য মনে মনে তৈরি করেছিল

সে, যখন একমাত্র মৃদুলাকে চায় সে, তখন একমাত্র সেই মৃদুলাকেই পাচার করে দেওয়া হল অন্য জায়গায়। সে জানে মাস দেড়েক আগে মৃদুলার বিয়ে হয়ে গেছে। তাকে পাত্তা দিল না মেয়েটা। ঠিক আছে। তবে এবার পাত্তা দাও বিভুকে, পৃথিবীর মানুষ। বুটের লাথি খেয়ে পাত্তা দাও, ছোরা খেয়ে ঢলে পড়তে পড়তে, আচমকা বোমা খেয়ে উড়ে যেতে যেতে...। দেখো হে, আমি বিভু—বিভু মাস্তান। বাপের সুপুত্র। কোথায় যাবে মৃদুলা? একদিন ঠিক দেখা হয়ে যাবে। বিভু জানে।

খ্যাপাটে চোখে বিভু তার দিকে তাকাল, কীসের ছাপ পড়েছে আমার চেহারায়?

হাত বাড়িয়ে রমেন তার হাতখানা ধরল। ম্লান মুখে বলল, আপনি তো জানেন।

বিভু হাত টেনে নেয়, কিন্তু আপনি কী করে জানলেন? ওস্তাদের মতো বললেন জানি! কী জানেন আপনি? আপনি কি জ্যোতিষ?

রমেন মাথা নাড়ল, না।

তবে? বিভু বিহ্বলভাবে চারদিকে চায়। বলে, আপনি তবে কোথাও আমাকে দেখেছেন! কোথায়?

একটি কিংবা দু'টি খুন করার পর মানুষের চোখ স্থির হয়ে যায়। বাইরে থেকে দেখায় শান্ত, কিন্তু আসলে তা শান্ত নয়। তখন চোখের পাতার একটা গাঢ় ছায়া পড়ে মণিতে। রমেন তা জানে। কিন্তু কী করে তা বলবে রমেন, অত আন্দাজি কিছু বলা যায়!

রমেন একটু কাশল। তারপর ঘুরিয়ে দিল কথাটা, না, আপনাকে এর আগে কোথাও দেখিনি। তবে আপনার চেহারা দেখে মনে হয় সম্প্রতি আপনার কোনও আপনজন মারা গেছেন।

মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে যায় বিভু, হঠকারীর মতো বলে ফেলে, না, না, তারা কেউ আমার আপনজন ছিল না। আমি তাদের চিনতামই না।

রমেন বুঝতে পারে ছেলেটা প্রকৃতিস্থ নেই। সে ত্বরিতে ওর হাত নিজের কোলের ওপর টেনে নিয়ে বলে, ঠিক আছে, আমি বুঝেছি। ইঙ্গিতে ট্যাক্সিওয়ালাকে দেখিয়ে চাপা গলায় বলে, ও শুনতে পাবে; চুপ করুন...

বিভু হকচকিয়ে চুপ করে যায়। তারপর চুপ করে থাকে।

রমেন ওর হাতে হাত বুলিয়ে দেয়। তারপর খুব মৃদু গলায় বলে, কে বলল যে, তারা আপনার আপনজন ছিল না?

আর কথাবার্তা তেমন কিছু হল না। বিভু সারাক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। আর ওর হাতখানা কোলে নিয়ে বসে রইল রমেন।

অনেক দিন আগে, রমেনের বয়স যখন দশ-এগারো, তখন যুদ্ধ চলছে। তাদের তিনটে বন্দুক তখন সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা। তাই সেই বয়সেই তাড়াতাড়ি বন্দুক শেখানোর জন্য তাদের পুরনো চাকর উদ্ধব আর ড্রাইভার আশু তাকে নিয়ে গেল কেওটখালির মাঠে। দূরে রাখল তিনপায়া একটা ব্ল্যাক বোর্ড, তাতে দুটো বৃত্ত আঁকল, তারপর তার হাতে তুলে দিল কারুকার্যকরা ভারী বন্দুকখানা। বলল, মারো, মাঝখানের গোল্লাটায় মারো। রমেন মেরেছিল, ভীষণ শব্দে প্রথমবার হাত থেকে প্রায় ছিটকে গেল বন্দুকখানা, গুলিটা কোথাও লাগেনি, উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর কয়েক বারের চেষ্টাতেই সে ঠিক মাঝখানের বৃত্তটাকে ফুটো করে দিল। উদ্ধব বলল, আর জন্মে তুমি অর্জুন ছিলে। তারপর বন্দুক চালানো নেশার মতো পেয়ে বসল তাকে। উদ্ধব দ্রোণাচার্যের মতো বোর্ডে পাখি এঁকে চোখ বসিয়ে বলত, চোখে মারো তো। রমেন মারত। যখন

এই ভীষণ নেশা তাকে প্রতি দিন বিকেল বেলা ঘর ছেড়ে বন্দুক হাতে বেরোনোর জন্য অস্থির করে তুলত, সেই সময়ে একদিন বন্দুকগুলো জমা পড়ে গেল। সন্ধেবেলা ভীষণ দুঃখে দাদুর ইজিচেয়ারের পাশে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে ছিল রমেন, দাদু তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, এ তো ভালই হল। এর পরে একদিন তোমাকে দেখলে অবোধ জন্তুরা ভয় পেত। রমেন বোঝেনি। অনেকক্ষণ পর একসময়ে দাদু মৃদু স্বরে আপনমনে বলল, তুমিই আমার অস্ত্র।

সে-কথাটার অর্থ রমেন এখন খানিকটা বোঝে। এই অচেনা ছেলেটা তার পাশে বসে আছে, এর ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে হয়তো রয়েছে হাতে-বাঁধা বোমা, তলপেটের কাছে লুকানো ছোরা—তবু কত নিরস্ত্র, অসহায় দেখাচ্ছে একে। এ জানে না অস্ত্রের ব্যবহার, কিংবা প্রকৃত অস্ত্র কাকে বলে। একদিন এ নিজের হাতে মারা যাবে।

রমেন বড় মায়ায় ছেলেটির হাতে হাত বুলোয়।

যাদবপুরের কাছে ট্যাক্সি থেকে নেমে জানালা দিয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল রমেন, আবার কোনও দিন দেখা হয়ে যাবে। আচ্ছা ভাই...

আচ্ছা... ছেলেটা হাত তুলল।

ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে নিল ট্যাক্সিওয়ালা।

রমেন একা একটু হাসে। মানুষের কাছ থেকে মানুষের কাছে, ক্রমে আরওতর মানুষের কাছে চলেছে সে। এইভাবেই দিন কাটে তার।

যাদবপুরের কিছুই আর চেনা যায় না। যখন প্রথম এখানে প্রজারা বসত নিয়েছিল, তখন মাঝে মধ্যে আসত রমেন। দুপুরেও ঝিঁঝির শব্দ শোনা যেত। শোনা যেত মাটি কাটার শব্দ। জমির দখল নিয়ে লাগত কাজিয়া, লাঠি সড়কি বেরোত। ঝগড়া লাগত কমিটিতে কমিটিতে। ফড়ে আর দালালদের গতায়াত ছিল খুব। উচ্ছেদের হুমকি দিতে আসত দারোগা। তখন সারা দিন প্রজাদের কাছে কাছে থাকত রমেন। সঙ্গে থাকত উদ্ধব আর লব। তাদের হাতে লাঠি। বাইরের হাঙ্গামার জন্য তারা ছিল, রমেন দেখত জমির বন্টন। যাদবপুর থেকে পুঁটিয়ারি, বারাসাত, দমদম, হাবড়া, কখনও বা সুন্দরবনের দিকে ঘুরে ঘুরে সে বেরিয়েছে। নতুন জায়গায় এসে দিশেহারা প্রজারা তাকে দেখে বল-ভরসা পেয়েছে আবার। কখনও কখনও জিপ গাড়িতে নিশান উড়িয়ে কাজ দেখাতে আসত পার্টির লোক, জমির লোভ দেখিয়ে ঘুষ চাইত কমিটির মেম্বার, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠত কো-অপারেটিভ সোসাইটি। রমেন তার প্রজাদের আড়াল দিয়ে দাঁড়াত।

এখনকার আলো ঝলমলে যাদবপুর দেখে খুশি হয় রমেন। গায়ে গায়ে দোকান, ট্যাক্সির স্ট্যান্ড, কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়। একটু অচেনা লাগে তার। কিন্তু চেনা রাস্তা খুব কমই হেঁটেছে সে জীবনে।

রিকশাওয়ালা ক্রিং করে বেলের শব্দ করে বলে, যাবেন বাবু—

রমেন সুন্দর শান্ত হাসি হেসে বলে, না ভাই।

রেল লাইন পেরিয়েও অনেকটা হাঁটতে হল রমেনকে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করতে হল। কলোনির একদম শেষ দিকে উদ্ধৰ জমি নিয়ে ঘর করেছিল, সেটা রমেনের মনে আছে। কিন্তু এখন আর কলোনির কোনও শেষ

খুঁজে পাওয়া যায় না। রেল লাইনটা এক দিকে আটকে রেখেছে, অন্য আর সবদিকে বাড়ির পর বাড়ি। সব প্রাকৃতিক দৃশ্য মুছে গেছে।

উদ্ধবের ছোট মেয়েটি কুপি উঁচু করে ধরে আগলের ও-পার থেকে জিজ্ঞেস করে, কে?

উদ্ধবের বাড়ি এটা?

অন্ধকারে, কুপির আলোর আবছায়ায় প্রকাণ্ড লম্বা লোকটিকে অবাক আর ভিতু চোখে দেখে শিশু মেয়েটি। তারপর ফিরে গিয়ে মাকে ডেকে আনে।

ঘোমটা টেনে উদ্ধবের বউ সামনে আসে, কাকে চান?

উদ্ধব কি বাড়িতে নেই!

না। ফিরতে তিনির রাত হয়। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বউটি ঠিক বুঝতে পারে না।

রমেন একটু ইতস্তত করে বহুদিনকার পুরনো ভুলে-যাওয়া এক নাম বলে, রায় রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

অমনি চঞ্চল হয়ে ওঠে বউটি। কী করবে বুঝতে পারে না। প্রথমেই তার মুখ দিয়ে বেরোয়, ওঃ মা!

আগল খুলে হাট করে দেয় বউটি। অভ্যর্থনার কোনও ভাষা মুখ দিয়ে বেরোয় না। মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে প্রণাম করে। এ যে বুড়োকর্তার নাতির নাম! এ নাম যে তার শিশুবয়সের সংস্কার!

পর দিন সকালে উদ্ধবের উঠোন ভরে যায় মানুষে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ টাকা রেখে প্রণাম করে। দেখে অনেক দিন আগেকার কথা মনে পড়ে যায় বলে রমেন হাসে। টাকা ফিরিয়ে দেয়। বলে, চিরকাল তোমরা আমাকে অনেক দিয়েছ। এবার বলো তোমাদের আমি কী দিতে পারি?

উদ্ধব চেঁচিয়ে বলে, তুমি আমাদের কাছে থাকো। আমরা সবাই মিলে তোমাকে বসত করে দেব, বিয়ে দেব, সংসারী করব। তার বদলে তুমি আমাদের দেখবে, যেমন বুড়ো কর্তা দেখত।

কিন্তু এক জায়গায় থাকে না রমেন। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গা। বাইরে থেকে শান্ত দেখায় তাকে। কিন্তু তার ভিতরে ভিতরে এক তীব্র আনন্দময় উত্তেজনা থরথর করে কাঁপে।

অনন্ত মণ্ডলের বাড়ি পশ্চিম পুঁটিয়ারি। তার নেশা জমি। দেশে থাকতে চাষ করত, এখন আর তা করে না, কিন্তু জমিরই ব্যবসা তার। কোনও কোনও জায়গা, দেখলেই সে বুঝতে পারে যে এখানে একদিন বসত হবে। অমনি এক লপ্তে জমি কেনে, মাটি ফেলে উঁচু করে, তার দিয়ে ঘিরে ফেলে রাখে। দু'-তিন বছরের মধ্যেই বিঘার দর কাঠার দরের নীচে চলে যায়। ঘোড়েল দু'খানা চোখ অনন্তর, জমি তার চোখে চোখে কথা বলে। এখন তার ঘরে ফ্লুরোসেন্ট আলো জ্বলে, রেডিয়োর আওয়াজ হয়, বাগানে ফুটে থাকে রজনীগন্ধা। তার দুটো বউ আজকাল ঝগড়া কাজিয়া কম করে। ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে যায়।

ছোটকর্তার লম্বা চেহারাখানা তার বারান্দায় সকালের রোদে ছায়া ফেলতেই চমকে ওঠে অনন্ত, পাগলের মতো দু' হাত ওপরে তুলে চেঁচায়, ছোটকর্তা না? আঁ?

রমেন দেশি সুরে কথা বলে, অনন্ত কেমন?

মুহূর্তে তুলকালাম কাণ্ড করতে থাকে অনন্ত। দুই বউকে টেনে নিয়ে আসে, নড়া ধরে আনে ছানাপোনাদের, রমেনের পায়ের কাছে ফেলে আর চেঁচায়, ভগবান, ভগবান!

ছেলেপুলেরা এখন বুঝতে শিখেছে। তারা ব্যাপারটা পছন্দ করে না। দেশ ভাগের সময়ে হয় তারা শিশু ছিল, নয়তো জন্মায়নি। কাজেই একটা অচেনা লোককে নিয়ে বাবার লাফালাফি তাদের আত্মসম্মানে ঘা দেয়। কিন্তু দুই বউ পায়ে লুটিয়ে পড়ে, তাদের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রমেন হাত জোড় করে চোখ বুজে তাদের প্রণাম নেয়।

রমেন বারান্দায় থামে ঠেস দিয়ে বসে। তাকে ঘিরে বসে অনন্ত, দুই বউ, আর শিশু ছেলেমেয়েরা। তদগতভাবে চেয়ে থাকে অনন্ত, আপনমনে হাসে, চোখ মোছে।

অনন্তর বড় ছেলে পার্টি করে, সে এসে হাতজোড় করে নমস্কার করতেই অনন্ত ঝাঁকি মেরে ওঠে, পায়ে হাত দে। রমেন উঠে দু' হাতে ছেলেটিকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, ঠিক আছে, ও-ই যথেষ্ট।

সবাই গোল হয়ে বসে রমেনের গল্প শোনে। বড়রা সবাই দেখেছে ছোটকর্তাকে গাড়ি চালাতে, বন্দুক ছুড়তে। কিন্তু এখন এ কী চেহারা ছোটকর্তার? তাদের চোখ ছল ছল করে।

আপনাদের কাছে কত সুখে ছিলাম, ছোটকর্তা!

রমেন হাসে, কেন সুখে ছিলে?

আপনারা ছিলেন আমাদের আপনজন, যেন আত্মীয়।

রমেন একটু চুপ করে থেকে বলে, কিন্তু এখন তো আমি ভিক্ষুক।

অনন্ত সোজা হয়ে বসে, কী কন ছোটকর্তা! আমরা আছি না? কীসের অভাব আপনার, বলেন!

রমেনের মনে আছে অনেক দিন আগে তার পৈতের সময়ে দণ্ডী ঘরে যাওয়ার আগে গায়ে গেরুয়া উত্তরীয়, হাতে দণ্ড আর ঝোলা, কামানো মাথা—এই রকম চেহারায় সে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর কাছে তার গেরুয়া ঝোলা বাড়িয়ে ধরে ভিক্ষে করছে, ভবতি ভিক্ষাং দেহি। ভবান্ ভিক্ষাং দেহি। সঙ্গে তার কাঁধে হাত রেখে দাদু আর কুলপুরোহিত সতীশ ভরদ্বাজ। ভদ্রজনের কাছে ভিক্ষা চাওয়া শেষ হলে দাদু তার হাত ধরে বাইরের উঠোনে নামিয়ে আনল। সেখানে হাজার প্রজা দাঁড়িয়ে। সে ঝোলা সামনে বাড়িয়ে 'ভিক্ষাং দেহি' বলার সঙ্গে সঙ্গে কী চঞ্চলতা পড়ে গেল সেই সহস্র লোকের মধ্যে। যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল মানুষের ভিতরে। তারা আশা করেনি ছোটকর্তা ভিক্ষে চাইবে তাদের কাছেও। মুহূর্তে ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। তাদের হাত কঁপে, মুখে উত্তেজনার চাপা উজ্জ্বলতা। তারা যে যা এনেছিল সব ঢেলে দেয় রমেনের ঝোলায়। তারা ছোট্ট রমেনের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে, চেঁচিয়ে ডাকে, কাছে আসতে চায়, দাদু কানের কাছে গুনগুন করে বলে, বলো, ভবান্ ভিক্ষাং দেহি, বলো চেঁচিয়ে, বলো অন্তর থেকে। ছোট্ট রমেন চেঁচিয়ে বলতে থাকে, ভিক্ষা দাও, আমাকে ভিক্ষা দাও। আবেগে তার গলা কাঁপে, চোখে জল আসে। ঝোলার ভারে কাঁধ ছিঁড়ে পড়ে, তাই টেনে টেনে রমেন হাঁটে, ভিক্ষে চায়। মানুষ ঘিরে ধরে তাকে। চোখের জল মুছে ভিক্ষে দেয়। রমেনের আর খেয়াল থাকে না সে কী করছে, কিংবা সে আসলে কে। তার বিমুগ্ধ মন কেবল ভাবে যে সে এক মহান ভিক্ষুক। নেশার মতো ওই ভিক্ষাবৃত্তি তাকে টেনে নিয়ে যায়, সে ফিরে আসতে পারে না। আর ফিরে আসার দরকারই বা কী! সে কখন যেন ভিক্ষে চাইতে চাইতে দেউড়ি পার হয়, লাল ধুলোর রাস্তায় পড়ে। দু'ধারে জয়ধ্বনির মতো চেঁচিয়ে ওঠে মানুষ, তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে।

দেউড়ি পার হতেই কে যেন তার হাত ধরেছিল। ব্যস আর না, এবার ফিরে এসো। ছোট্ট রমেন অভিভূত চোখে চেয়ে ছিল। কোথায় ফিরবে সে? কেন ফিরবে?

আজ রমেন জানে, তারা যে সৎ জমিদার সেটা প্রমাণ করার জন্যই যে দাদু প্রজাদের কাছে তাকে দিয়ে ভিক্ষে করিয়েছিল তা নয়। দাদুর অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় দণ্ডীঘরে এসে তাকে আহ্নিক করার পদ্ধতি শেখাবার পর দাদু বলেছিল, রমেন, ব্রহ্ম মানে বিস্তার। ব্রাহ্মণ তাই তার ক্ষুদ্র বাড়িতে বা সংসারে আবদ্ধ থাকেন না। তুমি যদি ব্রাহ্মণ তবে যেন একদিন সেই বিস্তার লাভ কোরো। আজ দরদালান থেকে ভিক্ষে করতে করতে তুমি দেউড়ি পার হয়ে গিয়েছিলে, ভিক্ষে চাওয়ার সময়ে তুমি কাঁদছিলে, কেন বলো তো? কারণ, ওই একটুতেই তুমি টের পেয়েছিলে বিস্তার কাকে বলে।

দাদু এসে দিনের অনেকটা সময় থাকত তার আবছা অন্ধকারে দণ্ডী ঘরে। বলত, তুমি মনেও কোরো না যে তুমি জমিদারের ছেলে বলে লোকে তোমাকে ভিক্ষা দিয়ে কেঁদেছে। তা নয়। আসলে তারা কেঁদেছে সেই ব্রাহ্মণের জন্য যে একদিন ভারতবর্ষকে ধর্ম দান করেছিল। শিখিয়েছিল কীভাবে বেঁচে থাকতে হয়, কীভাবে বেড়ে উঠতে হয়। তারা ভিক্ষার ছলে ছলে যেত মানুষের কাছাকাছি, তাদের দাওয়ায় বসত, দুঃখের কথা শুনত, ভাগীদার হত তার মনের। এইরকম করেছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও। তারা যাজনে ছেয়ে ফেলেছিল দেশ, ভিক্ষার ছলে ছলে তারা ভারতবর্ষের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল বুদ্ধের বাণী। মনে রেখো, ভিক্ষুকের পাত্র থেকে শুরু হয়েছিল ভারতবর্ষের বিপ্লব। কারণ ভিক্ষা থেকেই এসেছিল জন-সংযোগ, জন-জাগরণ। মানুষের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া। ভিক্ষুকরাই তা করেছিল।

তারপর দাদু অনেকক্ষণ ভেবে বলেছিল, কিন্তু আমি তোমাকে ভিক্ষে করতে বলতে পারি না। খামোখা তুমি ভিক্ষে করবে কেন? কিন্তু যদি তাঁর দেখা পাও, যিনি তোমাকে অন্ধ করে দিয়ে কেড়ে নিয়েছিলেন তোমার বল, তারপর আবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যদি তাঁকে কোনও দিন পাও, আর তিনি যদি তোমাকে ভিক্ষা করতে পাঠান তবে প্রসন্ন মনে তা কোরো। কিন্তু তুমি কি তাকে কোনও দিন খুঁজবে রমেন?

দাদু চুপ করে অন্যমনস্ক থেকেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, দুঃখে কাতর মানুষই কেবল তাঁর অনুসন্ধান করে। রমেন আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি তোমার জীবনে যেন দুঃখ তাড়াতাড়ি আসে।

অনন্ত আর তার ছেলে, বউয়ের কাছে সেই সব গল্প করছিল রমেন।

হঠাৎ চোখ মুছে অনন্ত বলে, হ্যাঁ, মনে আছে কর্তা, কী সুন্দর আছিল আপনার ব্রহ্মচারীর পোশাক। আমি ভিক্ষা দিছিলাম। আঙুল থিক্যা খুইল্যা দিছিলাম রুপার আংটি আর কোমরের কষি থিক্যা দুইটা টাকা। আইজ আমি আরও বেশি দিতে পারি। বলেন কী চাই!

আমি তোমারে কী দিচ্ছি?

এই তো দিলেন! এই যে আসলেন অধমের বাড়িতে, চোখ জুড়াইয়া গেল।

রমেন মাথা নাড়ে, হাসে। বলে, আবার আসুম হে, আবার—

অনন্তর বড় ছেলে, একুশ কি বাইশ বছর বয়স, রমেনের পিছু নিয়ে রাস্তায় আসে। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে, আপনি কি তাঁকে পেয়েছিলেন?

সতীশ ভরদ্বাজ, সেই কালো বেঁটে তেজি ব্রাহ্মণ, এখন শয্যাগত। ছেলেদের সঙ্গে বনিবনা হয়নি, তারা আলাদা থাকে, সামান্য কিছু দেয়। দুই মেয়ের একজন প্রেম করে বিয়ে করেছে, অন্যজন বিধবা, শ্বশুরবাড়িতে

আঁকড়ে পড়ে আছে।

বুকচাপা, অন্ধকার, ভ্যাপসা টিনের ঘরটায় রমেন ঢুকে দেখে বিছানায় একখানা ছায়া পড়ে আছে। দু'খানা চোখ জ্বলজ্বল করে প্রত্যাশায়।

কষ্টে উঠে বসে সতীশ ভরদ্বাজ। বলে, আমার বুড়িটার কপালে তখনও সিন্দূর—বুঝলা? বসো হে, তোমারও তো সব গেছে!

রমেন পায়ের দিকটায় বসে। সতীশ ভরদ্বাজ, সেই অহংকারী তেজি লোকটা, আক্ষেপ করে, আমি তো সদ্ব াহ্মণ, তবে ক্যান আমার এই অকাল মৃত্যু? ক্যান আমার বংশে অনাচার, অলক্ষ্মী? ইষ্ট কই?

বুড়ি একটা মোড়া পেতে সামনে বসে। গোদা পা দু'খানা দেখলেই বোঝা যায় শরীরে জল এসেছে। সিঁদুরের তলায় সিঁথিতে ঘা দেখা যায়। কপাল চাপড়ায় বুড়ি, সব গেল গিয়া।

কিছুই যায়নি। শতগুণে ফিরে আসছে সব। আর কয়েকটা দিন মানুষ তার সম্পূর্ণ ভুলগুলো বুঝে নিতে যতটা সময় নেবে, তারপরই বিপ্লবী ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকে ছেয়ে যাবে দেশ। জীবন বৃদ্ধির ধর্ম দান করে বেড়াবে মানুষকে। তেমন ভিখারিকে সর্বস্ব দেওয়ার জন্য ছুটবে মানুষ।

রমেনের শান্ত তৃপ্ত মুখখানা দেখে হঠাৎ যেন সতীশ ভরদ্বাজ কেমন একটু আশান্বিত হয়ে ওঠে। সর্বস্বই কি গেছে ছেলেটার? না কি আবার কিছু পেয়েছে!

ঘর অন্ধকার করে সন্ধেবেলায় শুয়ে ছিল রমণীমোহন। পুত্রশোক দু'টি গেছে পর পর। আগে নদীর তলা থেকে এক ডুবে খামচি দিয়ে মাটি তুলে আনত, এখন হাঁপানিতে হাঁফায় সারা দিন। প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করে। কীরকম উদ্দন্ত কীর্তন করত রমণী তা আর এখন কারও মনে নেই। বিধবার সম্পত্তি, গ্রাস করে করেছে ছোট্ট বাড়িখানা, তারপর থেকে পাপবোধে ভুগছে।

কই হে, রমণী।

ছোটকর্তার গলা না? রমণী চমকে ওঠে। তারপরেই বুঝতে পারে ওটা ভুল। কর্তারা কোথায় চলে গেছে! কে জানে বেঁচে আছে কি না! রমণী পাশ ফিরে শোয়।

কে যেন হাত ধরে তাকে তুলে বসায়। আবছা অন্ধকারে মুখোমুখি ছোটকর্তার মুখ। যেন ঘুম ভাঙার পরে স্বপ্ন।

রমেন চলতে চলতে মাঝে মাঝে দাঁড়ায়। চারদিকের আবহাওয়ায় কিছু একটা অনুভব করতে চেষ্টা করে। প্রতি জনপদেরই একটা বিশিষ্টতা আছে। অনেক মানুষ এক জায়গায় বসবাস করতে করতে কিছুটা একে অন্যের মতো হয়ে যায়। তাদের যৌথ চিন্তার বিকিরণ সেই জায়গার আবহাওয়াকে সম্মোহিত করে রাখে। কখনও রমেন মফস্‌সলের কোনও ছোট্ট শহরে পা দিয়েছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছে, এ-জায়গা অর্থলিপ্সুদের অধিকারে। প্রায় সময়েই দেখা গেছে যে তার ভুল হয়নি।

মানুষের চারধারে জ্যোতির্বলয় নেই। না থাক, কিন্তু তার অস্তিত্বের একটা বলয় সে তার চারধারে নিয়ে বেড়ায়। সেটা হয়তো তার গায়ের উত্তাপ, রক্তের স্পন্দন, গায়ের বিশেষ গন্ধ। দেহ সবসময়েই বিকিরণ করছে তার অস্তিত্বের সংবাদ। ঠিক সে-রকম, মানুষ তার সারা জীবনের যা কিছু কাজ তার স্বভাব এবং চিন্তারও একটি বলয় তৈরি করে নিজের অজান্তে। একে অন্যের বলয়ের মধ্যে এসে কী একটা টের পায়, কিন্তু সঠিক বোঝে না। তার নিজের অস্তিত্ব তাকে ব্যতিব্যস্ত রাখে বলেই সে অন্যকে সঠিক চিনতে পারে না।

কিন্তু রমেন পারে। সে স্পষ্টতই মানুষের চারধারে সেই বিশেষ বলয়টিকে অনুভব করে। যত মানুষ তার কাছাকাছি আসে, রাস্তায় মুখোমুখি এসে পেরিয়ে যায়। কিংবা রেলগাড়িতে বসে থাকে মুখোমুখি, তাদের প্রত্যেককেই বুভুক্ষু ভালবাসায় লক্ষ করে রমেন। সবসময়েই সে মানুষের সেই বলয়টির নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করে।

মানুষেরা জোটবদ্ধ হয়, হতে থাকে তার চারপাশে। প্রজারা পাড়ার প্রতিবেশীদের ডেকে আনে ছোটকর্তাকে দেখাবার জন্য। রমেন তাদের কাছাকাছি যায়, দাওয়ায় বসে, বহু দূর হেঁটে যায় একসঙ্গে। মানুষ সংগ্রহ করতে থাকে সে, সংগ্রহ করতে থাকে মানুষের সর্বস্ব। একদিন এই বিপুল ভিক্ষা সে নিয়ে যাবে তাঁর কাছে, যিনি একদিন তাঁকে নিশির ডাকের মতো ডেকে নিয়েছিলেন।

ভাদ্রের শেষ এখন। বাংলাদেশের প্রকৃতি সেজে উঠেছে এই সময়ে। অনেক দূর দেশের পাখি আর বাতাস আর সুন্দর পালের নৌকোর মতো মেঘ আসে। গত বর্ষার স্মৃতি মানুষ ভুলে যায়। ঠিক ওই পাখি বা মেঘের মতোই নূতন একটি জিনিস দেখতে পায় লোক—পুটিয়ারি, বারাসাত, চব্বিশ পরগনা, হুগলিতে। তারা দেখে গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় রমেনকে। সঙ্গে তার দুঃখী মানুষেরা। লোকটাকে দেখলেই বড় ভাল লাগে মানুষের, এক পলকের জন্য সংসারের সুখ-দুঃখের কথা ভুল পড়ে যায়। মানুষের মাথার চারদিকে জ্যোতির্বলয় নেই— এ তো ঠিক কথাই। কিন্তু কাউকে কাউকে দেখলে মনে হয়, এর মাথার চারদিকে ও-রকম অদৃশ্য কিছু একটা রয়েছে।

কীভাবে সেই বিপ্লব শুরু হবে তা মাঝে মাঝে ভাবে রমেন। কেবলই মনে হয় পারাপার জুড়ে শুয়ে আছে কর্ষিত ভূমি। তার হাতে বীজ।

ছাব্বিশ

রমেনের জীবনে দুঃখ তাড়াতাড়ি এসেছিল, যেমন ছিল তার দাদুর আশীর্বাদ।

মাঝে মাঝে একটা বুড়ো ময়ূর আর একটা পুরনো মোটর গাড়ির কথা রমেনের মনে পড়ে। তাদের বারবাড়ির উঠোন ছিল কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু। সেই সবুজ ঢালু মাঠে ধূসর রঙের ময়ুরটা এক বোঝা পেখম টেনে আস্তে আস্তে চরে বেড়াচ্ছে। কিংবা লজঝড়ে, পুরনো, ক্যাম্বিসের হুডওয়ালা তাদের গাড়িটা বৃষ্টির দিনে পাম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে। কখনও বা মনে পড়ে, প্রকাণ্ড ভাঙা পিয়ানোর ওপর ধুলোর আস্তরণ, তার ওপর আঙুল দিয়ে রমেন তার নাম লিখছে, রায় রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। কিংবা মনে পড়ে, তাদের ভূতগ্রস্ত, প্রকাণ্ড বাড়িটার পশ্চিমের ভিতের কাছে একটা আতসকাচ হাতে দাদু বসে আছে। চোখাচোখি হলে দাদু হেসে বলতেন, দেখো রমেন, পিঁপড়ে কেমন মাটি তুলেছে! তারপর চিন্তিতমুখে মাথা নেড়ে বলতেন তিনি, দেখো, পশ্চিমের ভিত থেকেই বাড়িটার ভাঙন শুরু হবে। এই দিক থেকেই বাড়িটা গাঁথা শুরু হয়েছিল, আমার মনে আছে।

রমেন অবাক হয়ে বলেছে, সে তো একশো বছর আগেকার কথা! তুমি তখন কোথায়?

তখন দাদু বিব্রত মুখে আতসকাচখানা রেখে দু'হাতে চোখ মুছে নিয়েছেন। অপ্রতিভ হাসিমুখে বলেছেন, আমার মনে হয় আমি তখনও ছিলাম। এইখানেই। আমি দেখেছি এ-বাড়ির ভিত গাঁথা হতে।

কী করে?

পশ্চিমের নির্জন চত্বরে তারা দু'জন— রমেন আর তার প্রায়-অন্ধ দাদু দু'টি শিশুর মতো বসেছে পা ঝুলিয়ে। দাদু বলছে, তখন আমি আসতাম ব্রহ্মপুত্রের ও-পার থেকে, নৌকোয় পার হয়ে। আমার ছিল মাটিমজুরের কাজ। এখন যেখানে মুকুন্দর মাটি ফেলেছি এই ভিত গাঁথার সময়ে—এ-রকম আমার মনে পড়ে। তখন মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে হত যে, এইখানে যে বড় বাড়িটা একদিন তৈরি হবে আমি যেন সেই বাড়িতে একদিন জন্মাই।

সত্যি? রমেন ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করেছে।

দাদু হেসে বলেছেন, কী জানি! আমার এ-রকম মনে হয়।

দাদুর চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলে রমেন তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যেত পুবের দালানের বারান্দায়, খুব ভোরবেলা সূর্য প্রণাম করতে। কখনও নিয়ে যেত ছাদে, সন্ধেবেলায় খোলা আকাশের নীচে। দাদু কখনও ক্বচিৎ চারদিকের পরিদৃশ্যমান জগতের কথা তার কাছে জানতে চাইতেন। কিন্তু দাদুকে অন্ধ বলে কখনও মনে হত না রমেনের। বরং মনে হত খুব গভীর ধ্যানস্থ মানুষটি চারপাশের দৃশ্যমানতার অনেক গভীরে ডুবে আছেন তাই তাঁর অন্যমনস্ক হাত তামাকের নলটা খুঁজে পাচ্ছে না।

একদিন সন্ধেবেলা দাদু হাতড়ে তার মাথাটা খুঁজে নিয়ে ডান হাতখানা মাথায় রেখে জিজ্ঞেস করলেন, রমেন, খুব ছেলেবেলার কোনও কথা তোমার মনে পড়ে?

রমেনের বয়স তখন বারো কি তেরো। সে একটু ভেবে বলল, পড়ে।

কী রকম?

রমেনের মনে পড়েছিল তার বাবার মৃত্যুর কথা। বয়ড়ার আবাদ থেকে ফেরার পথে ঘোড়াসুদ্ধ বাবাকে ধরেছিল কানাওলায়। বড় হয়ে রমেন জেনেছে কানাওলা আসলে ভূত নয়, এক ধরনের আবল্যি, মানুষের বোধবুদ্ধি কিছুক্ষণের জন্য নষ্ট করে দেয়। বয়ড়া থেকে ফেরার পথে কালীজয়দের বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ পাশা খেলে রাতে ফিরছিল বাবা। ঘোড়া ছুটেছিল, কিন্তু কোথাও পৌঁছুতে পারছিল না। তখন যুদ্ধের সময় মাঠে মাঠে কাটা হয়েছে আঁকাবাঁকা দীর্ঘ ট্রেঞ্চ, রাস্তার আলো নেই। ঘোড়া রাস্তা চিনত। ক্ষীণদৃষ্টি বাবা ঘোড়ার ভরসায় সওয়ার হয়ে বসে ছিল, কোনও দিকে ঘোড়াকে চালানোর চেষ্টা করেনি। কিন্তু ঘোড়াটা রাস্তা ঠিক করতে পারছিল না। তাকে ধরেছিল কানাওলা। কেউ কেউ দেখেছে মেজোকর্তার ঘোড়া সে-রাতে বড় রাস্তা ছেড়ে কেওটখালির মাঠে নেমে যাচ্ছে। তারা চিৎকার করে ডেকেছে বাবাকে। দূর মাঠ থেকে বাবা উত্তর দিয়েছে। কিন্তু অন্ধকারে তাকে আর দেখা যায়নি। বাবা চেঁচিয়ে বলেছিল যে রাস্তা ঠিক করতে পারছে না। যারা দেখেছিল মেজোকর্তাকে তাদের কেউ এসে খবর দিয়েছিল বাড়িতে। মুহূর্তে বাড়িতে শোরগোল পড়ে গেল, কানাওলা কানাওলা। রমেনের মনে পড়ে, সে তখন খুব ছোট, কাছারি বাড়ির উঁচু বারান্দায় উদ্ধবের হাত ধরে দাঁড়িয়ে দেখছে ব্রহ্মপুত্রের ঢালু পার দিয়ে মুকুন্দের ঘানিঘরের পিছনের মাঠ দিয়ে অনেক হ্যারিকেন দুলতে দুলতে যাচ্ছে বাবাকে খুঁজে বের করতে। বিশাল চরাচর জুড়ে অন্ধকারে অসহায় টিমটিমে হ্যারিকেনগুলো চলে যাচ্ছে দূরে। দূরাগত মানুষের কণ্ঠস্বর হাহাকারের মতো ডাকছে, মেজোকর্তা—আ—। বাবাকে পাওয়া গিয়েছিল একটি অগভীর ট্রেঞ্চের মধ্যে, ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে ছিল ট্রেঞ্চের ধারে। বাবার মৃতদেহ কীরকম দেখেছিল তা রমেনের মনে নেই, কিন্তু মনে আছে পরদিন সকালবেলায় সে দেখেছিল সেই অপরাধী ঘোড়াটাকে, সকালের আলোয় যখন তাকে বাইরের উঠোনে হাঁটিয়ে আনা হল। কী লজ্জিত বিমর্ষ ছিল তার চলার ভঙ্গি।

দাদুকে সে সেই ঘটনার কথা বলতেই দাদু তামাকের নল টেনে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তখন তোমার বয়স পাঁচ কি ছয়। ও-বয়সের অনেক কথাই মানুষের মনে থাকে। তোমার আরও ছেলেবেলার কথা মনে নেই!

রামেন আবার ভেবেছিল।

তখন সে কত ছোট কে জানে, তবে একবার অনেক ছোট বয়সে, তার মনে পড়েছিল ভীষণ জ্বরের ঘোরে সে শুয়ে আছে। চারপাশটা আবছা দেখাচ্ছিল। কেউ একজন তার জিবের তলায় থার্মোমিটার গুঁজে দিয়েছিল, আর সে কড়মড় করে চিবিয়ে ফেলেছিল সেটা। তারপর তাকে উপুড় করে বমি করানো হয়েছিল।

সেই ঘটনার কথা শুনে দাদু প্রসন্ন হাসলেন, হ্যাঁ, তখন তোমার বয়স তিন। বাঃ রমেন, তোমার স্মৃতিশক্তি সুন্দর। কিন্তু আরও ছেলেবেলার কথা তোমার মনে পড়ে কি?

এরপর রমেনকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছিল। আরও ছেলেবেলা! আরও ছোট বয়সের কথা!

তারপর তার হঠাৎ মনে পড়েছিল খুব ছেলেবেলায় হয়তো স্মৃতি, হয়তো বা কল্পনা, কিন্তু বহুদিন আগে সে যেন তার মায়ের হাতে একটা নীল রঙের কেটলি দেখেছিল।

শুনে দাদু নড়ে-চড়ে বসলেন। তামাকের নল নামিয়ে রেখে উত্তেজিত গলায় বললেন, তোমার দু' বছর বয়সে সেই কেটলিটা ভেঙে যায়। কিন্তু সেটা কল্পনা নয়, সত্যিই একটা নীল রঙের কেটলি আমাদের ছিল

রমেন, তোমার ভুল হয়নি। কিন্তু তুমি আর-একটু চেষ্টা করো, দেখো তো আরও ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে কি না!

রামেন আবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে, হাত শক্ত মুঠো করে। সে দেখতে পেয়েছিল সেই ছেলেবেলা যেন এক কুয়াশার জগৎ, আবছায়ার মায়ারাজ্য। কিছুই মনে পড়ে না, কিন্তু কেমন যেন আভাস পাওয়া যায়।

দাদু উগ্র আগ্রহে তার মুখের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। জিজ্ঞেস করছিলেন, মনে পড়ে না রমেন। কিছুই মনে পড়ে না?

রমেন মাথা নেড়ে হেসে বলল, না।

খুব তুচ্ছ সামান্য কিছুও না?

রমেন বলল, না তো।

দাদু মৃদু হাসলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি আজকাল এই খেলাটা খেলি। এই মনে পড়ার খেলা।

তোমার কত ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে?

দাদু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, অনেক দূর পর্যন্ত মনে পড়ে।

কত দূর।

দাদু একটু দ্বিধা করলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, অনেক দূর। রমেন, মানুষ চেষ্টা করলে জন্ম-মুহূর্তটিও মনে করতে পারে।

তোমার মনে আছে?

দাদু হেসে চুপ করে রইলেন।

কেমন ছিল তোমার জন্ম-মুহূর্ত?

দাদু ধীর গম্ভীর গলায় বললেন, অন্য রকম। সেই মুহূর্তটি অন্য সব দিনের মতো নয়।

শুনে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল রমেনের।

তবু বলো।

দাদু মাথা নেড়ে বললেন, বললে তুমি ঠিক বুঝবে না রমেন, কিন্তু তুমি নিজে কোনও দিন সেই মুহূর্তটির কথা মনে করার চেষ্টা কোরো। তুমি নিরন্তর স্মৃতিব্যক্ত থেকো, তা হলে কোনও দিন না কোনও দিন তোমার ঠিক মনে পড়বে। তোমার মন যদি স্বচ্ছ থাকে, যদি তুমি কখনও পাপবোধে কষ্ট না পাও, যদি তোমার মন কখনও কারও অনিষ্টচিন্তা না করে, যদি তুমি অসদাচরণ না করো, তা হলে সেই পবিত্র মুহূর্তটি একদিন ঠিক তোমার কাছে ধরা পড়বে।

বহুকাল ধরে সেই চেষ্টা করেছিল রমেন। বহু বার। যখন নদীতে সাঁতার দিত, বল নিয়ে দৌড়ত, গান গাইত, কিংবা চালাত মোটর গাড়ি, যখন একা থাকত কিংবা ঘর অন্ধকার করে বসত মাঝে মাঝে তখন কত বার এই খেলা খেলেছে রমেন। তারপর আপনমনে হেসে উঠেছে। কখনও তার ফাঁকা মাথার ভিতর দিয়ে গড়িয়ে গেছে ছেলেবেলায় হারানো তিনটে মার্বেল, মনে পড়েছে ছেলেবেলায় কিশোরীদের প্রিয় মুখগুলি যাদের সঙ্গে ফের দেখা হয়নি।

তার বাবার নামে দাদু একটা স্কুল খুলেছিলেন ব্রহ্মপুত্রের ধার ঘেঁষে। নরেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল স্কুল। সেই স্কুলের বেয়ারার চাকরির জন্য দাদুর পায়ে এসে পড়ল একটা জাত-ভিখিরি। সঙ্গে কালো একটা রোগা বউ, রোগা রোগা গোটা দুই ছেলেমেয়ে, তাদের বগলে ন্যাকড়ার পুঁটুলি। বড় মেয়েটার বয়স বছর দশেক। লোকটা কবুল করল যে, সে হচ্ছে সেই অশ্বিনী যে জাতে ছোট হয়েও কুলীন কায়স্থের বিধবাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বয়রার গ্রাম থেকে। এক বছর বাদে গ্রামে ফিরে আসার পর পণ্ডিতেরা খড়ম পেটা করে গ্রাম-ছাড়া করে। গত দশ বছর সে সেই কায়স্থের বিধবাকে বয়ে বেড়াচ্ছে। এখন তাদের গুটি দুই ছেলেমেয়ে। বুড়ো কর্তার জমিদারির বাইরে পৃথিবীটা নরক। সে এই স্বর্গরাজ্য ছাড়তে চায় না।

দাদুর মন তখন দূরে নিবদ্ধ। ব্রহ্মপুত্রের ও-পারের দিকে চোখ। কিন্তু দৃষ্টি আরও দূরপ্রসারী, কেননা সেই চোখ জোড়া তখন কোনও বস্তুকেই সঠিক দেখে না। নরেন্দ্রনারায়ণ মরে যাওয়ার পর দাদুর ও-রকমই হয়েছিল। মাঝে মাঝে অন্ধকারে বসে-থাকা দাদুর মাথার পিছনে হঠাৎ কখনও রমেন সাদা আলোর মতো কিছু দপদপিয়ে উঠতে দেখেছে।

অশ্বিনীর উপুড়-হওয়া শরীরের তলা থেকে পা টেনে নিয়ে দাদু বললেন, তোমার ছেলেমেয়েরা বর্ণসংকর। ওদের কী গতি হবে? আমার এলাকায় তোমরা পতিত। স্বজাতের বিধবাকে বিয়ে করলে আমি তোমায় চাকরি দিতাম, জমিও দিতাম। তুমি তোমার চেয়েও নিচু জাতের মেয়ে বিয়ে করলে সমাজের উপকার হত। কিন্তু এ যে প্রতিলোম।

অশ্বিনী অশিক্ষিত মানুষ, এত সব কথা বুঝল না। কিন্তু সে যে ভয়ংকর পাপ করেছে তা বুঝতে পেরে কাঁদতে লাগল। দাদু তখন ওর বউকে ডাকলেন। সে কাছে এসে আড়ষ্টভাবে আলগা প্রণাম করল, পা ছুঁল না। দাদু তাকে বললেন, এই যে অশ্বিনী, এর প্রতি তোমার কোনও শ্রদ্ধা আছে?

মেয়েটা চুপ করে থাকে।

এর প্রতি তোমার কীসের আকর্ষণ? বিয়ে করার ইচ্ছে হলে আমাকে এসে বলোনি কেন? আমি তোমার বিয়ে দিতাম। দরকার হলে ব্রাহ্মণের সাথেও।

মেয়েটি হঠাৎ বলল, তাতে কী হয়েছে?

দাদু উত্তর শুনে একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তোমার গলার স্বর শুনে মনে হয় তুমি স্বাধীনচেতা। আমার এলাকায় মেয়েরা ততখানি স্বাধীন যতখানি মেয়েদের পক্ষে হওয়া সম্ভব। তারা পুরুষের মতো স্বাধীন নয়। আমি তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু তোমার পুরুষালি স্বর শুনে মনে হয় তোমার চরিত্রও পুরুষের মতো। তুমি মেয়ে হয়ে তোমার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারোনি, তাই তুমি অসহিষ্ণু, অসুখী।

মেয়েটা মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

দাদু ধীর অনুত্তেজিত স্বরে বললেন, বিয়ের উদ্দেশ্য প্রজাবৃদ্ধি। তাই প্রজাপতি বিয়ের দেবতা। বিয়ের একটা অনুশাসন আছে। যাঁরা মনুষ্য-বিজ্ঞান জানতেন তাঁরা এই নিয়ম তৈরি করেছিলেন। তুমি সেই নিয়ম ভেঙে জাতিনষ্টকারী পাপ করেছ।

মেয়েটি সামান্য বিদ্রোহের ভঙ্গিতে বলল, আমি জাত বিচার করিনি। মানুষ দেখেছিলাম।

দাদু সামান্য হাসলেন, তুমি বিচার করার কে? মানুষের তুমি কতটুকু জানো? মানুষের বিচার হয় তার বংশগতি তার বর্ণবৈশিষ্ট্যের ওপর। তোমরা আমার এলাকায় থাকতে পারো, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী হয়ে নয়। আমি তোমাদের সম্পর্ক ভেঙে দিলাম। তোমরা আলাদা-থাকবে, অনাত্মীয়ের মতো। আর, তোমার ছেলেমেয়েরা কোনও দিন বিয়ে করতে পারবে না। তাদের প্রজাবৃদ্ধির অধিকার নেই।

মেয়েটি অপমানিত মুখে চুপ করেই ছিল।

দাদু তার নীরবতার মধ্যে কোনও একটি প্রশ্ন আন্দাজ করে বললেন, নিম্নবর্ণের মেয়ের উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হলে জাতি উন্নত হয়, আর উচ্চবর্ণের মেয়ের নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে বিয়েতে জাতি অধঃপতিত হয়। তুমি নিম্ন সহবাস করেছ। তোমার ছেলেমেয়েরা বর্ণসংকর। আমি তাদের প্রতি নিষ্ঠুর নই, কিন্তু সকলের ভালর জন্য আমি তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাই। তাতে ওদের হয়তো একটু কষ্ট হবে, কিন্তু বৃহত্তর কারণে ওরা সে কষ্টটুকু মেনে নেবে।

এরপর নরেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল স্কুলে ঠনঠন করে ঘণ্টা বাজাত অশ্বিনী। একা থাকত স্কুলঘরের পিছনের দিকে খুপরিতে। বউ বা ছেলেমেয়ের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাতে তাকে অসুখী মনে হত না। বরং কায়স্থের বিধবাকে নষ্ট করার জন্য যে পাপবোধে সে কষ্ট পাচ্ছিল তা থেকে বেঁচে যাওয়ায় সে বুড়োকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করত।

সেই কায়স্থ বিধবাটি বাড়ির পিছন দিকে যে ছোট্ট দাতব্য ডিসপেনসারিটি ছিল তার শিশি বোতল ধোয়ার কাজ করত। মাঝে মাঝে সে বাড়ির ঝি-দাসীদের কাছে তার বীভৎস বিতাড়িত জীবনের গল্প করত।

তাদের দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে ছেলেটি ছোট। মেয়েটি বড়, বছর দশেক বয়স তখন তার। তারা সারা বাড়িতে ঘুরঘুর করত। জল বা খাবার ছোঁয়া তাদের বারণ ছিল। বারণ বাইরে যাওয়া। রমেনের মাঝে মাঝে চোখে পড়ত মেয়েটি তার পড়ার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখছে। কখনও বা নীচের বারান্দা ঝাঁট দিতে দিতে হঠাৎ থেমে হাঁ করে চেয়ে থেকেছে। পিছনের ঘেরা পাঁচিলের দিকে যার ওপর দিয়ে দু' হাত দু' দিকে ছড়িয়ে টালমাটাল হাঁটছে রমেন।

উদ্ধব মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলত, ওই মেয়েটা ছোটকর্তার দিকে চেয়ে থাকে কেন! ওই রে মেয়েটা, এই হটে যা—

কিন্তু মেয়েটা ছিল স্বভাবে বাধ্য। রমেন যা করতে বলত তা তৎক্ষণাৎ করত, তার মুখে খুশির আভা দেখা যেত। ক্রমে সে রমেনের পোষা কুকুরের মতো হয়ে গেল। যেখানে রমেন সেখানেই ইরাবতী। পায়ে পায়ে ফিরত সে। তার করুণ কৃশ, শ্যামলা এবং সুন্দর মুখখানায় রমেনের প্রতি একটা কাঙাল ভাব ফুটে থাকত। ড্যাঙভাঙে রোগা হাত-পা আর মস্ত খোঁপায় তাকে একই সঙ্গে ছেলেমানুষ আর বয়স্ক দেখাত। আর তার দু' চোখে সব সময়েই বাস করত একটা হরিণের মতো সন্ত্রস্তভাব।

দাদু মাঝে মাঝে পায়ের শব্দ পেয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন, রমেন, তোমার সঙ্গে কে?

ইরা।

দাদু ভ্রূ কুঁচকে চুপ করে থাকতেন।

মুখ-বেঁকা লৰ ছিল রমেনের খাস চাকর। তার ছিল নাড়ী-জ্ঞান, আর জানা ছিল হোমিওপ্যাথি। সে ইরাকে প্রায়ই রমেনের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলত, বামন হয়ে চাঁদ ধরার মতলব, অ্যাঁ? কেন তুমি পায়ে পায়ে

ঘোরো?

একা খুব সুখেই ছিল অশ্বিনী। সে বউ ছেলেমেয়ের নামও করত না। ছুটির পর ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে বসে থাকত। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে তার তাড়ি-খাওয়া মেজাজি গানের রেশ শুনতে পাওয়া যেত। ইরার মা'র সঙ্গে কখনও দেখা হলে দূর থেকে হাতজোড় করে নমস্কার করত সে। রমেন তার কাছে সাঁতার শিখেছিল।

মাঝেমধ্যে ইরার মা'র সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে কখনও-সখনও চমকে উঠত রমেন। মনে হত এই মহিলার চোখ কথা বলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরে দাদু মারা গেলেন। খুব শান্তভাবে। সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে খড়মের শব্দ তুলে দরদালানের ভিতর দিয়ে চলে গেলেন শোওয়ার ঘরে। তারপর শুয়ে পড়লেন। খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা গেলেন তিনি। সেই সময়ে রমেন বাবার সাদা ঘোড়াটায় চড়ে কেওটখালির মাঠে ট্রেঞ্চের গর্তগুলো লাফিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করছিল।

যুদ্ধের পর বিশাল পরিবর্তন এসেছিল পৃথিবীতে।

বাবার মৃত্যুর পর থেকে মা মাঝে মাঝে ভূত দেখতেন। ওই দেখাটা তাঁর নেশার মতো ছিল। সাতচল্লিশ সালের শেষ দিকে যখন রমেন কাশীপুরে আসে তখন মাকে জোর করে নিয়ে আসতে হয়েছিল। তার ধারণা ছিল কলকাতায় গেলে বাবার আত্মা আর তাকে দেখা দেবেন না।

নিঃসন্তান জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছিলেন বাবারও আগে। জ্যাঠাইমা চলে গেলেন গোবরদিতে তাঁর বাপের বাড়িতে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মা ছাড়া রমেনের আর কোনও আত্মীয় নেই। তখন তার দু'ধারে দাঁড়াল প্রাচীন গাছের মতো দু'জন লোক। উদ্ধব আর লব। চারা গাছটিকে তারা বেড়ার মতো ঘিরে রাখার চেষ্টা করছিল। পারেনি।

অশ্বিনী থেকে গিয়েছিল। নরেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল স্কুলের পিছনের খুপরিতে বসে ব্রহ্মপুত্র দেখার নেশা তাকে ছাড়েনি। একা সে তখন সুখী ছিল। বড়কর্তার দয়ার কথা লোককে বলত। ইরার মা তার দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলে এসেছিল। কাশীপুরের বাড়ির রান্নাঘরের পাশে তাদের জন্য টিনের ঘর তুলে দিয়েছিল উদ্ধব আর লব, শাসিয়ে দিয়েছিল যেন তারা ভিতর-বাড়িতে না আসে। কিন্তু ইরা আসত। মাঝে মাঝে ইরার মা থানকাপড়ের ঘোমটার ভিতর থেকে অতীব তীব্র চোখে দেখত রমেশকে। তার ছেলেমেয়েকে বুড়োকর্তা সকলের সামনে বর্ণসংকর বলে আলাদা করে দিয়েছিল, নিষেধ করেছিল বিয়ে দিতে। সেই অপমান বোধ হয় সে ভোলেনি।

তখন কলেজে পড়ে রমেন। ম্যাগাজিনে ললিত ভট্টাচার্য নামে একজনের প্রবন্ধ বেরোল— ভারতে সাম্যবাদ এবং কয়েকটি অসুবিধা। সেই প্রবন্ধে খুব জোরালো যুক্তিতে দেখানো হয়েছিল কীভাবে প্রাচীন আর্যরা অর্থনৈতিক কারণে মানুষকে বর্ণাশ্রমে ভাগ করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে বর্ণাশ্রমকে বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়। এ ছিল শোষণের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা। যে-ব্যবস্থা আজও কার্যকরী রয়েছে ভারতবর্ষে। ইত্যাদি।

তখন ইরার বয়স বোধ হয় ষোলো-সতেরো। স্নিগ্ধ শরীর। শ্যামলা নরম রং। মায়ের কাছে বসে দুপুরে ফ্রেমে আঁটা সাদা কাপড়ে গোলাপ ফুলের নকশা তোলে। রমেনের পায়ের শব্দ পেলে নিঃসাড়ে উঠে আসে। জামা-জুতো ঠিক করে দেয়। রমেনের মাঝে মাঝে তাকে দয়া করতে ইচ্ছে হত। মাঝে মাঝে ভালবাসতেও।

তাই ললিত ভট্টাচার্যের সেই প্রবন্ধটা বড় ভাল লেগেছিল রমেনের। সে তখন নিজের সমর্থনে একটা যুক্তি দাঁড় করাতে চাইছিল। আলাপ হওয়ার পর ললিত নামে সেই ছেলেটি আবেগতপ্ত স্বরে মানুষের মুক্তির কথা বলত। সেগুলো বিশ্বাস করেছিল রমেন। ক্রমে সে নিজেও মানুষের মুক্তির কথা বলতে শুরু করে।

বছর দুয়েক বাদে পাকিস্তান থেকে চলে এল অশ্বিনী। সে খুব একা বোধ করছিল সেখানে, তা ছাড়া বুড়ো বয়সের চিন্তাও ধরেছিল তাকে। সে কাশীপুরের বাড়িতে কয়েক দিন থেকে তারপর যাদবপুরের দক্ষিণে কোথায় খানিকটা জমি পেয়ে গেল, তুলে ফেলল দু'খানা ঘর। একদিন উদ্ধব চেঁচিয়ে রমেনের কাছে নালিশ করল, অশ্বিনী লুকিয়ে ইরার মা'র সঙ্গে দেখা করে, তাকে নিয়ে যেতে চায়। বুড়োকর্তার নিষেধ মানছে না অশ্বিনী, তার নাকি একা একা লাগে, বউ ছেলেমেয়ের জন্য প্রাণ কাঁদে। ইরার মাও পালাবার তালে আছে।

তখন মানুষের মুক্তির কথা ভাবে রমেন। তাই উদারভাবে বলল, ওর বউ ছেলেমেয়ে, ওর তো নেওয়াই উচিত। যদি যেতে চায়, তবে ইরার মাকে ছেড়ে দিয়ো।

তখন রমেন আর ছোট নয়। বিশাল লম্বা তার চেহারা, গলার স্বর গুরুগম্ভীর। উদ্ধব আর লব তাকে তখন সমীহ করতে শুরু করেছে। তারা দু'-একবার বুড়োকর্তার দোহাই দিল, কিন্তু তারপর একদিন অশ্বিনী তাদের চোখের সামনে দিয়েই নিয়ে গেল ইরার মাকে তার দুই ছেলেমেয়েসহ।

তখন প্রজারা আসত রমেনের কাছে। রমেন তাদের চেয়ারে বসতে বললে বসত না, উবু হয়ে মাটিতে কিংবা পিঁড়িতে বসে কথা বলত। তারা রমেনকে সম্মান করতে ভালবাসত। রমেন অনেক দিন ভেবেছে ওটা অন্তর্নিহিত দাসত্ব না সত্যিই ভালবাসা! প্রজারা আসত হাজার সমস্যা নিয়ে। কখনও জমি কিনবার আগে সেই জমি কেনা উচিত কি না তা জানতে, কখনও মেয়ের বিয়ে ঠিক করার সময়ে পরামর্শ চাইতে। অসুখে ডাক্তারের যে প্রেসক্রিপশন তা ঠিক হয়েছে কি না তাও দেখাতে আসত কেউ কেউ। এ ছাড়া টাকার সাহায্য, ছেলের চাকরি কিংবা নিছক পেটের কিছু না-জুটলে খাদ্যপ্রার্থী প্রজারা আসতই। দাদু বেঁচে ছিল বলে এতকাল প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি দেখা হয়নি রমেনের। কিন্তু রমেন দেখেছে তাদের দেশের বাড়িতে প্রজাদের নিরন্তর আনাগোনা। তারা কত বিষয়-সমস্যা নিয়ে আসত দাদুর কাছে। দাদু তাদের বরাবর সঠিক পরামর্শ দিয়েছে। পাকিস্তান হওয়ার পরও কাশীপুরের বাড়িতে প্রজাদের আনাগোনা দেখে সে অবাক হয়েছিল। কিন্তু সে বুঝতে পারত যে প্রজারা তাদের পুরনো অভ্যাস মতো আসে, বুড়ো কর্তার জায়গায় ঠিক ওইরকম একজন সর্বজ্ঞ লোক চায় যে সঠিক পথ বলে দেবে। দাদু কখনও ভুল পরামর্শ দিতেন না। তবে কি দাদু সর্বজ্ঞ ছিলেন? না, তা নয়। দাদু তাঁর পূর্বপুরুষের কাছ থেকে প্রজাপালন শিখেছিলেন। ফলে যুবাবয়স থেকেই তিনি প্রজাদের সংস্পর্শে আসতে শুরু করেন। প্রজাদের যা সমস্যা তা তিনি জানতে শুরু করেন। আর সব কিছুর সমাধানের জন্য তিনি শিখেছিলেন চিকিৎসাবিদ্যা, চাষবাস, কামার কুমোরের কাজ, তাঁত চালানো, তিনি জানতেন মাছের গতিবিধি, তা ছাড়া জানতেন ফৌজদারি আইন, সর্বোপরি মনু পাতঞ্জল, গীতা ভাগবত, তাঁর প্রায় মুখস্থ ছিল বছরকার পাঁজি। আরও বোধ হয় অনেক কিছুই জানতেন দাদু, তাঁর না-জানা বিষয় ছিলই না। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য দাদু অতখানি শিখেছিলেন, তাই প্রজাদের কাছে তিনি ছিলেন অপরিহার্য। এখন প্রজারা সেই অপরিহার্য বুড়োকার্তার খোঁজে রমেনের কাছে আসতে লাগল। রমেন প্রথমে দিশেহারা বোধ করত খুব। কিন্তু সে সবাইকেই সৎ এবং আন্তরিক পরামর্শ দিতে চেষ্টা করত। কিন্তু দেখতে পেত তার সাংসারিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বড় কম। তা ছাড়া প্রজাদের সমস্যা হাজার রকমের। জমিদারি না পেলেও একটা বিপুল সংখ্যক

প্রজাকে সে পেয়েছিল, আর পেয়েছিল দায়িত্বের উত্তরাধিকার। মানুষগুলোকে সে ফিরিয়ে দিতে পারত না, বরং সে দেখতে চাইত দাদুর কাছে এই বিপুল সংখ্যক মানুষ কী পেয়েছিল, এবং সে সেটা দিতে পারে কি না। ফলে অবসর সময়ে বা ছুটির দিনে রমেন গাঁ-গ্রামে ঘুরতে শুরু করে, প্রজাদের বাড়ি বাড়ি যেতে থাকে, জমি চেনে, রাত জেগে লবের কাছে শেখে হোমিওপ্যাথি, পড়ে আইনের বই। আর প্রতি সকালে-বিকালে কারও-না-কারও কোনও-না-কোনও সমস্যার সমাধান তাকে দিতে হয়। প্রজারা প্রায়ই আনত তরিতরকারি, প্রণামী দিত টাকা, এক নিঃসন্তান বুড়ো তার বিঘা তিনেক জমি উইল করে দিয়ে গেল মরার আগে। যাদবপুরের দক্ষিণে একটা জায়গায় রমেনদের প্রজারা বেশি জোট বেঁধে ছিল। সেখানে রমেন গিয়ে দাঁড়ালে একটা হইচই পড়ে যেত। এই অভিভাবকত্ব আস্তে আস্তে ভাল লাগতে শুরু করে রমেনের। প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা দৈন্যের বিরুদ্ধে সে নিজেকে তৈরি করতে থাকে। এই সময়ে কলেজ ইউনিয়নের চোখা চালাক জেনারেল সেক্রেটারি ললিত আসত তাদের বাড়িতে। তাকে দেখত ঘুরে ফিরে, দেখত আসবাব, শুনত পিয়ানো বাজিয়ে রমেনের গান, তারপর মৃদু হেসে বলত, তোমার গা থেকে এখনও গন্ধ গেল না। এখনও তোমাকে সবাই ছোটকর্তা ডাকে।

রমেন লজ্জা পেত। অন্য দিকে রমেন তখন সাম্যবাদের ইশতেহার পড়েছে, কলেজ ইলেকশনে পোস্টার এঁকেছে রাত জেগে, চেঁচিয়ে বক্তৃতা করেছে, জিতিয়ে দিয়েছে ললিতকে। সে তখন মানুষের সাম্যের কথা, মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা ভাবে, তর্ক উঠলে কথায় কথায় ললিতের মতো বলে, রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখো।

এই দুই রকম বোধ তাকে কিছুদিন খুব দোলাচলে রাখল। এক দিকে তার মধ্যে ক্রমে ক্রমে বুড়োকর্তার ছাপ পড়েছে, অন্য দিকে ললিতের। দুটোকে মেলাবার একটা চেষ্টা করছিল সে। পারছিল না।

ঠিক এ-রকম সময়ে এক দিন হারু দত্ত নামে এক প্রজা এসে জানাল যে অশ্বিনীর মেয়ে ইরাবতী তাদের পাড়ার ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছে। তার ছেলে পরাণ ধরেছে ইরাকে বিয়ে করবে। অশ্বিনী আর সেই কায়স্থের বিধবাও সেই তালে আছে, মেয়েকে কারও ঘাড়ে গছাতে চায়। অথচ বুড়োকর্তার নিষেধ ছিল। ওদের জন্মের দোষ...

শুনে হঠাৎ রেগে গেল রামেন। 'জন্মের দোষ' কথাটা সে সহ্য করতে পারল না। এই লোকগুলো সেই কবেকার কথা মনে রেখেছে। বুড়োকর্তার কথা, তাই এরা ভুলতে পারছে না।

সেই মুহূর্তে রমেনের মন দাদুর দিক থেকে সরে এসেছিল। সে ভেবেছিল মানুষ জন্মমাত্রই স্বাধীন, মুক্ত, তার আবার শ্রেণীভাগ কীসের! তার মন দুলছিল। কতগুলো বিষয়ে সে দাদুকে স্বীকার করতে পারছিল না। ইরার মায়ের প্রতি দাদুর নিষ্ঠুর আদেশ এবং কয়েক বছর আগের সেই সন্ধ্যায় মেয়েটির ম্লান মুখখানা তার মনে পড়ছিল।

হঠাৎ একটা আবেগবশত সে হারু দত্তকে বলল, তোমরা কি ওদের ঘেন্না করো? কিন্তু আমি যদি ইরাবতীকে বিয়ে করি?

হারু সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে বলল, কর্তা, আপনি বিষ খেলেও কিছু হবে না। পাপ আপনাদের ছোঁয় না। কিন্তু আমরা কি তা পারি!

শুনে সামান্য একটু অহংকার বোধ করেছিল রমেন।

তারপর একদিন সে সোজা গিয়ে হাজির হল অশ্বিনীর বাড়িতে। তখন দুপুরবেলা। রমেনকে দেখেই অশ্বিনী গা ঢাকা দেওয়ার জন্য পিছ-দরজা দিয়ে পুকুর-ঘাটের দিকে রওনা হয়েছিল। রমেন প্রচণ্ড হাঁক মেরে ডাকল তাকে। সে বশংবদভাবে সামনে দাঁড়াতেই বলল, আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে করব।

কপাটের আড়াল থেকে লালপেড়ে শাড়ির ঘোমটায় ঢাকা একখানা মুখ খুব উদগ্রীবভাবে কথাটা শুনল, তার চুড়িপরা হাতের একটা ঝনাৎ শব্দ শোনা গেল শুধু।

কেন যেন তখনই রমেনের মনে হয়েছিল সে কাজটা ভাল করল না।

বিয়েটা খুব সহজ হল না। রমেনের মায়ের ভূতরোগ থেকে তখন মাথায় ছিট দেখা দিচ্ছে। তবু মা শুনে কেঁদেকেটে একশা করলেন। লব গম্ভীর হয়ে বলল, তোমার সঙ্গে বুড়োকর্তার তফাত এই যে, তুমি বেশি দূর দেখতে পাও না, বুড়োকর্তা অনেক দূর দেখতে পেতেন।

প্রজারাও শুনে খুশি হল না কেউ। কেবল তাদের ছেলেদের মধ্যে যারা কলেজটলেজে পড়ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ রমেনকে খুব বাহবা দিল।

উদ্ধব খুব বিষন্ন মুখে জিজ্ঞেস করল, অশনা তা হলে তোমার শ্বশুর হচ্ছে! দেখো, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কোরো না যেন।

সকলেরই অসন্তোষের কারণ ঘটিয়ে একদিন বিনা সমারোহে ইরাকে বিয়ে করে আনল রমেন। আর সেই সঙ্গে প্রজাদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা কমে গেল অনেক। তারা দেখল, বুড়োকর্তা— যিনি অনেক দূর দেখতে পেতেন— তাঁর কথা রমেন শুনল না।

বিয়ের পরেই রমেন ইরাকে সঠিক বুঝতে পারল। এ সেই নিরীহ অবোধ কিশোরী নয়, এ অন্য রকমের। ঝাঁঝালো শরীর ছিল ইরার, যতখানি ঝাঁঝ রমেনের ছিল না। প্রথমে অমিল হল সেইখানে। আর-একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল এই যে প্রতি দিন সকালে উঠে রমেন কেমন অবসাদ বোধ করত।

রমেন একদিন ইরাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার কি কোনও অসুখ আছে?

না তো! কেন?

কী জানি! আমার কেমন দুর্বল লাগে। মনে হয় একটা সংক্রামক কিছু তোমার কাছ থেকে এসেছে। আমার এ-রকম হত না তো।

আর একটা ব্যাপার রমেন লক্ষ করত, ইরা কখনও কারও 'মা' ডাক সহ্য করতে পারত না। প্রজারা তখনও কিছু আসে, তারা 'মা' বলে ইরাকে ডাক দেয়, আর ইরা কেমন কুঁকড়ে যায়। অস্থির বোধ করে। রমেন জিজ্ঞেস করলে বলত, মা-টা শুনলে আমার কেমন যেন নিজেকে অপরাধী লাগে।

ইরার মা বুদ্ধিমতী ছিল। বিয়ের পর শাশুড়ি সেজে কখনও এ-বাড়িতে আসত না। অশ্বিনী মাঝে মাঝে চুপিচুপি এসে বাইরে দেখা করত। রমেনের সঙ্গে দেখা হলে সে মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করে ডাকত 'ছোটকর্তা'। সম্পর্কটা ছিল আগের মতোই। কিন্তু একটা অসম্ভব হাস্যকর সম্পর্ক। লোকে এ-নিয়ে বলাবলি করত।

ইরা সারা দিন অস্থির বোধ করত। একটু নির্বোধ ছিল সে, স্বভাব ছিল ঢিলেঢালা, কথা বুঝতে সময় নিত। কিন্তু সে কিছুতেই নিজেকে রমেনের স্ত্রী বলে বিশ্বাস করতে পারত না। সম্ভবত ছেলেবেলায় ছোটখাটো জিনিস চুরি করা অভ্যাস ছিল ইরার। একদিন উদ্ধব এসে নালিশ করল যে, ইরা গোপনে কিছু জিনিসপত্র অশ্বিনীকে দিয়েছে। তার নিজের চোখে দেখা। সে ইরাকে ধরতেই ইরা কেঁদে ফেলেছে, আর অশনা পালিয়েছে।

রমেন শান্তভাবে উদ্ধবকে বলল, তাতে কী! ও ওর নিজের জিনিস দিয়েছে।

কথাটা উদ্ধব বিশ্বাসই করতে পারল না। ঠোঁট উলটে বলল, ওঃ! নিজের জিনিস!

এক বছর এ-রকমভাবেই রইল ইরা। তখন রমেন খুব ব্যস্ত মানুষ। আইন পড়ে, আর পার্টি করে, প্রজাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কমিউন তৈরির চেষ্টা করে। কখনও প্রবীণ প্রজাদের মধ্যে কেউ তার বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলে সাম্যের কথা শোনায় রমেন। কিন্তু সে স্পষ্টই বুঝতে পারত তার জনপ্রিয়তা অনেক কমে গেছে। সাধারণ মানুষের বুঝেছিল যে বুড়োকর্তার মুখ থেকে যা বেরোয় তা বেদবাণী। কিন্তু রমেন বুড়োকর্তার আদেশ লঙ্ঘন করেছে।

রমেন খুবই হতাশ বোধ করত। প্রজাদের মধ্যে প্রথম নিজের নেতৃত্ব বোধ করতে শুরু করে তার নেশা লেগে গিয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল তার পূর্বপুরুষদের মতো, দাদুর মতো সেও এদের সুখে-দুঃখে নেতৃত্ব দিয়ে যাবে। মাঝে মাঝে প্রজারা তাকে বলেছে, আমাদের এলাকা থেকে আপনি ইলেকশনে দাঁড়ান। আমরা জিতিয়ে দেব।

ঠিক যে সময়ে সে দাদুর আসন নিতে যাচ্ছিল সেই মুহূর্তেই ইরাকে বিয়ে করায় তার ছবি ম্লান হয়ে গেল। অথচ ওদিকে সাম্যবাদের প্রতি বিশ্বাসও তার দানা বেঁধে ওঠেনি।

তখন দাদুর ক্ষমতা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে রমেন। যার মুখের কথার একটু অনুশাসন ভেঙে একজন একঘরেকে উদ্ধার করতে গিয়ে তার জনপ্রিয়তা কমে গেল। সে আশ্চর্য হয়ে সেই বিশাল গাছের মতো মানুষটির কথা ভাবত, যার ডালপালায় প্রজারা নিরাপদ নীড় বেঁধে আছে। যিনি জমিদার এবং নেতা। যিনি প্রজাদের সব ভালমন্দ জানতেন। রমেন এও বুঝতে পারে যে, প্রজারা তাকে যেটুকু মানে তা তার পূর্বপুরুষদের সুকৃতির গুণে। সে নিজে থেকে কিছুই অর্জন করেনি। তাই আজ যদি সে পূর্বপুরুষদের অনুশাসন ভাঙে তবে প্রজারা আর তার কথা শুনবে না।

রমেন তাই তখন মাঝে মাঝে মধ্যরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠত। অস্থির বোধ করত। সাধারণ মানুষের জীবন, স্ত্রীর সঙ্গে বিছানা ভাগ করে শুয়ে সন্তান পালন করে, ঘর গোছানো সংসার করে জীবন কাটানোর কথা মনে করতেই তার মন খারাপ হয়ে যেত। সে কিছুতেই ভাবতে পারত না যে সে তার পূর্বপুরুষের মতো জীবন যাপন করবে না। বরং তার মনে হত একটা বৃহত্তর জীবনই তার জন্য অপেক্ষা করছে। যে জীবন বিশাল, যে জীবনের সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে, মানুষের ভালবাসা না পেলে সে বাঁচবে না। কে তাকে সেই অসাধারণ জীবন দেবে? কে তাকে দেবে সর্বজ্ঞত্ব? রমেন মনে মনে সেইরকম একজনকে খুঁজত। দাদু তাকে খুঁজতে বলেছিল।

বিয়ের এক বছর বাদে যখন ইরা মাত্র মাস দুয়েকের গর্ভবতী তখনই একদিন সে পালিয়ে গেল। উদ্ধব খবর দিল হারু দত্তর ছেলে পরাণ মাঝে মাঝে আসত এ-বাড়িতে। ইরার সঙ্গে বসে গল্প করত অনেক। খোঁজ নিয়ে জানা গেল পরাণও নেই।

লব তার বিষন্নতা আর লজ্জা দেখে বলল, তোমার নারীজ্ঞান নেই। যে উদ্ধার পেতে চায় না তাকে জোর করে উদ্ধার করেছিলে। বুড়োকর্তা কি মিছে বলেছিলেন? তিনি জানতেন।

তিনি জানতেন। ওই কথাই ছড়িয়ে গেল চারদিকে। রমেন দেখতে পেল প্রজাদের চোখ অন্ধ করে দাদুর ছবি ঝুলছে। তিনি জানতেন।

তারপর সেই জানাটাকেই অনেকভাবে জানতে চেষ্টা করেছে রমেন।

ইরাকে কেউ খুঁজল না। সে নিজেও নয়। তেমন কোনও অস্থিরতাও প্রকাশ করল না রমেন। তখন তার মন জুড়ে দাদুর ছবি।

কেবল মাঝে মাঝে সে প্রচণ্ড জোরে তার পুরনো মোটর গাড়িখানা চালিয়ে নিয়ে যেত উদ্দেশ্যহীনভাবে। ওই সময়েই একবার সে দুর্ঘটনায় পড়ে।

সাতাশ

ইরা চলে গেলে রমেন বাইরে বেরোনো প্রায় বন্ধ করে দিল। বন্ধুরা মাঝে মধ্যে আসত, রমেন তাদের দেখে ভয় পেত, পাছে তারা ইরার কথা জিজ্ঞেস করে। চেনা মানুষ দেখলে ভয় পেত রমেন, একা থাকতে ভালবাসত। পুরনো ভাঙা পিয়ানোটার তখন ঠিকমতো আওয়াজ হয় না, তবু রমেন সেটা বাজাত মাঝে মাঝে, গাইত পূর্ব বাংলার মাল্লাদের গান। কখনও গাড়িখানা নিয়ে চলে যেত দূরে। গঙ্গার ধার ঘেঁষে দাঁড় করাত গাড়ি, জামা খুলে ঝাঁপ দিত জলে। অনেক দূর সাঁতরে আসত। প্রজাদের আনাগোনা কমে গিয়েছিল অনেক। সারাটা দিন ফাঁকা পড়ে থাকত রমেনের। হাতে কোনও কাজ ছিল না। রমেন এম এ পরীক্ষা দিলই না। নিতান্ত অনিচ্ছায় দিল আইনের দ্বিতীয় পরীক্ষা, পাশ করতে পারল না। কোনও দুঃখই সে বোধ করল না তার জন্য। মাঝে মাঝে খুব ভোরবেলা উঠত রমেন। বল নিয়ে সে আর আগের মতো দৌড়ত না। সে খেলা ছেড়ে দিয়েছিল। তবু ভোরবেলা উঠে সে মাঝে মাঝে বাইরে আসত। কাশীপুরের বাড়ির সামনের দিকে একটু ছাড়া জমি ছিল বাগান করার জন্য। বাগান হয়নি, লব আর উদ্ধবের তখন বয়স হয়েছে, গাছের শখ কারও ছিল না, কে বাগান করবে। সেই ছাড়া জমিতে কিছু আগাছা আর লম্বা ঘাস জন্মেছিল, একটা বেল গাছ থেকে মাঝে মাঝে তক্ষকের ডাক শোনা যেত। সেই ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে রমেন খামোখা চক্কর দিয়ে ঘুরত। মাঝে মাঝে হাঁটতে হাঁটতে চোখ বুজত সে, ছেলেবেলায় ফেরার চেষ্টা করত। নির্জন রাস্তায় পায়ের শব্দ পাওয়া যেত স্নানার্থীর। তারা গঙ্গার দিকে চলে যেত। রমেনের হঠাৎ মনে পড়ত ছেলেবেলার মতো পুবের দালানে দাদুর পাশে দাঁড়িয়ে যেমন সূর্য প্রণাম করত সে, তেমন অনেককাল করে না। এক-আধদিন প্রণাম করার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু কোনও রোমাঞ্চ বোধ না করায় ছেড়ে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে ইরার কথা ভাবত। কেন ইরা তাকে পছন্দ করল না? সে মাঝে মাঝে নিজের কথা ভাবত। সে কীরকম জীবন-যাপন করবে এরপর?

এই সময়ে দু'টি ঘটনা ঘটে পর পর।

গঙ্গার ঘাটে শেষ দুপুরের নির্জনতায় একটি বাচ্চা ছেলে জলের তোড়ে কোথা থেকে এসে ভেসে যাচ্ছিল। কিছু লোক দেখতে পেয়ে তাকে টেনে তুলেছে। রমেন গিয়ে দেখে বছর দশেকের বাচ্চা ছেলে খালি গায়ে নতুন পইতে, পরনে নেভি ব্লু প্যান্ট, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। জলে থেকে সাদা হয়ে গেছে গা। জ্ঞান নেই। যারা তুলেছিল তারা হতবুদ্ধির মতো চেঁচাচ্ছিল, কী করতে হবে বুঝতে পারছিল না। লোকজন ছুটে আসছিল চারদিক থেকে, কিন্তু তাদের একজনও জানত না কী করতে হবে। ভিড় সরিয়ে রমেন ছেলেটাকে ধরেই বুঝতে পারল শরীরে প্রাণ আছে। সে জানত কী করে জলে-ডোবা মানুষ বাঁচাতে হয়। যা করতে হয় সে তাই করছিল। ছেলেটাকে ঠিকমতো শুইয়ে হাঁটুর চাপ দিয়ে ধরে লঘু দ্রুত হাতে মালিশ করে দিচ্ছিল শরীর। নিঃশব্দে ভিড়ের অত লোক তাকে দেখছিল সে একটা ছেলের প্রাণ ফিরিয়ে আনছে। কাজেই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করছিল রমেন। বাইরের জ্ঞান ছিল না। একজন চেঁচিয়ে বলল, জল বেরোচ্ছে, বেঁচে যাবে! একজন শান্ত প্রকৃতির লোক উবু হয়ে পাশে বসে দেখছিল, সে গায়ে হাত দিয়ে দেখে বলে ওঠে, গা গরম লাগছে যেন একটু। অনেকক্ষণ ধরে ডুবে ছিল ছেলেটা, গভীর অজ্ঞানতার মধ্যে চলে গিয়েছিল। সময় লাগছিল অনেক।

অনভ্যাসে রমেনের হাত টাটিয়ে গেল, ঘাম দিচ্ছিল তার শরীরে, উত্তেজনায় মুখে-চোখে গরম রক্তের আঁচ। অতগুলো লোকের সামনে একজনকে বাঁচিয়ে তোলার একটা তীব্র উত্তেজনায় সে থামছিল না। ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন রমেনকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। সে ডেকে এনেছিল ডাক্তার। হঠাৎ রমেন শুনতে পেল ‘ও কী করছেন।’ এই প্রশ্নে মুখ তুলে দেখল হাতে ব্যাগ, স্টেথসকোপওলা ডাক্তারকে, প্রবীণ মুখ। হতবুদ্ধির মতো চেয়ে থেকে রমেন বলল, কী করব! ডাক্তার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, ওভাবে নয়। ওকে চিত করে শোওয়ান, তারপর মালিশ। একপলকের জন্য রমেনের মনে হল, ডাক্তার ভুল বলছে। সে জানে, সে দেখেছে জলে-ডোবা মানুষ বাঁচাতে। তবু কেমন দিশেহারা বোধ করল রমেন। এতগুলো লোক সাক্ষী, যদি ডাক্তারের কথা সে না-শোনে, আর যদি তার হাতেই ছেলেটা মারা যায়? ভুল হয়েছিল। ডাক্তারের কথামতো ছেলেটাকে নতুন করে শোওয়াল রমেন, পনেরো মিনিটের মধ্যেই তার হাত টের পেল ছেলেটার কচি শরীর শক্ত হয়ে আসছে। সে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে তার বিব্রত মুখ দেখল, মাথা নেড়ে মৃদু স্বরে বলল, ঠিক হচ্ছে না। ডাক্তার ঝুঁকে ছেলেটার নাড়ি দেখলেন, ইতস্তত করে বললেন, তা হলে আবার আগের মতো করুন তো দেখি। কী জানি, বোধ হয়...। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। একদম কাঠের মতো হয়ে গেল ছেলেটার শরীর। অনেকক্ষণ সেই মৃতদেহটা দু'হাতে আকুলভাবে খুঁজে দেখল রমেন।

ডাক্তার ভুল বলেছিল। অতগুলো লোকের সামনে সে ডাক্তার, তাকে একটা কিছু করতে হয়। নইলে তার সম্মান থাকে না। ডাক্তার জানত না কী করে জলে-ডোবা মানুষ বাঁচাতে হয়। হয়তো পড়েছিল কোনও দিন, কাজে লাগেনি বলে ভুলে গেছে। আর রমেন ঠিকই জানত কী করে বাঁচাতে হয়, তবু সে পারল না। একা একা ঘুরে বেড়াত রমেন আর মাঝে মাঝে চমকে উঠত ভয়ে। ভুল জেনেও সে কেন ভুল করেছিল! অত মানুষ সামনে ছিল বলে সে কি এই ভয় পেয়েছিল যে, ছেলেটা মারা গেলে অত মানুষ তাকে দুয়ো দেবে, না কি সে ভেবেছিল ডাক্তার, যেহেতু ডাক্তার সেইহেতু তার চেয়ে ভাল জানে? না কি সে অন্তরে বিশ্বাস করেনি যে সে সত্যিই ছেলেটাকে বাঁচাতে পারে। এ কেমন যে সে তার অধীত বিদ্যা প্রয়োগ করতে পারছে না? কেন ওইরকম টানা-পোড়েন মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হল তার?

এই সময় একদিন মুনির বুড়ো বাপ এসে বলল, ছোটকর্তা, এক মুসলমানের জমি নিচ্ছি। শরিকি জমি, একটু গন্ডগোল আছে, তার ওপর পাকিস্তানের জমির সঙ্গে বদল করছি। কাগজপত্রগুলো একটু দেখে দেন।

মুনির বুড়ো বাপ দলিল-টলিল দেখতে দিল। অনেকক্ষণ ধরে দেখল রমেন। জমির কাগজ তার ছেলেবেলা থেকে চেনা। যে মুসলমান লোকটি মুনির বাপের সঙ্গে এসেছিল তার সঙ্গেও কথাবার্তা বলল রমেন। বুঝল জমিতে গন্ডগোল নেই। সব ভাই এককাট্টা হয়ে জমি ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু তবু রমেন অনেকক্ষণ ভাবল। দলিলটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আমার যদি ভুল হয়। তুমি কোনও উকিলকে দেখাও।

আপনি তো উকিলের বাবা।

তবু রমেন মাথা নাড়ল, না হে, যদি আমার ভুল হয়ে থাকে?

মুনির বাপ অনেকক্ষণ চেয়ে রইল রমেনের দিকে। বুড়োকর্তার নাতির মুখ থেকে কথাটা বেরোল না! তবে সে কার কাছে ভরসা করে যাবে?

একদিন একটা বার-এর সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সামান্য একটু হুইস্কি খেয়েছিল রমেন। তখন মাঝে মাঝে খেত। সঙ্গে ছিল সঞ্জয়। সেই রাত্রে সঞ্জয় হুইস্কির গ্লাস সামনে রেখে তাকে বুঝিয়েছিল যে, সে একটা মোটর-সারাইয়ের কারখানা খুলতে চায়। তার টাকা নেই, রমেন টাকা দিলে সে অংশীদারিতে ব্যবসা করবে। রমেন ব্যবসা করতে রাজি হয়নি। কিন্তু বলেছিল, তুই ব্যবসা কর আমি বরং কিছু ধার দেব।

সঞ্জয় হেসে বলল, তোর জীবন-সংগ্রাম বলে কিছু নেই। দূর, তুই একটা মরা মানুষ।

সেই রাতের কথা স্পষ্ট মনে আছে রমেনের। সঞ্জয়কে একটা চেক লিখে দিয়েছিল রমেন, এবং খুব সহজ বোধ করেছিল নিজের মধ্যে। অনেক রাতে একা গাড়ি চালিয়ে ফেরার সময়েও সেই মহত্ত্বের বোধ কাজ করছিল তার মধ্যে। সে গুনগুন করে ভাবছিল তার একটি প্রিয় ফরাসি গান—ও-লাল-লা- ও-লা-লা...। ঝরঝর ছড়ছড় করে শব্দ করছিল অবিরল পুরনো মোটরগাড়ি। গভীর রাত্রের প্রাঞ্জল রাস্তা-ঘাট দিয়ে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিল সে। খুব সামান্য নেশা হয়েছিল তার। সে ডালহৌসি স্কোয়ারের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে সেই নির্জনতায় অনুভব করেছিল তার চারপাশে প্রকাণ্ড সব গাছের অরণ্য। তার ভিতর দিয়ে ঝরনার মতো ঝরঝর করে বয়ে যাচ্ছে তার গাড়ি। তার মাঝে মাঝে শৈশবের কথা মনে পড়ছিল। তার ফাঁকা মাথার ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে গেল কবেকার হারানো তিনটে মার্বেল। যে-মার্বেলগুলো কখনও খুঁজে পায়নি বলে তার মনে রয়ে গেছে। মনে পড়েছিল ছেলেবেলার কিশোরীদের মুখ। সেই মুখগুলি তার প্রিয় ছিল, কেননা ফের দেখা হয়নি। কখনও বা মনে পড়েছিল একঢল সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে পেখমের বোঝা টেনে চরে বেড়াচ্ছে ধূসর রঙের ময়ুর। আর পাম গাছের ছায়ায় বাড়ির পশ্চিমের ভিতের কাছে আতসকাচ হাতে বসে আছে তার জ্ঞানী দাদু। মনে পড়েছিল মুকুন্দর ঘানিঘরের পিছনের মাঠটায় এক অন্ধকার সকালে সে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদছে। কাঁদছে হয়তো বা হারানো বলটির জন্য, হয়তো বা ঘরে ফেরার পথটির জন্য, কিংবা অলি নামে যে-মেয়েটি তাকে চুমু খেয়েছিল তার জন্য, হয়তো বা গাছপালা আকাশ এবং মায়ের মুখের জন্য। এইভাবেই টেরিটিবাজার ছাড়িয়ে গেল তার গাড়ি। শৈশব চিন্তায় অন্যমনস্ক রমেন এক বার লক্ষ করল পুরনো মোটর গাড়িটা গর্জন করছে অস্থিরভাবে, অভিভাবকের মতো বলছে, ঠিক মতো চালাও। নইলে বিপদ। আপনমনে হাসল রমেন। কী হয়, যদি সে এখন সেই শৈশবের মতো একবার চোখ বুজে দিক নির্ণয়ের খেলা খেলে? সেই চোখ-বুজে চলার খেলা সে বহু কষ্টে শিখেছিল, এ তার অধীত বিদ্যা, তবু একবার এক অন্ধকার ভোরে সেই খেলা সে ভুলে গিয়েছিল। ভুলে গিয়ে কেঁদেছিল মর্তের মানুষের মতো। এখন আর-এক বার তার পরীক্ষা করে দেখার সাধ হল। একবার সাবধানে চোখের পলক একটু বেশিক্ষণের জন্য ফেলল রমেন। তার গাড়ি কেঁপে উঠে সাবধান করে দিল তাকে। কোন দূরে পাখা ঝাপটাল একটা ময়ূর। দাদু পিঁপড়ের সারি থেকে চোখ তুলে তাকাল যেন। হাসল রমেন। আবার চোখ বন্ধ করে দিল। মনে মনে বলল, খুলব না। গাড়ি টাল খেল। কখনও ডান দিকে কখনও বাঁয়ে দুলতে লাগল। চোখ বন্ধ করে রইল রমেন। প্রাণপণে। সে মনে মনে এই কথা বলেছিল, আমি আর-এক বার ফিরে যাব সেই পাম গাছের ছায়ায় যেখানে চরে বেড়াচ্ছে ধূসর ময়ূর, ইজিচেয়ারে বসে-থাকা দাদুর পায়ের কাছে আমি বসব। তিনি অন্ধ চোখে আমার দিকে চেয়ে বলবেন, রমেন চোখ বড় মায়ার সৃষ্টি করে। রমেন বিড়বিড় করে বলল, শৈশবেই আমি ভাল ছিলাম। আমি জীবন-সংগ্রাম চাই না। আমি আর-এক বার জন্ম নিতে চাই। আমি শিশু হয়ে আসব, আবার খুব বড় হওয়ার আগেই আমি ফিরে যাব মায়ের জঠরে। ফিরে যাই। আমি জীবন-সংগ্রাম চাই না।

হঠাৎ যেন একমুখী স্রোতের নদী থেমে গেল, তারপর স্রোত বইতে লাগল উলটো দিকে। পশ্চাৎগামী এক রেল গাড়ির মতো ফিরে যেতে লাগল রমেন। মনে মনে তীব্র ইচ্ছাশক্তির বলে বন্ধ করে রইল চোখ। অলীক কয়েকটি মুহূর্তে সে সত্যিই ফিরে গিয়েছিল শৈশবে। আলো-আঁধারির এক ঝুঁঝকো বেলা, নিস্তব্ধ পৃথিবী শ্বাস বন্ধ করে প্রত্যক্ষ করছে এক শিশুর জন্ম। রমেন জন্মাচ্ছে। এক অব্যক্ত জগৎ থেকে ব্যক্ত জগতে চলে আসছে সে। টের পাচ্ছে ক্ষুধাতৃষ্ণা, শীত, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মৃত্যু। টের পেয়ে শিশু রমেন কাঁদছে। জন্মমুহূর্ত! ওই তার জন্মমুহূর্ত।

গাড়িটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, যেমন বিপদ দেখলে সওয়ারিকে অন্যমনস্ক টের পেলে লাফিয়ে উঠে সাবধান করে দিত তার প্রিয় সাদা ঘোড়াটা। রমেন চোখ চেয়ে দেখল বাঁকের মুখে তার গাড়ি, সামনে গাছ, ফুটপাথ, ঘুমন্ত মানুষ, দেয়াল। প্রচণ্ড জোরে ব্রেক চেপে ধরেছিল রমেন। স্টিয়ারিঙের সঙ্গে লেগে মট করে ভেঙে গেল তার পাঁজরের একখানা হাড়। রমেন অস্ফুট স্বরে গাল দিল, ইডিয়েট। হেডলাইটের আলোয় আর গাড়ির শব্দে ঘুম ভেঙে ফুটপাথে তাদের ছেঁড়া বিছানায় উঠে বসেছিল কয়েকজন ভিখিরি মানুষ। তারা অসহায়ভাবে নিয়তিকে প্রত্যক্ষ করল একবার, তারপর হাই তুলে আবার শুয়ে পড়ল।

বুকে প্লাস্টার নিয়ে শুয়ে থাকত রমেন, মাঝে মাঝে আপনমনে বলত, ইডিয়েট!

সে বছর মা লবকে ডেকে বলল, দেশ ছাড়ার পর আমরা আর দুর্গার পুজো দিইনি। সে জন্যেই এতসব অমঙ্গল ঘটছে। এ বার আমি পুজো দেব। তোমরা ব্যবস্থা করো।

সেবার পুজোয় খুব ধুম লেগেছিল। দেশ ছাড়ার পর এই প্রথম বড়বাড়ির পুজো। প্রজারা এসেছিল জোট বেঁধে দিগ্বিদিক থেকে। অষ্টমী পুজোর দিন কাশীপুরের বাড়ি ফেটে পড়ছিল ঢাকের আওয়াজে আর লোকজনে।

মায়ের ছিল হার্টের অসুখ। মহাত্মা গান্ধী গডসের গুলিতে মারা গেলে সেই সংবাদ যখন চোঙায় প্রচার করা হয়েছিল, তখন মা অজ্ঞান হয়ে যায়, যদিও মা জানত না, গান্ধী আসলে কে ছিলেন। দাদু মারা যাওয়ার পরও বহু দিনের জন্য শয্যা নিয়েছিল মা। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই মায়ের হার্টের অসুখের সৃষ্টি হয়। তারপর রমেনের অদ্ভুত বিয়ের সময়, ইরা যখন পালিয়ে যায়, আর রমেন যখন দুর্ঘটনায় পড়ে তখনও মায়ের শয্যাশায়ী অবস্থা হয়েছিল। রমেন মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে শুনত পাশের ঘরে মা একা একা কথা বলছে গুনগুন করে। মার ধারণা ছিল বাবার আত্মা তার কাছে আসে।

অষ্টমী পুজোর দিন দুপুরবেলা মা গোপনে গিয়েছিল মণ্ডপে প্রতিমাকে বুকের রক্ত নিবেদন করতে। রমেনের জন্য তার মানত ছিল। ছোট্ট একটা ব্লেডের টুকরো ডান হাতের আঙুলে ধরে বুকে সামান্য টান দিয়েছিল মা, তার আগে থেকেই তার মুখ-চোখ সাদা দেখাচ্ছিল। দু' ফোঁটা রক্ত নেমে সেমিজে পড়তেই মা মুখ নিচু করে তা দেখেছিল। তারপরই ঢলে পড়ল মা। পুরুতঠাকুর সতীশ ভরদ্বাজ আসনের ওপর দাঁড়িয়ে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছিল, তার আসনের কাছেই পড়েছিল মা'র ঘোমটায় ঢাকা মাথাটা। তখন রমেনের প্লাস্টার করা বুক, তবু সে মাকে দু' হাতে তুলে নিয়েছিল কোলে, কিন্তু স্পর্শমাত্র বুঝতে পেরেছিল সারা দিনের উপবাসী তৃষ্ণার্ত সেই রোগা দেহখানায় প্রাণ নেই।

এখন উৎসবের কলকাতা। মা'র মৃতদেহের অনুগমন করেছিল রমেন। ভিড়ের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ে তার মনে হয়েছিল যে সে অসম্ভব এক নির্জনতার ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কয়েকজন পথ-চলতি

মানুষ মৃতদেহ দেখে সংস্কারবশত জোড়হাতে নমস্কার করেছিল মাকে। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় রমেনের চোখে জল এল। সেদিন মর্মান্তিক পথ কীর্তন করেছিল রমণীমোহন, যে ছিল দাঙ্গাবাজ, জেলে-চাষা, করুণ কান্নার সুরে তার 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' শুনে কত লোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ভিতরে বাইরে সম্পূর্ণ একা হয়ে গেল রমেন। মাঝ রাত্রে ঘুম ভাঙত রোজ। মা মারা যাওয়ার পর থেকেই লব রোজ শুত রমেনের ঘরের দরজায়। শোওয়ার আগে সে রোজ মন্ত্র পড়ে বাড়ি-বন্ধন করে আসত। লবের দাঁত ছিল না, মুখখানাও ছিল বাঁকা, তাই ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত শব্দ করত সে। ঘুম ভেঙে সেই শব্দ শুনত রমেন। শব্দটা ছিল এমনিতে বিরক্তিকর, কিন্তু সেই একাকিত্বের মধ্যে লব কাছেই আছে জেনে তার ভাল লাগত। কখনও সে শুনত দেয়াল ঘড়ির চলমানতার প্রবল শব্দ, কখনও শুনত টুং টাং আওয়াজ করে ইঁদুর তাদের প্রকাণ্ড গ্র্যান্ডপিয়ানোর তার কাটছে। সেই সময়েই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে একজন কচি উদ্বাস্তু মেয়েকে বিয়ে করে লজ্জাবশত আলাদা হয়ে গেল উদ্ধব। আর লব আরও বুড়ো হয়ে গেল একদিন। তার কাছে রমেনের কোষ্ঠীটা জমা ছিল। বুড়ো-চোখে নিবিষ্ট মনে সে সেইটে দেখত সারা দিন। দেখতে দেখতে চিট হয়ে গিয়েছিল লম্বা কাগজখানা। লব মাথা নেড়ে বলত, কোষ্ঠীতে আছে তুমি ভাল গুরু পাবে। তোমার শনি প্রবল।

রমেন পড়ত বই। কখনও রাজনীতির। কখনও ধর্মের। দুটোকে মেলাতে চেষ্টা করত। সে সময়ে একবার ললিত এসে বলল, চলো, একটু গ্রামের দিকে যাই। আমরা বড় বেশি থিওরিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছি, একটু জন-সংযোগ দরকার।

রমেন আনন্দে রাজি হয়ে কয়েক দিন ঘুরল ললিতের সঙ্গে। ললিত গ্রামে লোক জড়ো করে বক্তৃতা করত। কয়েক দিন ধরে রমেন শুনে বুঝতে পারল, ললিত সেই একই কথা বলছে যা সে কলকাতায় মাঝে মাঝে স্ট্রিটকর্নার করার সময়ে বলেছিল, কিংবা যা বলেছে কলেজের নির্বাচনে, লোকে শুনত। বুঝবার চেষ্টা করত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করত না। তাই একদিন সে ললিতকে বলল, তুই যা বলিস তার ওপর তোর নিজেরই গভীর বিশ্বাস নেই।

ললিত অবাক হয়ে বলল, নেই? কী করে বুঝলি?

রমেন মাথা নেড়ে বলল, যে প্রকৃত বিশ্বাসী তার একটা হাত নাড়ার ভিতর দিয়েও সেটা বোঝা যায়, তাকে অত বলতে হয় না।

ললিত থমকে গিয়ে বলল, সেটা কী রকম?

একটু ইতস্তত করে রমেন উত্তর দিল, আমার দাদুকে দেখেছি যখন তামাকের নলটি বাঁ হাতে টেনে নিতেন তখন তাঁর সেই ভঙ্গির মধ্যেও কোথায় যেন একটা প্রবল ভালবাসার ভঙ্গি ফুটে উঠত, আর বোঝা যেত লোকটির মন বড় স্থির।

ললিত হাসল, তোর সেই জমিদার-দাদু!

রমেন হাসেনি। একটু ভেবে বলেছিল, যদি দাদু জমিদারি ছেড়ে দিতেন এবং প্রজাদের বলতেন তোমরা তোমাদের জমিদার নির্বাচন করে নাও— আমার মনে হয়, দাদুকে তারা বিপুল ভোটে আবার জিতিয়ে দিত। তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক নেতা, প্রজারা তাঁর কথাকে বেদবাক্য বলে মানত।

ললিত হেসেছে। মানুষের দেবতা হওয়ার কত অসুবিধে তা বুঝিয়েছে রমেনকে।

রমেন বোঝেনি। কারণ ইতিমধ্যে সে নিজের ভিতরে দেখেছে দাদুর ছায়া। প্রজারা চাইছে তার মধ্যে তাদের জ্ঞানী বুড়োকর্তাকে দেখতে।

একদিন দুপুরে মেডিক্যাল কলেজের সামনের ফুটপাথে একটা বুড়ো লোককে পড়ে থাকতে দেখল রমেন। এ-রকম হামেশা কলকাতায় দেখা যায়। লোকটার গায়ে চিট ময়লা, খোলা মুখের কাছে মাছি উড়ছে, বিজবিজ করছে সাদা কালো দাড়ি। মাথার কাছে উপুড় করা একটা অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো বাটি। বোঝা যায় ওই বাটির ওপর মাথা রেখে শুয়ে ছিল, কোনও কারণে বাটি সরে গিয়ে মাথাটা ফুটপাথে পড়ে গেছে। বে-খেয়াল লোকটাকে পেরিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিরে এল একটু, আবার হেঁটে গেল খানিক দূর। তার ইচ্ছে হচ্ছিল একবার লোকটার নাড়ি ধরে দেখে লোকটা মরে গেছে কি না। ফিরে এল রমেন। লোকটার নিজের পায়খানা পেচ্ছাপের ওপর শুয়ে আছে। হাতে পায়ে লেগে শুকিয়ে আছে সেই সব। গালের পাশে চাপ হয়ে আছে বাসি বমি। দীনতম ভিখিরি একটা, দুরারোগ্য অসুখে ভুগে হয়তো মারা গেছে। রমেন উবু হয়ে বসল তার কাছে, তারপর প্রশ্ন করল নিজেকে, আমি কি এই লোকটাকে ভালবাসতে পারি? সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল যে সে তা পারে না। বরং প্রবল ঘৃণা এবং উদাসীনতা বোধ করল সে। উঠে চলে যেতে ইচ্ছে হল। তবু নিজের ওপর জোর খাটাল রমেন। শরীরের ভিতর থেকে বমির ভাব উঠে আসছিল, ঘেন্নায় কাঁপছিল শরীর, তবু সে লোকটার পড়ে থাকা বাঁ হাতখানা তুলে নিয়ে নাড়ি দেখল। আশ্চর্য এই যে, লোকটা বেঁচে ছিল। লক্ষ করে লোকটার ছেঁড়া জামার তলায় বুকের ওঠা- নামাও লক্ষ করল রমেন। তারপরই প্রবল ভয় তাকে পেয়ে বসল। এখন সে কী করবে? লোকটা মরে গিয়ে থাকলে তার কোনও দায়িত্ব ছিল না, কিন্তু এখন যখন লোকটা বেঁচেই আছে তখন তার কিছু করা দরকার। অন্তত উচিত একে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু ততক্ষণে সমস্ত শরীরে ঘাম দিয়ে দুর্বল বোধ করছে রমেন, বমি আসছে। সে চোখ তুলে দেখতে পেল কিছু কৌতূহলী লোক তার চার ধারে দাঁড়িয়ে গেছে। তারা দেখছে বিশাল সুন্দর চেহারার এক দয়ালু পুরুষ বসে আছে রাস্তার ভিখিরির পাশে। মহান দৃশ্য। তারা দেখতে চায় সেই দয়ালু মানুষটি কী করেন ভিখিরির জন্য। সবাই অপেক্ষা করছে। তারা পথ-চলতি মানুষ, নিজের কাজে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠেছে মানুষের প্রতি সহানুভূতি। রমেন তাদের চোখে এইসব দেখতে পেল। কিন্তু প্রবল ভয়ে কাঠ হয়ে গেল তার হাত-পা। না, সে এদের সামনে কোনও উদাহরণ স্থাপন করতে পারল না, কেননা সে তত দূর শক্তিমান নয়।

কে একজন জিজ্ঞেস করল, কী বুঝলেন দাদা, বেঁচে আছে?

রমেন নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। না। উঠে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে সে পালিয়ে এল।

ডান হাতখানা অনেক বার ধুয়েছিল রমেন, কিন্তু তবু বহু দিন ধরে তাতে একটা শিরশিরানি অনুভূতি থেকে গিয়েছিল; মনে হত মানুষকে ভালবাসা কত কঠিন।

আর-একবার রমেন প্রবল ভিড়ের ট্রামে যেতে যেতে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল। একটা স্টপে বেঁধেছে ট্রাম, রমেন দেখছে একদল স্কুল-ফেরতা বাচ্চা মেয়ে বিকেলের ভিড়ের ট্রামটায় উঠতে চেষ্টা করছে। তাদের মুখ দেখলে বোঝা যায় অনেকক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে ছিল গ্রীষ্মের রৌদ্রে, তাদের চুল ধুলোয় ধূসর, মুখ লালচে, চোখে উৎকণ্ঠা। তারা অনেকক্ষণ খায়নি, তারা শিশু তাই বাড়িতে যেতে চাইছে তাড়াতাড়ি, অনেকক্ষণ মাকে দেখেনি। কিন্তু সেই ভিড়ে তারা কেউ উঠতে পারল না। ট্রাম ছেড়ে দিলে একটা বছর

সাতেকের মেয়ে তবু প্রাণপণে দৌড়ে আসছিল। সে হোঁচট খেল, হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল হ্যান্ডেল। তারপর ট্রামটা হু-হু করে তাকে ছাড়িয়ে গেল দেখে সে রাগ করে কান্নামুখে চেঁচিয়ে বলল, আমরা কি আজ বাড়ি যাব না?

'রোখে্ক' বলে উঠে পড়ল রমেন। ভিড় ঠেলে পরের স্টপে সে নেমে পড়ল ট্রাম থেকে, আবেগবশত। কিন্তু নেমেই বুঝতে পারল যে বোকার মতো একটা কাজ করেছে। এত সামান্য কারণে ট্রাম থেকে নেমে পড়ার কোনও কারণ নেই। সে আবার নিজেকে গাল দিল, ইডিয়েট।

তখন কখনও-সখনও ইরার কথা মনে পড়ে রমেনের। ইরা গর্ভবতী অবস্থায় চলে গিয়েছিল। যদি গর্ভপাত না করে থাকে তবে এত দিনে রমেনের সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। সেই সন্তান হয়তো কোনও দিনই জানবে না যে রমেন তার বাবা। ইরা তাকে সেই কথা বলবে না কখনও। সে হয়তো ছেলেবেলা থেকে হারুর ছেলেকে ডাকবে 'বাবা' বলে। এইসব কথা ভেবে মাঝে মাঝে অস্থির হত রমেন।

মাঝে মাঝে ছাদে শুয়ে থেকে সে দেখত আকাশ জুড়ে পড়ে আছে আকীর্ণ ধুলারাশির মতো ছায়াপথ। দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যেত। মনে হত এই পথ গেছে তার পূর্বপুরুষদের কাছে।

তখন রমেন বড় বেশি স্পর্শকাতর। ঠিক বুঝতে পারে না, তবে মাঝে মাঝে মনে হয় খুব সাধারণ জীবন যাপনের জন্য সে জন্মায়নি। তার জন্মের একটা কোনও উদ্দেশ্য আছে। এক-একদিন সে মাঝরাতে উঠে দরজা খুলে লবের ঘুমন্ত দেহ পার হয়ে যেত। কিন্তু চলে যেতে পারত না। ঘর ও বাইরের মধ্যে কী এক অদৃশ্য বাধা আছে যা মনে মনে পেরোতে পারত না সে। কখনও বা সে চোখ বুজে দিকনির্ণয়ের খেলা খেলত আপনমনে, ঘুরে বেড়াত একা একা, চোখ বুজে ঘর থেকে ঘরে ফিরে যেত শৈশবে।

তারপর একদিন সে বুঝতে পারল যে, যেতে হবে।

হাওড়া স্টেশনে তাকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিল লব। বিদায়ের মুহূর্তে খুব জ্ঞানী পুরুষের মতো সে বলেছিল, একেবারে চলে যেয়ো না। একদিন ফিরে এসো। আমাদের তো আর কেউ নেই।

আটাশ

পলাশপুরে ভদ্রলোকের বসত যত বাড়ে ততই ভাল। গাঁখানা ছেলেবেলা থেকেই রক্তে মিশে আছে। আগে একেবারেই চাষাভুষোর গাঁ ছিল। এখন ধানকল, বি ডি ও-র অফিস, জাতীয় সড়ক আর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল হয়েছে। আরও ভদ্রলোক আসুক, বসত বাড়ুক। বর্ণ হিন্দুরা না থাকলে গাঁ গ্রামের মধ্যে নিরেট একটা অন্ধকার টের পাওয়া যায়। বউ পেটানো, ছেলেকান্না, মুখখিস্তি। বসন্ত সিংহি জন্মকালেও এ-গাঁয়ের বাতাসে একছত্র সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারিত হতে শোনেনি। চালচলনে কারও সহবত ছিল না। লোকে বুঝত তালের রস মানেই তাড়ি। এখন গাঁয়ের চেহারা পালটেছে। ভদ্রলোক এবং সত্যিকারের ভদ্রলোক আরও আসুক। ঝলমল করে উঠুক গাঁখানা।

তুলসীকে তাই নিজের বাড়িখানা সযত্নে ঘুরে ঘুরে দেখাল বসন্ত সিংহি। উঠোনে টিউবওয়েল, পাকা পায়খানা, উঁচু ভিতের বাড়ি। বিধবার সম্পত্তি। খুড়িমা শেষ জীবনটা বসন্ত সিংহির ঘাড়ে পড়েছিল। বদলে লিখে দিয়েছিল জমিখানা। উনিশশো পঞ্চাশে তুলেছিল বাড়িখানা। টিনের চালওলা দু'খানা পাকা ঘর, পাকা ভিত। সরকারি অফিসকে ভাড়া দেওয়ার মতলব ছিল। কিছু দিন ব্রিজ-কনস্ট্রাকশনের অফিসাররা থেকেছিল। তারপর এক সময়ে জুনিয়ার হাইস্কুলটা এক লাফে হাই হয়ে গেল, বাঙালদের আগমনে বসতি বেড়েছিল কিছু, স্কুলে ছেলে ধরে না। তখন উঁচু দিকের কয়েকটা ক্লাস বসত এইখানে। মাগনাই ছেড়ে দিয়েছিল বসন্ত। আহা, বিদ্যাশিক্ষা হলে বাড়ি পবিত্র হয়।

তুলসী উঠোনের পিছন দিকটা ঘেরা নেই বলে ভ্রূ কোঁচকাল, ও-পাশ থেকে বাড়ির ভিতরটা যে দেখা যায়!

বসন্ত সিংহি হাসে, দেখা যায়! কিন্তু দেখবে কে? ওদিকটা পতিত জমি, জঙ্গল।

শেয়াল-ফেয়াল ঢুকে পড়তে পারে।

ঘিরে দেব। ভাববেন না।

ভদ্রলোক আসছে পলাশপুরে। তার জন্য না হয় খরচা একটু হলই।

ভাড়া মাত্র ত্রিশ। তুলসী মনে মনে খুশিই হচ্ছিল। এই বাসাখানা তার হবে। একান্তই তার আর মৃদুলার। সে পরিবারের কর্তা। ব্যাপারটা ভাবাই যায় না। এতকাল পরে স্বাধীন হচ্ছে তুলসী।

তুলসী তবু বলল, একদিন আমার ওয়াইফকে নিয়ে আসব। সে পছন্দ করলে তবে—

বসন্ত সিংহি হাসে, মা লক্ষ্মী কলকাতার মানুষ। পছন্দ হবে না জানি। তবে দেখবেন থাকতে থাকতে অসুবিধেগুলো আর লাগবে না।

সন্ধেবেলা বাসায় ফিরে মৃদুলাকে গোপনে বাসাটার বর্ণনা দিল তুলসী।

মৃদুলা ম্লানমুখে বলল, আমার এ অবস্থায় টিউবওয়েল পাম্প করা কি সম্ভব হবে?

দূর! ও তো আমি করে দেব। তখন হাতে কত সময় পাওয়া যাবে। সকাল থেকে পৌনে এগারোটা পর্যন্ত ছুটি। আবার বিকেলে তিনটে কি চারটে থেকে। অত সময় নিয়ে আমি করব কী? কত ঘরের কাজ করে দেব দেখো।

মৃদুলা তারপর শুকনো মুখে বলে, দাদাকে কীভাবে বলবে? মুখোমুখি বলতে পারবে?

তুলসীর দাদা নারায়ণ গম্ভীর মানুষ। একটু বোকাও। ছেলেবেলায় সবাই বলত বোকা নারাণ। গবেট ছাত্র ছিল। কিন্তু ঘষে ঘষে বেরিয়ে গেল ঠিকই। যে বছর পাকিস্তান হয় সে বছর পাকিস্তান আর হিন্দুস্থান দু' জায়গায় ম্যাট্রিক দিয়েছিল নারায়ণ। দুটোতেই পাশ করেছিল থার্ড ডিভিশনে। তারপর বি এ পর্যন্ত পাশ করে ফেলল ব্যাঙ্কে কেরানির চাকরি করতে করতে। নোয়াখালি ব্যাঙ্ক ফেল করলে চাকরি পেল রেলে। দুরে বদলি করায় চাকরি ছেড়ে ঢুকল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাজনা বিভাগে। সবাই বলত নারায়ণের কপালটাই ভাল। সেই তুলনায় ছাত্র ভাল ছিল তুলসীই। কিন্তু কার্যকালে তুলসী মফস্সলের মাস্টার। দাদা অফিসার, নাকতলায় দেড় কাঠা জমি কিনেছে। এখন খুব গম্ভীর দেখায় দাদাকে। মুখোমুখি আলাদা বাসা করার কথা বলতে ভরসা পায় না সে। বিয়ের পর এখনও মাস দুয়েক কাটেনি, এর মধ্যে ভাগ হওয়ার কথা বলাই যায় না।

তবু বলতেই হবে।

তুলসী একটু ভেবে বলে, টেলিফোনে বলব।

মৃদুলা হেসে ওঠে, কী বুদ্ধি!

তবে?

মৃদুলা ম্লানমুখে বলল, যে ভাবেই আলাদা হও ঠিক আমার ঘাড়ে দোষ পড়বে।

অনেক দিন হয় মৃদুলা তার মা আর ভাইকে দেখে না। বাবাও সময় পান না আসার। এক-একবার ইচ্ছে করে বেহালার বাসায় যায়। কাপড়ের ঢাকনা-দেওয়া তানপুরাটা এখনও দাঁড় করানো আছে শোওয়ার ঘরের বেঞ্চিটার এক কোণে। পাশে রাখা আছে গদিতে ঢাকা তবলা আর পেতলের ডুগি। ধুলো পড়ছে। বাবাকে বলেছিল ওগুলো দিয়ে যেতে। বাবা আনেনি। পলাশপুরে চলে যাওয়ার আগে একবার বেহালার বাসায় ঘুরে আসতে ইচ্ছে করে খুব। কত কালের পুরনো বাসা তাদের, চোখ বেঁধে দিলেও মৃদুলা ঠিক এ-ঘর ও-ঘর চলে যেতে পারবে। কিন্তু যাওয়া যায় না। এখনও বিভুর দলবল ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে।

রাত্রে শোওয়ার আগে মৃদুলা একটা পোস্টকার্ডে মাকে চিঠি লিখে জানাল যে তারা শিগগিরই পলাশপুরে বাসা নিয়ে চলে যাচ্ছে। শেষে লিখল, একবার পলাশপুর এসো। কলকাতায় তো আর দেখা হবে না। আমার খবর তো জানোই। আর সাত-আট মাস পরে কী হবে ভাবতেই ভয় করে। যদি না-বাঁচি তবে আর দেখাই হবে না। পলাশপুরে কিছু দিন গিয়ে থেকে এসো বাবা আর টুপুকে নিয়ে...

লিখতে লিখতে কয়েক বার চোখের জল মুছল মৃদুলা।

রাত্রে পাশাপাশি খেতে বসে তুলসী কাঁপা বুকে একসময়ে দুম করে কথাটা বলে ফেলল। আশ্চর্য এই, নারায়ণকে খুব দুঃখিত বা ভেঙে পড়া দেখাল না। বরং মুখের রেখাগুলো সহজ আর চোখ দুটোয় একটু অবিশ্বাসের ভাব দেখা গেল। যেন স্বস্তি।

বলল, কীরকম বাসা? ভাল?

খুব। এক্কেবারে আলাদা।

কেবল পিতু ভীষণ আশ্চর্য হয়ে বলল, কাকিমাকে নিয়ে যাবে?

তুলসী মাথা নিচু করে রইল।

বউদি ধমক দিয়ে বলল, না তো কী! হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবে দু' বেলা? তারপর তুলসীর দিকে চেয়ে হেসে বলল, একটা তবু জায়গা হল বেড়াতে যাওয়ার।

বউমার যত্ন-টত্ন নিতে পারবি তো!

খামোখাই মৃদুলাকে বউমা ডাকে নারায়ণ। ওর মুখে বেমানান আর বুড়োটে লাগে। নাম ধরে ডাকলেই তো পারে। আসলে নারায়ণের ধারণা বাবার অভাবে সে-ই তুলসীর বাবার জায়গা দখল করে আছে।

খুবই নিশ্চিন্ত লাগল তুলসীর। কথাটা বলে ফেলা গেছে।

রাতে মৃদুলা ঘুমোয়। দুশ্চিন্তায় জেগে থাকে তুলসী। দেখে, কেমন লাবণ্যহীন হয়ে গেছে মৃদুলার মুখ। ঠোঁট শুকনো, চোখের কোল কালো, হনুর হাড় দুটো জেগে উঠছে। রাতে খাওয়ার পরই বমি হয়ে গেছে। ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে বিকেলে দুটো চপ এনেছিল তুলসী। মশারির মধ্যে বসে সেই চপ দুটো খাচ্ছিল যখন তখনই মৃদুলাকে খারাপ দেখাচ্ছিল। আজ সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিল মৃদুলা, মুখখানা হাঁ করা, গাল বসা, শরীরটা যেন মুচড়ে আছে ব্যথা-বেদনায়। ওর খোলামেলা বিশৃঙ্খল শরীর দেখে একটুও কাম জাগেনি তুলসীর। বরং বড় উদোম মাঠের মধ্যে যখন হাওয়া বয়ে যায় তেমনি হা-হা করে উঠেছিল তার বুক, মৃদুলা কি বাঁচবে?

তুলসী ঠিক করল এবার থেকে সে ভিখিরিকে ভিক্ষে দেবে, যথাসম্ভব ভাল কাজ করবে রোজ দু'-একটা, পবিত্র থাকবে। থাকা দরকার। মাঝে মাঝে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবে মৃদুলাকে।

পলাশপুরে নিয়ে গিয়ে একটুও কাজ করতে দেবে না মৃদুলাকে। সে জল তুলবে নিজে, বিছানা পাড়বে, রান্নার লোক রাখবে একজন, যদি পয়সায় কুলোয়। পলাশপুরে গেলে সব হবে।

ললিত একদিন হাসপাতাল থেকে চেক-আপ করিয়ে এল। অল্পবয়সি ডাক্তারটি হেসে বললেন, শরীর তো ঠিক আছে। এবার কাজকর্মে লেগে পড়ুন। ঘরে বসে থাকার আর দরকার নেই।

আবার যেন সেই পুরনো দিনে ফিরে গেছে ললিত। ক্লাস-ঘরের নোংরা দেয়ালে পেন্সিলে লেখা জ্যামিতির উপপাদ্য, ইতিহাসের রাজাগজার নাম আর সন-তারিখ, বিজ্ঞানের যন্ত্রের ছবি, কিংবা সরল অঙ্ক, ভূগোলের জলবায়ু। যত দূর হাত পৌঁছেছে তত দূর দেয়ালে যথাসম্ভব লিখেছে ছেলেরা। হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা গেছে কিছু দিন আগেই।

পড়াতে পড়াতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায় ললিত। ছেলেদের মুখগুলি বাতাসে ভেসে ভেসে হঠাৎ কতগুলি শূন্য হয়ে যায়। পড়ানো থামিয়ে ললিত জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে। পশ্চিমের আকাশে মেঘস্তর। কখনও বা দেখে তিনতলার ছাদ থেকে উড়ছে মেরুন রঙের শাড়ি। কখনও বা জানালার পাশের দেয়াল বেয়ে একটা বেড়াল কেমন নিঃশব্দে হেঁটে লাফ দিয়ে কার্নিসে উঠে যায়। কত হাজার দৃশ্য দেখা যায়।

আজকাল তার ক্লাসে ছেলেরা খুব একটা শব্দ করে না। আগে গল্প বলুন স্যার বলে জ্বালিয়ে খেত, আজকাল নিঃশব্দে চেয়ে থাকে। ললিত স্যার তাদের বড় প্রিয় ছিল। কেউ হয়তো তাদের বলে দিয়েছে যে, ললিত স্যার আর বেশি দিন থাকবেন না। তাই কখনও কখনও ললিত টের পায় মুখের ভিড়ের ভিতরে একটি-দু'টি চোখ যেন তার দিকে চেয়ে ছলছলিয়ে ওঠে।

গিরিজা হালদার ক্যাশ ক্লার্ক। জালে-ঘেরা কাউন্টারের ও-পাশে বসে থাকে, তার গম্ভীর হিসাবমনস্ক মুখ। আগে মাঝে মাঝে কাউন্টারের ঘুলঘুলির সামনে ক্লাসে যাওয়ার পথে ললিত দাঁড়িয়ে দেখত হালদার

কালেকশনের টাকা গুনছে। সে ঘুলঘুলির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে অদৃশ্য রিভলভার উঁচিয়ে বলত, হ্যান্ডস আপ। হালদার হাসত। কখনও বা অকারণে হালদারের সামনে রাখা রবার স্ট্যাম্প তুলে দেয়ালে ছাপ বসাত। হালদার চেঁচিয়ে কপট রাগ দেখাত।

পোলাপান আর কারে কয়? আপনে কি ছ্যামরাগো পড়াইতে আহেন, না তাম্‌শা করতে? তবু ললিতের এই ছেলেমানুষি হালদারের প্রিয় ছিল। বিনা দরখাস্তে অনেক বার ললিতের ক্যাজুয়াল ছুটি মঞ্জুর হয়েছে, যা ললিত টেরও পায়নি। আজকালও ঘুলঘুলির সামনে দাঁড়ায় ললিত। হালদার শরীর ঠিক রাখার উপদেশ দেয়, চোখে চোখ রাখে না। রবার স্ট্যাম্প তুলে নিয়ে আগের মতোই দেয়ালে ছাপ বসায় ললিত, হালদার আপত্তি করে না, কেড়ে নিতে হাত বাড়ায় না। যত খুশি স্ট্যাম্প মারো, ইচ্ছেমতো মেরে নাও। আর কী কী করতে ইচ্ছে করে তোমার? খেলাটা তাই জমে না। রবার স্ট্যাম্পটা রেখে দেয় ললিত। মায়ের সঙ্গে সেই লুডো খেলাটাও জমেনি। এখন সবাই তাকে দান ছেড়ে দেয়।

তবু সেই পুরনো স্কুলবাড়িতে সেই পুরনো দিনগুলির স্মৃতি ছায়ার মতো দোল খায়। টিচার্স রুম-এর দেয়ালে বিখ্যাত মনীষীদের উইয়ে-খাওয়া ফোটো। সেই আলমারির ওপরে গ্লোব। মেয়ে-দেখা চেয়ার, যে-চেয়ারে বসলে রাস্তার পথ-চলতি মেয়েদের দেখা যায়। বিভূতিবাবুর সঙ্গে অনেক বার চেয়ারটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে ললিত। এখন চেয়ারটা তার জন্য খালি রাখা হয়। ললিত বসে না।

ক্লাস এইটের মাধব মুকুন্দ-বেয়ারার ছেলে। টিফিনে সে ক্লাস থেকে এসে মাস্টারমশাইদের চা দিয়ে যায়। ছেলেরা সেই কারণে তাকে খেপায়। মাধব এখন বড় হয়ে গেছে একটু। স্কুলের ফুটবল টিমে খেলছে। বাপ তাকে ক্রমশ সমীহ করছে। ললিত লক্ষ করে এ-সব।

ক্লাস নাইনের হরেনকে দেখে অনেক দিন আগেকার একটা দৃশ্য মনে পড়ে যায়। হরেনকে ভরতি করতে এসেছিল ফরসা গোলগাল সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক। পোশাকে বনেদিয়ানা, স্কুলের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে। লোকটাকে চিনতে পেরেছিল ললিত। একসময়ের বন্ধু। ললিত পরিচয় দিতেই লোকটা একটু ঘাবড়ে গেল, হেসেটেসে বলল, তুমি এই স্কুলে! বাঃ বেশ ভালই হল।

ললিত জিজ্ঞেস করল, কাকে ভরতি করতে এসেছ?

লোকটা খুব অপ্রস্তুত হয়ে লাজুক অপরাধী গলায় বলল, আমি তো জানতাম না যে, তুমি এই স্কুলে আছে। আমি—

গলা খুব নিচু করে ললিতের কানে কানে বলল, যাকে ভরতি করতে এনেছি সে আমার ডোমেস্টিক সার্ভেন্ট। পড়াশুনোয় ঝোঁক আছে বলে— বলতে বলতে লাল হয়ে গেল লোকটা।

সাম্যবাদে বিশ্বাসী ললিত। তবু হঠাৎ তার মনে একটা কোথাও ধাক্কা লেগেছিল। সেটা নিশ্চয় দুর্বলতা। আমি শালা তোমার চাকরকে পড়াব? পরমুহূর্তেই দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে অতিরিক্ত উৎসাহে ললিত চেঁচিয়ে উঠেছিল, খুব ভাল, এই তো চাই।

ললিত হরেনকে বেশিরকম নজরে রাখত। লাভ হয়নি। হরেনের মাথা ভাল না, বোকা। কিন্তু বহুকাল হরেনের কাছে সহজ হতে পারেনি ললিত।

মাঝে মাঝে সঞ্জয়ের টেলিফোন আসে। ললিতকে ক্লাস থেকে ডেকে আনে বেয়ারা, হেডমাস্টার হাত বাড়িয়ে রিসিভার তার হাতে দেয়, তারপর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। নিয়ম হল, ফোন এলে কাউকেই ক্লাস

থেকে ডেকে দেওয়া হবে না, তাতে ক্লাসের ক্ষতি। শুধু ‘ফোন এসেছিল’ এই খবরটা দেওয়া হবে। কিন্তু ললিতের বেলায় এই নিয়মটা ভাঙা হয়েছে। হেডমাস্টারের যে-চোখে ললিতের দিকে তাকানো উচিত ঠিক সেইভাবে উনি আজকাল তাকান না, বরং তাঁর চোখে একটা ‘আহা’ ভাব।

এ-সবই হয়তো সত্য। কিংবা ললিত কল্পনা করে। আজকাল সে বড় স্পর্শকাতর হয়ে গেছে।

অক্টোবরের প্রথম থেকেই শীতের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধেবেলা কুয়াশা হয় আজকাল। রাত গভীর হলে জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে একটা বিদেশি রহস্যময়তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। পুজোর ছুটির আর দেরি নেই।

একদিন টিফিনের আগে তুলসী এসে হাজির।

চল, একটা সিনেমা যাই।

সিনেমা!

ললিত সিনেমার কথা ভুলেই গিয়েছিল। কতকাল আর সিনেমা দেখা হয়নি।

তুলসী বিমর্ষ মুখে বলে, পলাশপুরের বাসার ভাড়া আগাম দিয়ে এলাম। পুজোর ক’টা দিন কাটিয়ে লক্ষ্মীপুজোর পর চলে যাচ্ছি। আর সিনেমা-ফিনেমা দেখা হবেই না।

টিফিনেই বেরিয়ে পড়ল দু’জন। ললিত হেডমাস্টারকে বলতেই উনি ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, চলে যান, ক্লাস ম্যানেজ করে নেওয়া যাবে।

ম্যাটিনিতে একটা বেলেল্লা ছবি দেখল দু’জনে। ললিতের মনটা খারাপ ছিল। তুলসীটা দূরে চলে যাচ্ছে। এখন কেউ একটু দূরে যাচ্ছে শুনলে কেমন যেন হাহাকারে ভরে যায় বুক। আর কয়েকটা মাস থেকে যেতে পারলি না তুলসী? আমার খাটের এক কোণে তোর কাঁধ দেওয়ার কথা ছিল যে! দিবি না? অতদূরে কে তোকে খবর দেবে সময়মতো?

পর্দার চলন্ত ছবির দিকে চেয়ে দু’ চোখ ভরে জল আসছিল। হয়তো বহুকাল পরে দেখছে বলেই পরদার আলো চোখে সহ্য হচ্ছে না, কিংবা হয়তো মন অজান্তে তুলসীর চলে যাওয়ার কথা ভাবছে। চেয়ারের হাতলে রাখা তুলসীর রোগা হাতখানার ওপর নিজের হাতখানা রাখে ললিত। অন্যমনস্কভাবে বসে থাকে। অনুভব করে সুখে দুঃখে তাদের পুরনো বন্ধুত্ব।

সিনেমার পর তুলসী বলল, চল একটু হাতিবাগানে গিয়ে পুজোর জামা-কাপড় কয়েকটা কিনে আনি। সাউথে বড্ড দাম।

তুলসীর পকেট গরম। সিনেমা হলের সামনে ছ’টার শোয়ের একটা দল নামছিল ট্যাক্সি থেকে। খোলা দরজা দিয়ে ফুড়ুত করে ট্যাক্সির মধ্যে চলে গিয়ে তুলসী ডাকল, আয়।

সেই পুরনো দিনের মতো। অবিকল পুরনো দিনের মতো।

ট্যাক্সি থামিয়ে মিষ্টির দোকানে তারা ছানার মিষ্টি খায়।

তুলসী খুশি গলায় বলে, খা। যা খুশি খা।

ফাঁসির খাওয়া খাওয়াচ্ছিস!

মৃদুলার জন্য একটা বিষ্ণুপুরি সিল্কের শাড়ি কিনল তুলসী। লাজুক গলায় বলল, আমি ওকে সোনাদানা কিচ্ছু দিইনি। প্রথম পুজোটা বিয়ের পর, তাই। নইলে তাঁত-ফাঁত দিতাম।

ললিতের মায়ের কথা মনে পড়ে যায় হঠাৎ। অনেককাল মাকে কাপড়-চোপড় দেওয়া হয়নি। মা কখনও কিছু বলে না। আগেকার পাড়ওলা শাড়িগুলোই এখনও পরে।

কে জানে তার জীবনের এটাই শেষ পুজো কি না। একটা সরু কালোপেড়ে কাপড় মায়ের জন্য কিনল ললিত। আর একটা সুন্দর ছাপা শাড়ি কিনল।

তুলসী অবাক হয়ে বলে, শাড়ি কার জন্য?

তোর বউয়ের জন্য। চল, আজ তোর বউকে দেখে আসি। তুই তো শালা ডাকলিই না।

তুলসী ভীষণ খুশি হয়, বলে, চল শালা, মালটা দেখিয়ে দিই।

বড় মিষ্টি বউটি তুলসীর। ললিতের নাম শুনে প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেল। একটু অবাক চোখে দেখল ললিতকে। তারপর হাতজোড় করে বলল, ওঃ—আপনিই—আপনিই—

এর চেয়ে বেশি কিছু তার বলার নেই। ললিত বোঝে।

শাড়িটা দিতেই ভীষণ লজ্জা পায় মৃদুলা। 'এ-সব কেন' বলে মৃদু আপত্তি করে আদরে শাড়িখানা নিয়ে বুকের কাছে ধরে রাখে একটু। ললিত নামে একজন মৃত্যুপথযাত্রীর দেওয়া বলে শাড়িখানাকে মনে মনে সম্মান করে সে। এ-সবই বুঝতে পারে ললিত।

পিতু এসে ললিতের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। বলে, ললিতকাকা, সেই কবে বলেছিলে একটা সিনেমা দেখাবে—

তুলসীর বউদি আসে। চোখ বড় করে বলে, ওঃ মা! কী ভাগ্যি ঠাকুরপো! কী একটু অসুখ হয়েছিল শুনলাম, তারপর থেকে দেখা নেই!

বাচ্চারা ঘরে এসে ভিড় করে।

এ-রকম চমৎকার দিন আসে এক-একটা। ঠিক সেই আগেকার মতো স্বাভাবিক, সুন্দর, হালকা দিন। তখন ব্যাধিটার কথা মনেও থাকে না।

তুলসীর বউ দুধের গ্লাস আর সন্দেশ নিয়ে এসেছিল। তাকে ফিরিয়ে দিল ললিত। বলল, ও-সব নয়। চা খাব। অনেককাল খাই না।

মৃদুলা ইতস্তত করছিল, তুলসীর দিকে তাকিয়েছিল একটু, ললিত হালকা ধমক দিল, চা আনুন।

অনেকক্ষণ সময় কাটাল ললিত।

মৃদুলা বলল, একবার পলাশপুরে আসবেন। ওখানে তো আমাদের সময় কাটবে না।

যাবে। ললিত যাবে।

বেরোবার মুখে তুলসী সঙ্গ ধরে বলল, চল পৌঁছে দিয়ে আসি। ললিত তাকে ফিরিয়ে দেয়, দূর শালা, নিজেকে একটু নর্মাল ভাবতে দে আমাকে।

একা একা রাস্তায় খানিক ঘুরল ললিত। স্বপ্নের মতো এক-একটা দিন আসে, যখন আগেকার সবকিছু ফিরে পাওয়া যায়।

সন্ধে পার করে ফেরার পথে বাসায় না ফিরে বিমানকে দেখতে গিয়েছিল ললিত।

বন্ধ দরজার বাইরে থেকেই শুনতে পেল, ভিতরে বিমান একা একা অনর্গল কথা বলছে।

আজ বিমানের চোখ অনেকটা ঘোলাটে লাল হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে কথার তাল থাকছে না।

সে জোর করে মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করছিল। ললিতকে দেখে ক্ষীণ শুকনো হাসি হাসল একটু। এনে বসাল বিছানার ওপর। তারপর নিজের হাতে চা করতে বসল। অনেক বার চায়ের বাসনকোসন কেটলি, চামচ, জমাট দুধের কৌটো গোলমাল করে ফেলছিল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় সে দু' কাপ চা বানিয়ে ফেলল। চা বানাবার সময়ে অনর্গল কথা বলছিল সে, কাকে বলছে তা সবসময়ে খেয়াল থাকছিল না। মাঝে মাঝে হাসছিল।

ললিত তাকে জোর করে পাশে বসাল। কাঁধে হাত রেখে বলল, কী হয়েছে বিমান?

বিমান কথার তাল রাখতে পারছে না। কেবল বড় কষ্টের সঙ্গে বলে, সব ব্যাপারই কেমন খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে দেখছ! অথচ কত সুন্দর হতে পারত সবকিছু!

অনেকক্ষণ তারপর চুপ করে থাকে বিমান। আস্তে আস্তে বলে, এবার আমার একদম ইচ্ছে করছে না।

কী? ললিত আকুল প্রশ্ন করে।

এই পাগল হয়ে যেতে।

বড় কষ্ট হয় ললিতের। চুপ করে থাকে।

ফেরার পথে অশ্বত্থ গাছটার তলায় ঝুঁঝকো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায় ললিত। ভাবে। সে নাড়াবুনে হয়েও একদিন সেজেছিল কীর্তনীয়া। মানুষের মুক্তির কথা বলেছে কত! হায়, এই পাগলের জন্য সে কিছুই করতে পারে না।

রাতে ঘরে ফিরে ললিত শুয়ে ছিল একা। চুপচাপ। শরীর ভাল ছিল না, তার চেয়েও খারাপ ছিল তার মন। কোনও একটা দিনই সম্পূর্ণ ভাল যায় না কখনও। তার মাথার মধ্যে বিমানের কথা দু'টি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এইবার আমার একটুও ইচ্ছে করছে না, পাগল হয়ে যেতে।

কত কথা ভাবে ললিত। এক দুঃখবোধ আরও দুঃখের ঝরনা খুলে নেয়। বুকের ভিতরে কী একটা খামচে ওঠে। আর কত দিন! কত দিন আর! সে মরে যাওয়ার পরও সবাই থেকে যাবে। তুলসী হাঁটুর ওপর ধুতি তুলে স্কুলে যাবে। সঞ্জয় গাড়ি চালিয়ে ফিরবে তার রিনি আর পিকলুর কাছে। শাশ্বতী হয়তো তার প্রেমিকের সঙ্গে হেঁটে যাবে দোকানের আলোয়, ফুটপাথ ধরে, অনির্দিষ্টভাবে। কিংবা আদিত্যই ফিরে আসবে নাকি! আহা আদিত্য! কত দিনের বন্ধু তার! কেটে গেল শালা। আবার আসবে কি ফিরে! ললিত মরার আগে এসে ডাকবে, কী রে লোলিটা?

শম্ভু এসে দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, ললিতদা, একজন আপনাকে খুঁজছে।

আলসেমি ভেঙে উঠল ললিত।

গলির মুখে এসে দেখল আবছায়ায় একটা লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাতে টিনের সুটকেস আর ছোট্ট বিছানা।

কে?

ললিত, আমি রে, আমি রমেন। তোর কাছে এলাম।

হঠাৎ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল ললিতের বুক। কতকাল...কতকাল দূর থেকে তার কাছে কেউ আসেনি!

রমেন! দু'হাত বাড়িয়ে ললিত বলল, আয়।

উনত্রিশ

যে-রমেন চলে গিয়েছিল, ললিত জানে, সে-রমেন ফিরে আসেনি। এ অনেক দূরের একজন মানুষ। কোন রহস্যময় অচেনা জগৎ থেকে এসেছে। এ হয়তো এমন কিছু জানে যা ললিতের এতকাল জানা ছিল না। যে রমেন গাড়ি চালাত, সাঁতার দিত, ফুটবল খেলত কিংবা পিয়ানো বাজিয়ে গাইত পুব বাংলার মাঝিদের গান, সে এ নয়।

উঠোনের এক কোণে আধো-অন্ধকারে যখন কুঁজো হয়ে রমেন হাত-মুখ ধুচ্ছে, তখন ললিত দরজায় দাঁড়িয়ে সেই আবছায়া দীর্ঘ মূর্তিটিকে দেখছিল। বড় অচেনা লাগে। বড় দূরের। এর সঙ্গে হয়তো আর আড্ডা জমবে না।

রমেন আলোতে এলে তার সুন্দর মুখে নিস্পৃহতা লক্ষ করে ললিত। শান্ত ভাব। আত্মস্থ। হয়তো এ-রকমই ছিল বুদ্ধের মুখ। না কি এ-মুখ নির্বোধের? যে যা নেই তাকেই বিশ্বাস করে বৃথা আয়ুক্ষয় করে! যে প্রজাদের বর্ণাশ্রম মানতে শেখায়! শেখায় বিবাহ-সংস্কার! ঈশ্বরের প্রতিনিধি সেজে মানুষকে তার সংগ্রামের ইতিহাস থেকে প্রান্তর-প্রান্তর দূরে নিয়ে যায়!

রমেন ললিতের মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে। বলে, তোর চিঠি পেয়ে এলাম। টাকা শোধ দিতে ডেকেছিস!

ললিত লজ্জা পায়। বলে, না রে। টাকা তো মানিঅর্ডার করেও পাঠাতে পারতাম।

তবে!

ললিত ইতস্তত করে বলে, তোকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল। কেমন আছিস রমেন?

রমেন মিটিমিটি হাসে।

ক্যান্সারের কথা রমেনকে লিখেছিল ললিত। কিন্তু রমেন তার ব্যাধির কথা জিজ্ঞেসও করল না। বলল না, কেমন আছিস!

মা এলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তাকে প্রণাম করে রমেন। এ-রকম প্রণাম ললিত আর দেখেনি। তার বন্ধুরা বিজয়ার পর ছাড়া বড় একটা প্রণাম করে না মাকে। তাও দায়সারা, পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকানো।

চিনতে পারছেন?

মা চিনতে পারল না।

ললিত বলল, ও অনেক বার এসেছে আমাদের বাসায়। রমেনকে তুমি কত দেখেছ!

মা বলে, তখন হয়তো ছোট ছিল। এখন অনেক বড় হয়ে গেছে।

রাতে পাশাপাশি বালিশে মুখোমুখি শুয়ে অনেক কথা বলল তারা। কত কথা জমে ছিল ললিতের। বলতে বলতে বহুবার উঠে সিগারেট ধরাল ললিত, উত্তেজিত হয়ে উঠল, ক্লান্ত হল। অবশেষে ঘুমে জড়িয়ে এল চোখ। তখন একসময়ে ক্লান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল, আমার অসুখের কথা জিজ্ঞেস করলি না, রমেন?

সে-কথার উত্তর দিল না রমেন। তার একখানা হাত অন্ধকারে ললিতের কাঁধে এসে পড়ল। রমেন বলল, আয় ললিত, আগের মতো আবার আমরা একটা কমিউন তৈরি করতে চেষ্টা করি।

কমিউন! ভীষণ অবাক হয় ললিত। কমিউন! একটা অতীত স্বপ্নের ছায়া তার চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যায়। একপলক পরে সে সচেতন হয়ে বলে, ঠাট্টা করছিস?

রমেন ধীর গলায় বলে, না রে।

ললিত মৃদু হেসে বলে, তবে, সে কি হবে ধর্মীয় কমিউন! সেখানে কি গরিবকে বলা হবে, তোমরা এই জাগতিক দুঃখ হাসিমুখে বহন করো, পরকালে স্বর্গলাভ করবে! আর ধনীকে বলা হবে, তোমাদের সঞ্চিত সম্পদ কিছু কিছু দান করো, তোমরাও স্বর্গের অধিকারী হবে! এইভাবেই ধর্ম সাম্য আনার চেষ্টা করেছে, আমরাও তাই করব?

রমেন আস্তে করে বলে, তা নয়।

ললিত হাসে। বলে, তুই কর। আমাকে ছেড়ে দে। লাতন হয়ে পড়ে আছি। দুম করে একদিন রওনা দেব।

রমেন হাসে। বলে, যতই তোকে আয়ু দেওয়া যাক, ততই তুই আরও আড্ডা দিবি, চা খাবি, দায়সারা চাকরি করবি— কিন্তু তারপরও তো একদিন মরতেই হত! আয়ু দিয়ে কী করবি ললিত?

ললিত ঘুমচোখে হাসে। বলে, কী করব... কী করব... অনেককিছু করব রে! বিকেলে আমাদের উঠোনে একটা অদ্ভুত আলো এসে পড়ে, কোনও দিন লক্ষ করিনি, সেই আলোটুকু রোজ চুপ করে বসে দেখব একা-একা।...ঠিক দুপুরবেলা, মা যখন একা থাকে, সেই সময়ে ওই জানালার পাশে চৌকিতে বসে লুডো খেলব মায়ের সঙ্গে, পেয়ারা গাছের ফাঁক দিয়ে একটু রোদ এসে পড়বে মায়ের মুখে। ...একটা প্রেম করব, বুঝলি? সন্ধের পর কলকাতার রাস্তায় দোকানের যে আলো পড়ে, সেই আলোয় তার পাশে পাশে হাঁটব...বিয়ে করব। ...প্রথমে একটা মেয়ে হবে। তার শিশুমুখের গন্ধ নেব বুক ভরে।...তারপর আস্তে আস্তে বুড়ো হব...অসুখ হবে...মরে যাব...

রমেন, আস্তে হাসল। বলল, তার চেয়ে এই তো ভাল।

কী ভাল?

মৃত্যুর সময়টা জানা থাকা ভাল। এটা তো একরকমের সৌভাগ্য, যখন মানুষ জানতে পারে আর ঠিক ক'টা দিন তার হাতে আছে।

তাতে কী হয়?

আয়ু ফুরিয়ে আসছে জানলে মানুষ খুব চনমনে হয়ে ওঠে। সচেতন হয়। তখন চেষ্টা করলে সে সাত দিনে একশো বছরের জ্ঞান লাভ করে চলে যায়।

ললিত অলসভাবে হাসে। বলে, কে চায় জ্ঞানলাভ করতে?

রমেন হঠাৎ একটা উদ্ধৃতি উচ্চারণ করে, কারও কারও মৃত্যু পালকের মতো হালকা। কারও কারও মৃত্যু পাহাড়ের মতো ভারী।

ললিতকে কথাটা চাবুকের মতো স্পর্শ করে। সে চুপ করে থাকে। এটা কার উদ্ধৃতি তা তার মনে পড়ে যায়।

রমেন ধীর স্বরে বলে, মৃত্যুটা দুঃখের নয়। ও তো আছেই। দুঃখের সেটা যখন মানুষ কর্তব্য না করে চলে যায়। সে যে-খাদ্য খেয়েছিল, যে-পোশাক পরেছিল, পেয়েছিল যত ভাল ব্যবহার, তার সবকিছুর ঋণ রেখে চলে যায়। ...ললিত, মনে পড়ে?

ললিত চুপ করে থাকে।

রমেন বলে, অকৃতজ্ঞ মানুষই সভ্যতার সব ফসল ভোগ করে নির্লজ্জের মতো, বদলে সভ্যতাকে কিছুই দেয় না।

ললিত হাসে ঘুমচোখে। তারপর মাথাটা এগিয়ে দেয় রমেনের বুকের কাছে। রমেন একখানা হাত রাখে ললিতের মাথা স্পর্শ করে। বলে, ঘুমো।

ললিত ঘুমোয়। কিন্তু মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যেই বিদ্যুতের মতো কী যেন স্পর্শ করে তাকে। অন্ধকারে পাশ ফেরার সময়ে সে অস্ফুট গলায় ডাকে, রমেন!

সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ধীর গলায় উত্তর পায়, এই তো আমি। জেগে আছি। তুই ঘুমো।

ললিত ঘুমোয়। কিন্তু সারা রাত ধরে সে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। অজান্তে রমেনকে খোঁজে। সাড়া পেয়ে আবার নিশ্চিন্তে ঘুমোয়।

সকালবেলা সে রমেনকে জিজ্ঞেস করে, তুই কাল রাতে ঘুমোসনি?

রমেন মিটিমিটি হাসে। বলে, কেমন যেন মনে হয়েছিল রাত্রিবেলা ঘুম ভেঙে গেলে তুই আমাকে খুঁজবি।

ললিত লজ্জা পেয়ে বলে, তার জন্য ঘুমোসনি? তুই কী রে শালা! অত দূর ঘুরেটুরে এলি, তোর টায়ার্ড লাগছিল না?

রমেন মাথা নাড়ে, আমি কম ঘুমোই। তাই আমার দিন তোর দিনের চাইতে অনেক বড়!

কাল রাত থেকেই ললিতের মায়ের মনে একটা সন্দেহ ঢুকেছে। এই যে রমেন নামে ছেলেটা এসেছে ললিতের কাছে, এর রকমটা কী? সাজেগোজে দীনদরিদ্র, কিন্তু মুখখানা দেখে মনে হয় বড়ঘরের ছেলে। বড় সুন্দর মুখখানা। চেনা-চেনা লাগছিল। ললিত বলছিল বটে, রমেন এ-বাসাতে অনেক এসেছে মা! ওকে তুমি কত বার দেখেছ। কিন্তু আজকাল চোখে একটা ঘোলা-ঘোলা ভাব, কোনও কিছুই ঠিকমতো নজরে আসে না। তা ছাড়া কত দিন আগে দেখা, অত কি মনে থাকে?

সে যাই হোক, কিন্তু ললিত বলছিল, ছেলেটা নাকি সন্ন্যাসী। কোন আশ্রমে থাকে। এটা শোনার পর থেকেই মনটা কেমন খচখচ করছে। ওই সন্ন্যাসী ছেলেটা ললিতের কাছে কেন এসেছে! কী দরকার! বড় ভয় করে ললিতের মায়ের। এ-ছেলেটা আবার তুক করে যাবে না তো ললিতকে! একেই তো ললিত উদাসী ছেলে! আধা-সন্ন্যাসী হয়েই আছে তো।

কাল রাতে এক বিছানায় শুয়ে ওরা দু'জন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কথা বলছিল। কী যে অত কথা ওদের। ললিতের মা অনেক চেষ্টা করেছে শুনতে। কিন্তু গুনগুন শব্দ, দেশলাই জ্বালবার খস ছাড়া কিছুই কানে আসেনি। সারা রাত জেগে ওই ছেলেটা কী যেন বুঝিয়েছে ললিতকে। বিবাগী ছেলেদের বড় ভয় ললিতের মায়ের। কী কথা হয়েছিল ওদের কাল রাতে? একেই বুড়ি নাচুনি, তার ওপর আবার ঢাকের বাদ্যি।

সকালে ললিত বাথরুমে গিয়েছিল, সে সময়ে রমেনকে একা পেয়ে ললিতের মা এসে বলল, বুঝলে বাবা, ললিতের তো সংসারে মতি নেই, তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে যেয়ো তো! দেখো, যেন ওর আর-একটু সংসারে ঝোঁক হয়, টাকাকড়ির দিকে মন দেয়। আর দেখো, ও মেয়ে দেখলে কানা হয়, চোখ তুলে তাকায় না, কিন্তু এ-বয়সে ও-রকম স্বভাব কি ভাল? তরতাজা বয়স, এ-বয়সে বয়সের গুণ থাকবে না? তুমি ওকে একটু দেখো তো—

দেখব।

দেখো। ওর যেন সংসারে মন হয়। আমি ওর জন্য মেয়ে দেখে রেখেছি। বেশ মেয়েটি। বড় লক্ষ্মীমন্ত।

ত্রিশ

নিজের ওপর মাঝে মাঝে আজকাল বড় রেগে যায় শাশ্বতী। ক্যান্সারের ওষুধটার কথা সে যে কোথায় পড়েছিল, কোন কাগজে, কবে, তা তার কিছুতেই মনে পড়ছে না। অনেক ভেবেছে সে।

একদিন ডাঁই করা পুরনো খবরের কাগজ মেঝেতে নামিয়ে ধুলো ঝেড়ে বহু সময় ধরে খুঁজেছে। মা এসে অবাক, ও কী রে ঠান্ডু, সারা দিন কাগজ গড়ায়, খুলেও দেখিস না, এখন পুরনো কাগজ পেড়ে ঘর নোংরা করে কী দেখছিস?

কী দেখছে তা কি কাউকে বলতে পারে শাশ্বতী? কে বুঝবে! তাই সে রেগে বলে, ঘর ঝেঁটিয়ে দেব। এখন যাও তো।

একদিন কালীনাথকেও জিজ্ঞেস করেছিল শাশ্বতী, দাদা, তোর মনে আছে—একদিন কাগজে বেরিয়েছিল না যে ক্যান্সারের কী একটা ওষুধ বেরিয়েছে!

ক্যান্সারের ওষুধ! কালীনাথ অনেকটা ভাবে। মাথা নেড়ে বলে, কোথায়, নজরে পড়েনি তো! বেরিয়েছে নাকি!

হুঁ। আমি নিজে দেখেছি।

কালীনাথ একটু ভেবে বলে, তা হলে খুঁজে দেখিস তো। কাগজে পেলে বলিস। অফিসে সবাইকে খবরটা দেব। খুব সেনসেশেন্যাল খবর। কেউ বলেনি তো!

শুনে রেগে যায় শাশ্বতী। খবরটা কি কেউ দেখেনি! তবে কি বেরোয়নি ও-রকম খবর? না কি সে উড়ো শুনেছে কোথাও।

খুব সন্দেহ হয় তার। কিন্তু হাল ছাড়ে না।

পাড়ার মহিম ডাক্তারকে শাশ্বতী কাকা বলে ডাকে। তার ডিসপেন্সারিতে সবসময়ে ভিড়। এক দুপুরেই যা একটু ফাঁকা। তখন মহিমকাকু কল-এ বেরোয়, আর মদন কম্পাউন্ডার বসে বসে ঝিমোয়। সেই সময়েই একদিন সেখানে হানা দিল শাশ্বতী, মদনদা, একটা খবর জানেন? ক্যান্সারের ওষুধ কোথায় করে বেরিয়েছে!

মদন বুড়ো মাথা নেড়ে বলে, বেরোল আর কোথায়! তবে বেরোব-বেরোব করছে। দু'চার দশ বছরের মধ্যে বেরিয়ে যাবে।

মদন জানে না, জানলে আর কম্পাউন্ডার হয়! শাশ্বতী তখন মহিম ডাক্তারের টেবিলের ওপর রাজ্যের মেডিকাল জার্নাল বসে বসে ঘাঁটে। সব বুঝতে পারে না, কিন্তু মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে খোঁজে, কোথাও ক্যান্সারের সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে কি না।

মদন কম্পাউন্ডার জিজ্ঞেস করে, কার ক্যান্সার?

কারও না। এক বন্ধুর সঙ্গে বাজি ধরেছি।

অ। বলে মদন হাই তোলে।

কলেজের লাইব্রেরিতে কোনও ডাক্তারি বই নেই। তবু শাশ্বতী ক্যাটালগ খুঁজে ফিজিওলজির গোটাকয় বই নিল। পড়ে কিছুই বুঝতে পারল না। নিজের বোধবুদ্ধির ওপরও তার ভয়ংকর রাগ হতে লাগল।

হাসপাতালে কদাচিৎ গেছে শাশ্বতী। যেতে ভয় করে। অনেক দিন আগে তার বড়দি লীলাবতী কিছু দিন ছিল মেডিক্যাল কলেজে। তখন, খুব ছোটবেলায় সে দু'-একবার সেখানে গেছে। সে জানে দু'নম্বর বাস মেডিক্যাল কলেজের পাশ দিয়ে যায়। সেই স্মৃতির ওপর নির্ভর করে, খুব সাহস করে একদিন কলেজে বেরিয়ে, কলেজে না গিয়ে সে দু' নম্বর বাসে চাপল। ভয়ে বুক ঢিবঢিব করছিল তার, তবু যেতেই হবে বলে গেল।

ক্যান্সার ইউনিট খুঁজে পেতে দেরি হল না। ছোটখাটো একটা বাড়ি। লোকজনের ভিড় কম। সে গেটের কাছে একজন বেয়ারাকে বলল, আমি একজন ডাক্তারের সঙ্গে একটু কথা বলব।

লোকটা তাকে একটা ফাঁকা অফিস-ঘরের মতো ঘর দেখিয়ে দেয়।

সেখানে বাচ্চা এক ডাক্তার বসে আছে। রোগা, ফরসা, চোখে চশমা, মিষ্টি মুখখানি। কথা বলতেই বোঝা গেল, একটু তোতলা। সুন্দর ব্যবহার তার। শাশ্বতীকে বসতে বলল।

কার ক্যান্সার?

একজনের। আমার চেনা একজন।

কোথায় হয়েছে?

পেটে?

লোকটা হাসে। বলে, পেটে তো অনেক কিছু আছে। পেটের কোথায়?

শাশ্বতী যত দূর জানে বলল। লোকটা ভেবে বলল, তা হলে গ্যাসট্রিক কারসিনোমা। অপারেশন হয়েছে বললেন?

হয়েছে।

লোকটা ঠোঁট ওলটায়। বলে, লাভ নেই অবশ্য।

শাশ্বতীর ভয়ংকর বুক কেঁপে ওঠে। কান-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। সে কাঁপা গলায় বলে, আর ট্রিটমেন্ট নেই?

লোকটা মিষ্টি হেসে বলে, গ্যাসট্রিক কারসিনোমা পাঁচ বছর পর্যন্ত টিকলে আমরা কিওর বলে ধরি। কিন্তু পাঁচ বছরই ম্যাক্সিমাম।

তার পর কী হবে?

কালো কফির রঙের বমি হবে। বাঁ কাঁধের দিকে কতগুলো লাম্প দেখা যাবে। খিদে থাকবে না। বমির সঙ্গে রক্তও থাকতে পারে।

কিন্তু শাশ্বতী সে-সব শুনতে পায় না। না শোনার জন্যই বলে, আমি শুনেছি রে দিলে ভাল হয়ে যায়! আমাকে আপনাদের যন্ত্রপাতিগুলো দেখাবেন?

আসুন। বলে লোকটা মিষ্টি হেসে উঠে দাঁড়ায়। সে নতুন ডাক্তার। এই কচি সুন্দর মেয়েটাকে সে নিজের কৃতিত্ব দেখাতে আপত্তি করে না।

নিঃশব্দ, ঠান্ডা ঘরে প্রকাণ্ড যন্ত্রগুলো ভীত চোখে দেখে শাশ্বতী। এই বিশাল যন্ত্রেও ওইটুকু রোগ ভাল হয় না!

লোকটা তাকে দূর থেকে যন্ত্রের কলাকৌশল বুঝিয়ে দিতে থাকে। শাশ্বতী শোনেও না। কেবল চেয়ে থাকে। বলে, কিন্তু আমি শুনেছিলাম, এর, ওষুধ বেরিয়েছে।

ওষুধ! অনেক ওষুধ বেরিয়েছে। কিন্তু কোনওটাই অমোঘ নয়।

কিন্তু কথাটা মনে রাখে না সে।

মানুষ এতকাল ধরে করেছে কী! কী করেছে তারা! শাশ্বতী ভেবে দেখে, এই একটু ছোট্ট ঘটনার কাছে পৃথিবীর সব আবিষ্কার ব্যর্থ হয়ে আছে! সে মানুষের ওপর বড় রেগে যায়। কেন অকাজের কাজ করে মানুষ! কেন খামোখা প্লেন বানাচ্ছে! রকেট ছুড়ছে! তৈরি করছে বোমা! এ তো ছেলেখেলা শুধু শুধু। তারা সব ছেড়ে দিক। তারা এক্ষুনি বসে যাক সেই অমোঘ ওষুধটা বানাতে। শাশ্বতী তাদের পাঁচ বছর সময় দেবে। না, অত নয়। এক বছর— এক বছরের মধ্যে যদি বানাতে পারে ভাল। নইলে—নইলে—হায়, নইলে অসহায় শাশ্বতী কী শাস্তি দেবে তাদের তা ভেবে পায় না।

তাদের ঝি ইন্দু মাঝে মাঝে ঠাকুরপুকুরের এক তান্ত্রিকের কথা বলত। সে রোগ সারায়, প্রাণবিনিময় করে দেয়। ইন্দুকে একদিন জিজ্ঞেস করল শাশ্বতী, হ্যাঁগো ইন্দুদি, সেই তান্ত্রিক ক্যান্সার সারাতে পারে?

ইন্দু ঘাড় হেলিয়ে বলে, সব। আমার ননদাইয়ের অমন বাতব্যাধি সেরে গেল!

ইন্দুর কাছ থেকে তান্ত্রিকের ঠিকানাটা রেখে দেয় শাশ্বতী।

কয়েক দিনের মধ্যেই এ-রকম অনেক ঠিকানা এসে যায় তার হাতে। সে ভেবে কূল পায় না, কার কাছে যাবে।

মাঝে মাঝে সকালের রোদে বাবা বাগানে আগাছা নিড়োয়, ফুলগাছের গোড়া খুঁড়ে দেয়। তখন বাবার কাছে গিয়ে চুপ করে বসে শাশ্বতী। বাবা কথা বলে না, কিন্তু কদাচিৎ কখনও উদাসীন চোখে তার দিকে একপলক তাকায়।

শাশ্বতী ডাকে, বাবা।

উত্তর নেই।

কী করলে ক্যান্সার সারে?

উত্তর নেই।

কেন মানুষ ওষুধ বের করছে না এক্ষুনি?

মানুষের কাজে বড় হেলাফেলা। শাশ্বতী ভাবে।

ললিতের বাসায় সেই যে গিয়েছিল শাশ্বতী তারপর প্রায় এক মাস কেটে গেছে। প্রায় এক মাস পর একদিন রবিবারের কাগজে একজন কবিরাজের প্রবন্ধ বেরোল। হিমালয়ের গাছগাছড়ার কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় এক দুর্লভ গাছের নাম করে বলেছেন যে, এর থেকে একদিন দুরারোগ্য ক্যান্সারের প্রতিষেধক বেরোতে পারে।

কালীনাথকে লুকিয়ে প্রবন্ধের পাতাটা ভাঁজ করে ব্যাগে ভরল শাশ্বতী। অল্প একটু সাজগোজ করে বন্ধুর বাসায় যাচ্ছে বলে বেরিয়ে পড়ল।

ললিতের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল খুব লম্বা, ফরসা একজন লোক। গায়ে হাফহাতা পাঞ্জাবি, পরনে খাটো ধুতি।

ললিতবাবু নেই?

আছে। আসুন। লোকটি বড় সুন্দর হাসে। শাশ্বতী লক্ষ করে।

আধশোয়া থেকে উঠে বসল ললিত। দরজাটা আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল রমেন, সে সরে যেতেই শাশ্বতীকে দেখে সে প্রথমে কথা বলতে পারল না। কেমন যেন বুক-কঁপা, কথা-গুলিয়ে-যাওয়া, আবেগসর্বস্ব এক অনুভূতি টের পায় সে।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

এতক্ষণ শাশ্বতী কেবল আসছিল ললিতের কাছে। একটা ব্যগ্র প্রয়োজনের কথাই তার মন জুড়ে ছিল। কিন্তু এখন, ললিতের মুখোমুখি সে হঠাৎ টের পায়, এতটা করার মধ্যে সে সকলের কাছেই ধরা পড়ে গেছে। সবাই বুঝতে পারছে এখন, কেন শাশ্বতী এত দূর এসেছে।

বুঝুকগে। শাশ্বতীর কিছু আর যায় আসে না।

আসুন। ভিতরে আসুন। রমেন ডাকে।

শাশ্বতী ভিতরে এসে তার শুষ্ক, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে একটু হাসে। বলে, কেমন আছেন দেখতে এলাম।

তারপরেই মাথা নিচু করে সে।

শাশ্বতীকে বসিয়ে মাকে ডেকে আনে ললিত রান্নাঘর থেকে।

এতক্ষণ মনে মনে বোধহয় শাশ্বতীকেই প্রার্থনা করছিল মা। গতকাল ওই সন্ন্যাসী ছেলেটা আসার পর থেকেই। ও কোনও তুক করার আগেই যেন শাশ্বতী আসে।

একগাল হেসে কাছে বসে শাশ্বতীকে প্রায় কোলে টেনে নেয় মা। বলে, মুখ শুকিয়ে গেছে যে! রোদে রোদে ঘোরো বুঝি! তারপরেই আর দেরি না করে জিজ্ঞেস করে, তোমরা বাঁড়ুজ্যে না! শাণ্ডিল্য গোত্র তো!

ললিতের কান-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। বলে, উঃ মা, কী হচ্ছে!

হায় মা! মায়ের জন্য বড় কষ্ট হয় ললিতের। মিতুর অপমান মনে পড়ে। মনে পড়ে আর কিছুদিন বাদে এই ঘরে কেমন একা হয়ে যাবে মা। মা জানে না, ললিত—তার একমাত্র ললিত থাকবে না। ধমক দিতে ললিতের কষ্ট হয়। চোখ ছলছল করে। মা আর শাশ্বতীর ও-রকম কাছ ঘেঁষে আপনজনের মতো বসে থাকা সে দেখতে পারে না। সে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

শাশ্বতীকে তাদের কাছে না-রেখে রান্নাঘরের দরজায় টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল মা। মায়ের মুখে আজ হাসি ধরছে না। এই গরিবের সংসারে লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটা কি আসতে রাজি হবে! হয় যদি! আহা, যদি হয়!

শাশ্বতীকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য রমেন আর ললিত একসঙ্গে বেরিয়েছিল।

আনোয়ার শা রোড ধরে কিছুক্ষণ হাঁটার পর ললিত একটু হাঁফিয়ে গেল। বেশ রোদ এখন। সেও আবেগবশত জোরে হেঁটেছে। লক্ষ করে শাশ্বতী বলল, আপনারা ফিরে যান। আমি তো রাস্তা চিনি। যেতে পারব।

রমেন ললিতকে ফিরিয়ে দেয়, তুই চলে যা। আমি এগিয়ে দিয়ে আসি।

ক্লিষ্ট একটু হেসে ললিত দাঁড়িয়ে গেল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিরে এল আস্তে আস্তে। এসে শাশ্বতীর রেখে-যাওয়া পত্রিকার প্রবন্ধের পাতাটা খুলল সে। খুলে হাসল।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে রমেন হাত ধরে শাশ্বতীকে রাস্তার ধারে সরিয়ে আনল। পিছনে অনেকক্ষণ ধরে হর্ন দিচ্ছিল একটা গাড়ি, শাশ্বতী শুনতে পায়নি। সে একটু লাজুক হাসল। যতক্ষণ ললিত সামনে ছিল ততক্ষণ লোকটাকে ভাল করে লক্ষ করেনি শাশ্বতী। এখন লক্ষ করে দেখল লোকটা একটা থামের মতো বড়। গায়ের ফরসা রং থেকে রোদ ঠিকরে আসছে, সুন্দর চেহারা, কিন্তু পোশাকের কোনও যত্ন নেই। পরনে একটা হাফ-হাতা পাঞ্জাবি আর ধুতি। লোকটা বোধ হয় কখনও খেয়াল করে না যে সে কতখানি সুন্দর। শাশ্বতীর ভাল লাগল যে সে রাস্তার মাঝখান দিয়ে অসাবধানে হাঁটছিল বলে লোকটা তাকে একটুও ধমক দিল না, উপদেশও দিল না। শুধু হাত ধরে সরিয়ে এনে আবার নির্বিকারভাবে হাঁটছে। যেন দরকার হলে আবার হাত ধরে সরিয়ে আনবে, ধমক বা উপদেশ দেবে না।

শাশ্বতী জিজ্ঞেস করল, বললেন না তো আপনি সন্ন্যাসী কি না!

রমেন শান্তভাবে বলল, না।

শাশ্বতী তার দাঁতে ঠোঁট টেপা সুন্দর হাসিটা হাসল। বলল, কিন্তু আপনি সন্ন্যাসী হলে খুব ভাল হত।

কেন?

সন্ন্যাসীদের তো অনেক তুকতাক তন্ত্র-মন্ত্র জানা থাকে। আমি আপনার কাছ থেকে ক্যান্সারের ওসুধ জেনে নিতাম।

রমেন একটু হাসল।

শাশ্বতী চিন্তিত মুখে বলল, কিন্তু যত দূর মনে হয় আমি কাগজে দেখেছি ক্যাসারের ওষুধ বেরিয়েছে। তাই না?

রমেন মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, বেরিয়েছে।

শাশ্বতীর মুখ সামান্য উজ্জ্বল দেখাল। বলল, আপনিও দেখেছেন, না?

রমেন একটু চিন্তা করে বলল, দেখেছি বোধ হয়।

বেরিয়েছে। শাশ্বতী হঠাৎ নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলে বলল, আমি জানি।

রমেন একটুও হাসল না। খুব গম্ভীরভাবে বলল, আমি অবশ্য একটা টোটকা ওষুধের কথা জানি।

কী সেটা?

হাঁটতে হাঁটতে বাস-রাস্তায় এসে গিয়েছিল তারা। রমেন বলল, আর-একদিন বলা যাবে। ওই আপনার বাস-স্টপ।

না, আপনি বলুন। অধৈর্যের স্বরে বলল শাশ্বতী। এদিক ওদিক একটু দেখে নিয়ে বলল, ওইখানে একটা রেস্টুরেন্ট দেখা যাচ্ছে। চলুন, একটু বসি।

রমেন একটু ইতস্তত করে বলল, আমি রেস্টুরেন্টে কিছু খাই না।

আচ্ছা, আমি চা খাব। আপনি বসবেন। চলুন।

সকাল সাড়ে দশটায় রেস্টুরেন্টটা খুব ফাঁকা ছিল না। কয়েকজন ইতর ধরনের ছেলে ছোকরা এদিক ওদিক বসে আছে। কেউ জোরালো শিস দিচ্ছে, তার সঙ্গে টেবিলে আঙুল ঠুকে তবলা বাজানোর শব্দ। দেখেশুনে মুখ শুকোল শাশ্বতীর। বলল, এখানে হবে না। বড় বাজে জায়গা।

সব জায়গাই এ-রকম। আসুন, কোনও ভয় নেই।

ভিতরটা নোংরা অন্ধকার। ছেলেছোকরারা লম্বা একটা টেবিল দখল করে রেখেছে, বাদবাকি রেস্টুরেন্টটা ফাঁকা। এরা আড্ডা দেয় বলেই বোধহয় এখানে তেমন খদ্দের আসে না। যে-দোকানে একবার এ-ধরনের আড্ডা বসে সে-দোকান আস্তে আস্তে মিইয়ে যায়, টিম টিম করে চলে।

ইস, কী অসভ্যের মতো তাকাচ্ছে! ফিস ফিস করে শাশ্বতী বলল।

আপনিও তাকান। ভয় পাবেন না।

যাঃ।

রমেন তার সরল সুন্দর চোখে তাকিয়ে ছিল ছেলেগুলোর দিকে। প্রায় নিস্পলকভাবে।

শাশ্বতী ফিসফিস করে বলল, কী করছেন! ওরা ভীষণ বাজে।

সে-কথায় কান দিল না রমেন। তাকিয়েই রইল। ব্যাপারটা খুব আস্তে আস্তে ঘটতে লাগল। কালোকোলো, রংচঙে জামা প্যান্ট পরা ছেলেগুলো ঘন ঘন তাকাচ্ছিল তাদের দিকে। হাসছিল, গা টেপাটেপি করে নিচু স্বরে কথা বলছিল। তারা কিছুক্ষণ রমেনকে লক্ষ করল, তার চোখের দৃষ্টি ফেরত দিল সমানে সমানে। একজন বলল, মাইরি, আমাদের ভসসো করে ফেলবে। তারপর আস্তে আস্তে ঠান্ডা লড়াইটায় তারা হারতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আর কেউ তাকাচ্ছিল না, নিজেদের আড্ডায় ডুবে গেল।

রমেন শাশ্বতীর দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, চোখের একটা কোনও শক্তি আছে। আপনি যদি কখনও এ-সব ছেলের চোখে সাহস করে চোখ রাখেন তবে দেখবেন এরা সেটা সহ্য করতে পারে না। তবে খুব সরলভাবে তাকাতে হয়, রেগে গিয়েও নয় আবার ভয়ে ভয়েও না।

কিন্তু ওষুধের কথাটা!

রমেন মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। সেটাও চোখেরই একটা ব্যাপার। আমাদের পরিবারে একটা পুরনো চোখের অসুখ ছিল। আমার ঠাকুরদার বাবা ছিলেন প্রায় অন্ধ মানুষ। দাদু সেই অসুখটা জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন। যৌবনকাল থেকেই তাঁকে চশমার সঙ্গে আতসকাচ কিংবা দূরবিন ব্যবহার করতে হত। আবার দাদুর দুই ছেলে, আমার বাবা আর জ্যাঠামশাই, আর এক মেয়ে, আমার পিসিমা—এদের বয়স তিরিশ পেরোনোর আগেই চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হতে শুরু করল। আর চল্লিশের আগেই সকলের অন্ধ হয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। সেই সময়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল আমাদের বিরাট বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ি, বাগান, খাজনার হিসেব এ-সবের দেখাশোনা নিয়ে। কে এ-সব দেখে? আমার ঠাকুমা বরাবর ভিতর-বাড়িতে থাকতেন, বাইরে বেরোতেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন বাবার চোখ খারাপ হতে শুরু করল তখন ঠাকুমাকে বেরোতে হল। আর, আশ্চর্যের বিষয় যে, ঠাকুমা খুব অল্পদিনেই সব বুঝেসুঝে নিলেন। খুব নিখুঁতভাবে, এমনকী দাদুর চেয়েও ভালভাবে তিনি জমিদারি চালাতেন। আমাদের বিরাট বাড়ি, বাগান-সম্পত্তি, সবকিছুর ওপর তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ ছিল। সকলের দেখা তিনি একা দেখতেন। তাই এত তীক্ষ্ণ হয়েছিল তাঁর চোখ যে বাগানের একটা ফুল কেউ তুললে তিনি টের পেতেন, গাছের একটা পাতা পড়ে গেলেও তাঁর চোখ এড়াত না। প্রতিটি প্রজার মুখ তাঁর মনে

থাকত। আমাদের বাসায় অজস্র সিন্দুক, আলমারি আর বাক্স প্যাঁটরা ছিল, ঠাকুমা সেগুলোর তালা একবার চাবি ঢুকিয়ে খুলতে, কখনও কোন তালার কোন চাবি তা ভুল করতেন না। এইভাবে সারা দিন চোখ ব্যবহার করতে করতে তাঁর চোখ ভয়ংকর তীক্ষ্ণ হয়ে যায়, আর বিষয়সম্পত্তির ওপর তাঁর ভয়ংকর একটা ভালবাসা চলে আসে। এর পর ঠাকুমা যখন মারা যান তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। তাঁর উদুরি হয়েছিল। তার ওপর গায়ে জল এসেছিল। একটা পা গ্যাংগ্রিন হয়ে পচে গোড়ালির হাড় বেরিয়ে পড়েছিল। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেল। কিন্তু ঠাকুমা মরছিলেন না। একদিন দু'দিন করে এক মাস দু'মাস বেঁচে রইলেন। ওই ফোলা পচাগলা শরীরের মধ্যে একমাত্র তাঁর চোখ দুটোই ছিল দেখবার মতো। সেই বড় বড় চোখ, সেই উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একই রকম ছিল, রোগের যন্ত্রণা সেগুলিকে একটুও ছোঁয়নি। কেবল বলতেন, আমি মরে গেলে এত সব কে দেখবে? বোধহয় সেই কারণেই ভীষণ ইচ্ছাশক্তির জোরে তিনি বেঁচে রইলেন আরও সাত-আট মাস। সেই বেঁচে থাকাটা দেখার মতো ছিল। তারপর একদিন দুপুরবেলা আমার জেঠিমা ঠাকুমার শিয়রের দিকের আলমারি খুলে কী যেন বের করতে গেছেন, ঠাকুমা ঘাড় উলটে সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বড়বউ, কী নিচ্ছ? ব্যস ওই অবস্থায় তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল। আমরা চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি অদ্ভুত দৃশ্য। ঘাড় উলটে ঠাকুমা এত বড় বড় চোখে আলমারিটার দিকে চেয়ে আছেন। একেবারে জীবন্ত মানুষের মতো খোলা চোখ, কেবল হাঁ-করা মুখের মধ্যে এলিয়ে থাকা জিবটা দেখে বোঝা যায়, ঠাকুমা বেঁচে নেই। সেই খোলা চোখ বন্ধ করতে আমাদের বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল। যত বার বুজিয়ে দেওয়া হয় তত বারই আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুলে যায়, আর ঠাকুমা তাকিয়ে থাকেন।

আহা। স্বভাবত কোমল মন শাশ্বতীর। তার চোখ ছলছল করে।

ওযুধের কথাটা কী জানেন? ঠাকুমা মরে যাওয়ার পর আমি অনেক ভেবে দেখেছি ঠাকুমার যে মরতে অত সময় লেগেছিল তার একটা কারণ হচ্ছে ওই বিষয়-সম্পত্তির প্রতি ভালবাসা। বিষয়-সম্পত্তির প্রতি বেশি টান ভালবাসা আমরা ভারতীয়েরা পছন্দ করি না, কিন্তু তবু বিষয়-সম্পত্তির মতো খারাপ জিনিসের প্রতি ওই ভালবাসাও ঠাকুমার আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছিল। তা হলে দেখুন, ভাল কিছু সৎ কিছুর প্রতি যদি মানুষের ও-রকম তীব্র ভালবাসা হয়, আর তাকে রক্ষা করার জন্য যদি মানুষ সজাগ হয়ে ওঠে তা হলে তার আয়ু বেড়ে যাবে না? শুধু আয়ু নয়, তার চোখের দৃষ্টি বেড়ে যাবে, বাড়বে শ্রবণক্ষমতা, বেড়ে যাবে স্মৃতিশক্তি কিংবা ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি। তখন আর পাঁচজন যা দেখে না, যা শোনে না তার সব সে দেখতে বা শুনতে পাবে। তাই না?

অনেকখানি ঘাড় হেলাল শাশ্বতী। বলল, ঠিক।

তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, তা হলে আপনি বলছেন, আপনার বন্ধুর অসুখটা সেরে যাবে?

মিটমিট করে একটু হাসল রমেন। বলল, আপনার কী মনে হয়?

গূঢ় প্রশ্ন। শাশ্বতী এর উত্তর জানে না। ললিতের উজ্জ্বল চোখ মুখখানা সে মনশ্চক্ষে দেখতে পায়। মৃত্যুর মুখোমুখি একা একটা লোক। রোগী। শাশ্বতীকে ভালবাসে, কিন্তু সেটাকে স্বীকার করতে চাইবে না, এমন অহংকারী! রমেনের সুন্দর সবল মুখখানার দিকে চেয়ে শাশ্বতীর ঠোঁট একটু কেঁপে ওঠে। রমেনের প্রশ্নটার কোনও উত্তর দেয় না শাশ্বতী, কিন্তু হঠাৎ স্খলিত গলায় বলে, আপনি ওকে বাঁচিয়ে দিন।

এই থামের মতো প্রকাণ্ড লোকটার সামনে কথাটা বলতে একটুও লজ্জা করে না শাশ্বতীর।

রমেন একটা নিশ্বাস ফেলল।

এক কাপ চা সামনে জুড়িয়ে যাচ্ছিল। শাশ্বতী তাতে দু'-একবার ঠোঁট ছুঁইয়ে উঠে পড়ল। বলল, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

রাস্তায় এসে শাশ্বতী বলল, আপনি একটা কথা কাউকে বলবেন না।

কী কথা!

আমি ওকে ভালবাসি।

রমেন মাথা নাড়ল, বলব না।

বাস-স্টপের ভিড় থেকে একটু আলগা দাঁড়াল দু'জন। শাশ্বতী হাত দিয়ে রোদ থেকে চোখ আড়াল করে মাথা উঁচু করে রমেনকে দেখল। তারপর বলল, আপনি বরং ওকে বলবেন।

কী?

শাশ্বতী লাজুক মুখ নামিয়ে বলল, বলবেন যে আমি ওকে ভালবাসি।

তারপর একটু ইতস্তত করে শাশ্বতী বিব্রত মুখে বলল, আমাকে যদি ও ভালবাসে তা হলে হয়তো, আপনি যা বললেন সে-রকম, ওর আয়ু বেড়ে যেতে পারে—

রমেন একটু হেসে মাথা নাড়ল, না। মেয়েদের ভালবাসা তো সোজা। সে-ভালবাসায় লাভ নেই। বরং মেয়েদের প্রতি অত্যধিক ভালবাসা মানুষের মধ্যে মৃত্যুপ্রেম জাগিয়ে দেয়।

সে কী?

রমেন শান্তভাবে বলল, আপনি যে-কোনও প্রেমের কবিতা পড়ে দেখবেন, কিংবা প্রেমের গল্প উপন্যাস, তাতে দেখবেন মৃত্যুর কথা কিছু না কিছু থাকবেই। যারা প্রেম-ট্রেম করে তাদের কথাবার্তা শুনে দেখবেন, তারা দু'-দশটা কথার পরেই একে অন্যকে বলছে, আমি যদি মরে যাই তা হলে তুমি কী করবে? মৃত্যুর চেতনা ছাড়া কিছুতেই প্রেমকে মহৎ করা যায় না। ও-রকম প্রেমে কি আয়ু বাড়ে?

তবে? কাকে?

রমেনের মুখে উত্তরটা এসে গিয়েছিল, কিন্তু সে উচ্চারণ করল না। 'ঈশ্বর' শব্দটা উচ্চারণ করার একটা বিশেষ সময় আছে, নইলে তো মানুষের মনে তরঙ্গ তোলে না। বরং শুনে মানুষ হেসে ওঠে, মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু কখনও কখনও এক-একটা বিশেষ সময় যখন মানুষ রেল লাইনের ঢালু জমিতে দাঁড়িয়ে থাকে রেলগাড়ির প্রতীক্ষায়, যখন জলপ্লাবনে ছেলে কোলে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়, কিংবা যখন—| তাই রমেন কথা বলে না। একটু হাসে মাত্র।

শাশ্বতী মুখ তুলে রমেনের উজ্জ্বল চোখ দু'খানা দেখল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনার কখনও চোখের অসুখ হয়নি?

না। বলে মাথা নাড়ল রমেন, তারপর একটু চুপ করে থেকে দুষ্টু ছেলের মতো হেসে বলল, কিন্তু একবার আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, কয়েক মুহূর্তের জন্য...কিন্তু ওই আপনার বাস এসে গেল।

বাসটা সামনে এসে দাঁড়াতেই কিন্তু শাশ্বতী পিছিয়ে গেল। বলল, বড্ড ভিড়।

রমেন একটু চিন্তা করে বলল, তা হলে চলুন রাসবিহারীর মোড় পর্যন্ত আপনাকে হেঁটে এগিয়ে দিয়ে আসি।

শাশ্বতীও তাই চায়। এ লোকটার সেই অন্ধ হয়ে যাওয়ার গল্পটা তাকে শুনতেই হবে। সদ্য চেনা একজন লোককে এতদূর খামোখা হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কেমন বেমানান তা তার মনেও হল না। বলল, বেশ হবে। চলুন। ওখান থেকে আমি যাদবপুর যাওয়ার বাস ফাঁকা পাব।

কিছুক্ষণ তারা নিঃশব্দে হাঁটল। ফুটপাথ নেই বলে রাস্তাটা বিপজ্জনক, অবিরল গাড়ি যাচ্ছে। রাস্তার দিকটায় রমেন, রাস্তার ধার ঘেঁষে শাশ্বতী। খানিক দূর হেঁটে শাশ্বতী হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়ে বলল, এবার সেই গল্পটা বলুন। সেই অন্ধ হয়ে যাওয়ার গল্পটা।

রমেন সামান্য একটু হাসল। বলল, রাস্তা একটু ফাঁকা পাই তারপর—

রেলব্রিজ পেরিয়ে যাওয়ার পর চওড়া সুন্দর রাস্তার ফুটপাথে উঠে এল দু'জন। শাশ্বতী এতক্ষণ কৌতূহল চেপে ছিল, এবার শ্বাস ফেলে বলল, এবার—

রমেন মাথা নেড়ে বলল, আমার ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর একদিন সন্ধেবেলা খেলাধুলো সেরে ফিরছি। আমাদের বাড়ির সামনের দিকটায় বিরাট হলঘরের মতো একটা বৈঠকখানা। সেই বৈঠকখানায় সন্ধের অন্ধকারে দেখি দাদু প্রকাণ্ড পিয়ানোটার পাশে বসে আছেন। হাতের আতসকাচ দিয়ে পিয়ানোর গায়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করছেন নিচু হয়ে। আমি তাঁকে টের পেতে না-দিয়ে পা টিপে টিপে বড় ঘরটা পেরিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময়ে দাদু খুব আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমি। দাদু একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে, যেন আমাকে কোলে নেবেন, এমনভাবে বললেন, রমেন! কাছে এসো তো। কাছে যেতেই উনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমার সামনে বোসো। আমি মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসলাম। দাদু আমার মুখ হাতে তুলে বললেন, দেখি রমেন, তোমার মুখখানা। আমার মুখের ওপর আতসকাচ ধরে দাদু অনেকক্ষণ ধরে আমার মুখ দেখলেন। তখনও ঘরে আলো দিয়ে যায়নি, ঘরটা অন্ধকার। আবছা একটু শেষবেলার আলোয় সেই আতসকাচের ভিতর দিয়ে আমি তাঁর দুটো প্রকাণ্ড চোখ, নাকের ওপর উঁচু হাড়, ঘন ভ্রূ আর কপাল দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হচ্ছিল সেই চোখ জোড়া আমার ভিতরে অনেকখানি দেখে নিচ্ছে। যখন আমার বয়স দশ কি এগারো, তখন আমি আমার প্রথম বয়ঃসন্ধির খারাপ স্বপ্নটি দেখেছি, আর একদিন, দুপুরবেলা অলি নামে একটি মেয়ে চোর-চোর খেলার সময়ে মুকুন্দর ঘানিঘরে অন্ধকারে লুকিয়ে আমাকে একটা চুমু খেয়েছিল, তখন আমার গালে একটি-দু'টি ব্রণ দেখা দিচ্ছে। তাই দাদুর সেই চোখ জোড়ার দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল তিনি আমার সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। আমার বুক কাঁপছিল। কিন্তু দাদু সেদিন আমাকে অন্যরকমভাবে দেখলেন। অনেকণ ধরে দেখে তিনি খুব স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলেন, রমেন, তুমি কি খুব বেশি কিছু চাও? খুব টাকা পয়সা, বড় জমিদারি, অনেক বাড়ি-গাড়ি? সে-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো তখন আমার বয়স নয়। দাদু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজে থেকেই বললেন, তুমি কখনও খুব বেশি কিছু চেয়ো না। লোকে যেন একদিন তোমাকে ভিখিরির পোশাকেও ঐশ্বর্যবান বলে চিনতে পারে। এই বলে দাদু আতসকাচ সরিয়ে রাখলেন। জলভরা চোখ দু'হাতে মুছে নিয়ে একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন, চোখ বড় মায়ার সৃষ্টি করে। এই ঘটনার পরদিন দাদু দুপুরবেলা একা একা ছাদে উঠে গেলেন। তারপর আতসকাচের ভিতর দিয়ে ভরদুপুরের সূর্যের দিকে চেয়ে দেখলেন। তার দুটো চোখই একদম নষ্ট হয়ে গেল। এই ঘটনায় আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তার ওপর আমার মা মাঝে মাঝে আমাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন আমি চোখে কীরকম দেখি। আমি ভালই দেখতাম, তবু মা'র সন্দেহ যেত না। জিজ্ঞেস করতেন, ওই যে

ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে নৌকোটা যাচ্ছে— বল তো ওটা কী নৌকো; কখনও বা জিজ্ঞেস করতেন, ওই যে ছাদে একটা টিকটিকি— ওটাকে দেখতে পাচ্ছিস? এতে আমার ভয় আরও বেড়ে যেত। তখন আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম যে একদিন আমিও আস্তে আস্তে অন্ধ হয়ে যাব। তাই তখন আমি গোপনে গোপনে একটা কাজ শুরু করলাম। গোপনে আমি চোখ বুজে হাঁটতাম, দিক ঠিক করার চেষ্টা করতাম। যদি কোনও দিন সত্যিই অন্ধ হয়ে যাই তবে যেন হঠাৎ মুশকিলে পড়তে না হয়। এই চেষ্টা আমি এমন প্রাণপণে করতাম, এমন প্রাণের টানে যে হোঁচট খেয়ে পড়লে, কিংবা কোনও কারণে ভয় পেলেও চোখ খুলতাম না। আমার এই কাজের সঙ্গী ছিল উদ্ধব নামে আমাদের এক চাকর। সে আমাকে গাড়ি করে অচেনা জায়গায় নিয়ে যেত, তারপর আমার হাত বেঁধে চোখে রুমাল জড়িয়ে ছেড়ে দিত, তারপর দূরে কোথাও লুকিয়ে থেকে একবার মৃদু একটা শিস দিয়েই চুপ করে যেত। আর আমি সেই শব্দটুকু মনে রেখে দিক নির্ণয় করে ঠিক ওকে খুঁজে বের করতাম। তারপর আস্তে আস্তে আমি এ-খেলায় এত পাকা হয়ে গেলাম যে একা একা আমাদের বাড়ির পাঁচিলের ওপর দিয়ে চোখ বুজে দ্রুত হাঁটতে পারতাম। উদ্ধব আমাদের বাড়ির বাইরের মাঠে দুরে একটা ব্ল্যাকবোর্ডে বৃত্ত এঁকে তার পিছনে দাঁড়িয়ে শিস দিত, আমি এয়ারগান দিয়ে চোখ বুজে সেইখানে ঠিকঠাক গুলি করতাম। এইভাবেই আমার যখন চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার আর কোনও ভয় নেই। এবার আমি আমার অন্ধকার দিনগুলোর জন্য প্রস্তুত। সেই সময়েই একদিন ঘটনাটা ঘটল। আমি রোজ খুব ভোরে উঠে ফুটবল নিয়ে দৌড়তে যেতাম মাঠে। বলটা মাটিতে গড়িয়ে দিতাম, তারপর পায়ে পায়ে বল নিয়ে মাঠের চার দিকে চক্কর। অন্ধকার থাকতে আমার দৌড় শুরু হত, মাঠটাকে পাঁচ কি ছ'বার পাক দেওয়ার পর আলো ফুটত। রোজই এ-রকম হত। একদিন খুব ভোরে উঠে দৌড়োতে গেছি, পায়ে বল, দৌড়তে দৌড়তে পাক খাচ্ছি মাঠের চার দিকে, ক্রমে ক্রমে এক দুই করে সাত আট দশ বার মাঠটা ঘুরে এলাম। কিন্তু সেদিন ভোর হচ্ছিল না। অন্ধকার জমাট বেঁধে রইল। কিন্তু সেদিকে আমার খেয়াল ছিল না, আমি বিভোর হয়ে দৌড়তাম এবং প্রায়ই সে সময়ে আমার চোখ বন্ধ থাকত। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে আমার পা থেকে বলটা একটু জোরে গড়িয়ে গেল আমার আয়ত্তের বাইরে। আমি থেমে চোখ খুলে বলটাকে খুঁজতে গিয়ে দেখি চার দিকে নিরেট ঘুটঘুটি অন্ধকার। মাটির দিকে চেয়ে দেখি জমাট অন্ধকার, আকাশের দিকে চেয়ে দেখি চাঁদ তারা কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, চার দিকে চেয়ে দেখি কোনওখানে কোনও আলো নেই, ঝাপসা গাছপালা নেই। কিছু নেই। আমি চোখের কাছে তুলে আমার সাদা হাতটাকে দেখার চেষ্টা করলাম, দেখলাম কিচ্ছু নেই। মনে পড়ল আমি মাঠটাকে অন্তত দশবার পাক দিয়েছি, তবু সেদিন ভোর হয়নি। আমি এক জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি যে চোখ বুজে হাঁটতে শিখেছিলাম, কিংবা শিখেছিলাম দিকনির্ণয় করার কৌশল সে-সব কিছুই এখন আমার মনে পড়ল না। আমার সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল ভয়ে। আমি আর এক পাও এগোবার সাহস পেলাম না, দিকনির্ণয় করতে আমার ভয় হল, যদি ভুল পথে চলে যাই? তাই তখন আমি খুব অসহায়ভাবে আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসলাম। আমার চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল। খুব তুচ্ছ কারণেই তখন আমি কাঁদছিলাম। কখনও হারানো বলটির জন্য, কখনও অলি নামে মেয়েটির জন্য, কখনও বা ঘরে যাওয়ার মেঠো পথটির জন্য। আমি কি আর কখনও কিছুই দেখব না? এতকাল ধরে আমি যা-কিছু দেখেছি, কিংবা যা-কিছু আমার দেখা হয়নি আমি সেই সবকিছুর জন্য কাঁদছিলাম। এইভাবে অলীক, অসম্ভব কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। এর আগে আমি কখনও ভগবানকে

ডাকিনি, ডাকার দরকার হয়নি বলে। যুদ্ধের সময়ে বন্দুক আর গাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে বলে দশ- বারো বছর বয়সে বন্দুক চালাতে শিখোছলাম, তেরো বছর বয়সে শিখেছি গাড়ি চালাতে, পনেরো-ষোলো বছর বয়সে শিখে গেছি কী করে চোখ বুজে চলতে হয়। আমি তো সবকিছুর জন্যই নিজের ওপর নির্ভরশীল, তবে ভগবানকে আমার কী দরকার? যে নিজে নিজে চলতে পারে তার ভগবান দিয়ে কী হবে? তাই সেই অদ্ভুত সময়ে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে মাঠের মধ্যে বসে থেকে যখন আমি ভগবানের কথা ভাবতে চেষ্টা করলাম তখন তাঁর কোনও চেহারাই আমার মনে এল না। তবু আমি আকুল হয়ে বললাম, রক্ষা করো, আমাকে রক্ষা করো, আমার চোখ ফিরিয়ে দাও। সেই আকুলতার মধ্যে বোধ হয় একটা কিছু ছিল, আমার মনশ্চক্ষে ভগবানের একটা চেহারা ভেসে উঠল। কেমন জানেন? সেই আতসকাচের ভিতর দিয়ে আমি দাদুর মুখ যে-রকম দেখেছিলাম অনেকটা সেই রকম। সে যেন দাদুর মতোই আমার প্রিয় কেউ, যে আমায় বড় ভালবাসে, সে যেন একটা আতসকাচের ভিতর দিয়ে নিবিড় ভালবাসায় শেষবারের মতো আমার মুখখানা দেখে নিচ্ছে। যেন বলছে, আহা, তুমি কি আমার রমেন! আমার রমেন! দেখি তোমার মুখখানা। অনেকটা দাদুর মতোই তার মুখ। পাহাড় পর্বত সমুদ্র আর গাছগাছালি রয়েছে, সেইখানেই রয়েছে আকাশ। এ-রকম কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেলে শীতের উত্তুরে হাওয়া হু হু করে বয়ে গেল, গাছপালায় চার দিকে সেই বাতাসের শব্দ হল। সেই বাতাসটাই আমার কোলের কাছে গড়িয়ে আনল আমার হারানো বল। আমি দু' হাতে বুকে তুলে চেপে ধরলাম বলটা। চোখ চেয়ে দেখলাম চার দিকে আলোয় আলো, আর সূর্য উঠছে।

শাশ্বতীর পা কখন থেমে গিয়েছিল। সে মুখ তুলে খাস চেপে জিজ্ঞেস করল, সত্যি?

রমেন ম্লান হাসল আবার। বলল, সত্যি।

আপনি কাউকে এ-গল বললেন না?

আমি দাদুকে এই ঘটনার কথা বলেছিলাম। দাদু তখন ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধ, তাই আমার বিশ্বাস ছিল দাদু সেই ঘটনাটা অবিশ্বাস করবেন না। তাই সেদিন সন্ধেবেলা দাদু তাঁর আহ্নিক সেরে এসে যখন বড় ঘরটায় আরাম-কেদারায় বসেছেন তখন আমি তাঁর পাশে মেঝেতে বসে সকালের ঘটনার কথা বললাম। শুনে দাদু আমার মাথায় নীরবে অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে দিলেন। টের পেলাম তাঁর হাত থরথর করে কাঁপছে। সেজবাতিটা কমিয়ে দেওয়া ছিল, তবু সেই অল্প আলোতেও দেখলাম তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, ভগবানের কথা ভাবতে গিয়ে তুমি কেন একজন মানুষের কথাই ভাবলে রমেন? ভগবান কি মানুষ? আমি এর উত্তর দিতে পারলাম না। কিন্তু মনে মনে ভেবে দেখলাম, সত্যিই তো, ভগবান যদি মানুষের মতোই দেখতে হয় তবে আর সে ভগবান কীসের? তবু আমি মুখে বললাম, মানুষ হলেও সে খুব প্রকাণ্ড মানুষ! ওই আকাশ পর্যন্ত তার মাথা, আর তার চোখের মধ্যে যেন পাহাড় সমুদ্র এ-সব রয়েছে! শুনে দাদু হেসে বললেন, মানুষ প্রকাণ্ড হলেই কি ভগবান হয়? প্রকাণ্ডতাই যদি ভগবানের গুণ তবে তুমি আকাশ, কিংবা পাহাড় কিংবা সমুদ্র— কিংবা এ-সব যা-কিছু মিলিয়ে যে প্রকাণ্ড চরাচর তাকে ভগবান ভাবলে না কেন? কিংবা তুমি তো ভাবতে পারতে যে তিনি এ-সবের অতীত একটা শক্তি। দাদুর এই কথা শুনে আমি ভেবে দেখলাম যে তা হয় না। পাহাড় আকাশ কিংবা সমুদ্র কী করে ভগবান হবে? তারা কি আমার কথা শুনতে পেয়েছিল? তাদের কি মন আছে যে আমার কথা বুঝবে? তা ছাড়া আমি তার যে-মুখ দেখেছিলাম তা অনেকটা দাদুর মতোই, যিনি আমাকে খুব ভালবাসেন। আমি

সেই কথাই দাদুকে বললাম। তখন দাদু আর হাসলেন না, গম্ভীরভাবে চুপ করে রইলেন। তারপর এক সময়ে বললেন, রমেন, অনেকদিন আগে ভগবান বলেছিলেন যে তিনি বার বার পৃথিবীতে আসবেন। যদি সে-কথা সত্যি হয় তবে এটা ঠিক যে তিনি বার বার পৃথিবীতে আসছেন। হয়তো এখন এ মুহূর্তেও তিনি আছেন পৃথিবীতে। কিন্তু মানুষ সে-কথাটা বিশ্বাস করে না বলেই তাঁকে কখনও খুঁজে দেখে না। কিন্তু তুমি খুঁজে দেখো। তুমি তাঁর কথা মানুষকে বোলো। বোলো যে তুমি তাঁর কাছে যাবে। তা হলে কেউ-না-কেউ একদিন ঠিক তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে।

রুদ্ধশ্বাসে শাশ্বতী জিজ্ঞেস করল, তারপর? আপনি কি তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন?

রমেন সে-কথার উত্তর দিল না। বলল, কিন্তু আমরা কোথায় এসে পড়েছি দেখছেন?

শাশ্বতী দেখল, রাসবিহারী মোড়। তার মন খারাপ হয়ে গেল। বলল, আপনার অনেক দেরি করিয়ে দিলাম।

রমেন মৃদুস্বরে বলল, দেরি হয়নি তো?

তারপর শাশ্বতীকে একটা ডবলডেকারে তুলে দিয়ে রমেন ফিরল।

একত্রিশ

আজকাল সঞ্জয়ের গাঢ় একরকমের ঘুম হয় রাতে, কিন্তু তৃপ্তি হয় না। মাঝে মধ্যে উঠে দেখে সাতটা সাড়ে-সাতটা বেজে গেছে। খুব আশ্চর্য হয়ে যায় সে। এ-রকম তো কখনও হত না! ছ'টার মধ্যে তার ঘুম ভাঙবেই। সে নিয়মের অনুশাসন মেনে চলা মানুষ।

বিরক্ত হয়ে সে রিনিকে জিজ্ঞেস করে, সকালে ডেকে দাওনি কেন?

কত ডেকেছি! তুমি কেবল উঁ-উঁ করে এ-পাশ ও-পাশ ফিরলে।

শরীরটা বুড়িয়ে গেছে বোধহয়। পায়ে পায়ে জড়তা আর আলসেমির ভাব। বিছানা ছাড়ার পর কোনও দিনই ঘুমের জড়তা থাকে না তার। কিন্তু আজকাল শরীর পালটাচ্ছে।

অফিসে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় পানের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল সঞ্জয়, জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট ধরে রইল। দোকানদারই দৌড়ে এল এক প্যাকেট সিগারেট হাতে।

গাড়ি আবার ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে দেখল বাস-স্টপে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ-চেনা মেয়ে, একসময়ে একই এক্সপ্রেস বাসে অফিসে গেছে। গাড়িটা দিয়ে তাকে প্রায় ঢেকে ফেলল সঞ্জয়। চোখে চোখ পড়তেই হাসল, চলুন, পৌঁছে দিচ্ছি।

মেয়েটি একটু অবাক হয়। এই প্রথম আলাপ। কিন্তু একসময়ে বাসে অফিস-যাওয়ার একঘেয়ে দূরত্বটুকু সঞ্জয় পার হত এই মেয়েটার দিকে চেয়ে থেকে। মেয়েটা প্রথম-প্রথম চোখ সরিয়ে নিত। তারপর মাথা নিচু করে লজ্জার ভান করেছিল কিছুদিন। তারপর একদিন— কবে থেকে যেন— চোখে চোখ রাখতে শুরু করল। চমৎকার সময় কেটে যেত। খেলা-খেলা একটা ব্যাপার—প্রেমের মতোই—অথচ প্রেম নয়— এরকমই একটা ব্যাপার।

বহুদিন হয় সঞ্জয়কে আর খুঁজে পায়নি মেয়েটা। আজ গাড়িসুদ্ধু দেখে খুব অবাক হল। ভদ্রলোক কোনও দিন কথা বলতে সাহস করেনি তার সঙ্গে, কিন্তু এখন গাড়ি হওয়াতেই বোধহয় সাহস বেড়েছে। মেয়েটি ইতস্তত করে বলল, বাসেই যেতে পারব।

দুর! আসুন না।

বাঁ হাতে সামনের দরজাটা খুলে ধরে সঞ্জয়। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসে।

শরৎকালের মতো ঋতু নেই। এমন উজ্জ্বল রোদ! সেই আলোতে মেয়েটি বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে। সুডৌল সুন্দর মুখখানা, নাকে একটা পাথর বসানো নাকছাবি ঝিকিয়ে উঠেছে। ডান হাতে সাদা ব্যাগ, বাঁ হাতে ভাজ করা রোদ-চশমা। ভাগ্যিস চশমাটা পরেনি! অমন সুন্দর চোখ দু'খানা, তাতে ভয়, সংশয় আর ইচ্ছার যে খেলাগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো দেখাই যেত না।

মেয়েটি উঠে এল। গাড়ি ছেড়ে দিল সঞ্জয়।

নিঃশব্দে বসে থাকে মেয়েটি, অস্বস্তি বোধ করে বোধ হয়। সঞ্জয় সেদিকে তাকালই না, আলতো হাতে স্টিয়ারিং ধরে অলস ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে গতি বাড়িয়ে দিচ্ছিল সে। মেয়েটি একপলক তাকে দেখল

নিঃশব্দে। এতকাল কোথায় ছিলে তুমি? তোমাকে কত খুঁজেছি!

ট্রাফিক জংশনে লাল আলো দেখে সঞ্জয় গাড়ি থামায়। সিগারেটের প্যাকেট খুলতে খুলতে মেয়েটির দিকে তাকায়। না, মেয়েটির শরীর কিংবা মুখ দেখে না। কেবল সিঁথিটা লক্ষ করে। সিঁদুরের চিহ্ন নেই। লুকোয়নি তো! ঠোঁটে আবছা লিপস্টিক, কপালে টিপ নেই। কিছুই বুঝতে পারে না সঞ্জয়। আজকাল বাঙালি মেয়েরা জনসাধারণকে ফঁকি দিতে শিখেছে! সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে, কোথায় আপনার অফিস?

নিউ সেক্রেটারিয়েটের কাছে, ম্যাককারিয়ন।

ঝামেলা। এখন আবার সেই নিউ সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত গিয়ে তারপর পার্ক স্ট্রিটে ঘুরে আসতে হবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। সঞ্জয় ঘড়ি দেখল। এখন মিনিট পনেরো সময় আছে, কিন্তু তাতে হবে না। এখন পর্যন্ত এই অফিসে তার একদিনও দেরি হয়নি! যদি হয়, আজই প্রথম হবে। এই মেয়েটির জন্যই। তা ছাড়া আজ সকাল সাতটায় উঠেছে সে। সময় ছিল না বলে দাঁত ঠিক মতো ব্রাশ করা হয়নি, গালে ক্ষুর পড়েনি ঠিকমতো, হাত দিলে খরখর করছে। অগোছালো হয়ে আছে সে। খামোখা জিজ্ঞেস করল, চাকরি করেন?

হুঁ।

কোন ডিপার্টমেন্ট!

পাবলিসিটি।

তাকে কথা শেষ করতে দেয় না সঞ্জয়। বলে, আমাকে আপনার মনে আছে?

বাজে কথা ছেড়ে চট করে কাজের কথায় চলে আসে।

মেয়েটা লজ্জা পায় বোধ হয়। উত্তর দেয় না।

হাজরার মোড় পেরিয়ে সঞ্জয় গাড়ি ছোটায়। গতি বাড়াতে থাকে। যদি সময়টাকে বাঁচানো যায়!

মেয়েটা বলল, গাড়ি কিনলেন!

ওই একরকম কেনাই।

খুব সুবিধে এখন, না? বাসে যা ভিড় বাড়ছে দিন দিন।

সঞ্জয় মৃদু হাসল। বলল, যখন গাড়ি ছিল না তখন একদিনও লেট হয়নি। আজই প্রথম লেট হবে বোধ হয়।

গাড়ি কি অনেক দিন কিনেছেন? বহু কাল আপনাকে দেখি না তো! বোধ হয় বছর খানেক—

না। গাড়ি তো সদ্য হল। মাঝখানে কিছু দিন ট্যাক্সিতে যেতাম।

মেয়েটা বলে, বেশ গাড়িটা। ছোটখাটো, কোজি—

ঘুরেফিরে গাড়ির প্রসঙ্গ। সঞ্জয়ের বিরক্তি লাগে। আমাকে দেখছ না কেন সেই আগের মতো? তখন একশো জনের চোখের সামনে বিহ্বল হয়ে দেখতে, এখন একা গাড়িতে আমরা দু'জন, তুমি কেবল গাড়িতে মনোযোগ রেখেছ। গাড়িটা কি আমার চেয়েও বেশি।

সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে, কোথায় থাকেন?

পণ্ডিতিয়া। আপনি?

হিন্দুস্থান পার্ক।

মেয়েটা একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করে, একা?

সঞ্জয় মিটমিটে ডানের মতো হাসে। মাথা নেড়ে বলে, না, আমার লোকজন আছে।

মেয়েটা ঠিক বুঝতে পারে না লোকজন কথাটার মানে কী। মেয়েটাকে ভাবতে দেয় সঞ্জয়, নিজের থেকে সে বলবে না যে তার রিনি আর পিকলু আছে। মেয়েটা সারা দিন ভেবে যাক। কেন আমি বলব? তোমরা কেন আজকাল সিঁদুর লুকোও। কেন জনসাধারণকে ফাঁকি দাও? এই যে আমি তোমার সাদা সিঁথে দেখেও কিছুতেই সিওর হতে পারছি না, যেমন আজকাল রিনিকে দেখেও বাইরের লোকজন বুঝতে পারে না—এই যন্ত্রণা কেন দাও?

ঘড়ি দেখে সঞ্জয়। মেয়েটাকে গাড়িতে তোলা ভুল হয়েছে। একদম ভুল। চৌরঙ্গি দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, সে এই মাত্র সার্কুলার রোডের ক্রসিং পেরোল। ঘড়িতে আছে আর মাত্র ন'-দশ মিনিট সময়। সে কেন গাড়িতে তুলে নিল মেয়েটাকে! হ্যাঁ, কেন তুলেছিল? কী উদ্দেশ্য তার? বুঝলে অচেনা মহিলা, মেয়েদের আমরা মাত্র একটিই ব্যবহার জানি। মাত্র একটিই। তোমাকে আমার গাড়িতে কেন তুলেছি তা চোখ বুজে একটু ভাবলেই দেখা যায়, দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত দেখা যায়। আমি রোজ ওই বাস-স্টপে গাড়ি থামাব, তুলে নেব তোমাকে। তারপর আস্তে আস্তে...। আমি অতদূর চরিত্রহীন। বুঝলে! কিন্তু একটা সময়ে আমার গোটাকয় জিনিস ছিল — সততা, নিষ্ঠা, কর্মক্ষমতা। আমি শূন্য থেকে বোস অ্যান্ড কোম্পানি তৈরি করেছিলাম। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভিখিরির মতো ঘুরেছি, ঝুলিতে ছিল ওই তিনটে জিনিস। ওই তিনটে জিনিসই আমাকে সব দিয়েছে, তারপর তারা ঝরে গেছে আস্তে আস্তে। শেষটা ছিল কর্মক্ষমতা। কাল পর্যন্তও ছিল সেটা। আজ সকাল সাতটায় ভেঙেছে ঘুম, দেরিতে যাচ্ছি অফিসে, শরীর ছেড়ে দিচ্ছে আলসেমিতে। শেষ গুণটাও ছেড়ে যাচ্ছে আমাকে। আর কী চাই! দুর রে!

এসে গেছি। ম্যাককারিয়নের অফিস এই তো দেখা যাচ্ছে। কাল আবার দেখা হবে কী বলো? জানি তো, একদিন অসময়ে গার্ড নিশান উড়িয়ে গাড়ি ছেড়ে দেবে, প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকবে গাঁটরি, খামোখা ভেবে কী হবে বলো! তার চেয়ে আমাদের ঘন ঘন দেখা করা ভাল।

দুপুরে ফোন করেছিল সঞ্জয় ম্যাককারিয়নের মুখার্জিকে। অনেক কালের চেনা লোক।

আরে মশাই, আপনাদের পাবলিসিটিতে একটা মেয়ে আছে না! নাকে নাকছাবি?

ওঃ, মিস দাশগুপ্ত!

মিস। আর ইউ সিওর যে মেয়েটা মিস?

মুখার্জি হাসে, কী ব্যাপার?

কিছু না। শুধু জানতে চাইছিলাম যে মেয়েটা সত্যিই মিস কি না, আজকাল তো বোঝাই যায় না...

জেনেই বা লাভ কী? মিস হলে সুবিধেটা কোথায়? ওর অনেক ভক্ত।

আমার এক শালা সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছে— ইঞ্জিনিয়ার, ভাবছিলাম তার সঙ্গে সম্বন্ধ করলে কেমন হয়! ভক্তের কথা কী যেন বলছিলেন?

মুখার্জি গলার ঠাট্টার ভাবটা পালটে বলে, না, ও কিছু না। মেয়েটা সত্যিই ভাল। কাউকে পাত্তা দেয় না। দেখতে পারেন। আমি পরশু-টরশু আরও খোঁজ নিয়ে জানাব।

পরশু কেন? কাল— কালকেই জানাবেন।

কাল বাংলা বন্ধ্। মনে নেই!

ওঃ হোঃ। ঠিক আছে, তবে পরশুই—

ফোন রেখে দেয় সঞ্জয়।

আর কিছু না, মেয়েটাকে এর পরদিন তার নাম ধরে ডাকবে সঞ্জয়, মুখার্জি আর যা যা জানাবে সব বলে দেবে মেয়েটাকে। ভীষণ অবাক হয়ে যাবে মেয়েটা। খুশি হবে। ভাববে সে কত ইম্পর্ট্যান্ট সঞ্জয়ের কাছে। একটা মেয়েকে নষ্ট করা কত সোজা!

আজ যেন কেমন কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। দুটো লোক পরশু থেকে পেমেন্টের জন্য ঘুর ঘুর করছে। দুই-একটা সইয়ের ব্যাপার। কিন্তু তাও করল না সঞ্জয়। বলল, পরশু নেবেন।

কলমটা চোখের সামনে আড়াআড়ি তুলে ধরে অন্যমনে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। একটা প্রোডাকশন দেখতে যাওয়ার কথা ছিল হাওড়ায়। ওপরওয়ালাকে ইন্টারকম টেলিফোনে বলল, পরশু যাবে। সব পরশুর জন্য ফেলে রাখছিল সঞ্জয়। বহুকাল পর আজ তার দুপুরে একটু ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।

নাকে নাকছাবি পরা একখানা মুখ হঠাৎ লক্ষ মানুষের ভিড় থেকে তাকে গেঁথে তুলছে। মেয়েদের মধ্যে একটা কিছু আছে, একটা রহস্যময় কিছু। অন্তর্বাস খোলার পর যা দেখা যায়, বা স্পর্শে টের পাওয়া যায় সেটুকুই সব নয়। হলে কারও জন্যই কারও এত স্পৃহা থাকত না। রিনি কি কিছু কম দিতে পারে? তবু কেন যে মনে হয় রিনির যা পেয়েছে তার অনেক বেশি রিনির আছে— যা তাকে দেয়নি। মাঝে মাঝে দেখা যায় রিনি বাবু হয়ে বসে পিকলুকে কোলে নিয়ে ঝুঁকে ওর মুখ দেখছে, পিকলু হাত পা ছুড়ে প্রবল ঔ-ঔ শব্দ করছে। তখন সমস্ত শরীর জুড়ে যে নম্র এক মা ফুটে ওঠে রিনির—ওটা, ওটুকুই কি মেয়েদের রহস্য? বোধ হয় চিরকাল প্রকৃতির সঙ্গে মেয়েরা গোপন ষড়যন্ত্র করে আসছে, ঠকাচ্ছে পুরুষদের! তাদের যেটুকু দেওয়ার —সেইটুকু, সেই তুচ্ছ শরীরটুকু সামনে ছুড়ে দিয়ে গোপন করছে মূল্যবান কিছু। পুরুষেরাও এর বেশি মেয়েদের বোঝে না। কিন্তু সে কেবল অতৃপ্ত থেকে যায়। যেমন রিনির কাছে না-পেয়ে সঞ্জয় এখন অফিসের কাজ ভুলে নাকছাবি পরা একটা মেয়ের মুখ ভাবে। কিন্তু পাবে কি সঞ্জয়! পাবে না। আরও পাগল-পাগল লাগবে, আরও খুঁজে দেখতে ইচ্ছে করবে। বারবার অন্তর্বাস ছিঁড়ে ফেলে সেই একই অতৃপ্তি। না হে, এখানে নেই। এইরকম অতৃপ্ত থেকে যায়, মানুষ বলে— আমি ঠিক এ-জিনিস চাইনি, আরও কিছু—আরও কিছু যেন ছিল পাওয়ার। কী সেটা? ধরি ধরি করেও ধরা যায় না। যেমন রমেন। কী দরকার ছিল ওর সন্ন্যাসী হওয়ার? ইরা এমন কী মেয়ে ছিল? কিছু না। তবু বোধ হয় রমেনের মনে হয়েছিল, তাকে ঠকিয়ে কী যেন নিয়ে গেল ইরা, হয়তো তাকে দিল না, অন্য পুরুষকে দিল। এই আক্ষেপ, এই ক্ষোভ পুরুষকে পাগল করে দিতে পারে। রমেন তো পাগলই হয়ে গিয়েছিল। সঞ্জয় কতবার রিনিকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছে, তোমার স্বরূপ কী? রিনি ঘুমকাতুরে গলায় সাজিয়ে বানিয়ে বলেছে, তুমি। সঞ্জয়ের হাসি পেয়েছে, তুমি আর আমি কি এক!

কে জানে এখন রিনির গিটার শেখার মাস্টার এসেছে কি না! কী করছে এখন রিনি? সঞ্জয়ের মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সে-ই গিটারের মাস্টার হয়ে রিনির কাছে যায়, কিংবা পিকলু হয়ে দেখে নেয় রিনির স্বরূপ। কী ভাবে যে দেখা যাবে কে জানে!

নাকছাবি পরা ওই মেয়েটা, ওর কী আছে? ওকে নিয়েই বা কী করবে সঞ্জয়? তবু ওকে ফাঁদে ফেলার অনেক উপায় আছে সঞ্জয়ের হাতে। ম্যাককারিয়নের অবস্থা ভাল না, যে-কোনও সময়ে উঠে যেতে পারে কোম্পানি. ওখানকার কর্মচারীরা কেউ স্বস্তিতে নেই। সঞ্জয় জানে। ওই রন্ধ্রপথে ঢোকা যায়। না, কিছুই করবে না সঞ্জয়, কেবল এই আলসেমিটুকু কাটানোর জন্য, এই একঘেয়ে টাকা-রোজগার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য একটু টিজ করবে—

কিংবা তাই কি? সে কি একটি মেয়েকে নিয়ে আজ খুব বেশি ভাবছে না?

ঘরে একা ছিল সঞ্জয়। হঠাৎ দুটো আঙুল গোল করে জিবের তলায় দিয়ে তীব্র সিটি দিয়ে উঠল। একবার দু'বার তিনবার। শরীরে ঝাঁকি লাগে। মনে ঝাঁকি লাগে। সে গাছের মতো ঝড়ের হাওয়ায় দোলে।

বেয়ারাটা হঠাৎ ফ্লাশ ডোর ঠেলে ঘরে ঢোকে। স্লিপ রেখে দাঁড়ায়। সঞ্জয় দেখে স্লিপের ওপর সুন্দর বাংলা হরফে লেখা— রমেন।

কে রমেন! কোন রমেন!

আর-কিছু মনে পড়ার আগে তার কেবল মনে পড়ে যে রমেন তার কাছে টাকা পায়। দু' হাজার টাকা।

মনে পড়তেই একটু চমকে ওঠে সঞ্জয়। যেদিন আদিত্যর লাথিটা লেগেছিল তলপেটে সেদিনও তার মৃত্যুর মুখোমুখি চার হাজার টাকার কথা মনে পড়েছিল। আশ্চর্য, আজকাল কেবল এইসব মনে পড়ে তার।

লোকটা ঘরে এলে সে অবাক হয়ে দেখে, সেই ভীষণ সুন্দর চেহারা, যার পাঞ্জায় বাঘের জোর ছিল, হরিণের মতো দৌড়ত একদিন যে ছেলেটা, সে এখন এমন একজন—যার গায়ে ফতুয়া, পরনে ধুতি, মিটিমিটি একটু হাসি লেগে আছে মুখে।

সঞ্জয় উঠে দু'হাত তুলে বলে, প্রজাপালক শ্রীমন্মাহারাজ রায় রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ভূপ বাহাদুরের জয় হোক।

রমেন হাসে। শান্ত চোখে চেয়ে থাকে।

সঞ্জয় ঝুঁকে বলে, মরিসনি! তুই মরিসনি তা হলে! দেখছি পৃথিবীতে আমার পাওনাদারদেরই আয়ু সবচেয়ে বেশি! হাসে সঞ্জয়। বলে, হোক। তবু আয় রমেন, আয়...

টেবিলটা ঘুরে গিয়ে সে দু'হাতে রমেনকে জড়িয়ে ধরে। হাসতে গিয়ে চোখে জল এসে যায় একটু। হারানো মানুষ ফিরে এলে পৃথিবীকে ভাল লাগে বড়।

একটু শ্বাস ছেড়ে সঞ্জয় বলে, আর এখানে না। চল কেটে পড়ি। আজ অফিস ভাল লাগছিল না একটুও। চল, রিনিকে দেখবি...পিকলুকে...

তাড়াহুড়ো করে গোটা দুই টেলিফোন করল সঞ্জয়। তারপর রমেনের হাত ধরে টানতে টানতে টপাটপ সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামল। চাবি দিয়ে গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বলল, চালাবি? চালা না!

রমেন স্মিতমুখে মাথা নাড়ে, আমার লাইসেন্স নেই যে!

কী করেছিস?

কোথায় হারিয়ে গেছে। দশ-বারো বছর গাড়ি চালাইনি।

কী জোর গাড়ি চালাত রমেন! হাওয়ায় উড়ত লম্বা চুল, ফরসা কপাল ঢেকে যেত চুলে, আর সুন্দর মুখে টেপা হাসি হেসে মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে সঙ্গীদের দেখত, কে কতটা ভয় পেয়েছে। দেখতে লজ্ঝরে ছিল

রমেনের গাড়িটা কিন্তু ইঞ্জিনকে রুপোর মতো ঝকঝকে রাখত রমেন। সে-সব গাড়িও আর নেই। সঞ্জয় এই ছোট গাড়িখানা নিয়েই কত ঝামেলায় আছে! রোজ একটা না একটা কিছু বদলাতে হচ্ছে, সারাতে হচ্ছে।

গাড়িটা বেচে দিয়েছিস? সঞ্জয় গাড়ি চালাতে চালাতে বলে।

না। রমেন মৃদুস্বরে বলে, কিছুই বেচিনি। সব পড়ে ছিল। পড়ে থেকে থেকেই বোধহয় ধুলো হয়ে গেছে।

খুব নিস্পৃহ গলা রমেনের। সেই নিস্পৃহতা সঞ্জয়কে আঘাত করে। সে শুনেছে কাশীপুরে রমেনদের বাড়িটা দখল করেছে উদ্বাস্তুরা। এ-সব ভাবলে কেমন বুকের ভিতরটা খামচে ওঠে। কত কষ্ট করে মানুষকে বাড়ি গাড়ি জিনিসপত্র করতে হয়! কত পরিশ্রম, কত ত্যাগস্বীকার, কত ব্যক্তিগত গুণের পরিবর্তে! কেউ সেগুলোকে ধুলোমাটি করে দিয়ে গেছে শুনলে মনটা গুড়গুড় করে। একেই কি সন্ন্যাস বলে? গাড়ি চালাতে চালাতে মুখ ফিরিয়ে একঝলক রমেনের মুখখানা দেখে সঞ্জয়। এই কি সন্ন্যাসী? খেলার মাঝখানে খেলা ছেড়ে চলে গেছে বলেই সন্ন্যাসী! রমেনের মুখে কিছুই দেখে না সঞ্জয়। কেবল দেখে একটু তৃপ্তি, শান্ত ভাব একটু, হয়তো বা একটু উদাসীনতা। তুই কি ঠকে যাসনি রমেন! বিনা কষ্টে সব পেয়েছিলি, আর আমাকে দ্যাখ—কত লাথিগুঁতো খেয়ে কতটুকু করেছি। আর তার জন্য দিয়ে দিয়েছি ঐশ্বর্যের মতো সব ব্যক্তিগত গুণগুলি! এটুকু সুখের জন্য মানুষ কত দেয়! আর তুই অনায়াসে সব পেয়ে ঠকে যাসনি তো রমেন! ঠিক জানিস তো!

হঠাৎ ফিস ফিস করে সঞ্জয় বলল, কী পেলি?

রমেন অন্যমনস্ক মুখ ফিরিয়ে বলল, অ্যাঁ!

কিছু না রে।

চুপচাপ কিছুক্ষণ গাড়ি চালায় সঞ্জয়। তারপর বলে, আমার কাছে কিছুদিন থাকবি রমেন!

কেন রে!

সঞ্জয় ক্লিষ্ট হেসে বলে, তোর কাছে কতগুলো জিনিস শিখে নিতাম।

কী?

চোখ বুজে তোর সেই হাঁটা, কতবার ইচ্ছে হয়েছে ও-রকম হাঁটি। পারিনি। কিংবা প্রজাদের ওপর তোর ওই ইনফ্লুয়েন্স, কী মারাত্মক হিংসে করতুম আমরা! কিংবা তোর সেই আশি-নব্বুই মাইল স্পিড়ে গাড়ি চালানো, তোর দৌড়, তোর সাঁতার—সব শিখে নিতুম। আর শিখতুম, কী করে হঠাৎ সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হয়!

রমেন! নামটা শুনে রিনি খুব অবাক হয়। সঞ্জয়ের কাছে সে অনেকবার শুনেছে এই নাম। তবে এই সেই রমেন! বউ পালিয়ে গিয়েছিল বলে যে সন্ন্যাসী হয়ে যায়! এই শান্ত, অসম্ভব সুন্দর, শক্তিমান স্বামীটিকে ছেড়ে কে এমন বউ আছে যে পালিয়ে যায়! বড় বোকা মেয়ে সে। বড় বোকা।

একটু হতভম্বের মতো রমেনকে দেখল রিনি। তারপর সংবিৎ পেয়ে বলল, আমি ওঁর কাছে শুনেছিলাম যে, আপনি আর কোনও দিন ফিরে আসবেন না। কিন্তু আপনার কথা শুনে আমার খুব ইচ্ছে করত আপনাকে দেখতে। মনে মনে চাইতাম, আবার আপনি ফিরে আসুন, আবার ঘরসংসার হোক আপনার—

হো-হো করে সঞ্জয় হাসে, দেখেছিস, দুধকলা দিয়ে সাপ পুষছি। ঘর করছে একজনের, আর ভাবছে আর-একজনের কথা।

রিনি লাল হয়ে ধমক দেয়, তোমার মুখের আটক নেই।

সঞ্জয় পিকলুকে নিয়ে আসে।

এই দ্যাখ পিকলু মহারাজ। ব্যাটা আমাকে মহা অপছন্দ করে। সুযোগ পেলেই গায়ে মুতে দেয়। তারপর বুকে চেপে ধরে সঞ্জয় পিকলুকে বলে, কেন রে বাটা, আমি তোর তুলসীগাছ?

শুনছেন? রিনি রমেনের দিকে চেয়ে অসহায় ভাবে বলে, একটামাত্র ছেলে আমাদের, তাকেও দিনরাত কুকুর বাঁদর বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। অথচ ছেলেটা কী লক্ষ্মী দেখুন, একটুও কাঁদে না!

রমেনের কোলে এসে হৌ-হৌ করতে থাকে পিকলু। রমেন ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে নেয়।

ঘুরে ঘুরে ঘরদোর দেখাল রিনি আর সঞ্জয়। সিঁড়ির দিকটায় দেড়তলায় একখানা একটেরে ঘর রয়েছে আলাদা। সেটা দেখিয়ে সঞ্জয় বলে, ওই ঘরটা ক'দিন আগে ভাড়া নিয়েছিলাম একটা স্টাডি করব বলে। আলমারি-টালমারির অর্ডারও দিয়েছিলাম। পরে একদিন ভেবে দেখলাম, আমি স্টাডি বানিয়েছি শুনলে বন্ধুরা হাসবে। তাই শেষ পর্যন্ত করলাম না। ঘরটা পড়ে আছে। তুই যদি থাকিস খুব আরামে থাকবি। দক্ষিণে জানালা আছে। যতদিন খুশি থাক। যতদিন খুশি। ঘরটা ছেড়ে দিলাম তোকে। থাকবি রমেন?

থাকুন না। রিনি মিনতি করে।

রমেন মৃদু হেসে মুখ নামিয়ে নেয়।

রিনি লুচি ভাজল, প্লেট ভরে সাজিয়ে দিল মিষ্টি, যত্নে তৈরি করে দিল ঘোলের শরবত। রমেন একটুখানি খেল মাত্র। বলল, ভাল খাবার না খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। এখন এ-সব সহ্য হবে না।

শুনে রিনির চোখ ছলছল করে। বলে, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

রমেন মিটিমিটি হাসে। বলে, একজন ডেকেছিল।

কে?

রমেন হঠাৎ চুপ করে চেয়ে থাকে। তার দৃষ্টি দূরে চলে যায়। অন্যমনে আস্তে আস্তে বলে, সে এমন একজন—এমন একজন—যে পৃথিবীকে খুব ভালবেসেছিল। ভালবেসে গলে গিয়েছিল। গলে গিয়েছিল মানুষের দুঃখ দেখে।

বলতে বলতে একটু আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল সে। তাই থমকে গেল হঠাৎ। এখনও সময় হয়নি। এখনও ঠিক সময় নয়!

সঞ্জয়ের মুখে একটু বিদ্রূপ আর অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠেছিল মাত্র, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল রমেন। আর বলল না।

রিনি কিন্তু চনমন করে ওঠে, বলুন না, বলুন না।

রমেন কেবল মিটি মিটি হাসে। প্রসন্নমুখে।

তার কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল পিকলু। পিকলুকে নেওয়ার সময়ে রিনি বলল, আপনি ওকে ভাল করে আশীর্বাদ করুন। আমাদের ওই একটিমাত্র। যেন বেঁচে থাকে।

বত্রিশ

পরদিন বাংলা বন্ ধ। বেলা করে উঠে বিভু তার নতুন কেনা টেরিলিনের শার্ট, টেরিকটনের গাঢ় রঙের প্যান্ট, তার ভারী সোলের জুতো জোড়া পরে নিল। এখন তার নাম হয়ে গেছে। কলকাতার গুন্ডা মহলে নাম করে নিচ্ছে বিভু। দুর্গাপুর থেকে ফিরে আসার পর আদিলের চায়ের দোকান থেকে খবরটা ছড়িয়ে গেছে। বিভুর একটা কেস বাড়ল। শরীরটা শক্ত হয়ে যায়, বুক ঠেলে ওঠে। সাফল্যের কেমন এক ধরনের আনন্দ আছে।

রোদ-চশমা পরে একটা টহল দিতেই পাড়ার আনাচকানাচ থেকে একজন দু'জন সঙ্গ নিতে থাকে। তোষামোদকারী। বিভু ডাঁটে হাসে। রাজার মতো হাঁটতে থাকে। কথা ছুড়ে দেয় এদিক ওদিক। বিভু মাস্তান।

আদিল এখন খাতির করে খুব। পর পর দু'বার চা খাওয়াল সবাইকে। সবসুদ্ধ বারো কাপ।

কত রে?

কী একটা হিসেব বলল আদিল, বিভু শুনলই না। পাঁচ টাকার একখানা নোট শূন্যে ছুড়ে দিয়ে বিভু জিজ্ঞেস করল, আজ হরতাল কীসের?

খাদ্য সমস্যা। কমিউনিস্টরা ডেকেছে।

কথাটা ভাল করে কানে গেল না বিভুর। সিগারেট ধরানোর সময়ে হঠাৎ তার মনে হল অনেকদিন হয় তার সঙ্গে হরতাল-টরতালের আর যোগাযোগ নেই। তবু যখন দেখা যায় হরতালের দিন সব অফিস-দোকান বন্ধ, কলকারখানার চাকি চলছে না, রাস্তায় গাড়িঘোড়া নেই তখন কেমন যেন বুক ভরে ওঠে। মিছিল দেখলে চনমন করে শরীর।

পাড়ার হরিশ তার পানের দোকানের একখানা তক্তা খুলে চোরের মতো সিগারেট বেচছে, সেখানে ভিড়। বিভু দলবল নিয়ে গিয়ে তার দোকান ঘিরল।

বন্ধ করে দে।

হরিশ ভয় পেয়ে বলে, বন্ধই তো। কেবল চেনা লোক দেখে দিচ্ছি—

না একদম বন্ধ। শালা দেশের লোক না খেয়ে আছে আর তুমি পয়সা লুটবে!

বিভুর সঙ্গীরা আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হাসে।

বিভু টহল মারে পাড়ায়। বড় রাস্তায় ফুটবল খেলা হচ্ছে, গলির মধ্যে ক্রিকেট। ওরা খেলুক ক্ষতি নেই। কিন্তু তেলেভাজার দোকান কেন খোলা? মিষ্টির দোকানের ভিতর থেকে কেন আসছে জিলিপির গন্ধ? বন্ধ, সব বন্ধ করে দে। দেশের মানুষ না খেয়ে আছে—

বিভুর গা গরম হয়ে যায়। বন্ধ, সব বন্ধ আজ।

দুর্গাপুরের লোকটা কোন দলের ছিল কে জানে! অত খবর বিভুকে দেয়নি ওরা। কিন্তু ব্যাপারটায় রাজনীতি আছে, বিভু জানে। টালিগঞ্জের শচে তাকে কাজটা ধরে দিয়েছিল। বলেছিল, তুই-ই যা, নতুন উঠছিস, হাত পাকবে। এখন সে-লোকটার বালবাচ্চা বউ কিংবা মা বাপ কাঁদছে হয়তো। ওরা তো জানে না বিভু আঠা দিয়ে বোমা বাঁধে, আঠা শুকোলে ছোট্ট আর কড়কড়ে হয়ে আসে মারাত্মক জিনিসটা, যত শুকোয় ততই যে-কোনও

সময়ে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়! এমনও হতে পারত যে বিভুর হাতেই ফেটে গেল বোমাটা, তখন কোথায় বিভু? বোমা তো আর কারও পোষা নয় যে, বিভুকে চিনে রাখবে! পরশুদিন গাড়ির সেই লম্বা লোকটা বলেছিল যে তাকে দেখলে নাকি মনে হয় তার কোনও প্রিয়জন মারা গেছে। কথাটা ঘুরিয়ে বলা; আসলে লোকটা বুঝতে পেরেছিল যে, বিভু খুনে। না, দুর্গাপুরের সেই লোকটা বিভুর প্রিয়জন ছিল না, শত্রুও নয়। কোন দলের যে তাও বিভু জানে না। তবু সে লোকটার জন্য তেমন দুঃখও নেই বিভুর। ভারতবর্ষে যদি এতদিনে তেমন কোনও যুদ্ধ হত তবে বিভু যেত সৈন্যের খাতায় নাম লেখাতে। কত অচেনা মানুষ মারা পড়ত তার হাতে। এও অনেকটা সে-রকমই, টাকা খেয়ে মানুষ মারা। তবে আর দুঃখ কীসের। নিজের মতো করে বিভুও একজন সৈন্য। কেবল একটা ব্যাপারেই খটকা লাগে তার। দুটো খুনের বেলাতেই সে সেই কবেকার ছেলেবেলার কেউটে-তাড়া-করা বিকেলের দৃশ্যটা দেখেছে। পিছনে আলের ওপর দাঁড়িয়ে একটা মুসলমান লোক লম্বা লাঠি তুলে তাকে সতর্ক করে দিচ্ছে, ভাইরে-এ-এ। কে ওই লোকটা? কেন সে দু'-দু'বার বিভুকে সাবধান করেছে?

ভাবতে ভাবতে মাথা কেমন ঘুলিয়ে ওঠে।

মৃদুলার বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে বিভু দেখে বাইরের ঘরে মৃদুলার বাবা ইজিচেয়ারে বসে আছে। আজকাল চোখে চোখ পড়লেই কেমন অসহায়ভাবে তাকায় লোকটা, বিড় বিড় করে ঠোঁট নড়ে। যেন বলে, আমাকে মেরো না। ক'দিনেই লোকটা বুড়িয়ে গেছে অনেক। দুশ্চিন্তা। মৃদুলার বিয়ের খবর পেয়ে দু'বার বুড়োটাকে ধরেছিল বিশুরা। বুড়ো ওদের পায়ে ধরেছে। বামুন! হায় ঈশ্বর! ক'দিন সারা রাত ঢিল পড়েছে ওদের বাড়িতে, সদরে ঢেলে দিয়েছে গু, সন্ধেরাত্রে ছোরার ওপর টর্চ ফেলে বাইরে থেকে ছোরা চমকে ভয় দেখিয়েছে। এত কিছুর পর বুড়োটা নিস্তেজ হয়ে গেছে। মৃদুলার ভাই আজকাল খুব ভয়ে ভয়ে রাস্তায় হাঁটে, তাদের মুখোমুখি হলে ভয়ে মুখ সাদা হয়ে যায়। দিনরাত এখন জানালা বন্ধ থাকে ওদের বাসায়। বিয়ের পর মৃদুলা আর আসেনি। ভয়! কিন্তু তাতে লাভ নেই, বিভু একদিন পেয়ে যাবে মৃদুলাকে। খোলা দরজাটার মুখোমুখি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ায় বিভু। বুড়োটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে—চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না—যেন সম্মোহিত।

বিভু একটু হাসল। তারপর দলবল নিয়ে হাঁটতে লাগল।

বড় রাস্তা দিয়ে জালে ঢাকা কালো একটা পুলিশ-ভ্যান চলে যাচ্ছে। আধখানা ইট তুলে নিয়ে বিভু ছুড়ে মারল, শালা! ঝং করে পিছনের জালে লাগল ইটটা। ভ্যানটা থামল না।

পালা, শালা, পালিয়ে যা। হারামি! এই রাস্তা দিয়ে কোনও গাড়ি চলবে না আজ। সব বন্ধ—সব—।

বিশু কানের কাছে মুখ এনে বলে, খামোকা হুজ্জত করিস না, তোর গন্ধ ছুটে যাবে চারধারে।

হ্যাঁ। বিভু জানে। গন্ধ ছুটবার আগেই তাকে পালাতে হবে। এইখানে বেহালার কোন কোণে বিভু-ফুল ফুটে উঠেছে তা টের পেতে মানুষের দেরি হবে না। ইতিমধ্যেই পাড়ার ভদ্রলোকেরা একবার জয়েন্ট পিটিশনের মুসাবিদা করেছিল বিভুর নামে। তার আগে ওসি-র সঙ্গে পরামর্শ করেছিল ওরা। বিশুরা হুজ্জত করে সেটা রুখেছে। কিন্তু ঠান্ডা থাকাই ভাল বিভুর। খুনের গন্ধ বহু দূর যায়। সারাজীবন গায়ে লেগে থাকে।

কিন্তু মাঝে মাঝে রক্ত গরম হয়ে যায়। ভাঙ শালা, সব ভেঙে ফেল। মাঝে মাঝে ডবল ডেকারে দশ নম্বর বা আটের বি কিংবা দু'নম্বর বাসে যেতে যেতে বড়লোকদের অন্দরমহল চকিতে চোখে পড়ে। কী সুন্দর পরদা

ওড়ে হাওয়ায়, কী সব বিছানা, কিংবা কেমন স্বপ্নের মতো আলো জ্বলে, কেমন বাগান! নিউ মার্কেটে ঘুরে বেড়ায় ছোট ব্লাউজ আর আঁচল-খসা শাড়ি পরা আপেলের মতো মেয়েরা। তাদের ঘুম-ঘুম চোখ। যেন এ-দেশের এ-জগতের কেউ নয়। নন্দীদের অ্যালসেশিয়ানটা প্রকাণ্ড গামলায় গম আর মাংসের ঝোল খাচ্ছে চকচক করে। ভুর-ভুর শব্দে চলছে এয়ারকুলার, ঠান্ডা ঘরে অকাতরে ঘুমোয় আগরওয়ালা। ভাঙ শালা, সব ভেঙে ফ্যাল। মার বোমা, উড়ে যাক কলকাতা। লুট করে আন ওই মেয়েদের, ভিখিরিদের ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যা ওই এয়ারকন্ডিশন ঘরের ভিতরে, সামনে সাজিয়ে দে রুটি-মাখন আপেলের টুকরো। ভাঙ শাল, ভেঙে ফ্যাল। মাঝে মাঝে রক্ত গরম হয়ে যায় বিভুর। ফুলের মালায় সাজানো প্রকাণ্ড গাড়িতে যাচ্ছে বর-বউ, বিভুর ইচ্ছে করে লাফিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। গাড়ি আটকে বলে, নামো, নেমে হেঁটে যাও। এইরকম কত কী ইচ্ছে করে বিভুর। ইচ্ছে করে সুভাষ বোস হয়ে পালিয়ে যেতে, ইচ্ছে করে অস্ত্রাগার লুট করতে ইচ্ছে করে ফাঁসির মঞ্চে উঠে গলায় দড়ি পরে 'বিদায় দে মা' কিংবা 'বন্দেমাতরম' গাইতে গাইতে মরে যেতে। কিন্তু বস্তুত শত্রুর দেখাই পায় না বিভু। ইংরেজ আমলে হিসেবটা সোজা ছিল, হিরো হওয়া কঠিন ছিল না। শত্রুরা ছিল চেনা। কিন্তু এখন কেবল মাথাটা ঘুলিয়ে যায় বিভুর। কে যে শত্রু তা বুঝতেই পারে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে বটে একজন-দু'জন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কি একজন-দু'জন নেতা-ফেতাকে শেষ করে আসি। কিন্তু তাতে কী লাভ? দু'-তিনটে দারোগা কি ম্যাজিস্ট্রেট মারলে কেউ তার প্রশংসা করবে না। নেতাকে মারলে নির্ঘাত জনতা তাকে লাথি মেরে শেষ করবে। এখন আর ক্ষুদিরাম হওয়া অত সহজ নয়। সুভাষ বোসও হওয়া যায় না আর। ছেলেবেলায় 'বন্দেমাতরম' বলে চেঁচালে কখনও-সখনও পুলিশ তাড়া করত, চনমন করে উঠত আশেপাশের লোকজন। কিন্তু এখন চেঁচালে লোকে ভেড়ার মতো তার দিকে একটু চেয়ে নিজের কাজে চলে যাবে। ঈশ্বরের বিধানে সবসময়েই তো আর শত্রুর গায়ের রং সাদা নয়। সবসময়ে চেনাও যাবে না তাকে যে মুখোমুখি লড়ে যাবে।

তবু বিভুর ভিতরটা খেপে ওঠে। পিচের ওপর আছড়ে ইট ভাঙে সে। মিত্তিরদের প্রকাণ্ড বাড়ির একতলায় বাথরুমে ঘষা কাচের সুন্দর জানালা বিভুর ইট লেগে মড়াত করে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে। 'কে? কে?' বলে কারা ছুটে আসে বারান্দায়। বিভু দৌড়ে চলে যায় অলিগলির মধ্যে, দু' হাত তুলে চেঁচায়, বন্ধ—আজ সব বন্ধ—সব বন্ধ করে দে। একটা ঝাঁপও যেন না খোলে!

রাস্তায় চলন্ত লোকজন দ্রুততর বেগে হেঁটে সরে যায়। বন্ধ হয়ে যায় বাড়িঘরের জানালার পাল্লা।

বিশু হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে তার কানের কাছে মুখ এনে বলে, তুই কি কমিউনিস্ট, না তুই কী? হরতাল তো তাতে তোর কী?

আমি! আমি! ঠিকঠাক জবাব দিতে পারে না বিভু। কিন্তু হঠাৎ ভিতরটা টগবগ করে ফোটে।

হুজ্জত করিস না। তোর এ-সবে মাথা গলানোর কী? তোর পকেটে টাকা আছে, তোর বাবার পয়সার অভাব নেই...

আই। বিভু দাঁড়িয়ে যায়। বাবা! বাবার কথাই মনে ছিল না। তিন-চারটে গোরুর দুধ আর তার সঙ্গে মিল্ক পাউডার, সয়াবিন আর কী-সব যেন মিশিয়ে তৈরি হয় দুধ, ছানা। কী এক অদ্ভুত উপায়ে টালিগঞ্জ খালপাড়ে চলে বাবার মিষ্টির দোকান। মনে পড়তেই ঝিমিয়ে যায় বিভু। এককালে বাবা দেশে নিজের হাতে চাষ করত। এখন অবস্থা ফিরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

যদি বাপকেই মারি ল হলেই কি শহিদ হওয়া যাবে? দূর! তাই কখনও হয়। লোকে থুথু দেবে গায়ে।

না, শত্রু চেনা এখন আর সহজ নয়। সকলেই সকলের শত্রু। মানুষ মারলে এখন আর বাহবা নেই। সেই ভোররাত্রে উঠে ঠান্ডা জলে স্নান করে গীতা পড়তে পড়তে হঠাৎ ফাঁসিতে চলে যাওয়া, জেলখানার বাইরে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার লোক কাঁদছে, ফিসফিস করে বলছে 'অমর শহিদ বিভু ঘোষ জিন্দাবাদ'—এ-রকম একটা ছবি স্বপ্নের মতোই থেকে যাবে। অলীক।

তার চেয়ে যদি কখনও যুদ্ধ হয়! বিভু চলে যাবে। তারপর ভয়ংকর লড়াইয়ের শেষে একদিন তার দেহ নির্জন নদীর ধারে পড়ে থাকবে, বুটসুদ্ধ পা দু'খানা অন্তর্জলিতে জল ছুঁয়ে আছে, মুখে হাসি—আমি দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছি।

শুনলে হা-হা করে হেসে উঠবে লোকজন।

না, ও-সব কিছু আর হবে না। বিভু আস্তে আস্তে ভাড়াটে হয়ে যাবে। শুধু গোপনে তার অন্তরে এক না-হওয়া শহিদের, বিপ্লবীর, দেশপ্রেমিকের রক্ত ফুট-ফুট করে ফুটে ফুটে ক্রমে শীতল হয়ে আসবে।

মৃদুলার বাড়িটাকে ভরদুপুরেও পোড়া বাড়ির মতো দেখায়। লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে যেন।

ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে বিভুর। খুব কাঁদতে ইচ্ছে করে। কোনও দিন বিভু একটা খুব মহৎ কাজ করে মরে যাবে। তার সেই কীর্তির কথা মৃদুলা যেন জানতে পারে, হে ভগবান! যেন তার জন্য মৃদুলাকে একদিন কাঁদতে হয়।

তেত্রিশ

কাল মাঝরাতে রিনি হঠাৎ ঠেলে তুলেছিল সঞ্জয়কে, শুনছ, আমার বড্ড ভয় করছে।

হুইস্কির গভীর আচ্ছন্নতা থেকে আঠায় লাগানো দু' চোখের পাতা খুলে সঞ্জয় বলে, কীসের ভয়! স্বপ্ন দেখেছ?

কী যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনল রিনি। বলল, ওই শোনো। এত রাতেও রাস্তায় কারা চিৎকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাবার চাইছে।

সঞ্জয় কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসে শুনল। এ তার চেনা চিৎকার। 'মা গো, মা গো' বলে গলিতে গলিতে, রাস্তায়, বড় রাস্তায় কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের গলার ওই অপার্থিব চিৎকার। কলকাতায় আজকাল প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। এর পাতকুড়ুনি। মানুষের রাতের খাওয়ার সময় পার হয়ে গেলে রাস্তায় বেরোয়।

রিনির ভিত সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে ঘুম-চোখেও সঞ্জয়ের হাসি পেল। বলল, এ তো রোজকার ব্যাপার। আজ নতুন করে শোনার কী?

রিনির মাথা নড়ে উঠল। ইয়ারিং ঝলসে ওঠে ম্লান আলোয়। বলল, রোজ শুনি। তুমি তো ঘুমোও, আমার যেন কেমন গায়ে কাঁটা দেয়, ঘুম আসে না। কত মেয়ে-মদ্দ রাত জেগে পথে পথে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে। বুকের মধ্যে কেমন করে।

সঞ্জয় হাসে।

রিনি বলে, হেসো না। এর আগে এত বেশি ছিল না। দিনকে দিন বাড়ছে।

ভিখিরিকে ভয় কীসের রিনি? বলে পাশ ফেরার চেষ্টা করে সঞ্জয়।

রিনি আস্তে করে বলে, ওরা সবাই কি ভিখিরি?

না তো কী? গাঁয়ে যখন খরা কি বন্যা হয় তখন দলে দলে চলে আসে শহরে। এবারও হয়তো কিছু একটা হয়েছে কোনও জেলায়। প্রতি বছরই হচ্ছে তো!

কী হয়েছে?

কী জানি! কাগজে লিখছে এবারকার ফলন ভাল নয়।

রিনি শ্বাস ফেলে বলে, কাল দেখলাম আমাদের পায়ের দিকের জানলার শার্সিতে একটা ছায়া। ঘোমটা মাথায় একটা বউ, তার কোলে বাচ্চা ছেলে। এমন চমকে উঠেছিলাম! মনে হল জানালার কাছে গিয়ে দেখব যে, ওখানে কেউ নেই, কেবল ছায়াটাই দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তাতেও বোধ হয় কেবল চিৎকারগুলোই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক এ-রকম অদ্ভুত মনে হয় আমার—

তা হলে ভূতই হবে বোধ হয়।

আচ্ছা গো, এই যে দিনরাত জুড়ে দেশময় ভিখিরিরা হাঁটছে তার মানে কি ভিখিরিরা অনেক বেড়ে গেছে?

অনেক।

রিনি একটু চুপ করে থাকে। অন্ধকারে তার ঘন শ্বাসের শব্দ শোনা যায়। বড় ভয় করে গো!

ভয় কীসের?

মনে হয় এরা শিগগিরই দলে ভারী হয়ে যাবে খুব। আর এরা দল বাঁধলে—

সঞ্জয় নিঃসাড়ে হাসল। রিনি একটা আঙুল দিয়ে ওর বুকের ওপর আঁকিবুকি কাটল।

তারপর বলল, দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে না-খাওয়া খিদে-পাওয়া লোক, দিনরাত জুড়ে ঘুরে ঘুরে ডাকছে। আমার বুক কাঁপে। আমি যেন টের পাই, আমাদের এই ছোট্ট একটু ঘর-সংসারের দিকে, আমাদের এক ফোঁটা পিকলুটার দিকে চার দিকের খিদে-পাওয়া মানুষের শাপশাপান্ত ছুটে আসছে। আমার বিধবা ঠাকুমা মা'র সঙ্গে ঝগড়া হলে মাটিতে লাথি মারতে মারতে বলত, তোর অবস্থা যেন আমার মতো হয়— আমার মতো হয়। ঠিক সেই রকম বুঝলে, ঠিক সেই রকম আমি চার দিকে মাটিতে লাথি মারার শব্দ শুনি। আমার বুকের মধ্যে ধুপধুপ শব্দ হয়। কারা যেন আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, তোদের অবস্থা যেন আমাদের মতো হয়— আমাদের মতো হয়— আমাদের মতো হয়। অনেক সময়ে শাপশাপান্ত ভীষণ ফলে যায়, জানো?

শুনতে শুনতে সঞ্জয় ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, ও বাচ্চা মেয়ের মতো সঞ্জয়ের বুকের মধ্যে মিশে রইল। আধফোটা গলায় বলল, তুমি এ-সবে বিশ্বাস করো না, না?

সঞ্জয় আস্তে করে বলল, মিছিল দেখেছ রিনি, শুনে দেখো মিছিলের স্লোগানেও কত অভিশাপ থাকে। সব কি ফলছে? ভেবে দেখলে আমাদের সকলেরই মন-ভরা অভিশাপ। কাকে দিতে হবে তা জানি না।

তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিল সঞ্জয়।

আজ সকাল থেকেই আবার গড়িমসি করছিল সঞ্জয়। বেলায় ঘুম ভেঙেছে আজ। তারপর রিনির নরম সাদা বুকের মাঝখানে মুখ ডুবিয়ে রেখেছে অনেকক্ষণ। চন্দনের গন্ধ পেয়েছে গা থেকে। জিজ্ঞেস করেছে, কাল তোমার গিটারের মাস্টার এসেছিল?

হুঁ।

কী শিখলে?

বাব্বা, আজকাল যে খুব খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে! ব্যাপার কী?

সঞ্জয় অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে করে বলেছে, শেখো, খুব ভাল করে শেখো। আমি জীবনে সিটি দেওয়া ছাড়া আর কিছু শিখিনি। পিকলুকে তুমি গান-বাজনা কিংবা সাহিত্য-ফাহিত্য কিছু একটা শিখিয়ো। ও-রকম একটা কিছু জানা থাকলে মানুষের একটা কিছু থাকে।

পিকলু তখন উপুড় হয়ে প্রাণপণে হামা টানার চেষ্টা করে গর্জন করছিল, চার দিকে উঁচু বালিশের বেড়া পার হতে পারছিল না। রিনি তার গাল টিপে দিয়ে বলল, শোনো পিকু, বাবু কী বলছে। তোমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে।

সঞ্জয় আস্তে বলল, যদি বাঁচে।

ফের!

সঞ্জয় হাসে। ভিখিরির অভিশাপ ফলে যায়, রিনির এ-বিশ্বাসও আছে। না, সিঁদুর লুকিয়ে, সেজেগুজে, গিটার শিখেও রিনি কোথায় যেন থেমে গেছে।

সঞ্জয়ের মন ভাল নেই। কাল রমেনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই মন খারাপ হয়েছিল। আহা, বেচারা রমেন। এখন ওর আর কিছু নেই। চক্রবৎ সুখ-দুঃখ আসে। এ তো জানা কথা। তবু কি তা ভাবতে ভাল

লাগে? রমেন যখন গঙ্গার ধারে তার প্রকাণ্ড বাড়িতে বাইরের ঘরে বসে পিয়ানো বাজায়, যখন পুরনো মোটরখানা দাবড়ে চষে বেড়ায় কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার, তখন সঞ্জয় সামান্য মোটর মেকানিক, ভূতের মতো খাটে আর পয়সা জমানোর বৃথা চেষ্টা করে। আর গতকাল তার এয়ারকন্ডিশন্ড অফিস ঘরে মুখোমুখি বসেছিল রমেন আর কিছুই নেই। আবার কি কখনও এই অবস্থা পালটে যাবে? উলটো হয়ে যাবে ছবিটা? ঐশ্বর্যবান এক রমেনের পাশাপাশি একই সমাজে বাস করবে ভিখিরি সঞ্জয়! দেখা যাচ্ছে কোনও কিছুরই শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্ব নেই। রিনির ওই যে ভয়, ওটাও একদিন সত্যি হতে পারে, জোট বাঁধতে পারে ভিখিরি আর অকিঞ্চন মানুষেরা!

এক-এক সময়ে মনে হয় যখন তার কিছুই ছিল না তখনই সঠিক ঐশ্বর্যবান ছিল সঞ্জয়। তিনটে গুণ ছিল তার। সততা, কর্মক্ষমতা আর নিষ্ঠা। তখন সে কত রাত চটের বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছে। তার কোলের মধ্যে শুয়ে থাকত একটা বেড়াল, মাথার ওপর দিয়ে লাফিয়ে যেত ইঁদুর। কখনও বা ফুটপাথে শুয়ে থেকে সে শুনেছে গায়ের পাশ ঘেঁষে চলে যাচ্ছে মাতালের পা, ঘুম ভেঙে কখনও দেখেছে রাতের আকাশ থেকে সহস্র চোখে কে একজন তাকে লক্ষ করছে। সুন্দর ছিল সেইসব রহস্যময় অনুভূতি। খোলামেলা মানুষ ছিল সে। সে স্পষ্টই জানত, বুঝতে পারত একদিন তার অবস্থা ফিরবে। যে চায়ের দোকানে সে বয়গিরি করত সেটা উঠে গেছে এখন, তার মালিক মারা গেছে লিভার সিরোসিসে, ছেলেমেয়েগুলো এত দিনে রাস্তায় নেমে গেছে বোধ হয়। হাজরার মোড়ের কাছে সেই মোটর সারাইয়ের কারখানা যেখানে সে ছিল মেকানিক তা সে-রকম হতশ্রী রয়ে গেছে। পরশুদিন সেই কারখানার পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এল সঞ্জয়, বুড়ো হয়ে গেছে বাদু মিঞা, কালো একটা মোটর গাড়ির বনেট-খোলা ইঞ্জিনের মধ্যে ঝুঁকে গাড়ির মালিকের সঙ্গে দরাদরি করছে বোধ হয়। ইচ্ছে হয়েছিল গাড়িটা একবার থামায়। কিন্তু লজ্জা করেছিল। সে তো সেই ছেলেবেলাতেই জানত যে একদিন সে মোটর দাবড়ে ঘুরে বেড়াবে, বাড়ি করবে বালিগঞ্জে। কেননা তার তিনটে গুণ ছিল, অসম্ভব তিনটে গুণ। যা ওদের নেই। সে গাড়ি থামায়নি।

সত্য বটে, গুণগুলো এখন আর সঞ্জয়ের নেই। তবু সে নিজের চেষ্টাতেই উঠেছে এত দূর। তাই এখন যদি দুম করে একটা কিছু হয়, যদি জোট বাঁধে ভিখিরিরা; যদি বিপ্লব হয়, যদি কোনও দুর্ঘটনায় হঠাৎ পঙ্গু হয়ে যায় সে, যদি মারা যায়, তবে আবার সব চলে যাবে। কেন যাবে? কেন কিছুরই স্থায়িত্ব নেই সংসারে? যদি এখন কেউ এসে তার কাছ থেকে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে বলে, আবার গোড়া থেকে শুরু করো দেখি! কেমন পারো শূন্য থেকে তৈরি করতে বাড়ি, ঘর, ফ্রিজিডেয়ার, মোটর গাড়ি! তা হলে কিছুতেই পারবে না সঞ্জয়। কিছুতেই না। কেবল ভয় করে এখন। অকারণে মাঝে মাঝে ভয় করে।

যেমন ভয় করেছিল কাল, রমেনের মুখোমুখি।

কলিং বেলটা টুংটাং করে বেজে উঠলে বিছানা ছেড়ে উঠল সঞ্জয়। দরজা খুলে দেখল পাশের ফ্ল্যাটের মাদ্রাজি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

লোকটা বাংলায় বলে, আপনার টেলিফোন।

সঞ্জয় এখনও নিজের টেলিফোন পায়নি, অ্যাপ্লাই করেছে অনেক দিন। এই লোকটার টেলিফোনে তার কাজ চালাতে হয়।

টেলিফোন ধরতেই চমকে গেল সঞ্জয়। অজয়ের গলা।

কে! সঞ্জু? শিগগির আয়, মা'র স্ট্রোক।

হঠাৎ হাত-পা হিম হয়ে আসে। গলা ঠিক রাখার চেষ্টা করে বলে, কীসের স্ট্রোক?

জানি না। অবস্থা ভাল না। জ্ঞান নেই। চলে আয়।

কী করে যাব? আজ তো সব বন্ধ!

পুলিশের গাড়ি ধরার চেষ্টা কর, ওরা অনেক সময়ে নেয়। দেরি করিস না।

সঞ্জয় ঘরে ফিরে আসে। তার পা সামান্য কাঁপছে। কিছুক্ষণ অর্থহীনভাবে সে রিনির দিকে চেয়ে রইল।

রিনি জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

সঞ্জয় উত্তরে বলল, বালিগঞ্জ থেকে বেলেঘাটা হেঁটে যাওয়া যায়? তোমার কোনও আইডিয়া আছে কতক্ষণ লাগবে?

রিনি উঠে বসে, কী হয়েছে বলো তো!

সঞ্জয় অন্যমনস্কভাবে বলল, যদি পুলিশের গাড়িতে না নেয় তবু রাস্তাটা আমাকে হেঁটেই পেরোতে হবে।

চৌত্রিশ

ডিটেকটিভ বই পড়তে পড়তে একদিন বারান্দায় সকাল দশটার সময়ে ঘাড় কাত করে রায়বাবু বসে আছেন। কোলের ওপর খোলা বই। ছেলের বউ স্নান করাতে নিয়ে যেতে এসে ডাকল, বাবু, উঠুন...

রায়বাবু নড়লেন না। খোলা বইয়ের পাতা ফরফর করে বাতাসে উড়তে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড় জমে গেল রাস্তায়।

খবর পেয়ে ললিত তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছিল, মা পিছন থেকে ডেকে বলল, মড়া ছুঁস না। তোর রোগা শরীর, সবতাতে সর্দারির দরকার কী?

বারোটা নাগাদ খাটলি, ফুল, নতুন কাপড় এসে গেল। শম্ভু, সুবল, আর কয়েকজন ছেলে রাস্তার মাঝখানে খাট সাজিয়ে ফেলল।

মড়া যখন নামানো হচ্ছে তখন মাথাটা ঝুলে লটপট করছে দেখে ভিড় থেকে এগিয়ে রমেন মাথাটা তুলে ধরে। বিশাল চেহারা ছিল রায়বাবুর। কোমরের দিকটা ধরে ঠিক তাল সামলাতে পারছিল না শম্ভু। রমেন ললিতকে ডেকে বলল, মাথাটা ধর তো এসে, আমি কোমরটা ধরি।

ললিতের ভিতরটা তখন কাঁপছ। এইভাবে—একদিন এইভাবে—

সে শূন্যচোখে চেয়ে বলে, ছোঁব?

ধর শিগগির। রমেন ধমক দেয়।

রমেন রায়বাবুর কোমর ধরতেই শম্ভু তাকে চাপা গলায় বলে, দাদা, আপনি খাটে কাঁধ দিলে কিন্তু খাট একদিকে উঠে থাকবে। আপনি যা টল।

সার্জেন্টের চাকরিতে লোকটা একনজরে সিলেক্টেড হয়ে যেত। শম্ভু ভেবে দেখল।

চার বছরের নাতিটা ভয় পেয়ে কঁদছে। এ-রকম রাজকীয় সমারোহে সে দাদুকে কখনও দেখেনি। একা ভিড়ের মধ্যে দিশেহারা হয়ে সে মানুষের পায়ের ভিতরে ভিতরে রাস্তা খুঁজছিল। হঠাৎ তাকে আকাশে তুলে নিল কেউ। অবাক হয়ে সে দেখল, একটা লোক সকলের মাথার ওপরে তাকে তুলে ধরেছে। উঁচু থেকে সে তার দাদুর মুখখানা শেষবারের মতো স্পষ্ট দেখতে পেল।

বল হরি—হরি বল।

ললিত নিচু স্বরে বলল, শ্মশানে যাবি?

রমেন বলল, তুইও চল।

বিবর্ণ মুখে ললিত বলে, আমার শরীরটা—

রমেন শক্ত করে তার হাত ধরে, চল।

শ্মশানের বদ্ধ চাতালে বসে আগুনের আঁচ অসহ্য লাগছিল ললিতের। আর ওই গন্ধটা। একটু দূরে শম্ভুরা আড়াল হয়ে সিগারেট টানছে আর ঠাট্টা করছে ডোমদের সঙ্গে, কীরে ক’ বোতল বেঙ্গলি টেনেছিস?

রমেন শান্ত মুখে বসে ছিল। একটা ছোট্ট খাট নিয়ে এসেছে কয়েকজন। বাচ্চা ছেলের মড়া। রমেন ললিতকে ডেকে বলল, ওই দ্যাখ, কলেরার মড়া।

কী করে বুঝলি?

রমেন উত্তর না দিয়ে উঠে গেল। কথাবার্তা বলতে লাগল বাচ্চাটার সঙ্গের লোকজনদের সাথে।

রায়বাবুর চিতাটা ভালই ধরেছে। গুনগুন করছে আঁচ। আগুনের ভিতর থেকে এখনও অমলিন পা দুটো দেখা যায়। পা দুটো দেখছিল ললিত। ফট করে একটা শব্দ হয়ে চিতাটা নড়ল, কাঠের গিঁট ফাটল বোধ হয়। ললিত দেখল রায়বাবুর দু'খানা ফরসা পা, আগুন ছোঁয়নি এখনও, একটু নড়ে উঠল। অনভিজ্ঞ লোক দেখলে চমকে উঠত। ললিত অনভিজ্ঞ নয়, এর আগে সে দু'-চার বার মড়া পুড়িয়েছে। তবু এখন কেমন শরীরে ঘাম ছাড়ে।

ডোমদের একটা বারো-তেরো বছরের ছেলে তাকে রায়বাবুর চিতাটা দেখিয়ে কিছু একটা বলছে।

কী রে?

ওই পা দুটো। চিতা থেকে পড়ে যাবে। ভারী কাঠ চাপা দিন।

ললিত বুঝল না কী করে পা দুটো চিতা থেকে পড়বে। এখনও চিতার মধ্যেই শোয়ানো রয়েছে পা দুটো।

রায়বাবুর বড় নাতিটা শম্ভুদের দঙ্গলের মধ্যে হাঁটুতে মুখ গুঁজে আছে। সে হঠাৎ মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠল, বাবা।

সবুজ পাতায় ছাওয়া বীথি পথটি দিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে অবনীশ। অফিসে ফোন করে ওকে পাওয়া যায়নি।পি ডব্লিউ ডি-তে কাজ করে, সাইটে গিয়েছিল। অফিসে ফিরে খবর পেয়ে সোজা শ্মশানে এসেছে। এখনও গায়ে অফিসের টিপটপ সাজপোশাক। টেরিলিনের টাই ঝুলছে গলায়। কালোর ওপর একটা লাল ত্রিভুজ। দাঁড়িয়ে টলছিল। এক্ষুণি অবনীশ পড়ে যাবে। ছায়ার মতো রমেনকে দেখা গেল তার পাশে। অবনীশ আর পড়বে না। বুঝতে পেরে নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজল ললিত।

শুনতে পেল কে যেন চেঁচিয়ে বলছে, পা দুটো দ্যাখ।

ললিত চোখ খুলে দেখে রায়বাবুর পা দুটো দু'খানা কাঠের মতো সোজা, আস্তে আস্তে ওপরে উঠে যাচ্ছে। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে উঠে স্থির হল। যেন ডুবন্ত মানুষের পা, জলের ওপর উঠে আছে। তারপর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ভেঙে আরও ওপরে উঠতে লাগল আস্তে আস্তে।

রমেন দৃশ্যটা আড়াল করে সামনে এসে দাঁড়াল। ডান পা'টা খসে গেল প্রথমে। হাঁটু থেকে পাতা পর্যন্ত অংশটা গড়িয়ে চিতার গা বেয়ে দূরে গিয়ে পড়ল। তখনও ফরসা রং গোড়ালির কড়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বাচ্চা ছেলেটা দৃশ্যটা দেখতে পেল না, অবনীশও না। রমেন তার প্রকাণ্ড চেহারা দিয়ে দৃশ্যটা ঢেকে ফেলল।

ডোমরা বড় একটা গা করে না। কিছু একটু করতে বললেই বোতলের পয়সা চায়। রমেন ললিতকে বলল, তুই একটু আড়াল করে দাঁড়া, আমি পা-টা তুলে দিই। বাচ্চাটা নইলে ভয় পাবে।

ললিত কষ্টে দাঁড়াল। রমেন চিতার ও-পাশে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে পা-খানা চিতার মধ্যে গুঁজে দিল, বাঁশ দিয়ে ভেঙে দিল অন্য পা।

মাথা ঘুরে বসে পড়ল ললিত। তারপর টক-তেতো জল বমি করতে লাগল। অনেকক্ষণ কিছু খাওয়া হয়নি। সে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল, রমেন!

উঁ। খুব কাছ থেকে উত্তর দিল রমেন।

তুই আমাকে এখানে আনলি কেন?

রমেন উত্তর দিল না।

দিন সাতেক বাদে বিমানের ঘরখানা খালি হয়ে গেল। তার বইগুলো নিয়ে গেল ললিত, আর বাসনপত্রগুলো বস্তায় পুরে মুখ বেঁধে রাখা হল বাড়িওয়ালার ঘরে। অপর্ণার প্রকাণ্ড মোটরগাড়িখানা বটতলায় অপেক্ষা করছিল, লাগেজ বুটের বিশাল ডালাটা খোলা। বিমানের বিছানাপত্র আর বাক্স পাড়ার লোকরাই ধরাধরি করে তুলে দিল গাড়িতে। সুবলকে ভীষণ ব্যস্ত দেখাচ্ছিল। তার মুখ লাল, চোখের পাতা বার বার নেমে আসছে, যত বার অপর্ণার দিকে তাকাচ্ছে সে।

বইয়ের র‍্যাক আর চৌকিটা পড়ে রইল। অপর্ণা বাড়িওয়ালার হাতে বাকি ভাড়ার টাকা দিয়ে বলল, ও-জিনিসগুলো ইচ্ছে করলে পরে যে ভাড়াটিয়া আসবে তারা ব্যবহার করতে পারে। নইলে আপনি যা খুশি করবেন।

বিমানকে মাঝখানে রেখে দু'ধারে বসল ললিত আর রমেন। স্টিয়ারিং হুইল ধরেছে অপর্ণা। গাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে সুবল জানালা দিয়ে ঝুঁকে বলল, ললিতদা, দরকার হলে আমি সঙ্গে যেতে পারি।

অপর্ণা দাঁতে ঠোঁট কামড়াল।

ললিত মাথা নেড়ে জানাল, দরকার হবে না।

একটু হতাশা দেখা গেল সুবলের মুখে।

পাড়ার লোক ভিড় করে গাড়ি দেখছে।

দু'জনের মাঝখানে নিথর হয়ে বসে আছে বিমান। সে আজকাল আর কিছুই টের পায় না। আকাশে টইটুম্বুর তার মাথা। দিনরাত আকাশ-ডুব। তাকে খুব রোগা দেখাচ্ছিল। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। তালুর খানিকটা অংশ চেঁছে ফেলা হয়েছে, সেখানে একটা পুলটিস লাগানো। দুটো কোটরগত চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আগে পাগল হয়ে গেলে শান্ত থাকত বিমান। কিন্তু এবার সে গন্ডগোল করেছে। প্রায়ই লাঠি হাতে লোকজনকে তাড়া করত। রাতে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ত। অচেনা বাড়ির দরজায় নিশুত রাতে গিয়ে কড়া নেড়ে চেঁচাত, টেলিগ্রাম... টেলিগ্রাম... শম্ভুদের জিমনাসিয়ামে গিয়ে প্যারালাল বার-এ উঠবার প্রাণপণ চেষ্টা করত মাঝে মাঝে। একদিন পেশিবহুল একটা ছেলে তাকে বের করে দেয়, তাকে ইট নিয়ে তাড়া করেছিল বিমান, বিপুল চেহারার ছেলেটি ভয়ে ছুটে পালিয়েছিল।

এখন বিমান শান্ত। কোনও অস্থিরতা নেই, কিন্তু কোটরগত দু'খানা জ্বলজ্বলে চোখ মাঝে মাঝে চারপাশে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে চিনতে পারছে না এরা কারা এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

ললিতের মুখ আর ঠোঁট সাদা। বিমানের একখানা হাত কোলে টেনে নিয়ে তার ওপর হাত রেখেছে সে। ঠান্ডা সেই হাত। ঘামছে। সে কোনও একটা সান্ত্বনার কথা বলতে চাইছিল অর্ণাকে। পারছিল না।

গাড়ি চলতেই রমেন বিমানের কানের কাছে মুখ এনে ডাকল, বিমান।

বিমান নড়ল একটু, উত্তর দিল না। রমেন বিমানের উদ্ধত মাথাটা হেলিয়ে দিল সিটের পিছন দিকটায়। অমনি গলার শীর্ণতা ফুটে উঠল বিমানের, দেখা গেল কণ্ঠাস্থির ওঠা-নামা। বিমান বার বার তার শুকনো মুখের বাতাস গিলছে। রমেন ওর কপালের ঘাম মুছে দিল হাতের চেটোয়। বিমান স্নান করতে চায় না, খেতে চায় না। রমেনই ওকে সব করাচ্ছে। একা। রমেনের হাতে-গালে ওঁর দাঁত আর নখের দাগ দেখা যায়।

ললিত চোখ ফিরিয়ে নেয়। সে ব্যাপারটা ঠিক চোখে দেখতে পারছিল না। অপর্ণা আর বিমানের কত সুন্দর বোঝাপড়া ছিল! এখন এই সব বিয়োগান্ত দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। একটা গভীর শূন্যতার মধ্যে তার মনে পড়ে একদিন— খুব শিগগিরই— তাকে মরে যেতে হবে। বিমানের দিকে তাকিয়ে ওই রোগা মুরগির গলার মতো সরু আর তেলচিটে ময়লা-বসা গলা দেখে তার মনে হয় ও-রকমই একটা রুগ্‌ণ চেহারা নিয়ে সে মরবে।

তিন দিন আগে আদিত্যর একটা চিঠি এসেছে। সংক্ষিপ্ত চিঠি। লিখেছে— এখানে জানালা খুললেই পাহাড় দেখা যায়। একটা অদ্ভুত উপত্যকা সামনে, ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে। দেহাতিরা হেঁটে নদী পেরিয়ে হাটে যায়। কলকাতার সব ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। উদোম মাঠে দাঁড়িয়ে যখন চারপাশটা খাঁ খাঁ করতে দেখি তখন হঠাৎ নিজেকে খুব মহৎ লাগে, মাইরি বিশ্বাস কর। একটা পিপুল গাছের নীচে চেয়ার টেনে বসে থাকি সারা দুপুর, একবারও সতীর কথা মনে পড়ে না। লোলিটা, সতীকে যদি দেখিস তবে বলিস, আমি যদি বিয়ে করতাম ওকে তবে সারা জীবন সন্দেহ করতাম। এ-রকম অদ্ভুত সম্পর্ক মানুষকে ছোট করে। আমি এখন অনেক দিন এখানে থাকব। সতীকে বলিস আমি ওকে অনেক ট্রাবল দিয়েছি। আর না। সঞ্জয়ের পেটে লাথি মেরেছিলাম, ওটা কি মরেই গেছে? মরলে পৃথিবীর মহৎ উপকার হয়েছে। কিন্তু ঠিক জানি ও মরেনি, অনেক জ্বালাবে। যদি পারিস এইখানে চলে আয়।

চিঠি পড়ে ললিতের ঠোঁট সামান্য কেঁপেছে। গলায় ঠেলা মেরেছে কান্নার ডেলা। শাশ্বতীকে ছেড়ে দিচ্ছে আদিত্য! কিন্তু তাতে কী লাভ?

অলৌকিকভাবে বেঁচে যেতে ইচ্ছে করে।

বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল ললিত। শুনতে পারছিল বিমান গুনগুন করে কথা বলছে। কখনও-সখনও হঠাৎ বিমান লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে ছুটে বেরোনোর চেষ্টা করেছে। কখনও চিৎকার করেছে, কিন্তু আবার পরক্ষণেই নিথর হয়ে গেছে। এখন বিমান কী বলছে তা শুনতে পাচ্ছিল না ললিত।

সঞ্জয়ের মা মারা গেছে। গুরুর দশা নিয়েই এসে দু'দিন আড্ডা দিয়ে গেছে। গলায় ধড়া, হাতে কুশাসন, গালে দাড়ি আর একটোকা চুল মাথায়। কী বীভৎস শোকের চেহারা! হিন্দুত্বের ওই আর-এক দোষ। শোকটাকে বিজ্ঞাপনের মতো নিয়ে বেড়ায়। লোকে চমকে ওঠে, মন খারাপ হয়ে যায়। বরং শোকচিহ্নগুলি লুকিয়ে রাখাই ভাল, মানুষের এমনিতেই দিনে কত বার মৃত্যুর কথা মনে পড়ে।

অপর্ণা—রোগা ফরসা মেয়েটা—সুন্দর গাড়ি চালায়। এত বড় গাড়ি কী অনায়াসে চালিয়ে নিচ্ছে! ওর মনের অবস্থা কী তা ললিত বোঝে। তবু ওপরের দাঁতে ঠোঁট কামড়ে মাঝে মাঝে উড়ন্ত চুল চোখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে দুটো সহজ হাতে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সামনেই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মহামহিম এক ল্যাংটা পাগল, হাতে লাঠি, ললিত চোখ বুজে ফেলে লজ্জায়। গাড়ির গতি ধীর হয়ে যায়। ললিত টের পায় গাড়িটা বেঁকে পাশ কাটিয়ে নিল। পাগলটা রাস্তা

ছাড়ল না। পাগল কত বেড়ে গেছে আজকাল। হঠাৎ হঠাৎ খেপে যাচ্ছে মানুষ। বিড়বিড় করছে হঠাৎ। মাঝরাতে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়, গায়ের জামা-কাপড় খুলে ফেলে দিচ্ছে। পাকিস্তান হওয়ার পরই এটা বেড়ে গেছে খুব। গতবারের আগের বার পুজোয় বন্ধুরা সব বেড়াতে গেল বাইরে। ললিত মাকে একা রেখে যেতে পারে না কোথাও। তাই সে রাস্তায় ঘুরে-টুরে সময় কাটাত। সেই সময় একদিন ভবানীপুরের ফুটপাথে প্রচণ্ড ভিড়ের ভিতরে একটা লোকের চোখে চোখ আটকে গেল। লাল আঁজি-আঁজি জ্বলজ্বলে পাগলের চোখ। লোকটা হঠাৎ তার দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলল, তুমি। হঠাৎ গুড়গুড় করে উঠেছিল ললিতের বুক। আমি! আমি কী! আমি কী! এক রাস্তা ভিড়ের মধ্যে অচেনা লোকটা তার শীর্ণ হাত তুলে তাকে চিহ্নিত করছে। থরথর করে কাঁপছে তার আঙুল, লক্ষ লোকের মাঝখানে সে ললিতকেই কিছু বলতে চাইছে, তুমি। হঠাৎ ও-রকমভাবে কেউ 'তুমি' বলে চেঁচিয়ে উঠলে যে কেউ টলে যায়। নিজেকে আজন্ম পাতি পাতি করে খুঁজে দেখতে ইচ্ছে করে। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, আমি কী করেছি! কী করেছি! ললিতের ঠিক তাই হয়েছিল। সেই পাগলটা কেন তাকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলেছিল, তুমি? হয়তো সে একটা কিছু দেখেছিল যা অন্য কেউ লক্ষ করেনি। সে হয়তো লক্ষ করেছিল ললিতের অসংগতি। হয়তো কোনও ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনা। কিংবা হয়তো সৌভাগ্যসূচক কিছু। আলটপকা বড় নাড়া খেয়েছিল ললিত। পরমুহূর্তেই সে স্বাভাবিক হয়ে হেঁটে চলে গিয়েছিল ভিড়ের মধ্যে। আশ্চর্য, সেই ঘটনার পর দু'বছরও কাটেনি, তার ক্যান্সার হল।

কোনও যোগাযোগ নেই, তবু আবছাভাবে মনে হয় যোগাযোগ আছে। পাগলটা হয়তো তাকে সাবধান করেছিল।

বিমান গুনগুন করে কথা বলছে। মুখ ফিরিয়ে ললিত দেখল রমেন নিবিষ্টভাবে বিমানের কথা শোনার চেষ্টা করছে।

কী শুনছিস?

রমেন আস্তে বলল, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ললিত বিমানের দিকে ঝুঁকে বসল। কথাগুলো ঠিক বোঝা যায় না। অসংলগ্ন। মনে হয় বুঝি বা কোনও কবিতার লাইন।

কতোবার গিয়েছি যে ব্যাবিলনে, স্বপ্নের উদ্যানে...কতোবার গিয়েছি যে...

রমেন হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে সোজা হয়। তারপর অপর্ণার দিকে মুখ বাড়িয়ে বলে, আপনি পারবেন না। গাড়ি টাল খাচ্ছে, অ্যাকসিডেন্ট হবে।

অপর্ণা মুখ ফেরায়। মুখখানা অল্প লাল, উত্তেজিত। চোখ টলটল করছে। একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, ঠিক ব্যালান্স থাকছে না।

গাড়ি থামান।

থামিয়ে?

আমি চালাব।

অপর্ণা একটু থমকে বলে, লাইসেন্স আছে?

রমেন হাসে, ছিল। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। আমি চালিয়ে নিতে পারব।

অপর্ণা জিওলজিক্যাল সার্ভের উলটো দিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সরে বসল। রমেন গিয়ে ধরল হুইল। সামান্য হাঁফাচ্ছিল অপর্ণা। বলল, সার্কুলার রোডের লাল বাতি আমার নজরেই পড়েনি। দিব্যি পার হয়ে এলাম। পুলিশ বোধ হয় নম্বর টুকে নিয়েছে।

ললিত দশ বছর পর গাড়ি চালাতে দেখছে রমেনকে। দশ বছর আগে পুরনো ঝরঝরে অস্টিন গাড়িটা যখন চালাত রমেন তখন তারা আশেপাশে আর পিছনে বসত। রমেন নিয়ে যেত শহরের বাইরে। কত বার গাড়ি চালানো শেখার চেষ্টা করেছে ললিত, ঠিকমতো পারেনি। একসঙ্গে এতগুলো যন্ত্র সামলাতে হয় যে তাল থাকে না। রমেন বিরক্ত হয়ে বলত, যন্ত্রপাতির মধ্যে তোর মনোযোগ নেই।

হঠাৎ ললিত আর-একটা ব্যাপার লক্ষ করে মনে মনে হেসে উঠল। সামনের সিটে ওরা দু'জন। রমেন— প্রাক্তন জমিদার আর অপর্ণা— কারখানা মালিকের মেয়ে। পিছনে সে স্কুলমাস্টার, আর বিমান— কর্পোরেশনের জমাদারবাবু। ঘটনাচক্রে দুটো শ্রেণী আলাদা আলাদা জোট বেঁধেছে।

দক্ষিণেশ্বরের কাছে মানসিক হাসপাতাল। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা। সামনের দিকে একটু বাগান আছে। ললিত ভিতরে গেল না। গাড়ি থেকে নেমে বাগানের মধ্যে বেড়াতে লাগল। বিমানকে ধরে ধরে নিয়ে গেল রমেন, পিছনে অপর্ণা নত মুখে। দৃশ্যটা এত খারাপ লাগছিল ললিতের! একটু পরে দু'জন লোক এসে গাড়ির লাগেজবুট খুলে বিমানের বাক্স-বিছানা নিয়ে গেল। হাসপাতালে বাক্স-বিছানা রাখতে দেয় কি না কে জানে! হয়তো মানসিক হাসপাতালের ব্যবস্থা আলাদা, নয়তো রমেন আর অপর্ণা বন্দোবস্তটা করিয়ে নিয়েছে। ওগুলো কোথাও রাখার জায়গা ছিল না।

ওদের ফিরে আসতে অনেক সময় লাগল। যখন বারান্দায় তিনটে সিঁড়ি ভেঙে এরা দু'জন, অপর্ণা আর রমেন নেমে আসছিল, তখনই হঠাৎ বিমানের জন্য সত্যিকারের একটা কষ্ট টের পাচ্ছিল ললিত। সেরে উঠতে বিমানের কত দিন লাগবে কে জানে! তত দিনে ললিত কোথায়?

ফেরার সময়েও গাড়ি চালাচ্ছিল রমেন। রমেনের পাশে ললিত। পিছনে অপর্ণা।

এক সময়ে অপর্ণা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ওরা যত্ন নেবে তো?

রমেন মুখ না ফিরিয়ে বলল, নেবে। ওরা আমার অনেক দিনের চেনা লোক।

অপর্ণা দাঁতে রুমাল কাটল। তারপর আচমকা বলল, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

ললিত ভয়ংকর চমকে উঠে ফিরে বলল, সে কী?

অপর্ণা মাথা নুইয়ে চুপ করে রইল একটুক্ষণ, যেন কাঁদবে। কাঁদল না। ম্লান মুখখানা তুলে বলল, বাবা সেদিন আমাকে ডেকে বললেন, অর্পণা, তুমি বুঝতে পারছ না আমার শরীরের অবস্থা। কিন্তু ডাক্তার কাজকর্ম চলাফেরা একদম বারণ করে দিয়েছে। এখন আমার এত সব কে দেখে! আমি ইঙ্গিতটা ধরতে পারলাম। উত্তর দিইনি। কিন্তু বাবা খুব কনসিডারেট, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার যদি পছন্দ মতো কেউ থাকে তো বলো আমি তার সঙ্গেই বিয়ে দেব। কিন্তু তাড়াতাড়ি বিয়ে, উইদিন এ মান্থ। জামাইকে আমার ছেলে হয়ে সব দেখতে হবে।

আপনি কী বললেন?

অপর্ণা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি কিছু বললাম না।

কেন?

ও তো বাবার ছেলে হতে পারত না!

তাতে কী আসে যায়!

অপর্ণা একটু হাসল। তারপর বলল, কী জানি! আমি তো তবু রাজি ছিলাম। কিন্তু ও সেদিন আমাকে বলল, আমি তোমাকে নিয়ে কী করব? তোমাকে খাওয়ানোর সাধ্য আমার নেই। তা ছাড়া আমি বিয়ে করব কেন, আমি কি সুস্থ? আমার সন্তান যে মাথার দোষ নিয়ে জন্মাবে না তার গ্যারান্টি কী? আমার ঠাকুমা পাগল ছিল। আমাদের সমাজ যদি মানুষ সম্পর্কে সচেতন হত তা হলে আইনত আমার মতো মানুষকে বিয়ের অযোগ্য বলে ঘোষণা করে দিত। সমাজ যখন তা করছে না তখন দায়িত্ব আমারই।

ললিত ভীষণ চঞ্চল হয়ে বলল, কিন্তু আপনি তো ইচ্ছে করলে একা থাকতে পারেন!

অপর্ণা আবার নতমুখ হয়ে যায়। সম্ভবত নিজের ত্যাগের অভাবের কথা ভাবে। তারপর বলে, সেটা করা যায় না যে তা নয়। কিন্তু কীসের আশায়! কেন?

কোনও যুক্তিপূর্ণ কথা খুঁজে পায় না ললিত, তবু আবেগ থেকে বলে, একজনের কাছে আপনি বাঁধা আছেন।

আপনাকে তো বলেছি আমি ভীষণ দুর্বল, আর ভিতু। একা আমি অত বড় কারখানা চালাতে পারব না। কর্মচারীদের আমি ভয় পাই। তা ছাড়া ওই যে ছেলেটা আপনাদের পাড়ার, ভীষণ ডেসপারেট, আজও বার বার আমার গা ঘেঁষে দাড়াচ্ছিল, ও-রকম সব ছেলের হাত থেকে কে আমাকে বাঁচাবে?

বড় রেগে গিয়েছিল ললিত। উত্তেজনার মাথায় বলে ফেলল, ভগবান বাঁচাবেন।

বলেই লজ্জা পেল।

খুব অবাক হল অপর্ণা। বলল, ভগবান! আপনি ভগবানের কথা বলছেন?

ইয়াঃ! বলে হেসে ফেলল ললিত। বলল, অত ভয় পেলে কি চলে?

অপর্ণা মাথা নাড়ল, আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম ওর মাথা পুরোপুরি ভাল হওয়া মুশকিল। র‍্যাডিক্যাল কিওর নেই। থাকলে আমি চেষ্টা করতাম। অথচ বিয়েটা বাবার দিক থেকে সত্যিই প্রয়োজন।

ললিত চুপ করে থাকে।

রমেন মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনাকে কোথায় পৌঁছে দেব?

অপর্ণা বলে, পরাশর রোড। ওখানে এক বন্ধুর বাসায় যাব। মাকে বলে এসেছি রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ আছে।

পরাশর রোড়ে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই কলস্বরা একটি মেয়ে ছুটে এল। অপর্ণা তখন নামছে, তার হাত ধরে ভীষণ উত্তেজিত চাপা গলায় হাসতে হাসতে বলল, মাসিমা একটু আগে ফোনে তোর খোঁজ করছিলেন, ড্রাইভার নিয়ে বেরোসনি বলে চিন্তা। আমি বলেছি তুই আর-এক বন্ধুর বাড়িতে একটু গেছিস, এক্ষুনি এসে পড়বি। ইস, সেই থেকে দরজায় দাঁড়িয়ে আছি।

অপর্ণা মৃদু হেসে রমেনের দিকে ফিরে বলল, গাড়িটা আমার এখন দরকার নেই, আমি তো সেই দু' ঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরব। আপনি বরং ললিতবাবুকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারেন। ওঁর তো শরীর খারাপ।

রমেন ললিতকে একটু চোখ টিপল। তারপর অপর্ণাকে বলল, সেই ভাল, চল রে ললিত।

বলে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রমেন।

গাড়ি ছাড়তেই ললিত বলল, তুই আবার গাড়ির ঝামেলাটা ঘাড়ে নিলি কেন! আবার তো তোকে ফিরতে হবে। বেশ তো দু'জন নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে পড়তাম।

রমেন মৃদুস্বরে বলল, গাড়ি চালানোর একটা নেশা আছে। কতকাল চালাই না! আর কী ভাল গাড়ি দেখছিস! বুইকের হাল-মডেল।

ললিত ঝেঁঝে উঠল, দূর।

রমেন একটু চুপ করে থেকে বলল, মেয়েটা বোধ হয় আমাকে কিছু একটা বলতে চায়। হয়তো একা বলবে। তাই গাড়িটা দিল, যাতে আমি ফিরে আসি।

আমার সামনে বলতে দোষ কী ছিল?

রমেন উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে গাড়ি চালাল রমেন। ময়দানের কাছাকাছি এসে পড়ল।

ললিত বলল, খামোখা পেট্রল পোড়াচ্ছিস!

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ছাড়িয়ে গিয়ে নির্জন রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাল রমেন। আয়, ড্রাইভিং সিটে বোস।

আমি! দূর, আমি ও-সব পারব না। শেখার বয়স চলে গেছে।

আয় না।

দূর, অন্যের গাড়ি, কোথায় চোটফোট লেগে যাবে।

কিন্তু রমেন ছাড়ল না।

ললিত বসল ড্রাইভিং সিটে। অনেকদিন আগে একটু-আধটু শিখেছিল। শিখিয়েছিল রমেন। রমেন তাকে আবার সব বুঝিয়ে দিল। তারপর বলল, চালা।

স্টার্ট দিতেই গাড়ি লাফিয়ে উঠল।

রমেন আস্তে করে বলল, তাড়াহুড়ো নেই। আস্তে চালা।

যন্ত্রপাতিগুলো ধীরে ধীরে অধিকার করে নিচ্ছিল ললিতকে। তীব্র উত্তেজনা বোধ করছিল সে। প্রথমটায় গাড়ি একটু এঁকেবেঁকে যাচ্ছিল, পিছন থেকে সাঁ সাঁ করে গাড়িগুলো তাদের পেরিয়ে যাচ্ছিল। ভয় করছিল ললিতের, যদি ধাক্কা লাগে! রমেন একটা হাতে ধরে রেখেছিল স্টিয়ারিং।

আস্তে আস্তে রোখ আর সাহস বেড়ে যাচ্ছিল ললিতের। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে একটু লালচে মুখে প্রবল মনোযোগের সঙ্গে একাই গাড়িটা চালিয়ে নিচ্ছিল ময়দানের নির্জন রাস্তায় রাস্তায়। পাশে একটু ঘাড় হেলিয়ে চোখ বুজে বসে আছে রমেন, যেন ঘুমোচ্ছে। একবারও সাবধান করছে না ললিতকে।

সাহস বাড়ছিল। উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছিল।

চাপা গলায় সে বলল, রমেন!

উঁ।

ওই যে সামনে একটা ছোট গাড়ি যাচ্ছে, দ্যাখ ওটাকে ওভারটেক করছি।

কর দেখি।

ললিত করল। গাড়িটা চালাচ্ছিল একটা মেয়ে। এক ঝলক সে প্রকাণ্ড বুইকটার দিকে ঈর্ষার চোখে তাকাল। ভীষণ একটা আনন্দ পেল ললিত। এই দেখো আমি ললিত, কত বড় আর দামি একখানা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

তারপরেই একটু হতাশা আসে। গাড়িটা তার নয়।

ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ চক্কর দিল ললিত। সমস্ত মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে সে গাড়ি চালাচ্ছিল। অখণ্ড মনোযোগে।

বোজা চোখে রমেন একটু হাসল।

রমেন!

উঁ।

এবার ফিরি। তুই চালা এবার। ভিড়ের রাস্তায় আমি তো পারব না।

দূর। ভবানীপুর পর্যন্ত তুই চালা। তারপর আমি দেখব।

আশ্চর্য এই, ললিত অনায়াসে ভবানীপুর পর্যন্ত চলে এল। অসুবিধে হচ্ছিল না তা নয়। কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে সে চালাচ্ছিল। ভুল করছিল না।

এলগিন রোডের কাছে গাড়ি থামিয়ে জায়গা বদল করার সময় রমেন চাপা গলায় বলল, সাবাস।

বাচ্চা ছেলের মতো লাজুক হাসল ললিত। তার কপালে ঘাম। হাত-পা কাঁপছে। অনেক—অনেক দিন বাদে আজ সত্যিকারের একটা আনন্দকে সে টের পাচ্ছিল। একটা ছোট্ট সাফল্যের অনাবিল আনন্দ। আমি সব পারি।

প্রতি দিন লক্ষ লক্ষ লোক গাড়ি চালায় যন্ত্রের মতো নির্ভুলভাবে। তারা হয়তো কোনও দিনই ললিতের এই আনন্দকে টের পায় না। একমাত্র ললিত জানে কেন এই আনন্দ।

রাত সাড়ে আটটায় অপর্ণাকে পৌঁছে দিচ্ছিল রমেন।

সারাক্ষণ তেমন কোনও কথা হল না।

শুধু একবার অপর্ণা প্রবল ক্ষোভের সঙ্গে বলল, এখন লোকে আমাকে খারাপ ভাববে। আমি সারা জীবন একজনকে ভালবাসলাম, কিন্তু বিয়ে করছি আর একজনকে। কিন্তু আমি সত্যিই তা চাই না। জানেন! যদি কেউ একজন আমার ভার নিত, যার টাকা পয়সা কিংবা মেয়েমানুষের জন্য একটুও দুর্বলতা নেই তবে কত ভাল হত। কিন্তু সেরকম বোধহয় কেউ নেই, না?

রমেন উত্তর দিল, আছে। বিমান।

অপর্ণা জিজ্ঞেস করে, আপনি—আপনি আমাকে কী করতে বলেন?

আধো-অন্ধকারে রমেন হঠাৎ অপর্ণার দিকে একপলক তাকাল।

ভীষণ চমকে উঠল অপর্ণা। তার মনে হল এ-লোকটা জানে যে অপর্ণা আসলে সেই ছেলেবেলার বয়ঃসন্ধিতে কবে যেন বিমানকে ভালবেসেছিল। তারপর ভালবেসেছিল সেই স্মৃতিকে। তারপর কখনও সে ভালবেসেছে অকিঞ্চনকে ভালবাসার মধ্যে তার নিজের যে মহৎ আত্মত্যাগ আছে, তাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কোনওটাই বিমান নয়। যে-বিমান কর্পোরেশনের জমাদারদের বাবু, যে মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যায়, তাকে সঠিক কবে ভালবেসেছে অপর্ণা?

এ-লোকটা বোধহয় জানে সব। বুঝতে পারে। তাই সে সারা রাস্তায় আর কথা বলল না।

পঁয়ত্রিশ

রায়বাবুর শ্রাদ্ধের দিন ভিতরের উঠোনে কীর্তন দিল অবনীশ। নিমন্ত্রণ পেয়েই রমেন লাফিয়ে উঠে বলল, আমি যাব।

সন্ধেবেলা ললিতকেও জোর করে নিয়ে গেল রমেন।

কয়েকজন রোগা চেহারার কালো লোক খোলে চাঁটি দিয়ে মিনমিন করে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' করছিল। ভিতরের বারান্দায় ভিড় করে বসেছে পাড়ার বুড়ো-বুড়ি আর কচিকাচারা। শম্ভুদের দলটা ঘোরাফেরা করছে। তারা শ্মশানবন্ধু।

রমেন হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, একে কি ছাই কীর্তন বলে!

তারপর একসময়ে নিঃশব্দে নেমে গেল রমেন। দেখা গেল সে কীর্তনীয়াদের মাঝখানে। তার শরীর দুলছে। কেঁপে উঠছে। তারপরই হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল সে, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ..কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে'...

পলকেই পালটে যায় আসরের চেহারা। বিদ্যুতের মতো কী যেন একটা সবাইকে স্পর্শ করে। কেঁপে ওঠে ললিত। দূরাগত বজ্রের মতো গুরুগুরু করে ওঠে খোল।

এমনিতেই চমৎকার গলা রমেনের। সুন্দর গান গায়। তার সঙ্গে এখন এক দুরন্ত ঝড় এসে যোগ দেয়। মানুষজন দুলে ওঠে। থির থির করে কাঁপে পায়ের তলার মাটি। রোগা কালো কীর্তনীয়ারা লাফিয়ে ওঠে রমেনের চারধারে। এ-রকম একজনের অভাবেই যেন এতক্ষণ বৃথা হচ্ছিল তাদের গান। শম্ভু-সুবলেরা এতক্ষণ কোথায় ডুব দিচ্ছিল মাঝে মাঝে, এখন তারা আসর ঘিরে দাঁড়ায়। চিত্রার্পিত হয়ে থাকে।

শূন্যে লাফিয়ে ওঠে রমেন। হুংকার দিয়ে মুহুর্মুহু বলে, হরে কৃষ্ণ হরে রাম... কীর্তনীয়াদের পা হরিণের পায়ের মতো দ্রুত বৃষ্টিপাতের মতো মাটি ছুঁয়ে যায়।

কী করে কী করে এত লোকের সামনে নাচছে রমেন, গান গাইছে? ওর লজ্জা করছে না? ললিতের শরীর কেমন ঝিম মেরে আসে।

কখন যেন শম্ভুর পেশিবহুল চেহারাটা কীর্তনীয়াদের দলে ভিড়ে যায়। সে গায়ের জামা খুলে ফেলেছে। পরনে প্যান্ট, গলায় খোল।

মানুষ বাস্তবতা ভুলে যেতে থাকে। কীর্তনের উদ্দণ্ড ঢেউ আঙুলের মতো তাদের ভিতরে স্নায়ুগুলোকে যন্ত্রের তারের মতো বাজাতে থাকে।

দেখা যায় রমেন কাঁদছে।

বুড়িরা ফুঁপিয়ে উঠে চোখে আঁচল চাপে

হঠাৎ ললিত দেখে তার সামনে রমেন। চোখ জ্বলছে। দু'হাত বাড়িয়ে হঠাৎ তাকে টেনে নেয় রমেন।

ললিত চেঁচিয়ে ওঠে, কী করছিস?

পরমুহূর্তেই সে দেখতে পায় যে, সে আসরের মাঝখানে। তার চারদিকে পাগল লোকগুলো চোখ বুজে নাচছে, গায়ে ঢলে পড়ছে। বিনি মদের মাতাল।

ললিত স্থিরভাবে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। পারে না। রমেন তাকে এক পাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দেয়। ললিত টলে পড়ে যেতে যেতে সামলায়। সুবল তাকে টেনে নিয়ে কী যেন বলে। দু হাত তুলে নাচে আর হাসে।

কীর্তনীয়ালের গানের বোল এখন আর স্পষ্ট বোঝা যায় না। কেবল 'জয়... জয়' ধ্বনি শোনা যায়। কার জয়? কীসের জয়? বুঝবার চেষ্টা করে ললিত। এর ওর ধাক্কা খায়। টলে পড়ে যেতে গেলে কেউ একজন ধরে আবার দাঁড় করিয়ে নেয়। তুলসীতলায় বাবা একা কীর্তন করত। কাঁদত। বাবার হাতে থাকত ছোট করতাল। বিষয়বুদ্ধিহীন বাবা কীর্তনের মধ্যে ভুলে থাকত তার বাস্তব জীবনের ব্যর্থতা। সেই দৃশ্য মনে পড়ে ললিতের। মনে পড়ে ছেলেবেলার হরির লুট। মনে পড়ে কীর্তন তার রক্তে রয়েছে। অথচ সে কখনও কীর্তন করেনি।

জয়-জয়-জয় গর্জন করে তার চারদিকের পাগল লোকেরা। মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি হয়, উলুর শব্দ বন্যার মতো ভেসে আসে। আকুল কান্নার শব্দ শোনা যায়। হৃৎপিণ্ড ঢিপঢিপ করে লাফিয়ে ওঠে।

'জয় জয়' ধ্বনিটা ধরে ললিত। তারপর ফিসফিস করে বলে, জয়-জয়। সংকোচ লজ্জা ভয় ক্রমে কেটে যায়। এত ভিড়ের মধ্যে কে আর তাকে আলাদা করে দেখবে?

তারপর ললিতের আর কিছু খেয়াল থাকে না। সে শুধু মাঝে মাঝে দেখে তার চারধারে অবাস্তব ছায়ার মতো লোক দুরে সরে যাচ্ছে, কাছে আসছে। মাঝে মাঝে কে যেন বুকে টেনে নিচ্ছে তাকে, ছেড়ে দিচ্ছে।

'জয়-জয়' বলে দু'হাত তুলে নাচতে থাকে ললিত।

কে জানে কখন শেষ হয়েছিল কীর্তন। ললিত শুধু শেষে টের পায় তার গায় এক অদ্ভুত উত্তেজনায় কদমফুলি কাঁটা দিয়েছে। কার জয়ধ্বনি সে এতক্ষণ দিয়েছে কে জানে। তবু, জয় হোক—তার জয় হোক।

রমেনকে ঘিরে ভিড়। সবাই জানতে চাইছে রমেন আসলে কে।

প্রায় দিনই সকাল বিকেলে দু'-চারজন করে রমেনের প্রজারা আসে। হাতে করে নিয়ে আসে লাউ, শাকপাতা, ফল, কিবা নগদ টাকা।

ললিত মাঝে মাঝে ধমক দেয়, এ-সব তুই নিস কেন?

রমেন হাসে। নিতে হয়। মানুষে ভালবেসে দিলে নিতে দোষ নেই। মানুষের দান গ্রহণ করা এককালে ব্রাহ্মণের প্রাফেশন ছিল।

কেন সেরকম প্রফেশন থাকবে?

রমেন একটু ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, ললিত, আমার পূর্বপুরুষেরা মানুষের অনেক উপকার করেছিল। মানুষ কৃতজ্ঞ হয়ে সেই ঋণ শোধ করত। ক্রমে ক্রমে ওইভাবেই আমাদের জমিদারি তৈরি হয়েছিল। আবার আমার আমলে চলে গেল জমিদারি। আমি আবার ব্রাহ্মণের পুরনো প্রফেশনে ফিরে এসেছি। ওরা আমাকে ভালবেসে দেয়, আমি নিই।

কেন দেয়? তুই ওদের জন্য কী করিস!

রমেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। আস্তে আস্তে বলে, কী দিই তা ওরা জানে। আমার তো টাকা পয়সা নেই। তাই আমি গিয়ে কেবল ওদের পাশে দাঁড়াই। দেশ ছাড়ার পর ওদের আর কোনও মানসিক আশ্রয় নেই। এককালে শোকে-দুঃখে ওরা আমাদের বাড়িতে ছুটে যেত। এখন তাই ওরা আমাকে দেখলে খুশি হয়। ছুটে আসে। দুঃখের কথা বলে আমাকে। আমি ওদের দাওয়ায় বসি, ছেলেপুলেদের সঙ্গে কথা বলি, কারও বাসায়

গিয়ে কীর্তন গাই, লোকগুলো আবার ঝাঁকি দিয়ে ওঠে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ এখন পয়সা করেছে। কেউ বা ডুবে গেছে। ওদের মধ্যে একটা সমতা আনার চেষ্টা করি। এর ওর কাছ থেকে চেয়ে এনে দিই। একে অন্যকে দেখার কথা বলি। কিন্তু এইটুকু তো মাত্র নয়। ওরা আমার কাছ থেকে টাকা পয়সার সাহায্য তেমন চায় না। ওরা এটুকু ভেবেই খুশি যে, আমি ওদের পাশে আছি। ছোটকর্তাকে ওদের দরকার একটা প্রতিমার মতো, যার মধ্যে বুড়োকর্তার ছাপ আছে। কাজেই আমি ওদের স্বার্থ, আমাকে বাঁচিয়ে রাখা ওদের দায়িত্ব।

ললিত তবু গুনগুন করে আপত্তি করে। রমেনের কথাগুলো সাম্যের বিরোধী। কেন একজন দেবতার মতো হয়ে উঠবে?

রমেন মৃদু হেসে বলে, এককালে তোকে দেখতাম রাত জেগে পোস্টার লিখছিস. ঘুরে ঘুরে পার্টির চাঁদা তুলছিস, মিটিং করছিস, মিছিল সামলাচ্ছিস। নিজের দিকে তোর খেয়ালই থাকত না। তখন তোর মনে একটা প্রকাণ্ড আদর্শ কাজ করছে, সকলের ভাল করার আদর্শ। তুই হয়তো টেরও পোতস না যে, সকলের ভাল করার চেষ্টা করছিস বলে তোকে বাঁচিয়ে রাখা সকলের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি দেখতাম কেউ নিজে থেকেই তোর ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে ধরিয়ে দিচ্ছে, তে এনে দিচ্ছে চা, রাত বারোটা তোর জন্য দোকান খুলিয়ে নিয়ে আসছে ‘পাউরুটি। তুই সে-সব টেরও পাচ্ছিস না। এক মনে কাজ করে যাচ্ছিস। আমার ব্যাপারটাও অনেকটা তেমনি। লোকের স্বার্থ হয়ে ওঠা। আমি কেন নিজের পেটের ধান্দায় ঘুরব, আমার পেটের ধান্দায় ঘুরবে অন্যেরা। কারণ, আমি তো তাদের ধান্দাতেই ঘুরছি।

কিন্তু এই প্রফেশন মহৎ নয়। এর মধ্যে ভিখিরিপনা আছে।

তবে কী করল। চাকরি? সে তো বাঁধা মাইনের ব্যাপার। মাইনের টাকা হাতে পেয়ে তার মাপে মাপে নিজেকে ছোট করে ফেলব, খরচ কমাব, জমাতে শিখব।...দ্যাখ না, সেদিন সঞ্জয়ের কাছে গেলাম, পুরনো দিনের কথা হচ্ছে, তার মাঝখানে হঠাৎ ও খুব অসহায় ভাবে লাজুক মুখে বলল, তুই আমার কাছে দু’-তিন হাজার টাকা পাস, কিন্তু সেটা এক্ষুনি দিতে পারছি না রে। সদ্য গাড়িটা কিনেছি, ওভারহল করতে অনেক খরচ গেছে। বিজনেসেও লস দিলাম অনেক... এইসব কথা। ওর এয়ারকন্ডিশনড় করা অফিসঘরে বসে আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল, সত্যিই সঞ্জয়টা গরিব, ঠিক আগে যেমন গরিব ছিল। কী করে টাকা দেবে ও? ওর যে টাকার বড় দরকার। অথচ ও আমাকে বারবার বলছিল যে ও সন্ন্যাসী হতে চায়, আর কয়েক বছর পরেই ও সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

বলে রমেন হাসে। ললিত চুপ করে থাকে।

কোনও দিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ললিত দেখে, রমেন বসে আছে। জানালার দিকে মুখ। কোলের ওপর জড়ো করা দুটি হাত। নিস্তব্ধ। জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের একটা ফিকে আলো আসছে, সেই আলোতে ললিত দেখে রমেনের দু’ চোখ দিয়ে জলের দুটি ধারা নেমে এসেছে।

দূরে কোথাও একটা কুকুর কাঁদছে। মশারির ও-পাশে জানালা। তার ও-পাশে ধূলিকণার ঝড়ের মতো নক্ষত্রে আকীর্ণ আকাশ। ধোঁয়াটে চাঁদ আকাশে। অপার্থিব মূর্তির মতো রমেন বসে আছে। ললিত বুঝতে পারে, রমেনের চেতনা নেই। সে ধ্যান করছে।

নিশুত রাতে কুকুরের কান্না, অস্পষ্ট আকাশ, ধ্যানস্থ রমেন—সব মিলেমিশে এমন এক স্বপ্নের মতো দেখে ললিত—যেন তা সত্য নয়, অথচ হঠাৎ বুকের ভিতর হু হু বাতাস বয়। কেন যে, ললিত জানে না। জানালা

দিয়ে ঝরে পড়ছে তারার গুঁড়ো, জ্যোৎস্নার মোম। কুকুর কাঁদছে শূন্যতার দিকে চেয়ে। আদিগন্ত ছায়াপথ পড়ে আছে হিম আকাশে। মানুষ হঠাৎ ঘুম ভেঙে চোখ চেয়ে দেখে। মূক হয়ে যায়। বিশ্বজগতের কোন রহস্যের সঙ্গে নিবিড় হয়ে আছে মগ্ন রমেন! ললিত তা কোনও দিনই জানবে না।

ছত্রিশ

অনিমা দাশগুপ্ত নামে সেই মেয়েটি খুব আশ্চর্য হল যেদিন সঞ্জয় ওকে নাম ধরে ডাকল।

কী করে জানলেন?

সঞ্জয় গম্ভীরভাবে বলল, শুধু নাম! আমি আপনার ভক্তদের সংখ্যা পর্যন্ত জানি।

মেয়েটা একটু হাসে, তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। সঞ্জয়ের কামানো মাথার দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে, আপনার মায়ের কী হয়েছিল?

বয়েস। একটু বিষণ্ণভাবে নিজের কথা চিন্তা করে সঞ্জয়। বলে, আমাদেরও হচ্ছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটে যাচ্ছে।

অনিমা এখনও রিনি আর পিকলুর কথা জানে না। আরও সময় দরকার। এখনই বলা যায় না। অনিমা কিন্তু ঘুরেফিরেই জিজ্ঞেস করে তার বাড়িতে কে আছে। সঞ্জয় এড়িয়ে যায়।

সঞ্জয় জানে অনিমার যারা ভক্ত তাদের কারও গাড়ি নেই। একটা গাড়ির যে কত উপযোগ! এই গরিব ভিখিরির দেশে একটা গাড়ি দেখিয়ে কত কিছু করা যায়!

আজ আর সোজা বাড়ি ফেরা হয় না। অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যায় ডালহৌসিতে। ম্যককারিয়নের অদূরে গলির মধ্যে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সিগারেট খায়। একটুক্ষণের মধ্যেই অনিমা চলে আসে। তরপর অনেকক্ষণ নানা রাস্তায় তাদের গাড়ি ঘুরে বেড়ায়।

বাসায় নতুন ফোন ফিট করে দিয়ে গেছে মিস্তিরিরা। ফোন আসার কয়েক দিন পরেই এক রাত্রে বাসায় ফিরে দেখল রিনি খুব অসহায় ভঙ্গিতে বসে আছে সুন্দর মুখখানা শুকনো। কী হয়েছে তা প্রথমে বলল না।

যখন রাতে বাইরের গ্রিল দেওয়া বারান্দায় হুইস্কি নিয়ে রোজকার মতো বসেছে সঞ্জয়, তখন নিঃশব্দে ছায়ার মতো সামনে এসে দাড়াল রিনি।

আজকে একটা অদ্ভুত ফোন এসেছিল।

কে করেছিল?

চিনি না। মোটা গলার একজন পুরুষমানুষ। বলল, আপনাকে একটা খবর জানানো দরকার। আপনার স্বামীর একটু খোজখবর নেবেন। সম্প্রতি উনি—

রিনি থেমে গেল। সঞ্জয় চেয়ে ছিল রিনির দিকে। মেয়েটা বড় নরম। সারা দিন কেঁদেছে হয়তো, এখনও কথা বলার সময়ে ঠোঁট কাঁপছে একটু একটু। রিনির তেজ বলে কিছু নেই। মুশকিলে পড়লেই কেমন অসহায় হয়ে পড়ে। সঞ্জয় ধমক-টমক দিলে উলটে ঝগড়া করতে পারে না, কেঁদে ভাসায়। দুর্বল মেয়ে। কথাটা ঠিক মতো স্পষ্টভাবে বলতে পারছে না। ভয় পাচ্ছে। বললেই দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সঞ্জয় চুপ করে থাকে। ফোনটা কে করেছে তা খানিকটা আন্দাজ করে নেয়। শুভময় ঘোষাল নামে ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ার। অনিমার ভক্তদের মধ্যে সেই সবচেয়ে উজ্জ্বল। ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে। তার প্রতি একটু দুর্বলতা আছে অনিমার।

প্যান্টের হিপ পকেট সাতশোর মতো টাকা ছিল। এটা এক দিনের রোজগার। সঞ্জয় হঠাৎ উঠে গিয়ে ওয়ার্ডরোব খুলে পকেট থেকে টাকার থোকাটা বের করল। রিনির হাতে দিয়ে বলল, এটা রেখে দাও।

রিনি আড়ষ্টভাবে টাকাটা হাতে নিয়ে সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে থাকে। বুঝতে পারে না হঠাৎ এ সময়ে, জরুরি কথার মাঝখানে, সঞ্জয়ের হঠাৎ টাকাটার কথা মনে পড়ল কেন!

রিনির সাদা মুখখানার দিকে চেয়ে হঠাৎ বড় লজ্জা পায় সঞ্জয়।

রিনি বলল, লোকটা বলছিল তুমি নাকি অনিমা নামে একজন মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াও!

রাস্তায় রাস্তায় এখন খুব ভিড়। পুজোর বাজার। দোকানের শো-কেসে সাজানো পুতুল-মেয়ের মুখ চোখে চোখ রেখে হাসে। সুন্দর সব শাড়ির রং রাস্তা আলো করে দেয়। তাদের গায়ে লটকানো ভয়ংকর দাম লেখা টিকিট। স্কুলের পর দোকান দেখতে দেখতে ললিত অনেক দূর হাঁটে। ইচ্ছে করে দোকানে ঢুকে অনেক কিছু সওদা করে নিয়ে যায়। অনেক দিন পর এবার মায়ের জন্য একটা সাদা থান কাপড় কিনেছে সে, তারপর আর কারও জন্যই কিছুই কেনার নেই। তবু দোকানের দিকে চেয়ে পথ হাঁটে ললিত, মানুষের কেনাকাটা দেখে। কখনও ফুটপাথের দোকানে চওড়া পাড় আর সুন্দর নকশার শাড়ি দেখে দাঁড়িয়ে যায়। দাম জিজ্ঞেস করে, শাড়ির গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, কত?

দোকানদার সাগ্রহে বলে, পঁয়ত্রিশ। নিন, কিছু কমে দেব।

ললিত মাথা নেড়ে বলে, থাক।

আশ্চর্যের বিষয় আজকাল রাস্তায় মেয়েরা তার দিকে তাকায়। আগে প্রায়ই মেয়েরা তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। কিন্তু এখন ললিতের চোখ মাঝে-মধ্যে অচেনা পথ-চলতি মেয়ের চোখে আটকে যায়। মেয়েটা চোখ সরায় না, তাকে দেখে, পেরিয়ে গিয়েও এক-আধবার ঘাড় ফেরায়।

দোকানের আয়নায় নিজের মুখখানা মাঝে মাঝে দেখে ললিত। সুন্দর মুখ। অসুস্থতার কোনও ছাপ নেই। মা বলে ছেলেবেলায় তার রং ছিল দেখবার মতো, রোদে পুড়ে আর ঘুরে ঘুরে সে-রং নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ললিত এখন ভাবে, বোধ হয় সেই শিশু বয়সের গায়ের রং আবার ফিরে এসেছে তার।

বোধ হয় মৃত্যুর আগে মানুষের কয়েকটা সুদিন আসে। সে ক'দিনে তাকে ভোগ করে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। একদিন স্কুল থেকে ফিরে সে ঘরে শুয়ে আছে বিছানায়, এমন সময়ে 'মাসিমা, ও মাসিমা' বলে ডেকে খোলা দরজা দিয়ে পালের নৌকোর মতো ভেসে ঘরে এল একটি মেয়ে। সাবলীল লম্বা মেয়েটি, পরনে তাঁতের রঙিন শাড়ি। বাঁ কোলে একটি বাচ্চা। প্রথমে ললিত চেনেনি, মা'ও না। দু'জনেই একটু অবাক হয়ে চেয়ে ছিল। মেয়েটি কোলের বাচ্চাটিকে মেঝেয় দাঁড় করিয়ে মাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই অহংকারের সেই পুরনো ভঙ্গিটি, ঘাড় পিছনে হেলানোর মিষ্টি মুদ্রাদোষটি দেখে চিনতে পারল ললিত। মিতু। স্বেচ্ছায় মিতু কখনও এ-বাসায় আসেনি। এই প্রথম তার স্বেচ্ছায় আসা। এখন তার সিঁথিতে সিঁদুর, কোলে বোধ হয় দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সন্তান।

হাসিমুখে বলল, আমি মিতু।

মা গলায় ঘরঘর শব্দ করে বলল, অ। বোসো। কবে এলে?

কাল এসেছি। বম্বে তো অনেক দূর। আসাই হয় না। চার বছর পর এলাম। পুজোর পরই শ্বশুরবাড়ি যাব ব্যারাকপুরে।

শোয়া থেকে আস্তে আস্তে উঠে বসল ললিত। এখন আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে মিতু। মসৃণ গা, সতেজ শরীর। দেখলেই বোঝা যায় বড়লোকের ঘর করে। ললিত একবার-দু'বারের বেশি তাকাতেই পারল না। ভীষণ লজ্জা করছিল। কেন এসেছে মিতু!

মা রান্নাঘরে গেল, মিতু গেল পিছু পিছু। ললিত একবার ভাবল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়, যাতে মিতুর সঙ্গে দেখা না হয় আর। উঠে সে জামা গায়ে দিল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল। হঠাৎ মনটা বড় ভাল লাগছিল তার। মিতু আসাতে বহুদিনের পুরনো একখানা কাঁটা সরে গেছে। শেষবার এ-বাড়িতে যখন এসেছিল মিতু তখন মায়ের ওপর রাগ করে কেঁদেকেটে মাকে অপমান করে চলে গিয়েছিল। ভেবেছিল মা তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ললিতের সঙ্গে বিয়ে করাতে চায়। সেই লজ্জায় এত দিন কাঁটা হয়ে ছিল ললিত। মিতু নিজে থেকেই এসেছে বলে বড় ভাল লাগছিল ললিতের। জীবনের শেষ কয়েকটি দিন ভরে যাচ্ছে কানায় কানায়। হয়তো মরার সময়ে সে ভরা মন নিয়ে যাবে। কোনও দুঃখ থাকবে না। পৃথিবীর কাছে সব দাবিদাওয়া শেষ হয়ে গেলে মরা কত সহজ হয়ে যায়!

দরজার কাছ থেকে আবার ফিরে এসে চৌকিতে বসল ললিত। সিগারেট ধরাল। শুনতে পেল উঠোনের ও-পাশের রান্নাঘরে মা আর মিতুর গলা, পরস্পর কথা বলছে। ললিত কান পেতে শোনবার চেষ্টা করছিল।

তখন ঘরটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। সন্ধের সামান্য একটু মরা আলোয় ছায়ার মতো একা, একটু কুঁজো হয়ে বসে আছে ললিত। এ সময়ে উঠোন পার হয়ে চলে যাওয়ার জন্য ঘরের মধ্যে এল মিতু। ললিত মুখ না তুলেও বুঝতে পারছিল মিতু চলে যাচ্ছে। জীবনে কোনও দিন মিতুর সঙ্গে তার কোনও কথা হয়নি। আজও হবে না কি? হে ভগবান...

মিতু দরজার মুখ থেকে আস্তে ঘুরে দাড়াল। কোলের বাচ্চাটা কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। আবছা অন্ধকারে মিতুর সুন্দর, অহংকারী মুখখানা বিষণ্ণ দেখল আজ। মৃদু গলায় হঠাৎ মিতু সোজা তার সঙ্গে কথা বলল, এখন কেমন আছেন?

কেমন হঠাৎ কাঠ-আড়ষ্ট হয়ে গেল হাত-পা, গলা বুজে আসছিল। ললিত আস্তে বলল, ভালই।

মিতু এক পাও কাছে এল না, কিন্তু গলার স্বর অনেকটা নিকটজনের মতো শোনাল। বলল, কী হয়েছে!

ললিতের ইচ্ছে ছিল না রোগের নামটা বলে। কী হবে মেয়েটার মন খারাপ করে দিয়ে। পরমুহূর্তেই ইচ্ছেটা পালটে গেল আবার। কেন মিতু চিরকাল সুখী থাকবে? দেখি না ক্যান্সার শুনে ওর মুখটা কেমন পালটে যায়!

ললিত মৃদু গলায় বলে, ক্যান্সার।

প্রথমটায় বুঝতেই পারল না মিতু। বলল, কী!

ললিত আবার বলল!

মিতুর চুড়ি-পরা হাত হঠাৎ ঝনাৎ করে পড়ে যায়। নিশ্বাসের সঙ্গে মিতু বলে, যাঃ! মিথ্যে কথা।

এত আপনজনের মতো শোনায় মিতুর গলা যে, ফের কথাটা শুনতে ইচ্ছে করে।

সত্যিই। ললিত বলে।

কিন্তু আমি যে শুনলাম আপনি শিগগিরই বিয়ে করছেন।

ললিত অবাক হয়, কে বলল?

পাড়ায় সবাই বলছে। শাশ্বতী না কী যেন নাম মেয়েটির!

ললিত অন্ধকারেই মাথা নেড়ে বলে, না।

না?

মিতু একটু চুপ করে থাকে। তারপর আপনমনে বলে, আমি তো জানতাম মাসিমা বলছিলেন কলিক পেন।

মা জানে না।

মিতুর কোলের বাচ্চাটা নড়ে উঠে 'অঃ' শব্দ করল। মিতু চঞ্চল হয়ে বলে, ওকে মশা কামড়াচ্ছে, এবার যাই।

আচ্ছা।

মিতু একটু দ্বিধা করে বলে, অনেক দিন আছি। মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাব।

ললিত বলে, আচ্ছা।

চলেই যাচ্ছিল মিতু। যখন ঘরের দরজার বাইরে তার এক পা তখনই হঠাৎ ললিত জিজ্ঞেস করল, কেন এসেছিলেন?

মিতু থেমে যায়। তারপর মাথা নিচু করে প্রায় ফিসফিস করে বলে, জানি না।

গলিটাকে খুব নির্জন করে দিয়ে মিতু চলে গেল।

ললিত জানে যে তাকে সুখী করা ছাড়া মিতুর এই আসার কোনও দরকারই ছিল না। এইভাবেই শেষ কয়েকটা দিন সে সুখেই কাটাবে।

রাতে এক ডাকেই রমেন সাড়া দেয়। কেন এতক্ষণ না ঘুমিয়ে ললিতের ডাকটারই অপেক্ষায় ছিল। জেগে উঠে বসে রমেন। তার গায়ে হাত রেখে গভীর গলায় বলে, কী রে!

ললিত কী বলবে ভেবে পায় না। ভিতরটা অস্থির লাগে। সারা দিন সে জীবন্ত মানুষজনের ভিতরে ঘুরে বেড়িয়েছে, দেখেছে দোকান, মেয়েদের চোখ, দোকানে সাজানো ফল, বইয়ের মলাট, অচেনা মানুষের মুখ, রাস্তার মোড়ে বকুল গাছ— এইরকমই সব তুচ্ছ বিষয়গুলির জন্য হঠাৎ ব্যথিয়ে ওঠে বুক, দম বন্ধ হয়ে আসে। সামনের পুজোয় শরৎকালে সে এসব দৃশ্য হয়তো আর দেখবে না। এই ব্যক্ত জগৎ ছেড়ে সে কি কোনও অব্যক্ত জগতে চলে যাবে! না কি কোনও অস্তিত্বই আর থাকবে না তার? সে কি আবার জন্ম নেবে? না কি একবারই ললিত এসেছিল, আর আসবে না?

ললিত শ্বাস ফেলে বলে, রমেন, আমি আর বেশি দিন বাঁচব না রে, তুই দেখিস।

রমেন সান্ত্বনা দেয় না, উত্তরও দেয় না। কেবল চুপ করে জেগে বসে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে ললিতের স্বাস কাঁপতে থাকে। তারপর কখন আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

সাঁইত্রিশ

লক্ষ্মীপুজোর পরদিন তুলসী আর মৃদুলা চলে যাচ্ছে। সকাল থেকেই গোছগাছ করছিল মৃদুলা। মাঝে মাঝে গোছানো থামিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছিল। বাইরে বহু দূর পর্যন্ত কলকাতার হিজিবিজি দেখা যায়, একটা স্বচ্ছ ধোঁয়ায় আবৃত। কলকাতার বেশির ভাগই মৃদুলার অচেনা। সে কেবল এতকাল ধরে চিনেছে তাদের বেহালা, তার স্কুল কলেজ, কয়েকজন আত্মীয়ের বাড়ি, বড় জোর কয়েক বার গেছে বোটানিকসে কি চিড়িয়াখানায়—বাদবাকি কলকাতা তার কাছে অচেনা, রহস্যময় এবং ভয়াবহ। ঢাকুরিয়ার বাসার জানালা দিয়ে কলকাতার কিছুই দেখা যায় না। তবু মৃদুলা নির্নিমেষ চেয়ে ছিল। কোথায় যেন নাড়ির যোগ ছিঁড়ে সে চলে যাচ্ছে। মৃদুলার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। বিয়ের পর একবারও বাপের বাড়ি যাওয়া হয়নি। কবে যে যাওয়া হবে আর! কয়েক দিন আগে তার চিঠি পেয়ে বাবা এসেছিল টুপুকে নিয়ে। বাবার শরীর ভেঙে গেছে অনেক, শরীরের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেছে। মুখে কেমন খড়ি-ওঠা শুকনো ভাব, মুখচোখের অবস্থা খুব ব্যথাতুর। টুপু তেমনি লাজুক, তবে আরও একটু রোগা হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে ছাদে চলে গিয়েছিল মৃদুলা। কত কথা জিজ্ঞেস করেছিল। কয়েক দিনের অদেখাতেই দিদিকে লজ্জা পাচ্ছিল টুপু, মাথা নিচু করে, চোখে চোখ না রেখে মিহি গলায় কথা বলছিল। কিছু দিন আগেই যে জলখাবার কম হয়েছে বলে দিদিকে পাখার ডাঁট দিয়ে মেরেছিল তা এখন তাকে দেখলে বিশ্বাসই হয় না। টুপুর কাছেই মৃদুলা শুনেছে বিভু এখন নামকরা গুন্ডা। তার দাপটে পাড়া অস্থির থাকে। কোমরে ছোরা আর পকেটে পাঞ্চ, ব্লেডের টুকরো, কখনও বা হাতে সাইকেলের চেন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রাত্রিবেলা মদ খেয়ে ট্যাক্সিতে ফিরে ট্যাক্সিওয়ালার ওপর হামলা করে। কখনও তাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে পা ফাঁক করে সিগারেট ফোঁকে। সপ্তমী পুজোর দিন গলির মধ্যে সে টুপুকে মুখোমুখি পেয়ে রাস্তা আটকায়। জিজ্ঞেস করে, এই শালা, তোর দিদির ঠিকানা কী রে? টুপু ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে সত্যি কথা বলেছে যে, সে জানে না। বিভু হেসে বলেছে, ভাবিস না, তোর দিদির ঠিকানা ঠিক খুঁজে বের করব। ঢাকুরিয়ার দিকে থাকে আমি জানি। বিশে একদিন দেখেছে কালোমতো শুটকো একটা লোকের সঙ্গে যাচ্ছে। আমি ঠিক খুঁজে বের করব। তারপর দেখিস কী হয়। শুনে মৃদুলা ঠিক আগের মতোই ভয় পেয়েছিল, তবে কেন যেন বিভুর জন্যও এই প্রথম একটু কষ্ট হচ্ছিল তার। টুপুর কাছেই আরও শুনেছে, মা'র বুকে এখন কেমন একটা ব্যথা হয়। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যায়। ডাক্তার দেখে বলে যায় অসুখটা আসলে মনের। মৃদুলা সেকথা বিশ্বাস করে। প্রত্যেকটা পরিবারেরই একটা করে আলাদা ধাঁচ আছে। কোনও পরিবারে রাগ বেশি, যেমন তাদের রাঙা পিসিমার বাড়ির প্রায় সবাই রাগী। সে-রকম, কোনও পরিবারে বেশি লোভ, কিংবা কম। ঠিক তেমনই তাদের পরিবারে সকলেরই একটু ভয়ের ধাঁচ আছে। অল্পেই ভয় পায় তারা। আত্মসমর্পণ করে দেয়। তাই ওইটুকুন ছেলেটা, ওই বিভুর ভয়ে তাদের পরিবারটা তছনছ হয়ে গেল। নইলে তারা গুটিকয় নিরীহ মানুষ, মা বাবা টুপু আর সে মিলে কত শান্তিতে ছিল! রাতে তারা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিত, তারপর মা বাবা আর দুই ভাইবোনের একটা ছোট্ট আসর বসত। কী যে সুন্দর ছিল সেই আসর! বাবা বলত কোর্টকাছারির অদ্ভুত সব গল্প, কত বার বাবার মক্কেল হরিদাসের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে তারা

পরস্পরের গা ঘেঁষে বসেছে। হরিদাস ছিল গুরুতর লোক, গুরুর কথায় ওঠেবসে, সারা দিন দয়াল গুরুর মহিমার কথা লোককে বলে বেড়ায়। বর্ধমানের এক গাঁয়ে একটা লোক অল্পবয়সে সান্নিপাতিকে মারা যাচ্ছিল। তার কচি বউ আর মায়ের কান্না শুনে থাকতে না পেরে হরিদাস গিয়ে বসল তার বিছানায়। হেঁকে বলল, গুরুর নামে বসলাম, আমি বলছি এ রুগি মরবে না এখন। হরিদাস বসেই রইল, রুগিও রইল ঘোর জ্বরবিকারের মধ্যে বেঁচে। হরিদাস নড়ে না, রুগিও মরে না। গাঁয়ের কবিরাজ এসে দেখে বলে, রুগি শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে কী করে যেন বেঁচে আছে সে। সাত দিন নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে বসে রইল হরিদাস, রুগিও রইল। তখন খবর গেল হরিদাসের গুরুর কাছে যে, হরিদাস মুমূর্ষ রুগিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ক্রমে রুগির চোখ গর্তে চলে যাচ্ছে, শরীর হয়ে যাচ্ছে কাঠের মতো শুকনো, তবু বেঁচে আছে। হরিদাস বিছানা ছাড়ছে না, পায়খানা পেচ্ছাবে যাওয়ার সময়ে গায়ের চাদরখানা খুলে রুগির বিছানায় রেখে যায়। শুনেটুনে হরিদাসের গুরুদেব তামাকের নল মুখ থেকে সরিয়ে বললেন, যখন চাদর রেখে যাবে তখন সেটা সরিয়ে নিন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া ভাল না। তাই হয়েছিল। হরিদাসের চাদর সরিয়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মৃত্যু ঘটেছিল। আর-একবার হরিদাস গুরুর নামে উৎসর্গ করা গাছ-পাকা একটা কাঁঠালকে একমাস ঘরে রেখে দিয়েছিল। সে কেবল গাছ থেকে পাড়ার সময়ে একবার বলেছিল, তোকে গুরুর নামে উৎসর্গ করছি, যখন সময় হবে তখন পাকিস। তারপর এক মাস নানা ধান্দায় ঘুরে বেরিয়েছে সে, এক মাস জগদ্দল কঁঠালটিও ছিল একই অবস্থায়। পাকেনি! এইরকম অবিচল ভক্তিও একদিন টলে গিয়েছিল হরিদাসের। তার ক্ষমতার কথা যখন চারধারে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন নিজেকে সে মহাশক্তিমান ভাবতে শুরু করে। বসে বসে সে ভাবত, আমি কম কী? তারপর থেকেই আস্তে আস্তে তার ক্ষমতা নিবে যেতে লাগল। এতটাই নিবে গেল যে, শেষজীবনে সে গুরুর সঙ্গে মামলায় নামে, তার গুরুর নামে উৎসর্গ করা সম্পত্তি ফেরত চায়। অল্পেই বুড়িয়ে যাওয়া হরিদাস নিজের এই পাপের গল্প বলত বাবাকে, চটি খুলে মারত নিজের গালে। গুরু তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন, আর ফিরিয়ে নিলেন তাকে দেওয়া সেই অপার্থিব শক্তি। হরিদাস বাবাকে দুঃখ করে বলত, সাধু মানে জাদুকর নয়, বরং ত্যাগী, প্রেমী। বড় দেরিতে সেটা বুঝলাম।

তাদের সেই পারিবারিক, ছোট্ট আসরটিতে আরও কত গল্প হত! তারা পরস্পরের গা ঘেঁষে, গা শুঁকে বসত। কলেজের বন্ধুদের গল্প করত মৃদুলা, কখনও বা গান শোনাত, কখনও কারও অদ্ভুত কথা বা আচরণ নকল করে দেখিয়ে হাসাত মা-বাবাকে। বেশ ছিল তারা—ভিতু, আমুদে, পরস্পরের মধ্যে গভীর সম্পর্ক। হঠাৎ বাজপাখির মতো ছোঁ মারল বিভু। নইলে আজও মৃদুলা বেহালার সেই বাসায় সকাল-বিকেল তানপুরা নিয়ে বসত, গ্রীষ্মের বিকেলে গা ধুয়ে চলে যেত ছাদে, বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তারা আর চাঁদ আর কলকাতার আকাশরেখায় রঙিন আলো দেখে কীরকম আনন্দ পেত!

বিভু জানেও না সে মানুষের কত ক্ষতি করেছে। সে চারজন ভিতু মানুষকে করে দিয়েছে দুর্বল, অসুস্থ, তাদের আয়ু যাচ্ছে কমে। তাদের সংসারে এখন লক্ষ্মী ছেড়ে যাওয়া ছন্নছাড়া ভাব। বাড়িতে কখন বোমা পড়ে সেই চিন্তায় বাবা কোর্টে ভাল সওয়াল-জবাব করতে পারছে না। অচিরে তার পসার কমে যাবে।

জানালা দিয়ে বাইরে কলকাতার সামান্য দৃশ্যটুকু দেখে মৃদুলা, আর ভাবে, এই শহর ছেড়ে সে যে চলে যাচ্ছে তার কারণও ওই বিভু। সেদিন সিনেমা হলে অনেকটা বিভুর মতো দেখতে সেই লোকটা তাকে চিমটি কেটে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তুলসী কলকাতার ওপর খেপে গেল। ভাগ্যক্রমে মৃদুলার বিয়েও হয়েছে

এক ভিতু মানুষের সঙ্গে, যে কেবল পালিয়ে যেতে শিখেছে, রুখে দাঁড়াতে জানেই না। ফলে, এখন অনিশ্চয়তার মধ্যে পাড়ি দিচ্ছে তারা দু'জন। কেমন হবে পলাশপুর জায়গাটা? আগে খুব পলাশপুরের নিন্দে করত তুলসী। আজকাল বলে, কলকাতায় থাকা মানে পৃথিবী এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া। এখানে পচে গেলাম। মৃদুলা জানে এ-সব মন-ভোলানো কথা। পলাশপুরে নিশ্চয়ই ভরসন্ধেয় শেয়াল চলে আসে উঠোনে, রাতদুপুরে কাঁদে কুকুর, ঘাসে গা মিলিয়ে চলে বেড়ায় সাপ, আর জোঁক লাফায়। গ্রামীণ মানুষগুলোর সঙ্গেও মিলমিশ হতে সময় লাগবে অনেক। তারা কলকাতার লোক, তারা এখন কলকাতার প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। কেমন লাগবে মৃদুলার?

দুপুরবেলা বাসনের বস্তার মুখ দড়ি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে তুলসী তার ঘেমো পরিশ্রান্ত মুখখানা মৃদুলার কানের কাছে এগিয়ে এনে বলল, মায়ের একটা সুন্দর সাঞ্চা-হাতা ছিল। পানের মতো দেখতে। কাঁসার, আর খুব ভারী। বউদি সেটা সরিয়ে রেখেছে কোথাও, খুঁজে বার করো দেখি।

উদাসীন গলায় মৃদুলা বলে, বাদ দাও। আমরা স্টেনলেস স্টিলের জিনিস কিনে নেব।

তুলসী মুখ বিস্বাদ করে বলে, ইঃ! সে-রকম জিনিস আর হয়! মা আমাকে একবার সেই হাতাটা দিয়ে পিটিয়েছিল। আমি ভীষণ কান্নাকাটি করায় মা বলেছিল, এটা তোর বউকে দেব, কাদিস না। হাতাটার একটা সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু আছে।

ভাগ-বাঁটোয়ারা অনেক কিছুই সরিয়ে রেখেছিল তুলসীর বউদি। কিন্তু মৃদুলা তেমন গা করল না। যেমন মৃত্যুর আগে মানুষের মায়া কমে যায় তেমনি মায়া কমে যাচ্ছিল তার। সে আড়ালে আবডালে কাঁদছিল।

বাসনের বস্তা বেঁধে তুলসী যখন ছাদের সিড়ির চাতালে বসে সিগারেট ধরিয়েছে তখন মৃদুলা তার পিঠ খুঁটে দিতে দিতে বলল, আবার আমরা ফিরে আসব। তুমি কলকাতায় চাকরি খুঁজো। ওখানে গিয়ে গা ছেড়ে দিয়ো না। গা ছাড়লে তুমি চাষাভুষা হয়ে যাবে।

কলকাতায় চাকরি! শুনে তুলসী একটু চমকে ওঠে। কয়েক দিন আগে ললিত তাকে বলেছিল, তুলসী, আমি সেক্রেটারি আর হেডমাস্টারকে বলে রাখব আমার চাকরিটা যাতে তোর হয়। সেই থেকে ভিতরে ভিতরে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও একটা লোভ কাজ করছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ মনে হয়, কলকাতায় ললিতের চাকরিটা পেলে মন্দ হত না। পরমুহূর্তেই সচেতন হয়ে সে নিজেকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা টানা-পোড়েন চলতে থাকে। কোথায় যেন ভিতরে ভিতরে ভাল-তুলসী আর মন্দ-তুলসীর একটা অবিরাম মল্লযুদ্ধ চলছে। কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। তাই মৃদুলার কথা শুনে তুলসী একটু চমকে ওঠে। তারপর নিঃশব্দে সিগারেট টানতে থাকে। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ খেয়াল করে বলে, আজ যাওয়ার সময়ে ললিতের দেওয়া শাড়িটা পরে যেয়ো।

কেন?

এমনিই। শাড়িটা ও দিয়ে যাওয়ার পর একদিনও পরোনি।

বাঃ। আমি যে নীল মুর্শিদাবাদিটা—

না। তুলসী দৃঢ়ভাবে বলে, ললিতের দেওয়াটা।

একটু থমকে যায় মৃদুলা। বলে, আচ্ছা।

তারপর খানিকক্ষণ তুলসীর পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, ললিতবাবু তো চাকরি ছেড়েই দেবেন! তখন তোমার ওখানে হয় না?

শুনে তুলসী চট করে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকে। মৃদুলা পিছু পিছু নেমে আসে। বলে, কলকাতায় তো আমাদের ফিরে আসতেই হবে। আমি চিরকাল পলাশপুরে থাকতে পারব না।

তুলসী ফিরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ হেঁকে বলে ওঠে, আমি পলাশপুরের লোক। আজ থেকে আমি চিরকাল পলাশপুরের লোক। আই ডিজওন ক্যালকাটা।

পিতু মেয়েটাকে কোনও দিনই পছন্দ করত না মৃদুলা। পিতু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাপ-মা'র সামনেই হিন্দি গান গুনগুন করে কোমর দোলায়। ছাদের আলসে থেকে ঝুঁকে রাস্তার ছেলেদের ইশারা করে! মৃদুলার সঙ্গে তার বনে না। কিন্তু আজ পিতু সারাদিন কাঁদছে। 'বন্ধের পর পরীক্ষা না হলে ঠিক তোমার সঙ্গে চলে যেতাম কাকিমা, অনেক দিন থেকে আসতাম তোমাদের পলাশপুরে। সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসতাম ঠিক শাশুড়িদের মতো।' কান্নার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে এ-রকম ঠাট্টাও করছে পিতু।

ইস! কত কাজের মেয়ে। জল গড়িয়ে খেতে পারে না। পরীক্ষার পরে যেয়ো, দেখব কেমন।

একটু হাসিঠাট্টা করেই পিতু 'ইস, সত্যি চলে যাচ্ছ' বলে থমথমে মুখ করে থাকে, চোখে টসটস করে জল। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুলাও কঁদতে বসে।

স্টেশনে খুব বেশি লোক আসবে বলে আশা করেনি তুলসী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বিদায় জানাতে অনেক লোক এসে গেল। সময়মতো এল না কেবল সঞ্জয়। কথা ছিল সে তার গাড়ি নিয়ে এসে তুলসীকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে। সঞ্জয়ের কথার খেলাপ বড় একটা হয় না। এটা সেই অন্যতম সদগুণ যার ওপর সঞ্জয় বড় হয়েছে। বেলা তিনটে অবধি তার জন্য অপেক্ষা করে অবশেষে ট্যাক্সি ধরতে হল।

বালিগঞ্জ স্টেশনের ওভারব্রিজের তলায় দাড়িয়ে ছিল লম্বা রমেন, উজ্জ্বল কিংবা শেষ উজ্জ্বল চেহারার চলিত, তার বা ধারে সার্জেন্টের পোশাক পরা, কোমরে পিস্তলওলা একজন লম্বা চওড়া লোক। দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিল, ললিত আর রমেনকে পুলিশ ধরেছে। কাছে এসে শম্ভুকে চিনতে পেরে খুব জোরে শ্বাস ছাড়ল তুলসী। বলল, হাঁরে, আমি কলকাতায় থাকতে থাকতে তুই সার্জেন্ট হলি না! তোর ভরসায় নিশ্চিন্তে রাস্তায় হাঁটতাম কয়েক দিন।

শম্ভু শুনে তৃপ্তির চওড়া বোকা-হাসি হাসল একখানা। তারপর জড়সড় মৃদুলার পাশে শাড়ী-পরা কচি চেহারার পিতুকে আড়চোখে লক্ষ করে অকারণে পিস্তলের খাপের ওপর হাতখানা রাখল সে।

দূর থেকেই বাবা আর টুপুকে প্লাটফর্মে ভিড়ের মধ্যে লক্ষ করে হাত তুলল মৃদুলা। শরীর ভাল থাকলে চেঁচিয়ে উঠত। টুপ তাকে দেখতে পেয়ে বাবাকে ডেকে আঙুল দিয়ে দিদিকে দেখিয়ে দিল। কী করুণ, কী স্নেহময় হাসি ফুটল মুখে! পিতুর হাত ছাড়িয়ে ছুটে লাইন পেরিয়ে প্লাটফর্মে উঠে গেল মৃদুলা।

মাকে আনলে না বাবা! একটু দেখতাম।

তার শরীর ভাল না রে। তা ছাড়া বাড়িটা ফাঁকা থাকবে।

তোমরা কবে যাচ্ছ পলাশপুরে, বলল। আমরা ওখানে একা, একদম মন টিকবে না। তোমরা গিয়ে এক-দুই মাস থাকবে। বলতে বলতে মৃদুলা একটু থেমে ভাবে। তারপর বলে, চলো না, কলকাতার বাসা উঠিয়ে সবাই

পলাশপুরে যাই। ওখানে সবাই কাছাকাছি থাকব।

পলাশপুর সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই মৃদুলার, কিন্তু সে মনশ্চক্ষে দেখতে পায় সে এক স্বপ্নের দেশ— যেখানে বাস্তবের কোনও রূঢ়তা নেই, যেখানে বাইরের দুর্দৈব এসে সংসার ভেঙে দেয় না, যেখানে সবাই চিরকাল সুখে থাকে। এইরকম এক পলাশপুরের চিন্তা করে সে বড় আশান্বিত হচ্ছিল।

বাবা তার মুখখানা খুঁটিয়ে দেখছিলেন। ধীর স্বরে বললেন, ভয়ে ভয়ে থেকেই আমরা শেষ হয়ে গেলাম। ছেলেটার বড় বাড় বেড়েছে। কেউ এমন নেই যে ওকে ঠান্ডা করতে পারে। কানাঘুষো শুনছি আজকাল খুনজখম শুরু করেছে।

মৃদুলার বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে। ব্যর্থ হয়ে জিজ্ঞেস করে, তা হলে কী হবে! মা গো! তুমি শিগগির একটা কিছু করো। পলাশপুর এমন কিছু দূর নয়, তুমি ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে পারবে।

বাবা ম্লান শুকনো মুখে হাসলেন, তাই কি হয়! পালিয়ে যাওয়াটা ভাল দেখাবে না। বরং সহ্য করে দেখি আরও কিছু দিন, তারপর না হয় অন্য পাড়ায় বাসা নেব।

একসময়ে ফাঁক বুঝে টুপু মৃদুলার কানে কানে বলল, দিদি, আমাকে পলাশপুরে নিয়ে যাবি? আমি জামাইবাবুর স্কুলে পড়ব।

মৃদুলা আকুল চোখে অসহায়ভাবে চোদ্দো বছরের টুপুর কচি, নরম আর ভিতু মুখখানা দেখে। কী যে বলবে ভেবে পায় না।

টুপু মৃদু স্বরে বলে, বেহালায় আমার একটুও ভাল লাগে না।

কেন রে?

টুপু কী একটু ভেবে লজ্জায় লাল হয়। চোখ নামিয়ে নেয়। কী করে সে মৃদুলাকে বলবে যে, পাড়ার রাস্তা দিয়ে সে হাঁটতে পারে না। বিভুর দল এখনও তাকে দেখলেই দুর থেকে চেঁচিয়ে বলে, এই বিভুর শালা। সেই থেকে 'বিভুর শালা' বলে খ্যাপায়। সে দুর্বল, ভিতু, মারপিট করতে পারে না, কাউকে ভয়ও দেখাতে পারে না। লজ্জায় সে কেবল মুখ লুকোয়। মাঝে মাঝে পড়ার টেবিলে বসে লজ্জায় আর অপমানে কাঁদে।

মৃদুলা বুঝতে পারে, টুপু পালাতে চায়। নিশ্চিন্ত, নিরাপদ এবং সম্মানজনক পরিবেশে চলে যেতে চায় সে।

টুপুর পিঠে হাত রাখে মৃদুলা। নরম গলায় বলে, যত দিন মা-বাবা আছে এখানে ততদিন তাদের কাছেই থাক। তুই ছাড়া দু'জনকে দেখবে কে? তুই কাছে না থাকলে মা বাবা আরও ভেঙে পড়বে। একটু চুপ করে মৃদুলা আবার বলল, মাঝে মাঝে যখনই ইচ্ছে হবে তখনই পলাশপুরে চলে যাবি।

কেমন একটু হতাশ আর স্তিমিত হয়ে যায় টুপু। এত দিন সে মনে মনে কল্পনা করেছে, কলকাতার বাইরে অনেক দূরে মেঠো সুন্দর গ্রামখানায় সে চলে যাবে, তারপর সেইখানেই থেকে যাবে সে। দিদিকে বললেই নিয়ে যাবে দিদি। বেহালার বাসায় আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না তার। বড় ভয় করে, লজ্জা লাগে।

বাবা আর দিদি কথা বলছে, টুপু একটু দূরে সরে দাঁড়াল। প্লাটফর্মের শানে একটু জুতো ঘষল। অন্যমনস্কভাবে সে ভাবছিল, খুব শিগগিরই সে একটা ব্যায়ামাগারে ভরতি হবে। সারিবাদি সালসার বিজ্ঞাপনে যে বিপুল চেহারার লোকটাকে দেখা যায় দু'হাতে প্রকাণ্ড একটা সাপকে ধরে পিষে ফেলছে, ঠিক ওইরকমই একটা শরীর বানাবে সে।

অন্যমনস্কভাবে চারদিকে চাইছিল টুপু। হঠাৎ একসময়ে চোখ তুলে কিছু দেখে সে খুব স্থির হয়ে গেল। ওভারব্রিজের ওপরে লোহার রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে একটা বিমের ধার ঘেঁষে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার চাপা গাঢ় কালচে রঙের প্যান্ট আর ঘি-রঙের টেরিলিনের শার্ট স্পষ্ট চেনা যায়। চোখে গগলস, খুব নির্বিকারভাবে সিগারেট টানছে। বিকেলের আলো খুব নিস্তেজ, তবু লোকটাকে চিনতে ভুল হয় না। চোখে গগলস বলে বোঝা যায় না কোন দিকে চেয়ে আছে। তবু টুপু বোঝে যে, বিভু তাকে দেখছে না, প্লাটফর্মের হাজারটা লোকের কাউকেই। তার চোখ এক নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির।

ভয়ে টুপুর মুখ সাদা হয়ে গেল। দিদি কিংবা বাবা কেউ লক্ষ করেনি বিভুকে। টুপু তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিয়ে নিজের জুতোর ডগার দিকে চেয়ে রইল।

জিনিসগুলো যেখানে নামিয়ে স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে সেখানে ছোট ভাইটার হাত ধরে নিজের বাবা-মার সঙ্গে আলাদা দাড়িয়ে ছিল পিতু। প্রকাণ্ড চেহারার সার্জেন্টটা তার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। যত বড় চেহারা লোকটার ততখানি সাহসী নয়। বরং ভিতু। চোখে চোখ পড়ল তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিচ্ছে। অত ঘাবড়াচ্ছে কেন ছেলেটা। পিতু তো চোখ দিয়ে বলতেই চাইছে যে, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। সার্জেন্টদের আমি সত্যিই পছন্দ করি।

ট্রাঙ্কের ওপর রাখা বেতের ঝুড়িটাকে একটু ঠেলে দিয়ে সেখানে বসল পিতু। ছোট্ট রুমালে নাকের নীচের সামান্য ঘাম চেপে নিল। তারপর হাতে থুতনি রেখে ঝুকে বসে চেয়ে রইল লোকটার দিকে। লোকটা কাকার চেনা, নাম নেছে শম্ভু। লোকটা যদি সাহসী হত তা হলে এই স্টেশনেই লোকটার সঙ্গে আলাপ হয়ে থাকত। কাল স্কুলের বন্ধুদের সে তার সার্জেন্ট-ভক্তের কথা অহংকার করে বলতে পারত।

ওদিকে অল্প অল্প করে ঘেমে যাচ্ছিল শম্ভু। মেয়েটার চোখে চোখ রাখতে পারছিল না। কচি সতেজ শরীরে, মোম-মাখানো মসৃণ চামড়া আর লম্বাটে ধাঁচের মুখওলা কিশোরীটা তাকে ওলটপালট করে দিচ্ছে। বেশ ভাইঝিটি তুলসীদার। যদি কোনও দিন সুযোগ হয় তবে সে তার লাল মোটরসাইকেলের পাশে ছোট খোপগাড়িতে বসিয়ে নিয়ে মেয়েটিকে সারা কলকাতা দেখিয়ে বেড়াবে।

এতদিন মেয়েদের কথা ভাবতেই পারত না শম্ভু। জিমনাশিয়ামের ইনস্ট্রাকটর কড়া ব্রহ্মচর্য করে যেতে বলেছিল তাকে। স্বাস্থ্যকে বরাবর ভালবেসে এসেছে শম্ভু। তাই এতকাল মেয়েদের ভাল করে চেনেনি সে। গোরুর মতো ছোলা মুগ খেয়েছে। কাঁচা ডিম গিলেছে। কিন্তু এবার এই প্রকাণ্ড শরীরটার একটা মূল্য পেতে ইচ্ছে করে। কেউ মুগ্ধ হোক, ভালবাসুক। পাখা ঝাপটাক বুকের মধ্যে। ছোট্ট পাখির মতো একটি মেয়ে, একটি কিশোরী।

শম্ভু প্রাণপণে ভেবে বের করতে চেষ্টা করল, এটা কীসের ইঙ্গিত।

শুক্রবার দিন বিকেলে অফিসের পর নিজের গাড়িতে নাকি দিঘায় গেছে সঞ্জয়। বাড়িতে রিনিকে ফোনে জানিয়ে গেছে যে, সে দিঘায় যাচ্ছে। তারপর থেকে আর কয়েক দিন তার কোনও পাত্তা নেই। এ দিকে ললিত আর রমেনকে অনেক আগেই বলে রেখেছিল সঞ্জয়, সামনের রবিবার তোরা আমার বাসায় খাবি। রমেনকে বলেছিল, তোর টাকাটা রবিবারে নিবি। সব দিয়ে-থুয়ে এবার আমি ঋণমুক্ত হব। অথচ রবিবারে তার বাসায় গিয়ে সে নেই জেনে দু'জনেই বেকুব। রিনি অবশ্য তাদের যথাসাধ্য আপ্যায়ন করেছে। কিন্তু খাওয়ার টেবিলে হঠাৎ রিনি ভেঙে পড়েছিল। খুব কান্নাকাটি করে বলল যে, প্রায়ই নাকি বাসায় ভুতুড়ে টেলিফোন

আসে। একজন লোক টেলিফোনে বলে, মিস দাশগুপ্ত নামে কে একজন মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় সঞ্জয়। ময়দানের অন্ধকারে গাড়ি থামিয়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। দিঘাতেও সঞ্জয় গেছে সেই মেয়েটির সঙ্গেই।

শুনে তুলসীর মন খারাপ হয়ে গেল। সঞ্জয় তাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজ গাড়ি নিয়ে আসেনি। তার অর্থ, সে এখনও ফোরেনি কলকাতায়। সঞ্জয় কথার খেলাপ করেছে আজ। অথচ কোনও দিন করত না। কতকগুলো সদ্‌গুণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সঞ্জয়। ধৈর্য, অধ্যবসায়, অবিচল পরিশ্রম আর নিষ্ঠা— যে-গুণগুলো তাদের আর কারও নেই। যদি সঞ্জয়ের কখনও পতন হয় তবে তুলসীর কাছে অনেকগুলো সদ্‌গুণের অর্থ নষ্ট হয়ে যাবে।

চারিদিকে হই-হট্টগোল শুনে বোঝা যাচ্ছিল যে, ট্রেন আসছে। উবু হয়ে বসে থাকা লোকজন মুখের বিড়ি ফেলে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

তুলসী চেঁচিয়ে বলে, শম্ভু, তুই তো ব্যায়ামবীর, আমার মালপত্রে একটু হাত লাগা।

শুনে শম্ভু গটগট করে হেঁটে গেল। পিতুর কাছে আসতেই উঠে দাঁড়াল পিতু। নিচু হয়ে ট্রাঙ্কটা হাতলে ধরে আলগা করে ওজন দেখার সময়ে শম্ভু বড় মিষ্টি একটা গন্ধ পায়। না, এটা স্নো-পাউডারের গন্ধ নয়। সে-গন্ধ ছাপিয়ে কিশোরী-দেহের ঘামের বোঁটকা মিষ্টি নেশারু গন্ধ পায় সে। চকিতে এক টানে ট্রাঙ্কটাকে মাটি থেকে আলগা করে ফেলে। এক হাতে। সে জানে, এভাবে গায়ের জোরটা কাউকে দেখানো এক ধরনের বোকামি। চারপাশের লোকজন তাকে হাঁ করে দেখছে। কিন্তু সে আর কী করতে পারে! শরীরের জোর ছাড়া তার আর কী আছে যা সে মেয়েটিকে দেখাতে পারে?

ট্রাঙ্কটা আবার নামিয়ে রেখে পিতুর দিকে চেয়ে হাসল শম্ভু। বলল, তেমন ভারী নয় তো!

নয়! ভারী অবাক হয় পিতু। বলে, ওর মধ্যে একগাদা কাচের বাসন আর বই আছে। খুব ভারী হওয়ার কথা।

পরিতৃপ্তির বোকা-হাসি হাসল শম্ভু।

রমেন অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করেছে, ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে কী যেন লক্ষ করছে দুর্গাপুরের সেই ছেলেটা। খুনি-চোখ পরকলায় ঢেকে রেখেছে। খুব অন্যমনস্ক। মাঝে মাঝে হাতের আঙুলের একটা আংটির পাথর মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

প্লাটফর্মের মাঝামাঝি হেঁটে এসে ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেটিকে দেখল। বড় অসহায় ছেলেটির ভঙ্গি। পৃথিবীতে বড় অনিশ্চয়তা বোধ করছে ও।

তুলসীর শালা বাচ্চা ছেলেটি জুতোর ডগা শানে ঘষতে ঘষতে হঠাৎ মুখ তুলে ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়ানো ছেলেটিকে দেখল। তার মুখ সাদাটে। তাতে লেখা আছে ভয়। রমেন বুঝতে পারছিল না, ওভারব্রিজের ওপর থেকে দুর্গাপুরের ছেলেটা কাকে দেখছে। সে খানিকটা আন্দাজে তুলসীর শালার পাশে দাঁড়াল। তার কাঁধে হাত রেখে বলল, কী হয়েছে?

ছেলেটা ভীষণ চমকে উঠে তার দিকে তাকাল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, না, কিছু না।

কিন্তু স্বস্তি পেল না রমেন। তার মন একটি কোনও বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল। সে দাঁড়িয়ে থাকল। দেখল ওভারব্রিজের ওপর থেকে দুর্গাপুরের ছেলেটা আস্তে আস্তে সরে আসছে সিঁড়ির দিকে। একটু পরেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল ছেলেটা। কালো চশমার ওপর তার কোঁচকানো ভ্রূ আর চোয়ালের দৃঢ়তা লক্ষ করে রমেন।

খুব কাছ দিয়ে বুক ঘেঁষে অন্যমনস্কের মতো হেঁটে গেল সে, কিন্তু রমেনকে লক্ষ করল না। তারপরেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল ছেলেটা।

তুলসীর শালা গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে মৃদুলা স্থির চোখে ভিড়ের ভিতরে কী যেন দেখছে। ঠোঁট কাঁপছে তার। তুলসীর শ্বশুরের চোখ কেমন ঘোলাটে, চঞ্চল। দু' হাতে আঙুল মটকাচ্ছেন তিনি। হাঁ করে শ্বাস টানছেন।

ঠিক এই সময়ে গাড়ির গুড়গুড় গম্ভীর শব্দ হচ্ছিল। তুলসী হেঁকে বলল, রমেন, তোর তো কোনও পিছুটান নেই, আমার সঙ্গে পলাশপুর যাবি? কয়েক দিন থেকে আসবি আমার সঙ্গে! একা এত মালপত্র নিয়ে সন্ধেবেলায় নামতে কেমন ভয় করছে।

রমেন একটুও চিন্তা না করে বলল, যাব।

বিভু মনস্থির করতে পারছিল না। সে খবর পেয়ে সঠিক পিছু নিয়ে এসেছে স্টেশনে। ওভারব্রিজ থেকে দেখেছে মৃদুলাকে এতক্ষণ। কিন্তু হায় ঈশ্বর, এ কী চেহারা হয়েছে মৃদুলার? কী রোগা হতশ্রী, শুষ্ক চেহারা! চোখের নীচে কালি, হনুর হাড় উঁচু, ঠোঁটে শুকিয়ে আছে পানের রস। কনুইয়ের চামড়ায় পড়েছে কড়া। গায়ের রং ফ্যাকাসে। হায় ঈশ্বর! এর কাছে আর কী চাওয়ার আছে বিভুর?

এতকাল বৃথাই সে ডাকপিয়নকে ভয় দেখিয়ে মা-বাবাকে লেখা মৃদুলার চিঠিগুলো পড়েছে। লোক লাগিয়ে খুঁজে বের করেছে ঠিকানা। পিছু নিয়ে এসেছে এত দূরে। ভেবেছিল, পলাশপুর পর্যন্ত যাবে। তারপর একদিন ওর স্বামী স্কুলে গেলে নির্জন দুপুরে হানা দেবে মৃদুলার দরজায়। বলবে, ওই শুটকো লোকটার চেয়ে কি আমি খারাপ ছিলাম? দেখো তোমার জন্যই আমি আজ ফেরারি, পুলিশ কেস পিছনে নিয়ে ঘুরছি। এ-বিষয়ে তোমার কী বলার আছে!

কিন্তু খুব কাছ থেকে মৃদুলাকে দেখার পর বিভু ভিড় ঠেলে অনেক দূর এগিয়ে গেল। ফিরে এসে আর-একবার মৃদুলাকে দেখতে ইচ্ছে করল না। প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তটা নির্জন। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে। গাড়ি এসে গেলে সে উদাসীন চোখে লক্ষ করল, ঢেউয়ের মতো হাজার হাজার মানুষ আছড়ে পড়ছে গাড়িতে। তার উঠতে ইচ্ছে করল না।

গাড়ি ছেড়ে গেল। আস্তে আস্তে ট্রেনের কোনও একটা জানালায় কবেকার দেখা একটা আধ-চেনা লোকের মুখ লক্ষ করে হঠাৎ সে চমকে ওঠে। বড় সুন্দর মুখখানা। কবে, কোথায় যেন দেখেছে। ঠিক মনে পড়ল না। ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে ভাবতে ফিরে যেতে লাগল বিভু।

আটত্রিশ

সেই রাত্রে আর রমেনের ফেরা হল না। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে যখন ট্রেনটা ছাড়ছিল তখন হতভম্ব ললিত চেঁচিয়ে তাকে বলেছিল, তুই সত্যিই চললি নাকি?

রমেন মৃদু হেসে ঘাড় নাড়তে ললিত আবার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কবে ফিরবি?

রমেন তার উত্তর দিতে পারেনি। আসলে সে তো কোথাও ফেরে না। যেখানেই সে যায় সেখানেই তার ফিরে যাওয়া। অন্তত ওই রকমভাবেই ভাবতে চেষ্টা করে রমেন। আশ্চর্য এই যে, ভাবতে আজকাল আর অসুবিধে হয় না। তবু ললিতের জন্য কষ্ট হচ্ছিল। রমেনকে ছাড়া আজকাল বোধ হয় ললিতের একটু একা-একা লাগে।

পলাশপুরের নতুন বাসায় পা দিতে-না-দিতে মৃদুলার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সন্ধের মুখে পৌঁছে তারা খানিক দূর ইলেকট্রিকের আলো আর পিচের রাস্তা পেল। তারপর অন্ধকার কাঁচা রাস্তায় একটুখানি গিয়ে ফাঁকায়, প্রায় মাঠের মধ্যে অন্ধকার বাসা। তুলসীর ছাত্ররা আর কয়েকজন মাস্টার, বাড়িওয়ালা নিজে— সবাই মিলে কয়েক পলকে পুরুষালি রীতিতে যেমন-তেমন ভাবে ঘর দু'খানা সাজিয়ে ফেলতে সাহায্য করল। কিন্তু হ্যারিকেনের আলোয় যে ধোঁয়াটে অন্ধকার সৃষ্টি হয়ে থাকে তাতে অভ্যাস ছিল না বলে মৃদুলার কেবল মনে হচ্ছিল সে এক চির অন্ধকারের নির্বাসনে এসেছে। আর কোনও দিন কলকাতা আর বেহালার মুখ দেখবে না। বাড়ির ভিতরদিককার দরজা খুলে ভিতর-বারান্দায় দাঁড়াতেই প্রতিপদের চাঁদের আলোয় ভাসা উঠোন, তারপর আগাছার বেড়া, আর বহুদূর বিস্তৃত এক কুয়াশায় মেঘাচ্ছন্ন আগাছা কণ্টকিত প্রান্তর দেখে তার মনে হল সে মৃত্যুর পরের জগতে চলে এসেছে। চারদিকের এ-জগৎ বেঁচে থাকার জগৎ নয়।

চা খেয়ে সবাই বিদায় নিয়ে গেলে রইল কেবল তুলসীর লম্বা সন্ন্যাসী বন্ধুটি। এও হয়তো কাল কি পরশু চলে যাবে। ভেবে মৃদুলার কেমন কান্না পায়। এখন যে-কোনও মানুষ কাছে থাকলেই ভাল লাগবে। যে-কোনও মানুষ।

নতুন তোলা-উনুনে চালে ডালে চাপিয়ে ভাজার বেগুন কুটতে বসেছিল সে, এমন সময়ে যে-সব ভীরু মেয়েরা দরজার আড়াল থেকে তাদের মালপত্র নিয়ে আসতে দেখেছে তারা আসতে লাগল এক দুই করে। অসম্ভব তাদের কৌতূহল কলকাতার মেয়েদের প্রতি। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মৃদুলা বুঝতে পারছিল যে গ্রাম সুখের জায়গা নয়।

তুলসী আড়াল আবডাল থেকে হ্যারিকেনের মাজা আলোয় যতটা সম্ভব মৃদুলার মুখের ভাব লক্ষ করে যায়। তারপর নানা কথা ভেবে কেমন একটু নার্ভাস বোধ করে। এতখানি করার পর যদি মৃদুলা সুখী না হয়ে থাকে তবে তার সুখ কোথায়?

নতুন চৌকির ওপর সদ্য পাতা বিছানায় রমেনের মুখোমুখি আঁট হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল তুলসী। বলল, এ-জায়গাটা খুব ডেভেলপ করবে, বুঝলি? ভাবছি কিছু জমিয়ে-টমিয়ে এ দিকেই জমি কিনব।

কথাটা বলেই তার খেয়াল হল যে, যাকে সে এই কথা বলল তার জমি-বাড়ি কিংবা পার্থিব সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহ না থাকারই কথা! মনে মনে একটু লজ্জা পেল তুলসী। বরাবর রমেনের কাছে নিজেকে তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে তার, আজও হল।

সকালবেলায় উঠেই রমেনের চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু মৃদুলা একটু আপত্তি তুলল, কেন যাবেন এক্ষুনি? কোনও কাজ তো নেই! আজকের দিনটা থেকে যান না।

আসলে বালিগঞ্জ স্টেশনে বিভুকে দেখার পর থেকেই মৃদুলা ক্রমান্বয়ে অস্বস্তিতে আছে। কেবলই মনে হয় যে-কোনও সময়ে যে-কোনও দিন বিভুর আবির্ভাব ঘটবে এইখানে। তুলসীকে মৃদুলা চেনে। যদি কখনও বিভুর মুখোমুখি হয় তবে কোথায় উবে যাবে তুলসীর সাহস! বিভুর আক্রোশের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতাই তুলসীর নেই। তাই লম্বা চওড়া সাহসী রমেন কয়েকটা দিন তাদের কাছে থাক। দুটো ঘরের একটা তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

রমেন থাকল।

মৃদুলাকে বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে চলে যেতে দেখল বিভু। ফেরার পথে ট্যাক্সিতে খুব অন্যমনস্কভাবে বসে ছিল সে। গড়িয়াহাট পেরিয়ে যাওয়ার পর লক্ষ করল সামনে আর একটা ট্যাক্সি। পিছনের কাচ দিয়ে দেখা যায়, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে।

প্রথমটায় কিছু মনে হয়নি বিভুর। দৃশ্যটা উদাসীনভাবে দেখল একটু। কিন্তু ট্যাক্সিটা আগাগোড়া তার ট্যাক্সির আগে আগে চলছিল। এতে সামান্য উষ্ণতা বোধ করল সে। কেন ওই ট্যাক্সিটা আগে আগে যাবে! বিকেলের নিস্তেজ আলোয় সে লক্ষ করে, মেয়েটার মাথা ভেঙে ছেলেটার ঘাড়ে নেমে আসে। ছেলেটা একটা হাত তুলে মেয়েটার কাঁধ জড়িয়ে ধরেছে। ওদের দু'জনেরই অবস্থা একটু বেসামাল।

বিভু হাত বাড়িয়ে ট্যাক্সিওয়ালার কাঁধ ছুঁয়ে বলে, ওই ট্যাক্সিটাকে ওভারটেক করো সর্দারজি।

ট্যাক্সিওয়ালা বিভুকে খানিকটা চেনে। যারা চেনে না তারাও চিনে নেয়। ফলে সর্দারজি নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে হর্ন দিল।

ত্রিকোণ পার্কের কাছে দুটো ট্যাক্সির জানালা সমান্তরাল হলে বিভু মুখ বাড়িয়ে দেখে, মেয়েটার কোলে ছেলেটার হাত।

বিভু চেঁচিয়ে বলল, এই শালা, সরে বোস।

ভীষণ চমকে ছেলেটা হাত টেনে নিল। ওদের ট্যাক্সিওয়ালা ফিরে তাকাল। বিভুর চিৎকারেই বুঝি ওদের ট্যাক্সিটা টলমল করে একটু আঁকাবাঁকা হয়ে আবার সোজা হল।

ওদের পেরিয়ে এসে বিভু পিছন ফিরে দেখল, ছেলেটা আর মেয়েটা অনেক দূরে সরে বসেছে। হাসল বিভু। পরিতৃপ্তির হাসি। শালা প্রেম করবে! দেশের এই অবস্থা, আর শালারা প্রেম করবে, অ্যাঁ!

মাঝে মধ্যে আজকাল বিভুর অদ্ভুত সব খেয়াল দেখা যায়। রাস্তা দিয়ে দু'টি ছেলেমেয়ে জোড় বেঁধে যাচ্ছে, বিভু হয়তো আসছে উলটো দিক থেকে। এ-রকম অবস্থায় সে ঠিক দু'জনের মাঝখান দিয়ে সোজা হেঁটে যায়; দু'জনকে ছিন্ন করে, দূরে সরিয়ে আনন্দ পায়।

রাসবিহারীর মোড়ের কাছে, রসা রোডে একদিন এই কাণ্ড করল বিভু। এবারের ছেলেটা হলুদ গেঞ্জি গায়ে, স্বাস্থ্যবান চেহারা। ফলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটা বিভুর কাঁধ চেপে ধরল।

বিভু ফিরে দাঁড়ায়। আপনমনে শান্তভাবে একটু হাসে। তাই! ছোকরার গায়ে জোর আছে। প্রেমিকাকে বীরত্ব দেখাতে চায়।

কী হল এটা? ভদ্রভাবে হাঁটতে শেখোনি! ছেলেটা গরম খেয়ে বলে।

বিভু শুধু হাসে। গায়ে জোর থাকলে কী হয়, প্রেমিকরা কোনও দিনই তেমন নিষ্ঠুর হতে জানে না। তুমি কি পারো আমার মতো হৃদয়হীন হতে! পারলে তুমি হতে মাস্তান। কিন্তু তুমি তো তা নও।

বিভু কিছুমাত্র গায়ের জোর দেখাল না। কেবল অতিশয় হৃদয়হীনতায় ঠান্ডা মাথায় ডান হাতের দুটো আঙুল সাঁড়াশির মতো তুলে লঘু হাতে ছেলেটির চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

এই হল কায়দা বুঝলে! শত রেগে গেলেও তুমি কখনও পারবে না কারও চোখে আঙুল ঢোকাতে। তোমার মায়া হবে।

ছেলেটা প্রথমে বুকফাটা চিৎকার করে দু'চোখ চেপে ধরেছিল। চশমা পরা মেয়েটা প্রথমে বুঝতে পারেনি কী হল। তারপর বুঝতে পেরে সে তাড়া করল বিভুকে হাতের সাদা ভ্যানিটি ব্যাগটা অস্ত্রের মতো তুলে ধরে।

বিভু শান্তভাবে কয়েক পা দৌড়ে গেল। ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেল ছুটন্ত বাস।

পা-দানিতে দাঁড়িয়ে দূর থেকেই সে দেখল ছেলেটা ফুটপাথে গড়াগড়ি যাচ্ছে। বোধ হয় কাঁদছে। ভিড় জমে উঠেছে আস্তে আস্তে।

প্রেম! শালা প্রেম! দেশের লোক বোমা বন্দুক খেয়ে মরে যাচ্ছে, ফসল ফলছে না জমিতে— তোমরা শালা প্রেম করবে! প্রেমের কি এই সময়! প্রেম দিয়ে কী হয় রে শালা জীবনে, যে সর্বস্ব নিয়ে একটা মেয়ের পিছনে ল্যাং ল্যাং করে ঘুরবে একটা ছেলে!

বিভু তাই রাস্তায় জোড়া ছেলেমেয়ে দেখলে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কখনও দূর থেকে চেঁচিয়ে আওয়াজ দেয়। মুখ খারাপ করে।

বিশু মাঝে মাঝে তাকে সাবধান করে দেয়, বড় বেশি তড়পাচ্ছিস। একদিন বেমক্কা মার খেয়ে যাবি, তোর চেয়ে ঢের মাস্তান আছে।

কিন্তু বিভু বিড় বিড় করে। না, তার চেয়ে বেশি কেউ নেই।

টুপু যেদিন মৃদুলাকে তুলে দিয়ে এসেছিল তার পরদিনই ফুটপাথের দোকান থেকে একটা দেশি লোহার লম্বা চকচকে ছুরি কিনেছিল। হাতলটা কাঠের। ছুরিটা এত লম্বা যে পকেটে আঁটে না।

পরদিন শানে ঘষে ছুরিটাকে আরও তেজালো করে তুলেছিল সে। বন্ধুরা দেখে বলল, বেশ ছুরি। কী করবি এটা দিয়ে?

দেখিস।

টুপু ছেলেমানুষ। কিন্তু ঠিক ছেলেমানুষের মতো সে বলেনি কথাটা। স্টেশনে দিদির সামনে দিয়েই যখন বিভু হেঁটে গিয়েছিল তখন দিদির মুখের ভাব আর বাবার অসহায় শ্বাস টানা সে লক্ষ করেছিল। এর পর থেকেই তার নিজেকে বড় বেশি অসুখী মনে হয়েছিল। এত বিমর্ষ সে আর কখনও বোধ করেনি।

খোলা অবস্থায় ছুরিটা সে পকেটে রাখে। পকেটে হাত দিয়ে মাঝে মাঝে অনুভব করে হাতলটা। ছুরিটাকে নাড়ে, ঘোরায়। ফলে কয়েক বার তার হাত কাটল, ছুরির ডগায় ফুটো হয়ে গেল আঙুল।

রাতে মা-বাবার চোখের আড়ালে দিদির শোওয়ার ঘরে একটা পুরনো কোলবালিশ দেয়ালের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে ছুরিটার প্রথম পাঠ নিল টুপু। আশ্চর্য কোলবালিশটা ঠিক ছুরি-খাওয়া মানুষের মতোই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গেল। পেটের ওপর হাতলটা রইল জেগে।

কেবল টুপু জানল, এ-রকম হবে। আর-কেউ জানল না।

টুপুর সিনেমায় যাওয়া বারণ। কিন্তু পোস্টার দেখে সে দুটো মারদাঙ্গার ছবি বেছে নিল। স্কুল পালিয়ে দেখে এল দুটো ছবি। তার চোখে মুখে এবং মনে যথেষ্ট হিংস্রতার সঞ্চার হয়ে গেল। ছবি দুটোর শেষে সত্য এবং অহিংসা এবং প্রেম ইত্যাদির কথা বলা হয়েছিল। টুপু সেগুলো মনে রাখল না।

আজকাল টুপু ডিটেকটিভ বইগুলো দু'বার করে পড়ছে।

বাইরে থেকে তাকে এখন বেশ ভাবুক আর গম্ভীর দেখায়। কেউ 'বিভুর শালা' বলে চিৎকার করে তাকে খ্যাপালে সে ফিরেও তাকায় না।

সে এই পারিবারিক দুর্দিনের শেষ দেখতে চায়।

কয়েক দিনই গা-ঘেঁষা দূরত্বে দেখা হল বিভুর সঙ্গে। আগের মতোই রাস্তা ছেড়ে পাশে সরে দাঁড়াল টুপু। ভয় পেল। চোখে চোখ রাখল না।

টুপু নানাজনের কাছে শুনে শুনে শিখেছে যে পেটই হল সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। সেখানে হাড় নেই। ছুরিটা ঢুকিয়ে একটু আড়াআড়ি টেনে দিতে হয়। ছুরিতে খুব ধার থাকলে ব্যাপারটা মোটেই শক্ত না।

উনচল্লিশ

দীর্ঘ রাস্তা মোটর চালিয়ে গভীর রাতে ফিরেছে সঞ্জয়। তারপর বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে নিঃসাড়ে। কাত হয়ে শুয়ে আছে সে। তেল-না-দেওয়া রুক্ষ চুলে ধুলোটে লালচে রং। এখনও চুল বাড়েনি সঞ্জয়ের। মায়ের শ্রাদ্ধের সময়ে কামানো হয়েছিল মাথা। তেল তেল করছে মুখ, গালে দাড়ি বেড়ে কর্কশ দেখাচ্ছে মুখখানা। হয়তো স্বপ্ন দেখছিল সঞ্জয়। তার ঠোঁটে একটু হাসির আভাস। সারা মুখখানায় কোনও পাপের চিহ্ন নেই, কিন্তু তাকে নিদারুণ পরিশ্রান্ত দেখায়।

রিনি এই দৃশ্যটা দেখল বার বার। কাল রাতে ঘুম থেকে উঠে সে সঞ্জয়কে দরজা খুলে দিয়েছিল। দেখেছিল হাসিমুখে সঞ্জয় দাঁড়িয়ে আছে দরজায়, হাতে সুটকেস।

ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল, পিকলু কই?

পিকলু! পিকলুকে কি সঞ্জয়ের মনে ছিল?

সুটকেস মেঝেয় রেখে মশারি তুলে আধখানা শরীর ভিতরে ঢুকিয়ে ঘুমন্ত পিকলুকে 'বাবা সোনা' এই সব বলে আদর করেছিল সঞ্জয়। ঠিক বাবাদের মতোই, আদেখলেপনায়।

সম্ভবত সেটা ছিল রিনির মুখোমুখি হওয়ার অস্বস্তি থেকে পলায়ন। নইলে পিকলুকে কখনও হাত-মুখ না ধুয়ে আদর করে না সে।

কিন্তু রিনি জানে, এ-অস্বস্তিটকু চিরকাল থাকবে না সঞ্জয়ের। বিয়ের পর প্রথম প্রথম সঞ্জয় বাইরে মদ খেলে কড়া জর্দা দেওয়া পান খেয়ে আসত। তবু টের পেত রিনি! টের না পাওয়ার ভান করত। ক্রমে ক্রমে সাহসী হতে হতে সঞ্জয়ের হুইস্কির বোতল আজকাল খাওয়ার ঘরের ফ্রিজেই মজুত থাকে।

ঠিক সেই রকম দিঘা বেড়ানোর ব্যাপারটাও একদিন সঞ্জয় প্রকাশ্যে করবে; রিনির মুখোমুখি দাঁড়াবে নিঃসংকোচে সরল গাছের মত। সেদিনের কথা ভাবলে রিনির ভয় করে।

কাল রাতে যে সঞ্জয় আসবে তার খবর আগে দেয়নি। ফলে খাবার ছিল না।

সঞ্জয় মুখে বলল, খেয়ে এসেছি।

কিন্তু বস্তুত অতিরিক্ত উন্মাদনায় তার খাওয়ার কথা মনেই ছিল না। তার মুখ-চোখ সেই সাক্ষ্য দিচ্ছিল।

রিনি কথা না বলে রুটি টোস্ট করেছে, ডিম ভেজেছে, তৈরি করেছে কফি। সঞ্জয়ের খাওয়ার সময়ে মুখোমুখি বসে লক্ষ করেছে তার মুখ। সমুদ্রের আবহাওয়ায় থাকার ফলে তাকে একটু কালো দেখাচ্ছিল।

রিনি কেঁদেছিল সঞ্জয় ঘুমোনোর পর।

সকাল থেকে ঘুরে ফিরে রিনি আসছে শোওয়ার ঘরে। অকারণে সঞ্জয়ের মাথার নীচে বালিশ ঠিক করেছে। পিকলুকে বিছানা পেতে শুইয়েছে খাওয়ার ঘরে ডাইনিং টেবিলের ওপর। পাছে তার চেঁচামেচিতে সঞ্জয়ের ঘুম ভেঙে যায়।

পিকলু এখন হামা টানে। টলমলে পায়ে কখনও দাঁড়ায়। তারপর ঝুপ করে বসে পড়ে। পাছে সে পড়ে যায় সেই ভয়ে শোওয়ার ঘর থেকে বারবার খাওয়ার ঘরে যাচ্ছিল রিনি।

এইভাবে সারা সকাল সে হাঁটছে। খাওয়ার ঘর থেকে শোওয়ার ঘর, আবার খাওয়ার ঘর। রিনি কোনও শারীরিক অনুভূতি টের পাচ্ছিল না। সকাল থেকে সে কিছুই খায়নি। কিন্তু তার খিদে পাচ্ছিল না, তেষ্টা পাচ্ছিল না। দুই ঘরে যাতায়াতে সে বোধ হয় মাইলখানেক হেঁটে ফেলল।

বেলা ন'টা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠতেই বুকের ভিতরে দুর দুর করে উঠল তার। দম বন্ধ হয়ে এল প্রায়। আজ সকালে সে এই প্রথম নিজের শরীর টের পেল।

কে?

আমি সেই লোক। সঞ্জয়বাবু ফিরেছেন?

লোকটা কোনও দিনই নিজের নাম বলে না। কিন্তু গলাটা এখন চেনা হয়ে গেছে রিনির।

ফিরেছেন। রিনি কাঁপা গলায় বলে। প্রথম প্রথম টেলিফোন রেখে দিত রিনি। কিন্তু আজকাল রাখে না। লোকটা সঞ্জয়ের নানা খবর দেয় তাকে। এই রকমভাবেই লোকটার সঙ্গে বোঝাপড়া এবং অদ্ভুত বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছে রিনির। সম্ভবত লোকটা সেই মেয়েটাকে ভালবাসে।

লোকটা কী যেন ভাবে। তারপর বলে, আপনি ওঁকে কিছু বলেননি?

কী বলব।

বলা উচিত। নইলে এরকম হতে থাকবে। আমাদের আর কিছুই করার থাকবে না।

রিনি চুপ করে থাকে।

লোকটা আত্মগতভাবে বলে, মেয়েটা এত সস্তা ছিল না বুঝলেন? কী করে যে ও এতটা বোকামি করতে পারে! মানুষ কী রকম পালটায়!

রিনি চুপ।

লোকটা আস্তে করে বলল, আমি আজ সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করব। যদি উনি কথা শুনতে না চান তবে—

লোকটা এইটুকু বলে ইতস্তত করলে রিনি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করে, তবে কী করবেন?

কিছু একটা করব। সামথিং হার্শ। আমার অনেক বন্ধু আছে। মেয়েটিকে বাঁচানো দরকার, আপনাকেও।

টেলিফোন রেখে দিয়ে রিনি আবার ঘুরতে থাকে। খাওয়ার ঘর থেকে শোওয়ার ঘর, আবার খাওয়ার ঘর।

সঞ্জয় চোখ মেলে তাকিয়ে সকালের ঝলসানো রোদ দেখে চোখ মিটমিট করে। অভ্যাসবশত ঘুম-চোখে হাত বাড়ায় রিনির জন্য। পায় না। পাশ ফিরে শূন্য বিছানাটা দেখে। সাদা এবং প্রকাণ্ড বিছানা। রিনি কোথায়! কেটে পড়ল নাকি? সঞ্জয় চমকে ওঠে।

ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে সে রিনিকে দেখে, এ-ঘর থেকে শ্লথ পায়ে ও-ঘরের পরদার আড়ালে চলে গেল।

শুয়ে থেকেই একটা সিগারেট ধরায় সঞ্জয়। সকালের এত স্পষ্ট আলো তার সহ্য হয় না। এত স্পষ্টতা তার অসহ্য লাগে। তার মনে হয় এর পর থেকে সারা জীবন দিনের চেয়ে রাতটাই তার বেশি ভাল লাগবে।

দিঘা থেকে ফেরার পরদিন সঞ্জয় গাড়িটা গ্যারেজে পাঠিয়েছিল ধোয়ামোছা আর মেরামতের জন্য। বিকেলের দিকে অফিস থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি না পেয়ে হেঁটেছিল অনেক দূর। টের পায়নি যে তাকে অনুসরণ করছে কয়েকজন লোক— যাদের চেহারা কালো, রোগা, কিন্তু মজবুত, যাদের দেখলেই পেশাদার গুন্ডা বলে চেনা যায়।

একটু অন্যমনস্ক ছিল সঞ্জয়। অনিমার ভক্তদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল যে ছেলেটি সেই শুভময় ঘোষাল তার অফিসে এসেছিল সেদিন। ছেলেটি মোটাসোটা গোলগাল, সঞ্জয় শুনেছে ছেলেটা নাকি ভাল রবীন্দ্রসংগীত গায়। ছেলেটি সঞ্জয়ের মুখোমুখি হয়ে একটুও না ঘাবড়ে বলল, আপনি দু'টি মেয়ের সর্বনাশ করছেন। এক নম্বর, অনিমা, আর দু'নম্বর রিনি— আপনার স্ত্রী।

এ-সব শান্তভাবে শুনল সঞ্জয়। বেয়ারাকে ডেকে দু' কাপ কফি আনতে বলল। বাড়িয়ে ধরল সিগারেটের প্যাকেট। ছেলেটাও শান্তভাবে সিগারেট নিল, কফি খেল। কিন্তু সোজা চোখে চোখ রেখে যা বলার তা বলতে ছাড়ল না। পুরনো ধরনের নীতিকথাই বলল বেশি। চরিত্র, সতীত্ব, সমাজ— এই সব নিয়ে যত দূর বলা যায়। ছেলেটি অনিমাকে ভালবাসে। গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারার কোনও ছেলেকে এ-রকম শীতল এবং শান্তভাবে রেগে যেতে কখনও দেখেনি সঞ্জয়।

শুভময়ের সঙ্গে একটু কথার খেলা খেলতে ইচ্ছে হয়েছিল তার। তাই কথার এক ফাঁকে হঠাৎ বলেছিল, অনিমার জন্য আমার কাছে আরও কয়েকজন এসেছিল। ডিজায়রেবল ক্যান্ডিডেটস।

ডাহা মিথ্যে। কিন্তু ছেলেটি এই প্রথম সামান্য লাল হয়ে গেল।

সঞ্জয় হঠাৎ টেবিলের ওপর ঝুঁকে বলল, অনিমা কীরকম মেয়ে তা তো আপনি জানেন বোধ হয়। আপনি শান্তশিষ্ট ভদ্র ছেলে, ওকে নিয়ে সামলে রাখতে পারবেন না। চান্স পেলেই ও দড়ি ছিঁড়বে, খোঁটা ওপড়াবে। আমি পাকা লোক, তবু আমিই সামলাতে পারছি না।

সঞ্জয় ছেলেটির গোল মুখে কোনও ভাবপরিবর্তন টের পেল না। কিন্তু ওর মুখে রক্তিমাভাটা লেগেই ছিল।

সঞ্জয় হঠাৎ যেন বে-খেয়ালে তার চেক-বইটা বের করে ফয়েলগুলো শুভময়কে দেখিয়ে বলল, চার দিনে আমরা খরচ করেছি হাজার দেড়েক টাকা। এই দেখুন।

শুভময় ইঞ্জিনিয়ার। সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। সম্ভবত সে বড়লোকের ছেলে নয় এবং বাড়িতে পুষ্যিও অনেক। সম্ভবত হাজার খানেকের বেশি মাইনে সে এখনও পায় না। তাই চার দিনে দেড় হাজার টাকা খরচের কথায় সে একটু ভ্রূ তুলল।

তারপর আস্তে করে বলল, বাঙালি মেয়েরা আজকাল কত দূর অধঃপতনে গেছে!

বলে সে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে একটু ইতস্তত করে বলল, আপনার স্ত্রীকে আমিই বেনামে ফোন করতাম। আজ সকালেও করেছি।

খুশি হল সঞ্জয়। বলল, আবার করবেন। যখন খুশি। ও খুব একা একা বোধ করে। ফোন করলে খুশি হবে।

এটাও কথার খেলা। ছেলেটার নীতিবোধ বড় প্রবল। সেইখানেই বোধ হয় আঘাতটা লাগল। শীতল চোখে নীরবতায় সঞ্জয়কে একটু দেখে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অফিসে যতক্ষণ ছিল সঞ্জয় তারপর, ততক্ষণ সে মৃদু একটা অস্বস্তি বোধ করেছে। কোনও কারণ নেই তবু কেবলই সে একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল।

অন্যমনস্ক সঞ্জয় 'বার'-এ একটু সময় কাটিয়েছিল বিকেলে। তারপর এসপ্ল্যানেডের ভিড় ঠেলে মেট্রোর সামনে দাঁড়াল ট্যাক্সির জন্য। কী ভেবে রাস্তা পার হয়ে গেল গোলঘরের পেচ্ছাপখানার দিকে। আবার বেরিয়ে এসে প্যান্টের বোতাম এঁটে গাছের তলায় ঝুপসি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যখন সিগারেট ধরাচ্ছিল তখন গোটা চারেক লোক নিঃশব্দে ঘিরে দাঁড়াল তাকে। চারজন পেশাদার লোক।

কাজটা অবশ্য তাদের পক্ষে সহজ হয়নি। সঞ্জয় প্রথম চোটে দু'জনকে নিয়ে নিয়েছিল। একজনের তলপেটে একটা লাথিও জমিয়ে দিয়েছিল সে। এরা কারা, এবং কেন তাকে মারছে তা ভাববার চেষ্টাও করেনি সে। কেবল লাথিটা মেরে সে আদিত্যর লাথিটার শোধ নেওয়ার এক অদ্ভুত আনন্দ বোধ করেছিল।

কিন্তু লোকগুলো ছিল পেশাদার। মার খাওয়া তাদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। কাজেই সঞ্জয়ের ঘুসি লাথি তারা তৃণজ্ঞান করে খুব চটপট সেই প্রকাশ্য জায়গায় তাদের কাজ সারল। চার পাশ থেকে ঘিরে, অভ্যস্ত সুন্দর হাতে।

পেটে সামান্য মদ ছিল সঞ্জয়ের। ফলে সে ওদের হাত আর পায়ের কাজ বুঝতেই পারল না। ঢলে পড়ল লোহার রেলিঙের তলায়, সিমেন্টের বাঁধানো গোড়ায় মাথা রেখে শুয়ে বমি করতে লাগল।

একসময় এ-সব ঘটনা ছিল তার গায়ের ধুলো। চট করে ঝেড়ে ফেলতে পারত। কিন্তু এবার তা হল না। কয়েক দিন ঘরে শুয়ে-বসে থাকতে হল তাকে। ডাক্তার দেখাতে হল। ওষুধ খেতে হল। ডাক্তার দেখেশুনে বললেন, ব্লাডপ্রেশার খুব হাই।

ইয়াঃ। সঞ্জয় শুয়ে থেকে সারা দিন আপনমনে হাসে। মনে মনে রিনিকে সম্বোধন করে কথা বলে, এই সবই বয়সের ব্যাপার, বঝলে রিনি। বয়স হয়ে যাওয়ার চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি মানুষের জীবনে আর নেই। কে আমাকে মেরেছে আমি তার কী জানি। কেন মেরেছে তাই বা কে জানে। কিন্তু এ-কথা ঠিক, বয়সের শেষ ঢলে মানুষের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়। খুব শান্তভাবেই মানুষের তা গ্রহণ করার কথা। আমি তো আর খুব সুন্দর জীবনযাপন করিনি!

আমি এখনও সন্ন্যাসী হওয়ার কথা ভুলিনি। বাইরে এই যে আমাকে দেখছ, সদ্ গুন ঝরে-যাওয়া লোক, চুরি করছে, টাকা জমাচ্ছে, করছে অবৈধ প্রেম, মদ খাচ্ছে— এ-সব কিছু আমার অন্তরের সেই বৈরাগ্যকে স্পর্শও করছে না। একদিন-না-একদিন সেই বৈরাগ্য সব ফেলে রেখে চলে যাবে।

কিন্তু যাওয়া হয় না।

মাঝে মাঝে আজকাল রাতে তার ঘুম আসে না। অনেকটা হুইস্কি খাওয়ার পরেও না।

কখনও নানা কাজে ব্যস্ত সঞ্জয় হঠাৎ গলার কাছে হাত তুলে একটা মাংসের ডেলাকে অনুভব করে। লাম্প। চমকে উঠে ভাবে, ক্যান্সার-ফ্যান্সার হবে না তো! কখনও বা শোওয়ার দোষে ঘুমের মধ্যে তার শ্বাসকষ্ট হয়। অমনি তড়বড় করে উঠে বসে। ভাবে, শরীরের মধ্যে কোথাও রক্ত জমাট বাঁধছে না তো! যদি থ্রম্বসিস হয়!

কখনও বা সে ঘুম-চোখে অকারণে রিনিকে ডাকে।

রিনি!

উঁ! রিনি ঘুমগলায় উত্তর দেয়।

রিনি! আবার ডাকে।

উঁ!

রিনি!

উঁ!

তখন পাশ ফিরে রিনির কানে কানে বলে, আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। পিকলুকেও। ঘর সংসার টাকা সব কিছুকেই। তবে আর কবে আমি সন্ন্যাসী হব!

রিনি এ-সব কথা বিশ্বাস করে না। চুপ করে থাকে। আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সঞ্জয়ের কেমন যেন ফাঁকা লাগে বুক। আড়াল থেকে কে যেন তাকে এই সব মিথ্যে রঙিন কথা বলায়। অকারণে। সে রমেন হবে না। সে কোনও দিন রমেন হবে না।

চল্লিশ

রমেনের ছোট্ট বিছানা আর টিনের সুটকেস পড়ে আছে। পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই জিনিসপত্র রেখে গেলে ফিরে আসার সম্ভাবনাও রেখে যায়। কিন্তু রমেনের বেলায় এ-নিয়ম খাটবে কি? ও দুটো তুচ্ছ জিনিস রমেনকে ফিরিয়ে আনবে, এ-কথা ভাবতে ললিতের ভরসা হয় না।

তবু নিজের অজান্তে রমেনের জন্য অপেক্ষা করে ললিত। রমেন যত দিন তার কাছে ছিল, তারা পাশাপাশি শুত, তখন প্রায়ই ললিত টের পেত, সারা রাত জেগে আছে রমেন। মাঝরাতে কি ভোর রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে অসহায় ললিত মৃদু অস্পষ্ট গলায় ডাকত, রমেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেত, কী রে! ললিত জিজ্ঞেস করত, জেগে আছিস? উত্তর পেত, আছি। তাই আবার নিশ্চিন্তে ঘুমোত ললিত। রমেনের এই নিরন্তর জেগে থাকা দেখে ললিত বড় অবাক হয়েছে প্রতি রাত্রে। ললিত ডাকবে, ডেকে পাছে সাড়া না পায়, সেইজন্যই কি জেগে থাকত রমেন? তুই কী রে রমেন? আমার জন্য কই কেউ তো কখনও এ-রকম জাগিয়ে রাখেনি নিজেকে!

কত কথা মনে পড়ে ললিতের। অপর্ণার মোটর গাড়িটা তার হাতে এক বিকেলে ছেড়ে দিয়েছিল রমেন, তারা ঘুরপাক খেয়েছিল ময়দানের নির্জন রাস্তায়। বহুকাল বাদে সেইদিন প্রথম নিজের ওপর কিছুক্ষণের জন্য একটা গভীর বিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল সে। কিংবা মনে পড়ে, শ্মশানের সেই ঘটনার কথা, তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ভয় ভেঙে দিয়েছিল রমেন। কিংবা মনে পড়ে, কীর্তনের মধ্যে তাকে টেনে নিয়েছিল, অলৌকিক জয়ধ্বনি বের করেছিল তার অবিশ্বাসী কণ্ঠ থেকে।

এখনও মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে গেলে অদূরে রমেন আছে ভেবে ঘুম-গলায় ললিত ডাকে, রমেন! উত্তর পায় না। মাঝরাতে তাই হঠাৎ এক শূন্যতা ভূতের মতো শিয়রের জানালা জুড়ে দাঁড়ায়।

রমেনের সঙ্গে আর দেখা হবে কি তার? সময়মতো রমেন যদি না ফেরে? মরার সময়ে রমেন যদি কাছে থাকে তবে বোধ হয় ললিতের তেমন কষ্ট হবে না।

বিজয়া দশমীর দশ দিন বাদে একদিন শাশ্বতী এল মাকে বিজয়ার প্রণাম করতে।

প্রণাম করে উঠে হাসিমুখে বলল, বড় দেরি করে এলাম।

সতেজ, সুন্দর হাসিটি। ঝকঝকে দাঁতে সকালের রোদ আর পেয়ারাপাতার সবুজ আভা চিকমিক করে গেল।

ললিতকে ইচ্ছে করেই একটু উপেক্ষার ভান করে শাশ্বতী। 'কেমন আছেন! শরীর ভাল তো!' এ রকম দুটি-একটি মামুলি প্রশ্ন করে সোজা চলে গেল রান্নাঘরের দরজায়। মা'র সঙ্গে বসে গল্প করল অনেকক্ষণ।

চলে যাওয়ার সময়ে ললিত তাকে এগিয়ে দিতে সঙ্গ নেয়। আর তখন দু'জনেরই বড় লজ্জা করতে থাকে। শাশ্বতী রমেনকে বলেছিল, সে যেন ললিতকে বলে যে, শাশ্বতী তাকে ভালবাসে। রমেন সে কথা বলে গেছে। তাই তারা বড় লজ্জা পায়। রমেন বলে গেছে, কিন্তু তারা কেউ পরস্পর পরস্পরকে সে-কথা বলে না।

শাশ্বতী মুখ তুলে প্রশ্ন করে, আপনার সেই সন্ন্যাসী বন্ধু—তিনি কোথায়?

কী জানি!

রমেন বলেছিল, ক্যান্সারের ওষুধ জানে। সে-কথা বিশ্বাস হয় শাশ্বতীর। ক্যান্সারের ওষুধ এখনও বাজারে বেরোয়নি। তা বলে কি নেই? কেউ না কেউ ঠিক জানে। লুকিয়ে রেখেছে। বলছে না। শাশ্বতী এও জানে যে, রমেনই সেই লোক। ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছেন। সময় হলে ঠিক মুহূর্তে সে এসে দেখা দেবে আবার। ভোজবিদ্যার মতো আরোগ্য দান করবে ললিতকে। এ-কথা মুখে বলে না শাশ্বতী। কিন্তু অন্তরের গভীরে সে বিশ্বাস করে। ভীষণ বিশ্বাস করে।

একচল্লিশ

কালীপুজোর রাত্রে খুব অদ্ভুতভাবে মারা গেল বিভু। পাড়ার পুজো। বিকেলে প্রতিমা আনার সময়ে তাদের লরির ধাক্কায় বোসপাড়ার মণ্ডপের একটা স্টিকলাইট ভেঙেছিল। সেইজন্য বোসপাড়ার ছেলেরা আটকে রেখেছিল প্রতিমাসুদ্ধ তাদের লরি। লাইটের দাম না দিলে তারা প্রতিমা ছাড়বে না।

কয়েকটা ছেলে দৌড়ে এসে এ-খবর পাড়ায় রটিয়ে দেয়। শুনে ভীষণ খেপে গিয়েছিল বিভু। বিভু মাস্তান। বস্তুত শহিদ বা সৈন্য কোনওটাই হওয়া যায়নি বলে তার ক্ষোভ নানা দিকে ফেটে বেরোচ্ছিল। তাই সকলের আগে দৌড় দিয়েছিল সে। বোসপাড়ায় যাওয়ার ঘুরপথ একটা আছে। সে-রাস্তায় বিভু যায়নি। সে গিয়েছিল দলবল নিয়ে। মহীনের খাটাল পার হয়ে বস্তি, নালা, মাঠ পেরিয়ে। বোমবাজি আর ছোরার ঝিলিকে বোসপাড়া ম্লান হয়ে গিয়েছিল। খাঁ খাঁ করছিল ওদের মণ্ডপ। আলোজ্বালা শূন্য মণ্ডপে ওদের অসহায় কালী, খাঁড়া তুলে বিভুর মাস্তানি দেখছিল। চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট তারা দখল করে রইল মণ্ডপ। বোসপাড়ার ছেলেরা ছাদ কিংবা অলি-গলি থেকে কয়েকটা ইট পাটকেল ছুড়ল মাত্র। ওদের ছ'জনকে মাটি নেওয়াল বিভু আর তার দল। বাদবাকিরা পালাল।

ফেরার পথে বিভু রাস্তার আলোর বালব ভাঙতে ভাঙতে এল। তার কচি শাকরেদরা এ-ব্যাপারে নিখুঁত পরিপাটি হাতের কাজ দেখাচ্ছিল। গোটা পাড়া অন্ধকার করে দিয়ে ফাঁকা নিরাপদ কয়েকটা পটকা ফাটিয়েছিল তারা।

অন্ধকারেই ঘটল ঘটনাটা। নিজেদের পাড়ার সীমানায়। অনেক রাতে মণ্ডপের পিছনেই সেই রাতে চমৎকার ভোজ রান্না হচ্ছিল। মাংস আর ভাত। ঝুড়ি ভরতি ছিল বাংলা মদের বোতল। বিভু রাত বারোটার পর খিদে বাড়াতে দুটো বোতল তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল মণ্ডপ ছাড়িয়ে মহীনের খাটালের পাশে বস্তিতে ঢুকবার কঁচা রাস্তার ধারে, যেখানে একটা নতুন বাড়ি উঠছে। বাঁশের ভারার শেষ ধাপটাতে বসে শান্তভাবে বিভু খাচ্ছিল। নেশা হয়েছিল খুব। দাঁড়িয়ে উঠে সে একটা হাঁক ছেড়েছিল। রুস্তমি হাঁক।

ভয়ে কেঁপে কুঁকড়ে আরও ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল পাড়া।

তারপর সামান্য টলোমলো পায়ে মণ্ডপের দিকে ফিরছিল বিভু।

সামনে রহস্যময় একটা আলো-আঁধারি, দূরে ধূ ধূ করে জ্বলে মণ্ডপের আলো। মাইক্রোফোনে বাজছে হিন্দি গান।

ঠিক এ সময়েই অন্ধকার থেকে একটা বাচ্চা ছেলেকে লাফিয়ে এগিয়ে আসতে দেখেছিল বিভু। সে সতর্ক হয়নি। হওয়ার কারণও ছিল না। আজ কত ছেলে রাত জেগেছে।

ছেলেটা মুখোমুখি ঠিক ছায়ার মতো এগিয়ে এল। তার ডান হাত পকেটে। তারপরই পকেট থেকে হাতটা বেরিয়ে এল। বিভু কেবল দেখতে পেয়েছিল হাতখানা একটু পিছিয়ে নিয়ে তারপর সামনের দিকে জোর চালাল ছেলেটা। খুব নিখুঁতভাবে নয় অবশ্য। কচি হাতে তেমন জোরও ছিল না।

তবু তখনই বিভু টের পেয়েছিল তার পেটের ভিতর পর্যন্ত ঠান্ডা অবশ করা কঠিন অনুভূতি। প্রথমে ব্যথা লাগে না। ছেলেটা কুঁজো হয়ে তার পেটের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ছোরাটা টানার চেষ্টা করল। কিন্তু টেরিলিনের শার্টটা আর ভিতরের গেঞ্জিতে আটকে ছিল বলে ছোরাটা খুব বেশি দূর গেল না। ছেলেটা ছোরার হাতলে জড়ানো রুমালটা দ্রুত খুলে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তখন বিভু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল তার পেটের ওপর আলো-আঁধারিতে একটা ছোরার হাতল। খুবই আনাড়ি হাতের কাজ। তবু এও যথেষ্ট।

'আঁক' করে একটা শব্দ তুলেছিল বিভু। হাঁটু ভেঙে সামনে পড়তে পড়তে সামলে নিয়েছিল। তারপর মুহূর্তে নিজের সর্বনাশ বুঝতে পেরে কয়েক পা প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে সে চিৎকার করেছিল—বি...শু...

যখন তার শরীর নিয়ে হইরই করছে ছেলেরা, অ্যাম্বুলেন্স ডাক্তার ডাকতে ছুটছে তখন বিভু চোখ বুজে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। বেলা শেষের পড়ন্ত আলোয় চষা খেতের ও-পারে লম্বা একটা লাঠি উঁচু করে ধরে একজন মুসলমান লোক তাকে চেঁচিয়ে বলছে—ভাই রে...এ, তুই এঁকে বেঁকে ছোট, এঁকে বেঁকে ছোট...

বস্তুত মৃত্যুর সময়টা বেশ উপভোগই করেছিল বিভু। শেষ পর্যন্ত তার কোনও দুঃখ ছিল না। যতক্ষণ তার জ্ঞান ছিল ততক্ষণ সে জিজ্ঞেসও করেনি, কে তাকে মেরেছে।

পাড়ার ছেলেদের সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে পুলিশ গিয়ে রাত্রে বোসপাড়ার কয়েকটা ছেলেকে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিভু-হত্যা-মামলার কোনও কিনারা হয়নি।

কালীপুজোর রাত্রেই খুব জ্বর এসেছিল টুপুর। অন্তত টুপুর তাই মনে হয়। যেদিন সে যে ভয়ংকর কাজটা করেছিল, তারপর অন্ধকারে অনেকটা দৌড়েছিল সে। যদিও এ-পাড়া তার শিশুবয়স থেকে চেনা, তবু সে দিক ঠিক করতে পারছিল না। তার আবছা মনে পড়ে সে বস্তির বাইরের কাঁচা নর্দমা পেরোতে গিয়ে একটা আছাড় খায়। কোনও ব্যথা টের পায়নি, তারপর খাটালের পাশের নাবাল মাঠটা পার হয়। কারও বাগানের বাঁশের কঞ্চির বেড়ায় ধাক্কা খেয়ে আবার পড়ে যায়। এমন প্রাণভয় সে আগে কখনও বোধ করেনি। বাগানের বেড়ার শব্দ শুনে কুপি হাতে একটা বুড়ো তোক মাঠকোটা বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সেই কুপির আলোতেই টুপু বাগানের এক কোণে কয়েকটা কলাগাছের ঝোপ দেখতে পেয়েছিল। হামাগুড়ি দিয়ে, তারপর বেড়া টপকে সে যখন ঠান্ডা, ভেজা-ভেজা সেই কলাঝোপের ভিতর গিয়ে দাঁড়াল, তখনই টের পেল, তার সমস্ত শরীর হি-হি করে কাঁপছে, গলা শুকনো, বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস শব্দ। হয়তো সেই সময়ে কিছুক্ষণ তার চেতনাও ছিল না। আবার আধচেতনার মধ্যে সে টের পেল, তাকে প্রবল মশা খুবলে খাচ্ছে, পায়ের পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কেঁচো, কানের কাছে ঝিঁঝি ডাকছে। তার বড় ভূতের ভয়। তবু সেই অন্ধকারে, বাগানের ঝোপঝাড় দেখেও তার ভূতের কথা মনে পড়েনি। কেবল প্রবল জ্বর আর শীতের ঠকঠকানি টের পেয়েছিল সে।

চারিদিক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ টের পেয়ে অনেক রাতে কলাঝোপ থেকে বেরিয়ে জ্বর গায়ে বাসায় ফিরল সে। মা জেগে বসে ছিল, বাবাও ঘর-বার করছেন দেরি দেখে। তাঁরা কেউ কিছু বলার আগে সে কোনওক্রমে বলল, আমার বড় জ্বর হয়েছে। আমি শোব।

দেখি। বলে মা গায়ে হাত দিতেই সে ভীষণ চমকে উঠেছিল। তখনও তার প্রতিটি রোমকূপ শিউরে কাঁটা দিয়ে আছে।

সারা রাত তার মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙল। সে এ-পাশ ও-পাশ করে ভাবল, বড় আনাড়ির মতো কাজ হয়েছে। ওই ছুরিটা! এটা তার বন্ধুরা দেখেছে। এখন যদি তারা বলে দেয় এটা টুপুর ছুরি! রুমাল দিয়ে হাতের ছাপ এড়িয়েছে সে, কিন্তু ছুরিটা যে অনেকেই চেনে। তা ছাড়া, বিভু যদি না মরে গিয়ে থাকে! নিশ্চয়ই তাকে চিনেছে বিভু। যদি কাল-পরশু এসে তাকে ধরে! কিংবা মরার আগে যদি পুলিশের কাছে এজাহার দিয়ে যায়!

ভয়ে উঠে বসেছে টুপ। মাকে ডেকে বলেছে, জল দাও।

আবার শুয়েছে। আবার উঠে ডেকেছে মাকে আমি পেচ্ছাপ করতে যাব। আলোটা জেলে দাও।

সকাল হতেই প্রবল ভয় তার কণ্ঠা পর্যন্ত হয়ে এল। এবার! এবার কিছু একটা হবে। সে যত ভাবে ততই তার নিজের ভুলগুলো চোখে পড়ে। দেয়ালির রাতে অনেক লোক জেগে ছিল। তাদের কেউ কি টুপুকে ছুটতে দেখেছে! যদিও তখন বেশি রাতে সব বাড়িতেই প্রদীপের আলো নিভে গেছে, তার ওপর ছিল অমাবস্যা, তবু দেখে থাকা অসম্ভব নয়।

সে বাড়ি থেকে বেরোল না। বলল, জ্বর হয়েছে। কিন্তু তার মা আর বাবা তার গায়ে হাত দিয়ে কিছুই টের পেল না। তারা চুপ করে রইল। ওদিকে পাড়ায় প্রবল উত্তেজনা। কারা এসে বাবাকে ডেকে নিয়ে গেল। কাঠ হয়ে পড়ে রইল টুপু।

বাবা ফিরে এসে হঠাৎ খুব খুশিমুখে মাকে বলল, ওই যে বিভুটা—ওটাকে কাল বোসপাড়ার কোনও ছেলে স্ট্যাব করেছিল। রাত্রেই মারা গেছে।

কয়েক দিন ধরে আস্তে আস্তে টুপু বুঝতে পারল, কেউ তাকে সন্দেহ করছে না। তবু অস্বস্তি বোধ করত সে। খাওয়া হত না, ঘুম হত না। রাস্তায় বা বাড়িতে কেউ তার দিকে তাকালে সে বড় চমকে উঠত।

মাঝখানে সে দিনকতক বেড়িয়ে এল মৃদুলার কাছ থেকে। সেই বেড়ানোটা ভালই লেগেছিল তার। এ-বছর পরীক্ষা হয়ে গেলে সামনের বছর থেকে তাকে পলাশপুরেই ভরতি করা হবে হয়তো। তাই যেন হয়। বেহালায় সম্ভবত আর থাকতে পারবে না টুপু।

কিন্তু আবার আস্তে আস্তে তার মন অন্য দিকে ফিরছে এখন। সে বুঝে গেছে বিভুর মৃত্যুর জন্য বোসপাড়ার ছেলেদেরই সন্দেহ করছে পুলিশ। বোসপাড়ার মারপিট লেগেই আছে। ভদ্রলোকেরা নিষ্ফল নাগরিক কমিটি তৈরি করে শান্তিরক্ষার কথা ভেবে আরও বুড়ো আর অথর্ব হয়ে যাচ্ছে।

বাবাকে আজকাল একটু সজীব দেখায়। এখন বাবা খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সকাল ন'টার রোদে পাড়ার ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলে। নিশ্চিন্ত মনে হাঁটাচলা করে রাস্তায়। বাবাকে আজকাল আর তেমন বুড়ো দেখায় না।

মাঝে মাঝে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে টুপু। দেখে অবাক হয়। তার মুখের মেয়েলি কচি ভাবটা সে আর খুঁজে পায় না।

বড় হয়ে সে কী হবে, এ-কথা ভাবতে গেলে আজকাল সে বিভুর কথাই ভাবে। তবে সে হয়তো বিভুর মতো অসতর্ক আর বোকা হবে না। সে যদি হয়, তবে হবে আরও বুদ্ধিমান এক মাস্তান।

পিতুর মর্নিং স্কুল শেষ হয় প্রায় এগারোটায়। সে সময়ে পিতুর সঙ্গিনীরা প্রায়ই দেখতে পায় স্কুলের সামনেই বড় রাস্তায় একটা সাইড-কার সমেত লাল মোটর সাইকেল থেমে আছে। কালো কিন্তু স্বাস্থ্যবান চেহারার

সার্জেন্ট লোকটা চোখে গগলস এঁটে বসে থাকে। মেয়েরা হাসে। পিতুকে ঠাট্টা করে বলে, চিলা চিভা চির?

পিতু একটু রাঙা হয়। কিন্তু গর্বে অহংকারে ময়ূরের মতো পেখম ধরে সে মনে মনে।

শম্ভু আজকাল আর ব্যায়াম করে না। এবার "দক্ষিণ কলকাতাশ্রী" কম্পিটিশনেও সে নাম দেয়নি। আসলে পিতুরই ব্যাপারটা পছন্দ নয়। সে কয়েক বারই বলেছে, শরীরে সাপের মতো মাংস কিলবিল করে—মাগো! ঘেন্না করে আমার। সেই থেকে শম্ভুরও বীতরাগ এসেছে ব্যায়ামে।

প্রথম চাকরি। তাই ভয় করে। নইলে পিতুকে সে মোটর-সাইকেলে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিত। এখন শুধু গলিতে-ঘুঁজিতে একটু আধটু চক্কর দেয়। এগিয়ে দেয় বাস-স্টপ পর্যন্ত। তারপর বিমর্ষ মনে কোনও এক রাস্তার মোড়ে একা একঘেয়ে গাড়ি-ঘোড়া সামলানোর কাজ করে।

কিন্তু পিতুর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। দেখা হতে থাকে।

মাস দুয়েকের মধ্যেই আকাশের শেষ অংশটুকু ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল বিমানের মাথা থেকে। চিন্তাশক্তি ফিরে এল। এখন তাকে হাসপাতালের দালানের বাইরে যেতে দেওয়া হয়। সে মাঝে মাঝে বাগানে চলে আসে। চমৎকার বাগান। ভেজা মাটির গন্ধে বুক ভরে যায়। সে পপি আর চন্দ্রমল্লিকার সারির ভিতর দিয়ে ঘোরে। মালীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা বলে।

অপর্ণার প্রকাণ্ড গাড়িটা এসে প্রায় রোজই ফুলগাছগুলোর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। অপর্ণার সঙ্গে বাগানে দাঁড়িয়ে কথা বলে বিমান। আকাশের নীচে। চারদিকে ফুলের আলোর মধ্যে। কত কথা হয়।

আর কিছুদিন মাত্র তাকে রাখা হবে এইখানে। অবজার্ভেশনের জন্য। তারপর বিমানের ছুটি। তখন তারা দু'জনে এক অদ্ভুত স্বর্গ রচনা করবে, এই কথা ভাবে অপর্ণা।

অপর্না মাঝে মাঝে রমেন নামে সেই লোকটির কৃতজ্ঞতা বোধ করে। একদিন নিভৃতে মোটর গাড়িতে বসে সে ঘুড়িয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল সেই মানুষের কথা যে নিরন্তর সততায় অপর্নাকে রক্ষা করবে। আছে কি তেমন মানুষ! সাধু-সন্নাসীর মতো সেই লোকটা বলেছিল, আছে। বিমান। সেই যে চমকে গিয়েছিল অপর্না, তারপর আজও সে সেই সত্য কথাটা ভুলতে পারে না। সত্য যে, বিমান ছাড়া আর কেউ নেই তার।

অপর্ণা রোজ আসে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে। একদিন এক শীতের বিকেলে অপর্ণা তার প্রকাণ্ড গাড়িখানা নিয়ে হাসপাতাল থেকে তুলে নিল বিমানকে। বলল, আমরা কিন্তু নতুন জায়গায় যাচ্ছি। তুমি আপত্তি করতে পারবে না।

না, বিমান আপত্তি করল না। ছেলেবেলা থেকে সে কখনও সুখের মুখ দেখেনি। সুখকে গ্রাহ্যও করেনি। কিন্তু এখন সে টাকার শক্তিকে অগ্রাহ্য করতে ভয় পায়। তার পুরনো ব্যাধি সেরে গেছে। যেদিন সে দু'জন ছিনতাইবাজের হাত থেকে নিজের ঘড়ি আর মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েছিল, সেদিন থেকেই বস্তুত তার এই ব্যাধির সূত্রপাত হয়েছিল। এখন সেই সব পাগলাটে ইচ্ছে তার আর হয় না। অপর্ণার পাঠানো নানা মহার্ঘ ফল ও খাবার, দামি ওষুধ এ-সবের ফলে ব্যাধি সেরে তার শরীর এখন মোটাসোটা, উজ্জ্বল গায়ের রং, মাথার চুল সুবিন্যস্ত, গায়ে ভাল জাতের জামা প্যান্ট। তবে, তাকে কেমন একটু ভিতু, সুখী আর লাজুক দেখায়। তার মাঝে মাঝে মনে হয় সে বোধ হয় আর ইচ্ছে করলেও মাথার ভিতরে আকাশটাকে টের পাবে না। আকাশ চিরকালের জন্য মাথার ওপরে, অনেক ওপরে, সরে গেছে।

মোটর গাড়ির এক কোণে গভীর গদির মধ্যে ডুবে থেকে সে বিকেলের স্নিগ্ধ, নীল সুন্দর আকাশের দিকে নিস্পৃহভাবে একটু চেয়ে দেখল।

চোখ ফিরিয়ে দেখল আকাশি নীল শাড়ি পরেছে অপর্ণা। সামনের দিকে ঝুঁকে ড্রাইভারকে পথের নির্দেশ দিচ্ছে। কয়েক বারই জিজ্ঞেস করেছে বিমান, কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে? অপর্ণা তার উত্তর দেয়নি। কেবল রহস্যময়ভাবে হেসেছে।

এখন আর জিজ্ঞেস করছিল না বিমান। যেখানেই হোক, খুব সুন্দর ভাল জায়গাতেই তাকে নিয়ে যাবে অপর্ণা, এ-কথা বিমান জানে। তারপর সেখানেই সে আর অপর্ণা থাকবে সুখে, চিরকাল, যত দিন না অমোঘ বিচ্ছেদগুলি আসে। কিন্তু এখন বিমান কেবল এটুকুই দেখতে পায় যে, অপর্ণার শাড়িখানার আকাশি নীল রংটা বড় সুন্দর। এ-রং অপর্ণাকে মানায়।

আশ্চর্য এই যে, ডাক্তারেরা কত জাদু জানে। কত ভোজবিদ্যা লুকোনো আছে ভাল ওষুধ আর পুষ্টিকর খাবারে। এখন আর কিছুতেই একটা অন্ধকার পৃথিবীর কথা ভাবা যায় না, যে-পৃথিবীতে জন্মান্ধ মানুষেরা হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজছে।

অপর্ণা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল। আস্তে করে বলল, তোমার মাথার আসলে কোনও গোলমাল ছিলই না, ডাক্তার বলেছে।

কী বলেছে?

বলেছে অপুষ্টি এবং বেশি চিন্তা-ভাবনা থেকে তোমার ও-রকম হয়েছিল। ওটা কিছু না। তুমি একদম সেরে গেছ।

বিমান, সেটা টের পায়। কতক জিনিস আছে যা টের পেতে ভুল হয় না।

অপর্ণা বলল, বাবা রাজি হয়েছেন।

কীসে?

লাজুক হেসে মুখ নামাল অপর্ণা। বলল, তুমি একটুও আমার কথা ভাবো না। ভাবলে বুঝতে পারতে।

বিমান বুঝতে পেরে যায়। সামান্য একটু সুখ এবং দুঃখ সে যুগপৎ বোধ করে। হ্যাঁ, বোধ হয় এখন সে অপর্ণাকে ভালবাসে। এতকাল সেই ভালবাসা সে বুঝতে পারত না।

বুঝতে পেরে নিজেও লাজুক হাসল বিমান। বলল, রাজি হলেন? কী করে!

বাঃ! আমি বাবার এক মেয়ে না! একটাই তো সন্তান আমি। আমার ইচ্ছে না রেখে কি বাবা পারে!

বিমান চুপ করে থাকে।

একটু ইতস্তত করে অপর্ণা বলে, কিন্তু এরপর থেকে তোমাকে ওই বিদঘুটে চাকরি ছেড়ে আমাদের কারখানা-টারখানার ভার নিতে হবে। তুমি আর আমি দু'জনে মিলে চালিয়ে নেব, কী বলো?

বিমান ঘাড় নাড়ে। এখন আর কোনও কাজই তার শক্ত বলে মনে হয় না।

হিন্দুস্থান পার্কে অপর্ণাদের বাড়ির অদূরে একটা সাদা সুন্দর ছোট বাড়ির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। সদ্য রং করা বাড়ি, এখনও এধারে ওধারে কাজ চলছে। অপর্ণা বলল, এটা আমাদেরই একটা বাড়ি। এত দিন ভাড়াটে ছিল।

তারা গেল কোথায়?

তাদের তুলে দেওয়া হল। পুরনো ভাড়াটে কম টাকা দিত। তা ছাড়া ওদের অবস্থাও পড়ে গিয়েছিল।

কী করে তুললে? মামলা করে?

অপর্ণা মাথা নাড়ল, না। তাতে অনেক সময় লাগত। আমরা ওদের কিছু নগদ টাকা দিয়েছি। ঘুষ।

বলে মাথা নিচু করল অপর্ণা। বিমানের সামনে হয়তো এটুকু ওর অপরাধবোধ।

কিন্তু তার দরকার ছিল না। কবিতার আর দর্শনের বই কেনার জন্য বিমানও ঘুষ নিত জমাদারদের কাছ থেকে। মাথা পিছু দশ পয়সা।

মিস্ত্রিদের কাজের তদারক করতে করতে ধুলোবালি আর চুনের গুঁড়ো লাগা চেহারার উঁচু করে পরা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা অপর্ণার বাবা সদরের সামনে এসে গম্ভীর মুখে ওদের সামনে দাঁড়ালেন।

বিনা দ্বিধায় বিমান এগিয়ে গিয়ে তাকে প্রণাম করল।

যত দূর গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাঁকে তিনি আসলে তত দূর গম্ভীর ছিলেন না। তিনি বিমানের মুখে কী একটু খুঁজে দেখলেন। তাঁর হিসেবি চোখ কিছু একটা খুঁজে পেল। পরমুহূর্তেই বিমানের কাধে একখানা হাত রেখে বললেন, এই বাড়ি তোমার।

তারপর একটু থেমে বললেন, শুধু এই বাড়ি কেন, ক্রমে ক্রমে আমার যা আছে সবই তোমার হবে। সব দেখেশুনে নিয়ো।

এই কথা শুনে একটু কুঁকড়ে গেল বিমান। কেন কুঁকড়ে গেল তা সে বুঝতে পারল না তক্ষুনি। কিন্তু অস্বচ্ছভাবে তা হল, কোনও দিনই আর তার দ্বারা কোনও মহান মানুষের জন্ম হবে না।

এক রবিবারের সকালে রিনি আর পিকলুকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে এল সঞ্জয়। ললিতের মাকে ডেকে বলল, চলুন মাসিমা, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, আর যেখানে যেখানে যেতে চান, সব ঘুরিয়ে আনি। সারা দিনের প্রোগ্রাম।

সঞ্জয় ললিতের মুখের দিকে ভাল করে তাকাল না। লজ্জা পাচ্ছিল বোধ হয়। মা বেরোবার জন্য গোছগাছ করতে রান্নাঘরে গেল, সঙ্গে রিনি। পিকলু ললিতের কোলে বসে দুই স্বাস্থ্যবান হাতে তার মুখে থাবা দিচ্ছিল। সেই সময়ে সিগারেট ধরিয়ে সঞ্জয় জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। ললিত মনে মনে হাসে! ইচ্ছে করে, উঠে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে একটা ঝাঁকুনি দেয় সঞ্জয়কে। বলে, ইডিয়েট, তোর লজ্জা করে না? সব পেয়েও ফাউ-এর জন্য হাত বাড়াস, ভিখিরি হ্যাংলা কোথাকার!

কিন্তু কিছু বলে না ললিত। অনেক পুরনো একটা ঘটনা মনে পড়ে যায় বলে নিজেকে দুর্বল লাগে। বহুকাল আগে, তখনও সঞ্জয় ম্যাকগুইয়ের অ্যান্ড কোম্পানির অফিসার, সে-সময়ে সার্কুলার রোডের একটা বিশাল ফ্ল্যাটবাড়িতে একটি মেয়ের কাছে মাঝে মধ্যে যেত সঞ্জয়। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, নিখুঁত সম্পন্ন গৃহস্থের মতো সাজানো ড্রয়িংরুম, আলমারিতে রবিঠাকুরের বই, দেয়ালে সুন্দর ছবি, অথচ সেটা প্রকৃতপক্ষে এক বেশ্যার আস্তানা। জোর করে সেখানে একবার সঞ্জয় টেনে নিয়ে গিয়েছিল ললিতকে। ললিত সেই সুন্দর ঘর দেখে অবাক হয়েছিল। মেয়েটিও কুচ্ছিত ছিল না, ছিপছিপে শরীর, টানা চোখ, কথাবার্তা শিক্ষিতার মতোই। মেয়েটি গিটারে তাদের রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়েছিল। ললিতের মাথা ঘুরে গিয়েছিল অল্প। তারপর কী হয়েছিল তা ললিত ইচ্ছে করেই মনে না করার চেষ্টা করে। কিন্তু উঠে গিয়ে সঞ্জয়ের চুলের মুঠি ধরার মতো জোর আর সে পায় না। ওই একবার, মাত্র একবার, একটি নীতিবোধহীনতার ঘটনা তাকে সারা জীবন সঞ্জয়ের কাছে

দুর্বল করে দিল কি? আশ্চর্য! অতীতের স্খলন, পতন কিংবা দুর্বলতাগুলির স্মৃতিকে জয় করতে না পারলে মানুষ কি আর কোনও দিন সোজা হয়ে দাড়াতে পারে না!

ললিত পিকলুর পেটের মধ্যে মুখ গুঁজে তার শিশুদেহের গন্ধে আর-একবার সেই অতীতের ঘটনাটি ভুলবার চেষ্টা করল।

ওরা চলে গেলে একা একা ঘর পাহারা দিচ্ছিল ললিত। এক ডাঁই পরীক্ষার খাতা খুলে বসে। পুজোর পর থেকেই আবার স্কুলে যাচ্ছে সে। নিয়মিত। একদিনও কামাই করেনি। একসময়ে সে ছাত্রদের পড়া ফেলে রাখত। টাস্ক দিয়ে বসিয়ে রাখত চুপচাপ। পরে টাস্ক দেখত না। ফলে ছাত্রদের পড়া পড়ত বাকি। সে-সব এখন আর করে না সে। খুব মন দিয়ে পড়ায়। আজকাল সে কাজের মধ্যে ডুবে থাকার চেষ্টা করে। স্কুল ম্যাগাজিনটার ভার ইচ্ছে করেই সে নিয়েছে এবার, সামনের সেশনে সে একটা ডিবেটিং ক্লাবও খুলবে।

সিগারেট ধরাতে গিয়ে ললিত দেখে দেশলাই ফুরিয়েছে। মোড় থেকে কিনে আনবে বলে গায়ে জামা দিয়ে বেরোল ললিত। গলিটা পেরিয়ে রাস্তায় পা দিতেই সে আপাদমস্তক বিদ্যুৎপ্রবাহে কেঁপে উঠল। দেখল, শাশ্বতী আসছে।

মাঝে মাঝেই আসে শাশ্বতী। মায়ের সঙ্গে গল্প করে যায়। কখনও বা স্কুলে ফোন করে ললিতের শরীরের খবর নেয়। তাই, শাশ্বতীর আসাটা তেমন বিচিত্র নয়। কিন্তু আজ! একা ফাঁকা ঘরে শাশ্বতীকে নিয়ে যাবে ললিত! তারা বসবে মুখোমুখি! এই দুরন্ত নির্জন শীতের দুপুরে। কেবল সে আর শাশ্বতী!

গুড়গুড় করে ডেকে ওঠে বুকের ভিতরটা ললিতের। উৎকণ্ঠা, ভয়, উত্তেজনা চেপে রাখতে গিয়ে তার হাসিটা ক্লিষ্ট হয়ে যায়।

আসুন।

শাশ্বতী তার মায়াবী চোখ তুলে সুন্দর হাসে।

ললিত মুগ্ধ হয়।

আজ মা নেই কিন্তু।

কোথায় গেছেন? শাশ্বতী একটু ভ্রূ তোলে।

দক্ষিণেশ্বর, আরও কোথায় কোথায় যাবে। আমার এক বন্ধু গাড়ি করে নিয়ে গেছে।

শাশ্বতী তবু এগিয়েই আসে। ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, কোথায় বেরোনো হচ্ছিল দুপুরে?

ললিত হাসে, দেশলাই নেই। আনতে যাচ্ছিলাম।

শাশ্বতী আবার ভ্রূ কোঁচকায়, সিগারেট খাওয়া কিন্তু বড্ড বেড়েছে। এতটা ভাল নয়।

সেই কাঁপা বুক, ক্লিষ্ট মুখখানা, অস্বস্তি নিয়ে শাশ্বতীকে ঘরে আনে ললিত। সদর দরজাটা হাট করে খুলে রাখে।

বসুন।

কালোর জমির ওপর হলুদ এমব্রয়ডারি করা একখানা রোব ছিল শাশ্বতীর গায়ে। সেখানা খুলে রেখে শাশ্বতী বলে, এতটা হেঁটে এসে গরম লাগছে।

আশ্চর্যের বিষয়, শাশ্বতীর হাবভাবে এতটুকু জড়তা নেই। ওর কি বোধশক্তি কম! ও কি বুঝতে পারছে না যে ললিতের সঙ্গে এই ভয়ংকর দুপুরে ও একা! ঠিক যেন নিজের বাড়িতে এসেছে, এরকমই হাবভাব ওর।

কপালের ঘাম ছোট্ট রুমালে মুছে বলল, কী করছিলেন! ওমা, কত খাতা!

বলতে বলতে ললিতের কাছে উঠে এসে ঝুঁকে খাতাগুলো কৌতূহলে দেখে শাশ্বতী। বলে, ইস! কত ফেল করিয়েছেন! একটুও মায়া দয়া নেই আপনার।

ললিত কাঁপা বুক নিয়ে বসে থাকে। মেয়েরা কত নিঃসংকোচ হতে পারে! সেদিন মিতু এসেছিল; সেও কত নিঃসংকোচে কথা বলল। অত ঘটনার পর ললিত তো মরে গেলেও কোনও দিন কথা বলতে পারত না মিতুর সঙ্গে।

মায়ের বিছানায় পা তুলে, হাঁটু মুড়ে বসে শাশ্বতী মৃদু চিকমিকে হাসি হাসে। অনায়াসে চোখ রাখে ললিতের চোখে। বলে, অনেক হেঁটে এসেছি। একটু চা খাব।

শুনে ললিত উঠতে যাচ্ছিল।

ও কী! কোথায় চললেন?

দোকানে চা বলে আসি।

কেন! অবাক হয় শাশ্বতী, চা আমি নিজেই তৈরি করে খেতে পারব। রান্নাঘরে কোথায় কী আছে আমি তো সব জানি।

অসহায়ভাবে ললিত বসে। চেয়ে থাকে।

হয়তো শাশ্বতী কিছু বুঝতে পারে। মাথা নিচু করে নরম অভিমানী গলায় বলে, আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?

ললিত ভীষণ লজ্জা পায়। লাল হয়ে কী একটু বলতে যায়। শাশ্বতী বাধা দিয়ে বলে, তা হলে আমি বরং চলে যাই।

কেমন যেন উদাসীন, অভিমানী, দুঃখী শোনাল ওর গলা। ললিতের অন্তর ককিয়ে ওঠে, না। যাবে কেন! গেলে আমি নিঃস্ব হয়ে যাব।

কিন্তু সে-কথা বলে না ললিত।

আচমকা তাকে আপাদমস্তক শিহরিত করে শাশ্বতী বলে, তুমি আমাকে অত ভয় পেয়ো না।

ললিত স্তব্ধ হয়ে নিজের রক্তের কলরোল শোনে।

দুরন্ত দুপুর বয়ে যায়।

কত ঘটনাই ঘটে যেতে থাকে পৃথিবীতে!

একদিন অপর্ণা আর তার সঙ্গে ফরসাটে এবং মোটামুটি ভাল চেহারার একজন লোক এসে হাজির। তখন সকালবেলা। অপর্ণা লাজুক মুখে একটু হাসল। সঙ্গের লোকটিও। তারপর লোকটি বলল, আমাদের বিয়ে। নেমন্তন্ন করতে এলাম। যেয়ো। দোসরা ফাল্গুন।

ভীষণ অবাক হয়েছিল ললিত। রেগেও গিয়েছিল, অচেনা উটকো লোকটা তাকে 'তুমি' বলায়।

কিছুক্ষণ পরে ভুল ভাঙল। লোকটি যে বিমান— একথা কে বিশ্বাস করবে? তার ইচ্ছে হয়েছিল বিমানের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়, চোখের তারার গভীরে অনুসন্ধান করে দেখে এই সেই পুরনো বিমান কি না।

বিমানকে দেখে ডাক্তার আর হাসপাতালের ওপর ভক্তি বেড়ে গেল ললিতের। ভক্তি বাড়ল ওষুধের ওপর। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি সে কৃতজ্ঞতা বোধ করতে লাগল। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। হে ভগবান, মানুষকে আর-একটু শক্তি দাও। আমি মরার আগেই সে আবিষ্কার করুক ক্যান্সারের ওষুধ।

নেমন্তন্ন করতে এল আদিত্যও। খুব ব্যস্তসমস্ত আর উদভ্রান্ত দেখাচ্ছিল তাকে।

এসে এক গাল হাসল। অমলিন হাসি। সেই আদিত্য, যার গড়ানে মন, সেখানে কোনও জল দাঁড়ায় না। বলল, মাঘের পঁচিশে বিয়ে, বুঝলি! পাত্রী ঠিক করেছেন বাবা। তাকে আমি চোখেও দেখিনি। বাবা দেখার কথা বলেছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি। দেখলুম, বাবার ইচ্ছেমতোই যখন চলব ঠিক করেছি, তখন আর নিজে দেখে কী হবে! নিজে তো আমি কিছুই করতে পারলুম না! জানি তো, সেই মেয়ে টাকার কাঁড়ি আর জিনিসপত্রের জঙ্গল নিয়ে আসছে। বনেদি ঘরের মেয়ে, যার গায়ে রোদ লাগেনি! কিন্তু সেজন্য আর দুঃখ নেই রে। আমি সব ভুলে গেছি। অতীতের সব।

বলে হাসল।

তারা দু'জন এসে বসল গণেশের চায়ের দোকানে। ললিত আর আদিত্য। সেদিনকার মতো বেঞ্চটাতে বসল দু'জন। কেবল মাঝখানে শাশ্বতী ছিল না। হয়তো তারা অনুভব করল সেটা, হয়তো করল না। কিন্তু গোপন এক অপরাধবোধে অস্বস্তি পেতে লাগল ললিত।

আদিত্য আস্তে আস্তে বলল, প্রকৃতি-টকৃতির মাঝখানে তিন মাস কাটিয়ে এলুম বুঝলি! একা থাকতুম একটা বাংলোয়। বাংলোর সামনেই একটা পিপুল গাছ, দুপুরে যখন হু হু করে গরম বাতাস বইত, তখন সেই গাছের ছায়ায় একটা চেয়ার নিয়ে বসতুম। বহুদূর পর্যন্ত ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখা যেত। জীবনে আমি এত দূর পর্যন্ত কমই দেখেছি। তাই নেশা লেগে যেত খুব। মাঝে মাঝে দেখতুম সামনের তিরতিরে নদীটা হেঁটে পার হয়ে বিকেলের দিকে দেহাতি লোকরা দূরের হাটে যাচ্ছে। সঙ্গ ধরতুম তাদের। কিছুতেই কলকাতায় ফিরতে ইচ্ছে করত না। ফেরার কথা ভাবলেই মনে হত, সভ্য জগতে সম্পর্কগুলো বড় জটিল। ফিরলেই আবার সে বনেদি বাড়ির কমপ্লেকস চেপে ধরবে। চেপে ধরবে ব্যর্থতার সব বোধ, হতাশা। তার চেয়ে এখানেই থেকে যাই না কেন! এক-একদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে বসতুম। কী নিস্তব্ধ লাগত চার দিক। কী উদাসী বৈরাগীর মতো দেখাত মাঠ ঘাট, নদী দূরের পাহাড়। মনে হত এরা আমাকে ভিক্ষা চাইছে। বলছে, দিয়ে দাও। নিজেকে দিয়ে দাও। অমনি রমেনের কথা মনে পড়ত। ইচ্ছে হত, চলে যাই। রমেনের মতো চলে যাই। একদিন হয়তো তাঁকে খুঁজে পাব যে একদিন রমেনকে নিশির ডাকের মতে ডেকে নিয়েছিল। লোলিটা, এক-একদিন আমি চলেও যেতাম। পায়ে পায়ে এগিয়ে নদী পার হতাম। হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম পাহাড়ের তলাকার জঙ্গল পর্যন্ত। সেইখানে গাছগাছালির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বিড় বিড় করে বলতাম, ফিরব না। ফিরব না। কিন্তু যেই সন্ধে হল, অন্ধকারে যখন সব ডুবে যাচ্ছে, অমনি ঘরের জন্য, আলোর জন্য, বিছানার জন্য কেমন অস্থির লাগত। কত বার ভাবতুম, আর মায়ের কাছে টাকা চাইব না, যে-ক'দিন এখানে আছি দেহাতি বস্তি কিংবা এর-ওর-তার কাছে ঘুরে ঘুরে চেয়ে-চিন্তে কাটিয়ে দিই, যেমন ফকির কি সন্ন্যাসীরা করে। কিন্তু হাতের টাকা ফুরিয়ে আসতেই কেমন ধকধক করত বুকের ভিতরটা। ভয় করত বড়। তাই মাকে আবার টাকা পাঠাতে লিখতুম। দ্যাখ, ফিরব না ফিরব না করেও আবার ফিরতে হল। ভালই হল, কী বলিস! সবাই কি আর রমেন হতে পারে!

হাসল আদিত্য।

যাস কিন্তু লোলিটা। পঁচিশে মাঘ। মনে থাকে যেন।

যাব। নিশ্চয়ই যাব।

লোলিটা, পুরনো কিছু মনে রাখিস না।

আদিত্য অস্থিরভাবে মাঘ মাসের প্রতীক্ষা করে আজকাল। রোজই নিমন্ত্রিতের তালিকায় একটু-দু'টি নতুন নাম যোগ করতে থাকে। তালিকা বড় হয় রোজ।

অনেক দিন বাদে নিশ্চিন্তে বাপের বাড়িতে এসেছে মৃদুলা। সঙ্গে তুলসী।

খ্রিস্টমাসের বন্ধটা তারা বেহালায় কাটাবে। খুশিতে ডগমগ করে মৃদুলা। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়ায় নিশ্চিন্তে। তাদের দুর্গ্রহ কেটে গেছে। একজনের মৃত্যু যে কত আনন্দদায়ক হতে পারে! বুকের চাপ হালকা করে দিতে পারে কতটা।

পলাশপুরে ফিরে যাওয়ার আগের দিন তুলসী দেখা করতে এলে তার মুখে চাপা আনন্দের আভা দেখে একটু অবাক হয় ললিত। বহুকাল ধরে সে তুলসীর এ-রকম তাজা, প্রাণময় মুখশ্রী দেখেনি।

বুঝলি রে, আমার একটা ফাঁড়া খুব জোর কেটে গেছে। বলে তুলসী। তারপর মৃদু মৃদু হাসতে থাকে আপনমনে। বস্তুত এবার বোধ হয় সে মৃদুলাকে পুরোপুরি পাবে। কোথাও আর মৃদুলার কোনও ভয়ংকর দাবিদার নেই।

তুলসীর কাছেই শুনল ললিত, পলাশপুরে কয়েক দিন থেকে আবার কোথায় চলে গেছে রমেন। বলে গেছে, আসবে। কবে আসবে কে জানে! তুলসী ঠোঁট উলটে বলে, ও শালা নৌকো বাঁধে না।

সুবলকে আজকাল আর চেনা যায় না। যাতায়াতের পথে মাঝে মাঝে সুবলকে দেখতে পায় ললিত। হয় গণেশের দোকানের সিঁড়িতে, নয়তো রায়বাবুর শূন্য বারান্দায় বসে আছে। একা একা বিড়বিড় করছে। গালে দাড়ি, রুখু চুল, চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচকে। কখনও তাকে ছেঁড়া পায়জামা আর ময়লা রঙিন শার্ট পরে উদভ্রান্তের মতো ঘুরতে দেখা যায়। আ-ছাঁটা চুল বাবরি হয়ে নামছে ঘাড়ে।

দেখে লুলিত বড় দুঃখ পায়। দেখা হলে সুবল সিগারেট চায়, নয়তো বলে, একটু চা খাওয়াবেন ললিতদা? আগে সুবল ললিতের সামনে সিগারেট লুকোত। কিন্তু সে-সব কথা মনে রাখে না ললিত। মাঝে মাঝে নিজেই ডেকে বলে, নে সুবল, সিগারেট খা। চা খাবি? আর কী খাবি বল!

সুবলের সারাটা দিনই প্রায় কাটে হিন্দুস্থান পার্কের রাস্তায় ঘুরে। দূর থেকে সে অপর্ণাদের বাড়িটাকে দেখে। দেখতে পায় বাড়িটাতে রং করা হচ্ছে। বাঁশের ভাড়ায় উঠে কাজ করছে মিস্ত্রিরা। ওরা অপর্ণার কত কাছে আছে, এই ভেবে সে হিংসা বোধ করে। একা একা বিড়বিড় করে কথা বলে সে, মাঝে মাঝে তার মাথার মধ্যে এক দুর্বোধ্য যন্ত্রণা হয়।

অপর্ণাদের প্রকাণ্ড গাড়িটা তার গা ঘেঁষে রাজহাঁসের মতো মাঝে মাঝে চলে যায়। সুবল দেখে, অপর্ণাদের বাড়িতে অনেক জিনিসপত্র কিনে আনা হচ্ছে। আনাগোনা করছে বহু লোকজন।

কী হবে এ-বাড়িতে? কোন উৎসব?

সুবল তা কিছুতেই ভেবে পায় না।

যাবে। দু'জনের বিয়েতেই যাবে ললিত। সুন্দর উপহার দিয়ে আসবে। জানিয়ে আসবে সত্যিকারের শুভকামনা।

ঘুরে-ফিরে শাশ্বতীর সঙ্গে দেখা হয়। রোজই। যেমন সাধ ছিল ললিতের, ঠিক তেমনি সন্ধেবেলার কলকাতার রাস্তায়, দোকানের আলোতে তারা পাশাপাশি হাঁটে। কখনও বা চুপচাপ বসে থাকে পাশাপাশি। এখন তারা পরস্পর কম কথা বলে। পৃথিবীতে আর কেউ তেমন করে টের পায় কি না কে জানে, তবে তারা যখন পরস্পরের কাছাকাছি থাকে, তখন স্পষ্টই টের পায়, সময় বয়ে যাচ্ছে। সময় বয়ে যাওয়ার কোনও শব্দ নেই, তবু তারা এক রকমের অদ্ভুত শব্দও বোধ করে। সেই টিপ টিপ শব্দ তাদের নিস্তব্ধতাকে ভয়াবহ করে তোলে।

মাঝে মাঝে শাশ্বতী রমেনের কথা জিজ্ঞেস করে, উনি কোথায় গেলেন? ফিরবেন না?

কে জানে! ঠোঁট ওলটায় ললিত।

মৃত্যুর কথা ভাবলেই পৃথিবীর প্রতি মায়া-দয়া বেড়ে যায়। অন্তরে অন্তরে ললিত মানুষের প্রতি জীবজগৎ ও গাছপালার প্রতি এক দুর্বোধ্য ভালবাসাকে অনুভব করে। এ রকম ভালবাসা সে কখনও টের পায়নি। একদিন সে যখন মানুষের মুক্তির কথা বলত, বিপ্লবের রাস্তা তৈরি করতে ব্যস্ত থাকত, তখনও না। তার মরে যেতে ইচ্ছে হয় না। সে ভাবে, এ-পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য সে একটা কিছু করে যাবে। খুব শিগগিরই করবে। মরে যাওয়ার আগেই।

কিন্তু মরেই কি যাবে ললিত! মাঝে মাঝে এর উত্তর সে খোঁজে শাশ্বতীর মুখে। শাশ্বতী সুন্দর হাসে। নিশ্চিন্ত মুখখানা। যেন সে নিশ্চিত বুঝে গেছে যে ললিত বেঁচে থাকবে, অসুখ সেরে যাবে।

মাঝে মাঝে সে মায়ের দিকে চেয়ে থাকে। কাঠকুড়ুনির মতো কোলকুঁজো মা ঘরের কাজ সারছে। খুটখুট করে ইঁদুরের মতো শব্দ করছে ঘরময়।

কেমন ছিল মায়ের সেই বয়সের চেহারা যখন ললিত ছিল তার কোলে?

কে জানে! ললিতের কেবল ইচ্ছে করে আর-একবার শিশু হয়ে এই মায়ের কোলে ফিরে আসতে। মাকে আরও কত ভালবাসার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু আচমকা ফুরিয়ে গেল বেলা।

রমেনের সঙ্গে আর দেখা হবে কি তার? সময়মতো রমেন যদি না ফেরে! মরার সময়ে রমেন যদি কাছে থাকে তবে বোধ হয় ললিতের তেমন কোনও কষ্ট হবে না। রমেন তার সুন্দর, শান্ত মুখখানা মুখের কাছে এনে বলবে, আবার আমাদের দেখা হবে ললিত, আবার আমাদের দেখা হবে। সেই গভীর বিশ্বাসের কথা শুনে মৃত্যুপথযাত্রী ললিতের মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে যাবে আনন্দে।

আসবে কি রমেন? মনে মনে অস্থির হয় ললিত। আকুল প্রতীক্ষা করে। সেই প্রতীক্ষায় তার আয়ু একটু একটু বাড়তে থাকে। অলক্ষে। সে টের পায় না। কিংবা টের পায়। কে জানে!

রাতে মাঝে মাঝে এখনও ঘুম ভাঙে তার। হঠাৎ মনে হয়, কাছেই রমেন বসে আছে। পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙে। ললিত পাশ ফিরে শোয়। কিন্তু তার কেবলই মনে হয়, কোথাও না কোথাও রমেন ঠিকই জেগে আছে। পাপ-পুণ্যময় দিনশেষে মানুষ যখন ঘুমোয়, তখন কারও কারও শিয়রের কাছে নিরন্তর জেগে আছে রমেন।

পলাশপুরে এক রাতে মৃদুলার চিৎকারে ঘুম ভাঙল তুলসীর। ভয় পেয়ে উঠে বসল। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় দেখা গেল মৃদুলা চোখ বড় করে তাকিয়ে ঘন শ্বাস টানছে।

কী হয়েছে মৃদুলা?

দেখো, আমার পেটের মধ্যে কী যেন নড়ছে।

নড়ছে? ভারী অবাক হয় তুলসী, কী নড়ছে?

ভীষণ ভয় করছে আমার। একটু তন্দ্রার মতো লেগে এসেছিল, অমনি হঠাৎ নড়ে উঠল। মৃদুলা ভিতু গলায় বলে।

তুলসীও ভয় পায় প্রথমে। তারপর মৃদুলার পেটের ওপর সে হাত রাখে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর টের পায়, হঠাৎ টোকা দেওয়ার মতো সেই নড়া, নড়ে ওঠা।

ওই দেখো। মৃদুলা চমকে বলে।

বোধ হয় বাচ্চাটা। তুলসী ফিসফিস করে বলে।

নড়ছে! বাচ্চাটা নড়ছে! ইস, কী রকম যে লাগছে আমার!

তুলসী মৃদুলার পেটের ওপর কান পাতল। অপেক্ষা করল অনেকক্ষণ। আবার সেই নড়ে ওঠা টের পেল। তার শরীর কাঁটা দিল রোমাঞ্চে। কী রকম পোকার মতো নড়ছে! শব্দটা কীসের? ওটা কি ওর হৃৎপিণ্ড, না কি হাত। না কি পা? কে জানে? সে জানান দিচ্ছে যে সে আছে, সে আসছে।

দুঃখময় পৃথিবীতে মানুষ কত পুরনো হয়ে গেল! তবু মানুষের জন্ম এখনও কী রোমাঞ্চকর!

এই লেখকের অন্যান্য বই

অনেকের গল্প
অসুখের পরে
আদম ইভ ও
অন্ধকার
আলোয় ছায়ায়
আলোর গল্প,
ছায়ার গল্প
আশ্চর্য ভ্রমন
উজান
উপন্যাস সমগ্র
(১ম-৫ম খণ্ড)
ঋণ
কাগজের বউ
কাপুরুষ
কালো বেড়াল,
সাদা বেড়াল
কীট
কোনও দিন
এরকমও হয়
কোলাজ
ক্ষয়
গতি
গয়নার বাক্স
গুহামানব
ঘুণপোকা
দ্বিতীয় সত্তার
সন্ধানে
ধন্যবাদ
মাস্টারমশাই
নরনারী কথা
নানা রঙের আলো
নীচের লোক
উপরের লোক
নীলু হাজরার
হত্যারহস্য
পরিহাটির হরিণ
পার্থিব
পিদিমের আলো
প্রজাপতির মৃত্যু ও
পুনর্জন্ম
ফজল আলি
আসছে
ফুলচোর
বনদেবী ও পাঁচটি
পায়রা
বাঁশিওয়ালা
বিকেলের মৃত্যু
ভুল করার পর
মাধব ও তার
পারিপার্শ্বিক

চক্র
চুরি
চোখ
জাল
ঝাঁপি
দশটি উপন্যাস
দিন যায়
দূরবীন
দ্বিচারিণী

মানবজমিন
ম্যাডাম ও মহাশয়
যাও পাখি
রহস্য সমগ্র (শবর ও অন্যান্য রহস্য কাহিনী)
লাল নীল মানুষ
শিউলির গন্ধ
শ্যাওলা
সতীদেহ
সন্ধি প্রস্তাব
সাঁতারু ও জলকন্যা
সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে
হৃদয়বৃত্তান্ত